কলিকাতা ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, পরিবর্তিত ও সংশোধিত নূতন পাঠক্রম (Syllabus) অনুসারে লিখিত ত্রি-বার্ষিক স্নাতক (Three- Year Degree, Pass Course) পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক।

সমাজদর্শন

[ত্রি-বার্ষিক স্নাতক-শ্রেণীর পাঠ্য]

অধ্যাপক শ্রীপ্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, এম. এ. (দর্শন ও বাংলা)

দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর (বীরভূম) এবং

পরীক্ষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় , কর্তৃক

প্রণীত

অধ্যাপক শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায়, এম. এ.

দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, যোগমায়া দেবী কলেজ ;

অধ্যাপক, আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা এবং পরীক্ষক,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; কর্তৃক

পরিমার্জিত

বি.পি

ব্যানার্জী পাবলিশার্স

৫/১এ, কলেজ রো

কলিকাতা ৯

প্রকাশক :
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১এ, কলেজ রো
কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ : আগস্ট '৬১

সপ্তম সংস্করণ (পরিমার্জিত ও সংশোধিত) : নভেম্বর '৬৪

মুদ্রাকর :
শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

সপ্তম সংস্করণের ভূমিকা

সমাজদর্শনের ষষ্ঠ সংস্করণ অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়াতে গ্রন্থটির সপ্তম সংস্করণ সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হল। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক প্রশ্নাবলীর দিকে লক্ষ্য রেখে এই পরিমার্জনার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং শিক্ষা-সম্পর্কীয় দার্শনিক মতবাদগুলোর আলোচনা এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

আশা করি এই নতুন সংস্করণটিও ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকদের সমাদর লাভ করবে। এই সংস্করণটি প্রকাশে কিছু বিলম্ব ঘটাতে আমি খুবই দুঃখিত।

হেতমপুর
নভেম্বর '৬৮

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

সমাজদর্শনের ষষ্ঠ সংস্করণ সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হল। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক প্রশ্নাবলীর দিকে লক্ষ্য রেখে এই সংস্করণটিতে কতকগুলি নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে; যেমন, 'সমাজদর্শন কি সম্ভব?', 'সমাজদর্শন কি নীতিবিজ্ঞানের উপাঙ্গ?', 'বিশ্ব-সম্প্রদায়ের সম্ভাবনা', 'রাষ্ট্রের উৎপত্তি', 'সামাজিক ব্যাধির কারণ', 'অপরাধ কিভাবে নিবারণ করা যায়?', 'অপরিণত বয়স্কদের দুষ্ক্রিয়তা', সামাজিক অগ্রগতির পথে যা সহায়ক ও প্রতিবন্ধক ইত্যাদি। এছাড়াও প্রতিটি অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়গুলি প্রায় নতুন করেই লেখা হয়েছে। 'সামাজিক ক্রমোন্নতি' অধ্যায়টি 'সামাজিক বিবর্তন ও অগ্রগতির' অধ্যায়টির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এবং সামাজিক ক্রমোন্নতি, সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতির পারস্পরিক পার্থক্যের আলোচনাও ঐ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

আশা করি এই নতুন সংস্করণটিও ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপকবৃন্দের সমাদর লাভ করবে। ইতি—

হেতমপুর
১০ই নভেম্বর '৬৭

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

স্নাতক-শ্রেণীর তিন বৎসরের শিক্ষাক্রম এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন পরিবর্তন এনেছে এবং এর ফলে পুরাতন পাঠ্যসূচীর প্রভূত রদ-বদল করা হয়েছে। 'দর্শন'-এর পাঠ্যসূচীর অন্যতম পরিবর্তন হচ্ছে দ্বিতীয় পত্রে নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শনকে যুক্ত করে দেওয়া। স্নাতক-শ্রেণীতে (*Pass course*) মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়াতে মাতৃভাষায় লেখা দর্শনের পাঠ্যপুস্তকের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। বাংলাভাষায় লেখা সমাজদর্শন-বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক খুবই কম। এই অভাব মেটাবার উদ্দেশ্য নিয়েই স্নাতক-শ্রেণীর (*Pass course*) নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী প্রথমে 'নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন' নামে পুস্তক রচনা করি। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে দ্বিতীয় খণ্ড এখন পৃথকভাবে 'সমাজদর্শন' নামে প্রকাশিত হল। বলা বাহুল্য, স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করার জন্য পুস্তকটিকে সযত্নে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত করা হয়েছে এবং প্রতি অধ্যায়ের শেষে সেই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার সংযুক্ত করা হয়েছে।

এ পুস্তক রচনায় আমাকে একাধিক গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। *Mackenzie*-র 'Outlines of Social Philosophy'; *MacIver* ও *Page*-এর 'Society'; *MacIver*-এর 'Community'; *Gisbert*-এর 'Fundamentals of Sociology'; *Miall Edward*-এর 'Philosophy of Religion'; *S. Radhakrishnan*-এর 'Religion and Society', *M. Ginsberg*-এর 'Sociology'; *Hobhouse*-এর 'Social Development'; *N. V. Joshi*-র 'Social Philosophy' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। এ সকল লেখকদের কাছে আমি

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ইতিপূর্বে মাতৃভাষায় দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য পুস্তক ও প্রবন্ধাদি যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের ব্যবহৃত পরিভাষা আমায় বিশেষ সাহায্য করেছে। সে জন্য আমি তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ। পরিভাষার অপ্রতুলতাহেতু প্রয়োজনবোধে কোনও কোনও স্থানে আমি নিজে নতুন পরিভাষা তৈরী করে নিয়েছি। এসব পরিভাষার একটা তালিকা গ্রন্থের প্রথমে ও প্রশ্নমালা গ্রন্থের শেষে যুক্ত করা হয়েছে।

সমাজদর্শনের বিষয়বস্তুগুলি এ পুস্তকটিতে সরল ও সহজ ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। তবে বিষয়বস্তুকে সহজ করার জন্য বিষয়বস্তুর গুরুত্ব যাতে হ্রাস না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা পরিভাষার পাশেই ইংরেজী প্রতিশব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর আলোচনাকে একদিকে যেমন অনাবশ্যকভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়নি, তেমনি পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত বিষয়বস্তুর অনাবশ্যক আলোচনায় পুস্তকের কলেবর স্ফীত করা হয়নি। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্ত্য সমাজ-বিজ্ঞানী ও সমাজ-দার্শনিকদের মতামতগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রন্থে সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে যেসব ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত দিয়েছি, সেগুলির দায়িত্ব আমারই।

এই পুস্তক রচনার জন্য সর্বপ্রথম প্রেরণা লাভ করি হাওড়া গার্লস কলেজ ও শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীঅজিতকুমার ঘোষের কাছ থেকে এবং সেই সঙ্গে প্রেরণা দিয়েছেন যোগমায়া দেবী কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায়। তিনি পুস্তকটির প্রতি অধ্যায় পাঠ করে যত্নপূর্বক পরিমার্জিত করেছেন এবং প্রয়োজনমত অংশবিশেষ পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বন্ধুবর শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ ও হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীকৌশম্বীনাথ মল্লিক সমাজদর্শনের কয়েকটি সমস্যার আলোচনায় তাঁদের অভিমত জানিয়ে এ গ্রন্থ রচনায় সহায়তা করেছেন। এছাড়াও বড়িষা বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যাপক, বন্ধুবর অমিয়কান্তি ভৌমিক, মগরা শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅনিল দাশশর্মা, হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুকুমার চন্দ্র—এ গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে নানাভাবে

আমায় সহায়তা করেছেন। এ ছাড়াও সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দের প্রেরণা ও বহু ছাত্র-ছাত্রীর সহায়তা এ গ্রন্থ রচনার মূলে বর্তমান।

পরিশেষে, যাদের জন্য বইখানি লেখা তারা উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে। ব্যানার্জী পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী এই পুস্তকটি প্রকাশের এবং শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না পুস্তকটি মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান মৃণালকান্তি সেনগুপ্ত, বি. এস্-সি, এ পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য এক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন অবকাশ নেই।

পুস্তকখানি ছাত্র-ছাত্রীগণ ছাড়াও যাতে সাধারণ পাঠকের উপকারে আসে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ইতি—

হেতমপুর
১৮ই সেপ্টেম্বর '৬১

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

SYLLABUS

SOCIAL PHILOSOPHY

CALCUTTA UNIVERSITY

Social Philosophy : Its meaning and scope. Relation to Sociology, Psychology, Politics and Ethics.

The social nature of man. Society and the Individual. Individualism and Socialism. Society as an Organism. The Idea of Common good.

Social groups and Institutions : Family, Community, State, Church, Educational Institutions and Cultural Association The Psychological and Philosophical bases.

Conditions of Social development. Social Ideals. Herd Sentiments. Common Interests. Religion as a Cohesive force The Marxist interpretation. Naturalistic theories.

Social Pathology : Crime and punishment. Social Evolution and Progress. The Social Self. The Ethos of a people.

BURDWAN UNIVERSITY

Social Philosophy : Its meaning and scope. Relation of Sociology, Psychology, Politics and Ethics.

The Social nature of man. Society and the Individual. Individualism and Socialism. Society as an Organism, the Ideal of Common Good.

Social groups and Institutions : Family, Community, State, Church, Educational Institution and Cultural Associations. Their Philosophical bases.

Conditions of Social Development, Social Ideals, Herd sentiments. Common interests, Religion as a Cohesive force. The Marxist interpretation. Naturalistic Theories.

Social Pathology : Crime and Punishment. The Philosophical basis of Social Evolution and Progress. The Social self. The Ethos of a people.

সূচীপত্র

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

পারিভাষিক শব্দ

Agnosticism—অজ্ঞেয়তাবাদ

Agnostic Naturalism—অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদ

Association—সংঘ, প্রতিষ্ঠান

Attitude—মনোবৃত্তি

Barbaric Institution—বন্য অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান)

Collective Mind—সমষ্টিগত চেতনা

Collectivism—সমষ্টিবাদ

Common Good—জনকল্যাণ, সাধারণ কল্যাণ

Common Interest—সাধারণ বা সমজাতীয় স্বার্থ

Common Will—সাধারণ ইচ্ছা

Communism—সমভোগবাদ

Community—সম্প্রদায়

Community Sentiment—স্বাজাত্যবোধ

Concept—ধারণা

Criteriological—সমালোচনামূলক

Cultural Institutions—সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান)

Crowd—জনতা

Custom—রীতি

Dogmatic Naturalism—বিচারহীন প্রকৃতিবাদ

Equality—সাম্য

Ethos of a People—লোকায়ত নীতিতত্ত্ব

Eugenics—সুপ্রজনন-বিজ্ঞান

Evolution—বিবর্তনবাদ

Formative Institution—গঠনমূলক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান)

Fraternity—ভ্রাতৃত্ব

General Will—সর্বগত ইচ্ছা

Governmental Institution—সরকারী অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান)

Group-mind—গোষ্ঠী চেতনা

Herd Sentiment—যূথ-মনোভাব

Idealism—ভাববাদ

Individualism—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

Individual Mind—ব্যক্তিচেতনা

Instinctive Action—সাহজিক ক্রিয়া

Institution—অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান

Interest—স্বার্থ

Like Interest—একজাতীয় স্বার্থ

Material Science—জড়বিজ্ঞান

Mental Science—মানসিক বিজ্ঞান

Morality—নৈতিকতা

Monarchy—রাজতন্ত্র

Nation—জাতি

Nationality—খণ্ড জাতি

Naturalism—প্রকৃতিবাদ

Normative—আদর্শনিষ্ঠ

Objective—ব্যক্তি-নিরপেক্ষ

Oligarchy—শাসকশ্রেণী
Ontological—তত্ত্বমূলক
Organic Theory—আঙ্গিক মতবাদ
People—জনসাধারণ
Philosophy of Religion—ধর্মদর্শন
Positive—বস্তুনিষ্ঠ অস্তিবাচক
Psychological—মনস্তত্ত্বমূলক
Quasi-group—আপাত-গোষ্ঠী
Race—বংশ
Reason—বিচারবুদ্ধি
Reflex Action—পরাবর্তক ক্রিয়া
Scope—আলোচনাক্ষেত্র, পরিধি
Social Contract Theory—সামাজিক চুক্তি মতবাদ
Social Development—সামাজিক ক্রমোন্নতি
Social Good—সামাজিক কল্যাণ
Socialism—সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ
Sociology—সমাজবিজ্ঞান
Social Mentality—সামাজিক মানসতা
Social Pathology—সামাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞান
Social Progress—সামাজিক অগ্রগতি
Sovereignty—সার্বভৌমিকতা
Struggle for Existence—জীবন সংগ্রাম, জীবন-যুদ্ধ
Subjective—ব্যক্তি সাপেক্ষ
Supplementary Education—পরিপূরক শিক্ষা
Synthetic—সংযোগাত্মক
System—প্রথা
Theoretical—তাত্ত্বিক, তত্ত্বনিষ্ঠ
Tyranny—স্বৈরাচারতন্ত্র
Ultimate Value—পরমমূল্য
Utilitarianism—উপযোগবাদ

সমাজদর্শন

[Social Philosophy]

প্রথম অধ্যায়

সমাজদর্শনের অর্থ এবং আলোচনা ক্ষেত্র

(The Meaning and Scope of Social Philosophy)

১। ভূমিকা (Introduction):

মানুষ সামাজিক জীব। সে সমাজবদ্ধ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। আদিমতম যুগ থেকেই মানুষ সংঘবদ্ধভাবে জীবন যাপন করে আসছে। যেসব বিজ্ঞান সমাজ-জীবনে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে সেগুলিকে আমরা বলি **সামাজিক বিজ্ঞান** (Social Sciences)। যেমন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। যে বিজ্ঞান মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা এবং সমাজের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ বর্ণনা করে এবং তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে বলা হয় **সমাজবিজ্ঞান** (Sociology)। সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের প্রভেদ আছে। সামাজিক বিজ্ঞানগুলি সমাজ-জীবনে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের বিভিন্ন দিক পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করে। সামাজিক বিজ্ঞানগুলি মানুষের কার্যকলাপের সামগ্রিক আলোচনা করে না। সমাজ-জীবনের সামগ্রিক আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞান। অর্থাৎ সমাজ-জীবনে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের সামাজিক আলোচনা করাই সমাজবিজ্ঞানের কাজ। গিন্‌সবার্গ (*Ginsberg*) সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে বলেন, 'মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধহেতু তাদের যা কিছু ঘটে সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।'[1] যদিও সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্র

সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ-জীবনে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে

সমাজ বিজ্ঞান মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা, সমাজের রীতিনীতি, অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে

সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

---

1. "It is concerned with all that happens to human beings in virtue of their relations to each other."

—*Morris Ginsberg*: Reason and Unreason in Society; Page 1.

বা পরিধি খুবই ব্যাপক তবু এমন কয়েকটি প্রশ্ন আছে যার আলোচনা সমাজবিজ্ঞান করে না। অথচ সমাজ-জীবনের আলোচনার ক্ষেত্রে এ সকল প্রশ্নের আলোচনা একেবারেই অবাস্তব বা অপ্রাসঙ্গিক নয়। বস্তুতঃ, এ বিষয়গুলি আলোচনা ভিন্ন সমাজ-জীবনের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

সমাজ-জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে কতকগুলি প্রশ্ন আমাদের সামনে দেখা দেয়। যথা, সমাজ-জীবনের উদ্দেশ্য (Ends), আদর্শ (Ideals) ও মূল্য (Value) কি? সামাজিক বিজ্ঞানগুলি যেসব নীতি এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে সেগুলি কি যথার্থ বা যুক্তিযুক্ত? এসব নীতি এবং পদ্ধতির সত্যতা কি ভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে?

সমাজ-জীবনের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা করে সমাজদর্শন

ব্যক্তির যেমন একটা আদর্শ আছে, উদ্দেশ্য আছে; সমাজ-জীবনেরও তেমন একটা আদর্শ ও উদ্দেশ্য আছে। বস্তুতঃ, আমরা ব্যক্তির উন্নতির কথা যেমন বলি, সমাজ-জীবনের উন্নতির কথাও তেমনি বলি। ব্যক্তি যেমন একটা আদর্শ বা নীতিকে সামনে রেখে তার ব্যক্তিগত জীবন চালিত করে; তেমনি একটা আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী তার সমাজ-জীবন পরিচালিত হয়। প্রশ্ন হল, এই আদর্শের স্বরূপ কি? ব্যক্তির আদর্শ ও সমাজের আদর্শ কি পৃথক, না অভিন্ন? মানুষ ও সমাজ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত, মানুষকে নিয়েই সমাজ। মানুষের ব্যক্তিগত আশা, আকাঙ্ক্ষা উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সমাজের সামগ্রিক জীবনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই সমাজ-জীবনের আলোচনায় মানুষের উদ্দেশ্য, আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোচনা কি অবাস্তব আলোচনা? মানুষ তার ব্যক্তিগত কল্যাণ (Individual Good) চায়, কিন্তু জনকল্যাণের (Common Good) কথা চিন্তা না করে ব্যক্তিগত কল্যাণ লাভ করা কি সম্ভব? জনকল্যাণের ধারণা হল একটা আদর্শ। কি উপায়ে এই আদর্শ লাভ করা যায়?

যেমন সমাজের আদর্শের স্বরূপ কি?

জনকল্যাণের আদর্শ কি ভাবে লাভ করা যেতে পারে?

সমাজবিজ্ঞান সমাজ-জীবনের আলোচনায় যেসব মৌলিক নীতি এবং ধারণা (fundamental principles or concepts) বিনা বিচারে গ্রহণ

করেছে সেগুলির প্রকৃতি বা স্বরূপ কি? সমাজবিজ্ঞানের স্বীকার্য বিভিন্ন সত্য, নীতি এবং সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য? বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের ফলাফলগুলিকে কি নিয়মানুসারে সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে? সামাজিক পরিবর্তন বা ক্রমবিকাশ কি কোন উদ্দেশ্য অনুযায়ী সাধিত হয়, না তা নিছক আকস্মিক ঘটনা? সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের ইচ্ছার কি সম্বন্ধ আছে? সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি কি উদ্দেশ্য পূর্ণ করে? সামাজিক উন্নতি কি কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা, না এই উন্নতি নৈতিক মানদণ্ডে বিচার্য? সমাজ-জীবনের পরমমূল্য (Ultimate value) কি? সামাজিক অগ্রগতি কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল? আমরা যে সামাজিক ঐক্যের (Social Unity) কথা বলে থাকি, সে ঐক্যের আলোকে মানুষের সামাজিক দিকগুলি আলোচনা করলে তার কি তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়? সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের কতদূর সংগতি বর্তমান?

সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক নীতি এবং ধারণাগুলির স্বরূপ কি?

সামাজিক পরিবর্তন বা ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্য কি?

যেহেতু সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান জ্ঞাননিষ্ঠ বিজ্ঞান (positive sciences) সেহেতু তারা সমাজ-জীবনের আদর্শ ও মূল্য সম্পর্কীয় প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে না। অন্য একটি শাস্ত্র এই সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে। তার নাম সমাজদর্শন (Social philosophy)। সমাজদর্শন আদর্শনিষ্ঠ (normative) শাস্ত্র। সামাজিক ঘটনার দার্শনিক তাৎপর্য নিরূপণ করাই সমাজদর্শনের কাজ।

সমাজদর্শন পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার জন্য সচেষ্ট হয়, কারণ সামাজিক ঘটনার (social facts) নিছক বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সমাজদর্শনের কাজ নয়, আদর্শ ও মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ঘটনার তাৎপর্য নির্ধারণ ও যৌক্তিকতা বিচার করাই সমাজদর্শনের কাজ। সামাজিক ঘটনার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা নয়; তার মূল্য নির্ধারণই সমাজদর্শনের লক্ষ্য।

সমাজবিজ্ঞান ও সমাজদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য

গিন্স্বার্গ (*Ginsberg*) বলেন, 'একথা সত্য যে, জড়বস্তু-সম্পর্কীয় বিজ্ঞানগুলি কি পদ্ধতি অবলম্বন করবে তা নির্দেশ করা যেমন দর্শনের কাজ নয়, তেমনি

সামাজিক বিজ্ঞানগুলি কি পদ্ধতি অবলম্বন করবে দর্শন তা নির্দেশ করতে পারে না। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানগুলি যেসব পদ্ধতি এবং ধারণাগুলিকে স্বীকার করে নেয়—বিশেষ করে সেই সব প্রাথমিক ধারণাগুলি, যার থেকে সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সংযোগ-সাধনের কাজ শুরু হতে পারে—সেগুলিকে বিচার করার এবং তাদের মূল্য অবধারণ করার একটা সমালোচনামূলক হাতিয়ার দর্শন দিতে পারে এবং বর্তমানে তা দেবার জন্য তার সচেষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন।'[1]

গিন্‌সবার্গ (Ginsberg)-এর মন্তব্য

২। সমাজদর্শনের অর্থ (Meaning of Social Philosophy) :

দর্শনের কাজ অভিজ্ঞতার অর্থ, তাৎপর্য ও মূল্য নিরূপণ করা। সমাজদর্শনের কাজ সামাজিক ঘটনার অর্থ, তাৎপর্য ও মূল্য নিরূপণ করা। সমাজদর্শন হল সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শনের মিলন ক্ষেত্র। গিসবার্ট (Gisbert) সমাজদর্শন এবং সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সম্বন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজদর্শনের স্বরূপ ও কার্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[2] তিনি বলেন, 'সমাজদর্শন নামটিই নির্দেশ করে যে, সমাজদর্শন সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনের মিলনস্থল এবং সমাজদর্শন উভয়েরই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।' তাঁর মতে সমাজদর্শনের কাজ হল বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত সমাজ-জীবনের মৌলিক নীতিগুলি এবং ধারণাগুলিকে জ্ঞানের ও মূল্যের দিক থেকে আলোচনা করা। এছাড়া সমাজদর্শন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির ফলাফলগুলিকে সংযুক্ত করে এবং জ্ঞান-জগতে এই সংযোগের স্থান নির্ধারণ করে।

সমাজদর্শন সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনের মিলনস্থল

1. "It is further true that philosophy can no more prescribe the methods to be employed by the social sciences than it can prescribe the methods to be employed by the physical sciences. But philosophy can and it seems urgently necessary just now that it should attempt to provide a critical apparatus for scrutinizing and evaluating the methods and assumptions made by the social sciences and particularly the more fundamental conceptions from which a synthesis of the social sciences might proceed."

—*Morris Ginsberg* : Reason and Unreason in Society.

2. *P. Gisbert* : Fundamentals of Sociology ; Page 21.

সমাজদর্শনের দুটি অংশ আছে, একটি হল জ্ঞানের দিক (Epistemological) এবং অপরটি হল মূল্যের দিক (Axiological)। সমাজদর্শনের যেটি জ্ঞানের দিক সেটি জ্ঞান-বিষয়ক প্রশ্নগুলি আলোচনা করে এবং যেটি মূল্যের দিক সেটি মূল্য-সম্পর্কীয় প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে।

সমাজদর্শনের দুটি দিক—জ্ঞানের দিক এবং মূল্যের দিক

জ্ঞানের দিক থেকে বিচার করতে গেলে সমাজদর্শনের কাজ তিন ধরনের; যথা, (১) **তত্ত্বমূলক** (Ontological), (২) **সমালোচনামূলক** (Criteriological) এবং (৩) **সংযোগাত্মক** (Synthetic)। সমাজদর্শনের তত্ত্বমূলক কাজ হল, সমাজ-জীবনের মৌলিক নিয়মগুলি এবং ধারণাগুলি আলোচনা করা। যেমন—মানুষ, সমাজ, ন্যায়, সুখ প্রভৃতি ধারণাগুলির তাৎপর্য নির্ণয় করা। সমাজদর্শনের সমালোচনামূলক কাজ হল, সামাজিক বিজ্ঞানগুলির স্বীকার্যসত্য, মূল নিয়ম এবং সিদ্ধান্তগুলি সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করা এবং তাদের সত্যতা নির্ধারণ করা।

সমাজদর্শনের জ্ঞান-বিষয়ক কাজ তিন ধরনের—তাত্ত্বিক, সমালোচনামূলক এবং সংযোগাত্মক

সমাজদর্শনের সংযোগাত্মকমূলক কাজ হল যে-সকল সামাজিক বিজ্ঞান মানুষকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে সে-সকল সামাজিক বিজ্ঞানে ফলাফলগুলির সঙ্গে নিজের ফলাফলকে সংযুক্ত করা। এ জাতীয় সংযোগের কাজ সমাজবিজ্ঞানের কাজ নয়। এ সংযোগের কাজ সাধিত হয় সমাজদর্শনে। বস্তুতঃ, এই সংযোগের কাজ সমাজবিজ্ঞানের স্তরে সীমাবদ্ধ না থেকে দর্শনের স্তর উন্নীত হয়।

সমাজদর্শনের কাজ সংযোগাত্মকমূলক

সমাজদর্শনের মূল্য সম্পর্কীয় দিকটির কাজ হল সমাজ-জীবনের পরমমূল্য (Ultimate Values) নির্ধারণ করা এবং কি ভাবে তাদের লাভ করা যায় সে উপায় নির্ধারণ করা। সমাজদর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল পরম নৈতিক মূল্যের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করে সামাজিক কল্যাণ (Social Good) কি ভাবে লাভ করা যায় তা নির্দেশ করা। এই সামাজিক কল্যাণ হল একটা আদর্শ। সকলের বা বহু লোকের সমবেত চেষ্টায় এ আদর্শ লাভ করা যায়। সমাজদর্শন এই সামাজিক কল্যাণের আদর্শ

সমাজদর্শন মূল্য নিয়ে আলোচনা করে

নিয়ে আলোচনা করে এবং কি উপায়ে এ আদর্শ লাভ করা যেতে পারে তা নির্দেশ করে। মূল্যের (Values) আলোচনা ছাড়া যে সমাজবিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়—এ বিষয়টি আজ সর্বজনস্বীকৃত।[1]

সামাজিক বিজ্ঞানগুলি উদ্দেশ্যের (End) যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করে না, সাধারণতঃ উপায়ের (Means) আলোচনা করে। কিন্তু উপায় ও উদ্দেশ্য সাপেক্ষ পদ। উদ্দেশ্য লাভ করার জন্যই উপায়। সমাজদর্শন উদ্দেশ্য বা

সমাজদর্শন উদ্দেশ্য বা আদর্শের সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করে

আদর্শের যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করে। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) এ প্রসঙ্গে বলেন, "সমাজদর্শন বিশেষ করে মানুষের সামাজিক ঐক্যের উপর তার মনসংযোগ করে এবং ঐ ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে চায়। প্রধানতঃ এর অর্থ হল মূল্য, উদ্দেশ্য, এবং আদর্শের আলোচনা করা—কি আছে, কি ছিল, কি থাকতে পারে তা নয়—বরং এগুলির থাকার তাৎপর্য ও তার মূল্য আলোচনা করা।"[2]

গিন্‌স্‌বার্গ (*Ginsberg*) সমাজদর্শন এবং সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা করতে গিয়ে সমাজদর্শনের স্বরূপ ও কাজের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন,

সমাজদর্শনের দুটি দিক—সমালোচনামূলক এবং গঠনমূলক

সমাজদর্শনের দুটি অংশ আছে—একটি হল **সমালোচনার দিক**, (Critical or Logical) এবং অপরটি হল **গঠনমূলক বা সংযোগাত্মক দিক** (Constructive or Synthetic)। প্রথম অংশটির কাজ সামাজিক বিজ্ঞানগুলির যৌক্তিকতা নিয়ে এবং সেসব পদ্ধতি ও নীতি, এই বিজ্ঞানগুলি প্রয়োগ

---

1. মূল্য বলতে কি বুঝি? সাধারণতঃ যা মানুষের কোন প্রয়োজন মেটায় তাকেই আমরা মূল্য বলে মনে করি। মূল্য দুপ্রকার: যথা, স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য (Intrinsic and Extrinsic value)। যার নিজস্ব কোন মূল্য নেই, অন্য মূল্যের সহায়ক, তাই হল পরতঃমূল্য। যেমন—অর্থ। যার নিজস্ব মূল্য আছে, নিজগুণে যা মূল্যবান তাই হল স্বতঃমূল্য। মানবমনের তিনটি বৃত্তি: চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা। এই তিনটি বৃত্তির আদর্শ হিসেবে তিনটি মূল্য পাই, যথা—সত্য (Truth), শিব (Goodness) ও সুন্দর (Beauty)।

2. *Mackenzie*: Outlines of Social Philosophy; Page 14.

করে সেগুলির সত্যতা নিয়ে। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানে যে 'সামাজিক পরিবর্তনের (Social Change) ধারণাকে প্রয়োগ করা হয়, সমাজদর্শন তার দার্শনিক বিশ্লেষণ করে এবং সমাজের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। দ্বিতীয় অংশটি—যেটি গঠনমূলক, তার কাজ হল সামাজিক আদর্শের সত্যতা (Validity of social ideals) নিয়ে আলোচনা করা। এই দিক থেকে বিচার করতে গেলে বলতে হয়, সমাজদর্শনের কাজ সমাজ-জীবনের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে নীতিবিজ্ঞানের ফলাফলগুলি প্রয়োগ করা। ধরা যাক, সামাজিক উন্নতির সমস্যা। এ হল একাধারে সমাজবিজ্ঞানের প্রশ্ন এবং অপরদিকে সমাজদর্শনের প্রশ্ন। সামাজিক উন্নতির প্রশ্নের ক্ষেত্রে যেমন একদিকে সমাজে যা ঘটেছে তার তথ্য আমাদের সংগ্রহ করতে হবে তেমনি নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে সেগুলি ভাল কি মন্দ তা বিচার করতে হবে। অর্থাৎ একদিকে আছে সামাজিক ঘটনা অপরদিকে তার মূল্য বিচার।

হবহাউস (*Hobhouse*-) এর মন্তব্য

[1]হবহাউস (*Hobhouse*)-এর মতে, 'সমাজদর্শনের কাজ হল শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য মানুষের ক্ষমতার সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিপূর্ণতার ধারণাকে আমাদের সামনে তুলে ধরা' এবং তাকে লাভ করার উপায়গুলি অন্বেষণ করা। সমাজের নিয়ম, প্রথা বা প্রতিষ্ঠানগুলির আসল উদ্দেশ্য সমাজ-জীবনকে বজায় রাখা নয়, একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনকে রক্ষা করা এবং উন্নত করা।

৩। সমাজদর্শন কি সম্ভব? (Is Social Philosophy Possible)?

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী সমাজদর্শনের সম্ভাবনাকেই স্বীকার করতে নারাজ। তাঁদের মতে সামাজিক বিজ্ঞানগুলিতে ঘটনার আলোচনা করা হয়, সমাজদর্শনে মূল্য বা আদর্শের আলোচনা করা হয়। কাজেই সামাজিক বিজ্ঞান

---

1. "A conception of the harmonious fulfilment of human capacity as the substance of happy life."

—*Hobhouse*: Elements of Social Justice.

সম্ভব, সমাজদর্শন সম্ভব নয়। সমাজদর্শনের কাজ সামাজিক ঘটনার মূল্যাবধারণ। কিন্তু যেহেতু মূল্যাবধারণের ব্যাপারটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেহেতু সমাজ-দর্শনের আলোচনায় সামাজিক ঘটনার যথাযথ স্বরূপ প্রকাশিত না হয়ে তার পক্ষপাতদুষ্ট ও বিকৃত স্বরূপটি প্রকাশিত হয়। আদর্শ ও মূল্যের আলোচনা যেহেতু নৈতিক আলোচনা, সেহেতু সামাজিক বিজ্ঞানগুলিকে সামাজিক ঘটনার স্বরূপ অন্বেষণের প্রচেষ্টায় নীতিবিজ্ঞান থেকে দূরে সরে থাকতে হবে, অর্থাৎ সামাজিক ঘটনার মূল্য অবধারণের কোন প্রয়োজন নেই। সামাজিক ঘটনাকে ব্যক্তিগত অনুভূতি, সংস্কার ও পক্ষপাতিত্ব থেকে দূরে রাখাই শ্রেয়। তাঁরা মনে করেন যে, সমাজদর্শন পাঠে সামাজিক ঘটনার প্রকৃত রূপটিকে জানা যায় না। তাছাড়া, বিজ্ঞানের সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করেও মূল্যাবধারণের বিষয়টিকে বিচার করা সম্ভব হয় না। সামাজিক বিজ্ঞানগুলি নৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কি আছে তারই আলোচনা করে, কি হওয়া উচিত তার আলোচনা করে না। সেহেতু সামাজিক বিজ্ঞানগুলিতেই সামাজিক ঘটনার যথাযথ রূপ জানা যায়।

সমাজদর্শনের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ

আমাদের মতে সমাজদর্শনের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা চলে না। কারণ ঘটনা ও মূল্যের আলোচনা এমনভাবেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে একটিকে উপেক্ষা করে আর একটির আলোচনা চলতে পারে না।

সামাজিক তথ্য আলোচনা করতে গিয়ে মানুষের উদ্দেশ্য, আশা, আকাঙ্ক্ষার কথা বাদ দেওয়া যায় না। এই কারণে গিন্‌সবার্গ (*Ginsberg*) বলেন, "এটা কি স্পষ্ট নয় যে কোন-না-কোন অর্থে উদ্দেশ্য ও মূল্য সামাজিক বিজ্ঞানের অংশরূপে গণ্য হবে এবং সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের যে পার্থক্য সে পার্থক্য ঠিক তথ্য আলোচনার এবং মূল্যের আলোচনার পার্থক্য নয়?"[1] সুতরাং সমাজদর্শনের কাজ হল সংযোগের কাজ। এ সম্পর্কে ম্যাক্‌ডুগাল (*McDougall*)

1. "It is not clear that in some sense ends and values must form part of social science and that the distinction between social philosophy and sociology does not quite correspond to the distinction between the study of facts and the study of values?"

—*Morris Ginsberg*: Sociology; Page 28.

বলেন, 'সমাজদর্শনের উচিত সুচিন্তিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত মূল্যের তারতম্য অনুসারে তার নির্দেশগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির উচিত কি ভাবে এ মূল্যগুলিকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করা যায় তার উপায় আবিষ্কার করা।'[1]

কি সামাজিক বিজ্ঞান, কি নীতিবিজ্ঞান, উভয়ের যে-কোনটির প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করলেই বোঝা যাবে যে ঘটনাকে ও আদর্শকে সম্পূর্ণ পৃথক রেখে আলোচনা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ, আদর্শের সত্যতা ও মিথ্যাত্বের প্রশ্ন না তুলে, তাদের নিছক সামাজিক ঘটনারূপে আলোচনা করা সম্ভব নয়। যেহেতু আদর্শ সমাজস্থ মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে সেহেতু সমাজ-জীবনের অঙ্গ হিসেবে তার মূল্য বিচার করার সময় তার সত্যতা ও মিথ্যাত্বের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কি সম্ভাবনা নিহিত আছে সেটি আলোচনা না করলে শুধুমাত্র তার বর্তমান ও অতীত রূপের আলোচনা করে তার যথাযথ প্রকৃতিকে জানা যাবে না। তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিষয়টি নিরূপণ করা যেতে পারে যদি তার কি হওয়া উচিত সেটা নিরূপণ করা যায়। অর্থাৎ কিনা একটা আদর্শের সঙ্গে তুলনা করেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এবং তাদের ক্রমায়ন (gradation) সম্ভব হয়। তত্ত্বের দিক থেকে ঘটনা ও আদর্শকে যতই পৃথক রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, বাস্তবে এই পার্থক্য বজায় রাখা সম্ভব নয়। আমরা সমাজকে কোন্ পথে পরিচালিত করতে চাই তার উপরই নির্ভর করে সামাজিক বিজ্ঞানগুলির উপাদান নির্বাচন। নির্বাচনের বিষয়টি নিছক ঘটনা নয়, এটি আদর্শ-নির্ভর।

সমাজবিজ্ঞানী আদর্শকে উপেক্ষা করে সামাজিক ঘটনার আলোচনা করতে পারে না

1. "......Social philosophy, should first lay down its specifications in accordance with a hierarchy of values completely thought out and validated. Then the various social sciences should proceed to discover how these values may best be realised."

—*W. McDougall in Human Affairs*—edited by *Cattell, Cohen and Travers*; Page 840.

নীতিবিদ্যার দিক থেকেও অগ্রসর হতে গেলে দেখা যায় যে এক্ষেত্রেও আদর্শের আলোচনাকে ঘটনার আলোচনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে না।

নীতিবিদ্যা সামাজিক ঘটনাকে উপেক্ষা করতে পারে না

প্রথমতঃ, মানুষ সাধারণভাবে যেসব নৈতিক বিচার করে, সেগুলিকে সামাজিক ঘটনারূপে গণ্য করা হলেও, নীতিবিদ্যার অনুসন্ধানের কাজ তাদের কেন্দ্র করেই শুরু হয়।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের বাস্তব প্রকৃতি ও সম্ভাবনাকে বাদ দিয়ে আদর্শ সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক মতবাদে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, নীতিবিদ্যার মতানুসারে বিভিন্ন ধরনের আচরণের ভালত্ব ও মন্দত্ব বিচার করতে গিয়ে তাদের ফলাফলগুলিকে উপেক্ষা করা চলে না এবং এই ফলাফলগুলি নির্ধারণ করা সামাজিক বিজ্ঞানের কাজ।

কাজেই সামাজিক বিজ্ঞান যদি ঘটনার আলোচনা করে এবং সমাজদর্শন মূল্য বা আদর্শের আলোচনা করে তাহলে পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই

সমাজদর্শন সম্ভব

সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, সামাজিক বিজ্ঞান যদি সম্ভব হয়, তাহলে সমাজদর্শনও সম্ভব। সমাজদর্শনের সম্ভাবনাকে কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না, কারণ ঘটনা ও আদর্শের আলোচনা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

তবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে ঘটনার আলোচনার সঙ্গে আমরা আদর্শের আলোচনাকে গুলিয়ে না ফেলি। আলোচনার ক্ষেত্রে তথ্যের ও আদর্শের আলোচনাকে সব সময় পৃথক রাখতে হবে, যদিও চরম সমন্বয়ের (final synthesis) ক্ষেত্রে উভয় প্রকার অনুসন্ধানকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আলোচনার প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা কি তথ্যের না আদর্শের আলোচনা করছি। হবহাউস

আলোচনার সময় মূল্য ও ঘটনার আলোচনাকে পৃথক রাখা ও চরম সমন্বয়ের সময় তাদের যুক্ত করা উচিত

(*Hobhouse*) বলেন, "ঘটনা ভাল বলেই ঘটছে, বা ঘটছে বলেই ভাল, এই ধরনের চিন্তা আমাদের পরিহার করতে হবে। নতুবা আমাদের ঘটনা সম্পর্কীয় বিবরণ পক্ষপাত দুষ্ট হবে এবং মূল্য সম্পর্কীয় বিচার বিকৃতরূপ ধারণ করবে।" গিন্‌সবার্গ (*Ginsberg*) বলেন, "মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ

আলোচনাতে সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজদর্শনের সমন্বয় সাধিত হবে, কিন্তু উভয়ের মিশ্রণ ঘটবে না।"[1]

২। সমাজদর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র বা পরিধি (The Scope of Social Philosophy) :

ইংরেজী '*Scope*' কথাটির অর্থ হল আলোচনার ক্ষেত্র বা পরিধি। প্রতিটি বিজ্ঞান প্রকৃতির এক বিশেষ বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করে; অর্থাৎ তার আলোচনার একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু আছে। এই নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুই হল তার আলোচ্য বিষয়বস্তু, আলোচনার ক্ষেত্র বা পরিধি। সমাজদর্শনেরও একটি নির্দিষ্ট আলোচনা ক্ষেত্র আছে।

"Scope" কথাটির অর্থ

ইতিপূর্বে সমাজদর্শনের অর্থ বা স্বরূপ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে সেই আলোচনা থেকেই সমাজদর্শনের আলোচনা ক্ষেত্র বা পরিধি সম্পর্কে একটা ধারণা করা যাবে। সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্তমান।

সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। সমাজবিজ্ঞান মানব সমাজের উৎপত্তি, তার বিভিন্ন রূপ, আইনকানুন, রীতিনীতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ভাষা, মানুষের চিন্তাধারা, অনুভূতি, কার্য সবগুলিই আলোচনা করে। বস্তুতঃ, মানুষের সমগ্র জীবনই তার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সমাজদর্শনের আলোচনা ক্ষেত্র বা পরিধি সমাজবিজ্ঞানের মত এতটা ব্যাপক নয়। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "সমাজদর্শনের পরিধি খুবই সীমাবদ্ধ। দর্শনকে যেভাবে অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে পৃথক করা হয়, সমাজবিজ্ঞানের বিশেষ শাখার বা অন্যান্য শাখার সঙ্গে সমাজদর্শনের সেরকম পার্থক্যই বর্তমান।"[2]

সমাজদর্শনের আলোচনা ক্ষেত্র সমাজবিজ্ঞানের মত ব্যাপক নয়

---

1. Sociology, P. 87.

2. "Social philosophy has a much more restricted province. It differs from the special branches of sociology or from the other branches of sociology in the way in which philosophy in general is distinguished from the particular sciences."

— *Mackenzie*: Outlines of Social Philosophy, Page 18.

সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়ঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সমাজদর্শনের আলোচনা ক্ষেত্র বা পরিধির অন্তর্ভুক্ত। যথা,

মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ইত্যাদি

(ক) মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, এ বিশ্বে মানুষের স্থান (Man's place in the cosmos), ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ, জনকল্যাণ, জনকল্যাণের সঙ্গে ব্যক্তিগত কল্যাণের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলি সমাজদর্শনের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠান

(খ) বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী এবং অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু কোন আদর্শের আলোকে সমাজবিজ্ঞান এগুলি আলোচনা করে না। এগুলির মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং দার্শনিক ভিত্তি (Psychological and Philosophical basis) সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়। পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যেমন—গীর্জা, সংঘ প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য বা আদর্শ সমাজদর্শন নিরূপণ করে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশ কোন্ আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করা যেতে পারে, সেসব প্রশ্নের আলোচনাও সমাজদর্শনে করা হয়।

সামাজিক আদর্শ

(গ) সামাজিক আদর্শের (Social Ideals) আলোচনা সমাজদর্শনের অন্যতম প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয়। মূল্য (Values), উদ্দেশ্য (Ends) ও আদর্শের (Ideals) আলোচনা সমাজদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক অগ্রগতি

(ঘ) সামাজিক অগ্রগতি (Social Progress) সমাজদর্শনের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের পার্থক্য, সামাজিক অগ্রগতির মাপকাঠি বা মানদণ্ড (Criterion of Social Progress), সামাজিক অগ্রগতির প্রসারণ ও গভীরতা (Extensive and Intensive aspects of Social Progress), সামাজিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য বিষয়সমূহ (Conditions of Social Develop-

ment), সামাজিক দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায় (Methods of checking social evils) প্রভৃতি সমাজদর্শনের আলোচনা ক্ষেত্র বা পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) সমাজ-জীবনে ধর্ম এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বস্তুতঃ, সমাজ-জীবনের ঐক্যের মূলে এই ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত অর্থ, ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও ধর্মের সম্পর্ক, ধর্ম ও সমাজসেবা, রাষ্ট্র ও ধর্ম, ধর্মের উন্নতি ও বিকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ধর্ম

(চ) সমাজ-জীবনের যেমন আছে একটা সুস্থ ও বলিষ্ঠ দিক, তেমনি আছে তার ব্যাধির দিক। সমাজ-ব্যাধিবিজ্ঞান (Social Pathology) সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। সমাজ-জীবন ব্যাধিগ্রস্ত হয় বলেই সমাজে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, অপরাধীর শাস্তিবিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়। সামাজিক অপরাধ এবং শাস্তির আলোচনা সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়।

সমাজ-ব্যাধিবিজ্ঞান

(ছ) সমাজের বিবর্তন (Social Evolution), মানুষের সামাজিক সত্তা (The Social Self); মানুষের সামাজিক প্রকৃতি (The Social Nature of Man), লোকায়ত নীতিতত্ত্ব (The Ethos of a People)—এগুলিও সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

সমাজের বিবর্তন

(জ) সমাজ-জীবনের মৌলিক নীতি এবং ধারণাগুলি সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত; যেমন—মানুষ, গোষ্ঠী, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ন্যায়, সুখ ইত্যাদি। সমাজ জীবনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও মূল্যের (values) আলোচনাও সমাজদর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

সমাজ-জীবনের মৌলিক নীতি এবং ধারণা

বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে সমাজদর্শনের সম্পর্ক বর্তমান। বিশেষ করে জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, আইনবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং ধর্ম-দর্শনের (Philosophy of Religion)

সঙ্গে এর সম্পর্ক খুবই নিবিড়। সুতরাং পূর্বোক্ত বিজ্ঞানগুলির অনেক বিষয় সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়। মানুষকে জানতে হলে সাধারণভাবে মানুষের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। জৈবিক বিবর্তনবাদ জীবনের ক্রম-বিকাশের উপর প্রচুর আলোকপাত করে। সেহেতু 'জীববিদ্যার' এই বিষয়টি সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়। মানুষের স্বভাবকে জানা মানে তার মনকে জানা। মনোবিজ্ঞান মন নিয়ে আলোচনা করে। সে কারণে 'মনোবিজ্ঞানের অনেক বিষয় সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। সামাজিক মনোবিজ্ঞান (Social Psychology) বর্তমানে অন্যতম জ্ঞানের শাখা রূপেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। সামাজিক অগ্রগতি সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তু। সামাজিক অগ্রগতি বস্তুতঃ ব্যক্তি বিশেষের উন্নতির উপর নির্ভরশীল। শিক্ষা সম্পর্কীয় বিভিন্ন নীতি ব্যক্তি বিশেষের উন্নতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং এগুলিও সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। সমাজদর্শন সামাজিক আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে এবং এই আলোচনা নীতিবিজ্ঞানের আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; যেহেতু নীতিবিজ্ঞান মানুষের পরমকল্যাণের আদর্শটিকে নির্ধারিত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। এই রাষ্ট্র সম্পর্কীয় ধারণা ও আইনবিজ্ঞানের ন্যায়ের (Justice) ধারণা সমাজদর্শনের আলোচনার বিষয়বস্তু। অর্থনীতি বস্তুর উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় এবং বিতরণ নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু এ সবই জনকল্যাণের ধারণার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। জনকল্যাণের ধারণা সমাজদর্শনের অন্যতম আলোচ্য বিষয়, সেহেতু সমাজদর্শনকেও প্রত্যক্ষভাবে অর্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হয়। সামাজিক বিকাশ বা অগ্রগতি ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় এবং তা সমাজদর্শনেরও আলোচ্য বিষয়। ধর্মদর্শন ধর্ম নিয়ে আলোচনা করলেও, সমাজদর্শন সমাজে ধর্মের ভূমিকা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে। সুতরাং সমাজদর্শনের পরিধি সীমাবদ্ধ হলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়।

বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শনের সম্পর্ক

সমাজদর্শন মনোবিজ্ঞানের অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে

সমাজদর্শন অর্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে

সংক্ষিপ্তসার

১। যে সকল বিজ্ঞান মানুষের সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে, তাকে বলা হয় সামাজিক বিজ্ঞান; যেমন—রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু যে বিজ্ঞান সমাজ-জীবনে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সকল প্রকার সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করে তার নাম সমাজবিজ্ঞান। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞান মানবসমাজের ক্রমবিকাশ, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, বিধিব্যবস্থা ও নানাপ্রকার সামাজিক সংগঠন প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। প্রত্যেক বিজ্ঞানের মতো সমাজবিজ্ঞান কতকগুলি মূল নীতি ও নিয়ম স্বীকার করে নিয়ে নিজের বিষয়বস্তুর আলোচনা করে এবং একটি বিশেষ প্রথা অনুসারে সে আলোচনায় অগ্রসর হয়। এছাড়া আছে মনুষ্য জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য। সমাজবিজ্ঞানের স্বীকৃত মূল নীতি ও নিয়ম, তার আলোচনা, প্রথার যৌক্তিকতা ও যথার্থতা এবং সমাজ-জীবনের মূল আদর্শের স্বরূপ—বিশেষ করে জনকল্যাণ ও সামাজিক ঐক্য নিয়ে আলোচনা করা এবং সে সম্বন্ধে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছান সমাজদর্শনের কাজ।

২। সমাজদর্শন হল সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয়। সমাজদর্শনের দুটি অংশ—জ্ঞানাত্মক ও মূল্যনির্ণয়াত্মক। জ্ঞানের দিক থেকে সমাজদর্শনের তিনটি কাজ; (ক) তত্ত্বমূলক কাজ অর্থাৎ সমাজ জীবনের মৌলিক নিয়ম ও ধারণা, যেমন—'সমাজ', 'গোষ্ঠী', 'ন্যায়', 'প্রগতি প্রভৃতির তাৎপর্য নির্ণয় করা; (খ) সমালোচনামূলক কাজ অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের 'মেনে নেওয়া মূল নিয়ম', ধারণা ও আদর্শের যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য নির্ণয় করা; (গ) সংযোগাত্মক কাজ অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের মধ্যে সংগতি ও সামঞ্জস্য আনয়ন করা।

সমাজদর্শনের মূল্যনির্ণয়াত্মক অংশে তার কাজ হল সমাজ জীবনের পরমার্থ বা জনকল্যাণের স্বরূপ নির্ণয় করা। মূল্যাবধারণের ক্ষেত্রে সমাজদর্শন নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের কাজ হল সমাজ-জীবনের মান ও মূল্য-বোধের অগ্রগতিতে সহায়তা করা অর্থাৎ সমাজ-জীবনকে উন্নত করা। আদর্শই উন্নতির মাপকাঠি, উন্নতি মানে আদর্শের দিকে অগ্রগমন। সমাজদর্শনের কাজ সামাজিক আদর্শের বিচার করা—তার সংজ্ঞা, স্বরূপ ও উপায় নির্ণয় করা।

৩। কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী সমাজদর্শনের সম্ভাবনাকে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে সামাজিক বিজ্ঞান সম্ভব, সমাজদর্শন সম্ভব নয়। সমাজদর্শন সামাজিক তথ্যের মূল্যাবধারণ করে। যেহেতু মূল্যাবধারণ ব্যক্তিগত ব্যাপার সেহেতু সমাজদর্শনের আলোচনায় সামাজিক তথ্যের বিকৃত রূপই ধরা পড়ে। নীতিবিজ্ঞানকে সামাজিক বিজ্ঞান থেকে দূরে রাখাই শ্রেয়। কিন্তু এই অভিমত যুক্তিযুক্ত নয়। সমাজদর্শনের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা চলে না, কারণ তথ্য ও মূল্যাবধারণ দুটি পরস্পরের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। নীতিবিজ্ঞানকে সামাজিক তথ্যের আলোচনা করতে হয়, সামাজিক বিজ্ঞানকে আদর্শের আলোচনা করতে হয়। তবে আলোচনার ক্ষেত্রে মানুষের জীবনে পরিপূর্ণ তথ্য ও মূল্যের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন আছে, সংমিশ্রণের নয়।

৪। যদিও সমাজদর্শন এক হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি ও পটভূমি তবু এদের পরিধি সমব্যাপক নয়। দর্শনের কাজ 'বিশেষ' বা 'অংশকে' সমগ্র বা সমষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ও নির্ণয় করা। এ হিসেবে সমাজদর্শনের কাজ 'সামাজিক ঐক্যে'র পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সমাজ-জীবনের বিভিন্ন অংশ ও দিককে বিচার এবং নির্ণয় করা। সমাজদর্শনের পরিধি নিম্নলিখিত-ভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে :

(ক) বিশ্বে ও সমাজে মানুষের স্থান; মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ। (খ) বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও দল, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান—এদের মনোবিজ্ঞান-সম্মত এবং দার্শনিক ভিত্তি। (গ) বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের স্বরূপ ও মূল্য, বিশেষ করে সামাজিক ঐক্যের ধারণা। (ঘ) সামাজিক অগ্রগতি—এর প্রসারণ, গভীরতা ও উপায়, সামাজিক অবনতি প্রতিরোধের উপায়। (ঙ) সমাজ-জীবনে ধর্মের স্থান; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান; শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। (চ) সমাজ-ব্যাধি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। (ছ) সমাজের বিবর্তন; মানুষের সামাজিক সত্তা ও প্রকৃতি; লোকায়ত নীতিতত্ত্ব। (জ) সমাজবিজ্ঞানের স্বীকৃত মূল ধারণা, নিয়মের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নির্ণয় এবং সমাজ-জীবনের পরমার্থ বা পরম আদর্শের বিচার।

সমাজদর্শন সামাজিক বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান এবং দর্শনের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তবে এ সকল জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে দর্শন, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শনের যোগাযোগ শুধু গভীর নয়, এক হিসেবে অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ বলা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজদর্শনের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক এবং সমাজদর্শনের মূল্য

(Relation of Social Philosophy to other Subjects and Value of Social Philosophy)

১। সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞান (Social Philosophy and Sociology):

সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বস্তুতঃ, এ দুটি জ্ঞানের শাখা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং একটি আর একটির পরিপূরক। উভয়েই মানুষের সমষ্টিগত চেতনা ও বাস্তব জগতে সেই চেতনার বহিঃপ্রকাশ নিয়ে আলোচনা করে। সমাজদর্শন সমাজের উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং মূল্য নিয়ে আলোচনা করে। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, 'সমাজদর্শন সামাজিক ঐক্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঐ ঐক্যের আলোকে মানুষের জীবনের বিশেষ দিকগুলি আলোচনা করে।' সমাজবিজ্ঞান সমাজের উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশ; সমাজের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-কানুন, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করে. ব্যাপক অর্থে, সামাজিক মানুষের সমগ্র জীবনই সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তবে সমাজবিজ্ঞান বিশেষ করে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া এবং তার কারণ ও পরিণাম নিয়ে আলোচনা করে।

সমাজদর্শন সমাজের উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে এবং সমাজবিজ্ঞান সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

সমাজদর্শন এবং সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে কয়েক বিষয়ে যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনি কয়েক বিষয়ে আবার পার্থক্য আছে।

(১) সমাজদর্শন আদর্শনিষ্ঠ (Normative), সমাজবিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ (Positive)। (২) সমাজদর্শন সমাজের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে না; সমাজ কি রকম হওয়া উচিত, কি আদর্শে সমাজ পরিচালিত হওয়া উচিত তাই নিয়ে আলোচনা করে। সমাজদর্শন সমাজের বিধি-ব্যবস্থা ও গঠনের

মধ্যে যে আদর্শ নিহিত আছে তা নির্ধারণ করে এবং ঐ আদর্শের আলোকে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের মূল্যাবধারণ করে। (৩) সমাজবিজ্ঞানের কাজ কিন্তু ভিন্ন। বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের (Positive Science) দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন দিক; যথা—বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি এবং বিকাশ, সামাজিক নিয়ম, সামাজিক আইন-কানুন, ভাষা, বিশ্বাস, সংস্কার সব কিছুই নিয়ে আলোচনা করে। (৪) সমাজ কি রকম হওয়া উচিত, আদর্শ সমাজ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—এ সব বিষয় সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে সমাজের বিভিন্ন দিকগুলিকে ব্যাখ্যা করতে সমাজবিজ্ঞান সচেষ্ট। কিন্তু সমাজদর্শনের কাজ শুধু বাস্তবকে নিয়ে নয়, আদর্শকে নিয়ে। সমাজদর্শন চায় জনকল্যাণের আদর্শটি নির্ধারণ করতে, যার দ্বারা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধন হতে পারে। (৫) এ ছাড়া সমাজবিজ্ঞান হল তাত্ত্বিক বিজ্ঞান এবং জ্ঞানদান ছাড়া এর বিশেষ ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই। কিন্তু সমাজদর্শন যে আদর্শ নির্ধারণ করে, ব্যক্তির সমাজ-জীবনের উপর তার ব্যবহারিক উপযোগিতা বর্তমান। (৬) তাছাড়া, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও উন্নতি সমাজদর্শন দ্বারা নির্ধারিত আদর্শ অনুসারেই করা সম্ভব। জনকল্যাণকে বাস্তব রূপ দিতে হলে সমাজদর্শন দ্বারা স্থিরীকৃত কোন বলিষ্ঠ ও সুষ্ঠু আদর্শ অবলম্বনের দ্বারাই তা সম্ভব।

সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের পার্থক্য

সমাজদর্শনের ব্যবহারিক উপযোগিতা

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞান এক হিসেবে একই সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে; সেজন্য এদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। উভয়ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তির পেছনে কি উদ্দেশ্য বর্তমান, কি আদর্শে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে—এসব তথ্য সম্পর্কে যদি সমাজবিজ্ঞানী অবহিত হয়, তাহলে সে প্রতিষ্ঠানটির স্বরূপ নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে তার জ্ঞান হবে যথার্থ, সুসংগত ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। অনুরূপ

সমাজদর্শনের আদর্শ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীর অবহিতি হওয়া প্রয়োজন

ভাবে বলা যেতে পারে যে, সমাজদার্শনিক জনকল্যাণের যে আদর্শ নির্ধারণ করতে চায়, বাস্তব সমাজে সেই আদর্শ কতটুকু রূপ পেয়েছে, তা তার জানা প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞানের দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করেই এই আদর্শ সমাজের স্বরূপ সমাজদার্শনিককে নির্ধারণ করতে হয়। সুতরাং সমাজদর্শনকে সমাজবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া, সমাজদার্শনিক সমাজের রীতিনীতি, বিভিন্ন সামাজিক ধারণাগুলি (Concepts) বিচার করে এবং তার মূল্য অবধারণ করে। এই অবধারণ তখনই সহজ হয়, যখন সামাজিক রীতিনীতি ও অন্যান্য বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে সমাজদার্শনিকের সঠিক জ্ঞান থাকে। অর্থাৎ সামাজিক বাস্তব তথ্যগুলিকে অবহেলা করে সমাজদর্শন আদর্শ সমাজের স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারে না।

সামাজিক তথ্যের ভিত্তিতে আদর্শ সমাজের রূপ সমাজ-দর্শন নির্ণয় করে

যে প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়, সমাজবিজ্ঞান সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দেয়। সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতির জন্য কি কি বিষয় সহায়ক, কোন্গুলি তার প্রতিবন্ধক এবং সমাজসম্পর্কীয় অনুসৃত নীতিগুলির পরিণাম কি হতে পারে সেই সম্পর্কেও সমাজ বিজ্ঞান জ্ঞান দেয়। সমাজবিজ্ঞান সমাজ-জীবন সম্পর্কে যে সব তথ্য সরবরাহ করে বা যে জ্ঞান দান করে সমাজ-সংস্কারক এবং রাজনীতি-বিদ্দের পক্ষে সমাজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য তা একান্ত প্রয়োজন এবং এগুলির উপর ভিত্তি করেই তারা ভবিষ্যৎ সমাজেরউন্নত রূপটি নির্ণয় করতে পারে।

সমাজবিজ্ঞানের তথ্যের উপর সমাজদর্শন নির্ভরশীল

পরিশেষে, আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, যদিও সমাজবিজ্ঞান ও সমাজদর্শনের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়, তবু দুটোকে এক করে ফেললে চলবে না। আলোচনার প্রত্যেকটি ধাপে আমাদের জানতে হবে আমরা কি তথ্য নিয়ে বা আদর্শ নিয়ে আলোচনা করছি। তথ্য এবং মূল্যের আলোচনাকে সব সময় পৃথক রাখাই বাঞ্ছনীয়, যদিও মানুষের জীবনের সামগ্রিক আলোচনার ক্ষেত্রে উভয়ের সংযোগ-সাধনের প্রয়োজন আছে। সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শনের সংযোগের প্রয়োজন আছে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে উভয়ের মিশ্রণ (fusion) না ঘটে।

২। সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞান (Social Philosophy and Psychology) :

সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক খুবই গভীর। সমাজদর্শন সমাজ-জীবনের মৌলিক নীতি এবং ধারণাগুলির যৌক্তিকতা বিচার করে এবং আদর্শের মানদণ্ডে তাদের মূল্যাবধারণ করে। মনোবিজ্ঞান মন সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। মন বলতে বুঝি বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া—চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা। সমাজদর্শনের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয় করার পূর্বে উভয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য আছে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য আছে নির্ণয় করা দরকার। সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য হল এই যে, উভয়ই মানসিক বিদ্যা (Mental Science), জড়বস্তু সম্পর্কীয় বিজ্ঞান (Material Science) নয়। উভয়ই মানসিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। মনোবিজ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ণয় করে। সমাজদর্শন সমাজ-জীবনের ধারণা, নীতি ও আদর্শের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া আলোচনা করে।

সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য

কিন্তু উপরি উক্ত বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। সমাজদর্শন হল আদর্শনিষ্ঠ (Normative), মনোবিজ্ঞান হল বস্তুনিষ্ঠ (Positive)। সমাজের আদর্শ কি রকম হওয়া উচিত তাই হল সমাজদর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়, আর মনোবিজ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। মানসিক প্রক্রিয়াগুলি কি রকম হওয়া উচিত মনোবিজ্ঞান তা আলোচনা করে না, অর্থাৎ কোন আদর্শের আলোকে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করা মনোবিজ্ঞানের কাজ নয়। মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হল ব্যক্তি-সাপেক্ষ (Subjective), সমাজদর্শনের বিষয়বস্তু-ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (Objective)। সমাজদর্শন ব্যক্তি নিরপেক্ষ বিষয়বস্তু; যথা—সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার, সংঘ, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী —এসব নিয়ে আলোচনা করে। এ ছাড়া সমাজদর্শন সমষ্টিগত চেতনা (Collective Mind) নিয়ে আলোচনা করে, মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিচেতনার (Individual Mind) প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। মনোবিজ্ঞান আলোচনা

সমাজদর্শন ও সমাজ-বিজ্ঞানের পার্থক্য

করে মানসিক ক্রিয়ার প্রকৃতি কি, সমাজদর্শন আলোচনা করে মানুষের ক্রিয়াকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করলে জনকল্যাণের আদর্শ লাভ করা যায়। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের উপর মনোবিজ্ঞানের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই, সেহেতু মনোবিজ্ঞান পুরোপুরি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান (Theoretical science)। সমাজদর্শন জনকল্যাণের আদর্শটি নির্ধারণ করে, সেহেতু মানুষের ব্যবহারিক জীবনের উপর তার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। মনোবিজ্ঞানের পরিধি (Scope) সমাজদর্শনের পরিধির তুলনায় অনেক ব্যাপক। মনোবিজ্ঞান সকল রকম মানসিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। সমাজদর্শন সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের বিশেষ কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য বর্তমান সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এবার উভয়ের মধ্যে যে গভীর সম্বন্ধ বর্তমান তা নির্ধারণ করা যাক।

সমাজদর্শন সমাজ-জীবন নিয়ে আলোচনা করে। ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ। ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা—এক কথায় ব্যক্তির মনই সমাজ-জীবনে প্রতিবিম্বিত হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তির আশা, অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষাই রূপ লাভ করে। সুতরাং ব্যক্তির মনকে বাদ দিয়ে সমাজ-জীবনের কোন আলোচনা সম্ভব নয়। অর্থাৎ সমাজ-জীবনের একটি মনস্তত্ত্বমূলক ভিত্তি (Psychological Basis) আছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের গভীর সম্পর্ক

সমাজদর্শন সামাজিক সম্পর্কের (social relations) অর্থ ও মূল্য নিরূপণ করতে চায়। এই কারণে তাকে সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক

1. এ প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার (*MacIver*), বলেন, 'যা কিছু একটি জীবিত মানুষ করে বা ভোগ করে, যা কিছু ইতিহাস বা অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় সবই হল মানসিক ঘটনা এবং মানসিক বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্য, প্রয়োজন এবং ভাবাবেগকে বাদ দিয়ে এসব ঘটনাকে বুঝে ওঠা যায় না' ("Everything a living creature does or suffers, every event in history or experience is a psychical phenomenon and cannot be understood except in terms of the purpose, needs and passions of psychical beings.")

—*MacIver* : Community ; Page 59.

আলোচনা করতে হয়। কিন্তু মানস জীবনের সাধারণ নিয়ম (general laws of mental life), যা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় তার সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই সামাজিক সম্পর্কের অর্থ ও মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব। সামাজিক সম্পর্কের তাৎপর্য নিরূপণ করতে হলে সমাজস্থ ব্যক্তি-মানুষের কামনা, বাসনা, অনুভূতি, আবেগ, সহজাত প্রবৃত্তি, প্রয়োজন, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি জানা দরকার। এই সব মানসিক বৃত্তিই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। এর জন্য মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয়।

সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের অর্থ, উদ্দেশ্য ও মূল্য নিরূপণ করা সমাজ-দর্শনের কাজ। কিন্তু সমাজস্থ মানুষের মনের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব। কাজেই এক্ষেত্রেও সমাজদার্শনিকের পক্ষে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ সমাজ-জীবনের একটি মনস্তত্ত্বমূলক ভিত্তি (Psychological Basis) আছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরকে বিশ্লেষণ করে, তার মনস্তত্ত্বমূলক ভিত্তিকে অনুধাবন করেই সমষ্টিগত চেতনার আশা, আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি, চিন্তাধারা সকল কিছুই জানতে পারা যায় এবং এগুলিই জনকল্যাণের আদর্শটি নির্ধারিত করতে সহায়তা করে, যা বিশেষভাবে সমাজদর্শনের কাজ।

যে জনকল্যাণের আদর্শে সমাজ গঠিত হওয়া উচিত এবং যে উপায়ে এই আদর্শ লাভ করা যেতে পারে সমাজদর্শন তার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সমাজস্থ ব্যক্তির সামর্থ্য এবং ক্ষমতা, তাদের ইচ্ছা এবং কামনা-বাসনার পরিপ্রেক্ষিতেই এ আদর্শ নির্ধারিত হতে পারে। অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছা, অনুভূতি এবং চিন্তাকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করলে এ আদর্শ লাভ করা যেতে পারে সমাজদার্শনিককে সে সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এজন্য মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজদার্শনিকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজদার্শনিকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন

সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনার ফলে নতুন একটি জ্ঞানের শাখার সৃষ্টি হয়েছে, যাকে বলা হয়

সামাজিক মনোবিজ্ঞান (Social Psychology)।[1] সামাজিক মনোবিজ্ঞান সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংঘ, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, জনসাধারণের মতামত—এগুলি মানুষের অনুভূতি ও আবেগের সঙ্গে কি ভাবে সম্পর্কযুক্ত তা আলোচনা করে। জনতার মনস্তত্ত্ব (Crowd Psychology), মানুষের ভাষার উৎপত্তি এবং বিকাশ সামাজিক মনোবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়বস্তু। অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়, সামাজিক মনোবিজ্ঞানের আলোচনা সমাজদর্শনের সঙ্গে কি ভাবে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। সমাজদর্শন যে সব মূল্য এবং আদর্শকে আবিষ্কার করতে চায় সামাজিক মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচনা থেকে সেগুলির সমর্থন পাওয়া যায়, কারণ সমাজ ব্যক্তিমনেরই প্রকাশ। সমাজদর্শনের অন্যতম লক্ষ্য হল মানুষের ঐক্য (Unity of Mankind)। আধুনিক মনোবিজ্ঞান সমাজদর্শনের এই লক্ষ্যকে সমর্থন করে।

সামাজিক মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ

পূর্বোক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে, সমাজদর্শনের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী যেমন ম্যাকডুগাল (*McDougall*) এবং ফ্রয়েড (*Freud*), মানুষের সমাজ-জীবনকে কতকগুলি মানসিক শক্তিতে (Psychological Forces) রূপান্তরিত করেছেন। সেক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান হয়ে ওঠে মনোবিজ্ঞানের অর্থাৎ সামাজিক মনোবিজ্ঞানের শাখা এবং সেহেতু সমাজদর্শনও হয়ে পড়ে পুরোপুরি ব্যক্তি-সাপেক্ষ (Subjective)। কিন্তু এ ধারণা যুক্তিযুক্ত নয়। গিস্‌বার্ট (*Gisbert*) বলেন, 'যেহেতু যে সব কারণ আমাদের সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করে সেগুলি সবই মনস্তত্ত্বমূলক নয়, সেহেতু কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করেই সামাজিক জীবনের আলোচনা চলতে পারে না। মানুষের সামাজিক আচরণের মূলে কেবলমাত্র মানসিক কারণই বর্তমান নেই; অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং জৈবিক কারণও বর্তমান। এজন্য সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠানগুলির ভিন্নতা এবং তাদের বিকাশ কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানসম্মত নিয়মের সহায়তায় ব্যাখ্যা করা যাবে না।

1. "Psychology when it studies mind as revealed in social relation is often called Social Psychology." —*MacIver* : Community ; Page 69.

2. "But as the causes affecting social behaviour are likewise other than psychological, social life cannot be studied exclusively with the methods of the Psychologist." *P. Gisbert* : Fundamentals of Sociology. Page—20.

৩। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Social Philosophy and Politics) :

সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। সমাজদর্শনের কাজ হল সামাজিক নীতি, নিয়ম এবং ধারণাগুলির যৌক্তিকতা বিচার করা ও তাদের মূল্যাবধারণ করা, জনকল্যাণের আদর্শ নির্ধারণ করা এবং যে সমাজ-ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের জনকল্যাণের আদর্শটি বাস্তব রূপ পেতে পারে তার স্বরূপ নির্ণয় করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল রাষ্ট্র-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। গার্নার (*Garner*)-এর মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সমস্যাগুলি হল রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং স্বরূপ নিরূপণ করা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ, ইতিহাস ও গঠন সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং তার থেকে রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির বিধিগুলি অনুমান করে নেওয়া। রাষ্ট্রের লক্ষ্য হল মানুষের কল্যাণের জন্যই মানুষের আচরণকে উপযুক্ত শাসনযন্ত্রের সহায়তায় নিয়ন্ত্রিত করা এবং সেজন্য ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য নির্ণয় করা।

সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বরূপ

সমাজদর্শন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য এবং কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়ই আদর্শনিষ্ঠ (Normative), যেহেতু উভয়ই জনকল্যাণের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যবহারিক বিজ্ঞান। সমাজদর্শনও সমাজস্থ ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়ই সমাজ-জীবন সম্পর্কে আলোচনা করে। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েরই আলোচ্য বিষয় সমষ্টিগত চেতনা (Collective Mind), ব্যক্তি-চেতনা (Individual Mind) নয়।

সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য

রাষ্ট্র একটি সুসংগঠিত শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের আনুগত্য লাভের জন্য কতকগুলি আইন প্রণয়ন করে। সামাজিক ঐক্য এবং সহযোগিতা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ এসব আইন পালন করতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভিন্ন রাষ্ট্রের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র পূর্বোক্ত সামাজিক ঐক্য এবং সহযোগিতার আদর্শের দিকে নাগরিকবৃন্দকে কতখানি পরিচালিত করছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দোষত্রুটি বিচার করে।

সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেই আদর্শের দ্বারাই পরিচালিত হয়, যে আদর্শ বস্তুতঃ সমাজদর্শনই বিচার ও নির্ণয় করে। সমাজদর্শনেরও আদর্শ হল সামাজিক ঐক্য, সামাজিক সংগতি এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের পারস্পরিক সহযোগিতায় লব্ধ জনকল্যাণ। একথা ঠিক যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ, যেহেতু একমাত্র মানুষের রাজনৈতিক সম্বন্ধের মাধ্যমেই এই আদর্শের দ্বারা তাকে পরিচালিত হতে হয়। সমাজদার্শনিক আদর্শ সমাজের পক্ষে অপরিহার্য যে সকল বিষয় নির্ধারণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সেগুলিকে উপেক্ষা করা কোন মতেই সম্ভব হয় না। সমাজদর্শনের নির্ণীত আদর্শ থেকে দূরে সরে গেলে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের জীবনের উপর অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। কোন রাজনৈতিক নেতা যদি আদর্শশূন্য হয়ে নিজের খেয়াল-খুশিমত রাষ্ট্র পরিচালনা করে তবে রাষ্ট্রে অব্যবস্থা এবং অরাজকতা দেখা দিতে বাধ্য।

সমাজদর্শনের আদর্শ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পরিচালিত করে

সমাজদর্শন ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তার মূল্য নির্ধারণ করে। কিন্তু কোন-না-কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকেই ব্যক্তি তার সামাজিক জীবন যাপন করে। সুতরাং এই সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত না হলে ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং সমাজের আদর্শ নির্ধারণ করা সমাজ-দার্শনিকের পক্ষে সম্ভব নয়।

সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে যথেষ্ট যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সমাজদর্শন সকল প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ ও সংগঠন নিয়ে আলোচনা করে। এক হিসেবে রাষ্ট্র, পরিবার, ধর্ম, নীতিবোধ, কলা সব কিছুই সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান মাত্র একপ্রকার সামাজিক কার্যকলাপ, অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপ, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র ইত্যাদি। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রধানতঃ তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যথা—(১) রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা এবং যে সকল বিষয়ের উপর

সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

এদের উৎপত্তি নির্ভরশীল সেই বিষয়গুলি, (২) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি এবং (৩) শাসনব্যবস্থা পরিচালনার কায়দা-কানুন। প্রথম এবং তৃতীয় বিষয়ের সঙ্গে সমাজদর্শনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দ্বিতীয় বিষয় নিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে। সমাজদর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় সমাজ-জীবনে মানুষের উদ্দেশ্য, আদর্শ, মূল্য ও মানুষের সামাজিক ঐক্য এবং এদের সাহায্যে সামাজিক তথ্যের মূল্যাবধারণ।

৪। সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান (Social Philosophy and Ethics):

সমাজদর্শনের সঙ্গে অন্যান্য জ্ঞানের শাখার সম্পর্কের তুলনায় নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে এর সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। সমাজদর্শন সমাজের মৌলিক নীতি এবং ধারণাগুলির যৌক্তিকতা বিচার করে এবং মূল্যাবধারণ করে।[1] সমাজদর্শন মূল্য, উদ্দেশ্য এবং আদর্শ (Value, Ends and Ideals) নিয়ে আলোচনা করে এবং মানুষের ঐক্যের (Unity of Mankind) আলোকে মানুষের সামাজিক জীবনের বিশেষ দিকগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্য সচেষ্ট হয়। নীতিবিজ্ঞান সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের ভালত্ব ও মন্দত্ব নৈতিক আদর্শের আলোকে বিচার করে। এজন্য নীতিবিজ্ঞানকে মানুষের জীবনের নৈতিক আদর্শ অর্থাৎ পরমকল্যাণ বা পরমার্থের স্বরূপটি নির্ধারণ করতে হয়।

সমাজদর্শন ও নীতি-বিজ্ঞানের স্বরূপ

সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য হল যে, উভয়ই আদর্শনিষ্ঠ (Normative) এবং উভয়ই মনুষ্য-জীবনের আদর্শ, মূল্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে চায়।[1] সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান উভয়েরই কাজ হল সমাজস্থ মানুষ নিয়ে। যে আদর্শ সমাজদর্শন নির্ধারণ করতে চায় সে আদর্শ সমাজের ব্যক্তিদের জন্যই প্রয়োজন। নীতিবিজ্ঞান পরমকল্যাণের বা পরমার্থের যে আদর্শটি নির্ধারণ করতে চায় তাও প্রয়োজন সমাজস্থ ব্যক্তিদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য। সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান উভয়েই সমাজকেন্দ্রিক।

সমাজদর্শন ও নীতি-বিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য

এক হিসেবে সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান একই আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে। সমাজদর্শনের আদর্শ হল জনকল্যাণ (Common Good)। এই জনকল্যাণের আদর্শ নীতিবিজ্ঞানের পরমকল্যাণের আদর্শ বা পরমার্থ থেকে পৃথক বা বিযুক্ত নয়। নীতিবিজ্ঞান ব্যক্তিবিশেষের দিক থেকেই এই পরমার্থের স্বরূপ নির্ধারণ করতে চায়। কিন্তু মানুষ সামাজিক জীব এবং তার সমাজ-বহির্ভূত পৃথক কোন সত্তা নেই। সে কারণে নীতিবিজ্ঞানে পূর্ণতাবাদীরা (Perfectionists) স্পষ্টই প্রকাশ করেছেন যে, মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ বা জনকল্যাণের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মানুষের পরমকল্যাণ হল তার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ এবং এই কল্যাণ জনকল্যাণের বিরোধী নয়; বরং এক হিসেবে তা জনকল্যাণেরই অঙ্গ বা অংশবিশেষ।

উভয়ই এক আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে

পূর্বোক্ত সাদৃশ্য থাকা সত্বেও সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য বর্তমান। সমাজদর্শনের কাজ সমাজ নিয়ে বা সমষ্টিগত চেতনার বিকাশ নিয়ে, আর নীতিবিজ্ঞানের কাজ সমাজস্থ ব্যক্তি-চেতনার বিকাশ নিয়ে। সমাজদর্শন হল ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মানসিক জ্ঞানের শাখা (Objective Mental Study), যেহেতু সমাজদর্শন যে সব বিষয়গুলি আলোচনা করে সেগুলি নিছক মানসিক প্রক্রিয়া নয়, প্রক্রিয়ার বস্তুগতরূপ; যেমন—সমাজের নিয়ম-কানুন, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। নীতিবিজ্ঞান হল ব্যক্তি-সাপেক্ষ মানসিক বিদ্যা (Subjective Mental Science), যেহেতু নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় মানুষের কামনা, বাসনা, সংকল্প, অভিপ্রায় ইত্যাদি।

সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

বস্তুতঃ, সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং একটি অপরটির পরিপূরক। সমাজদর্শন সামাজিক নিয়ম ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের নৈতিক মূল্য নিরূপণ করে। সামাজিক উন্নতির প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য সমাজদর্শনকে নৈতিক নীতিগুলি প্রয়োগ করতে হয়। কাজেই সমাজদর্শনকে নীতিবিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়। আবার সমাজদর্শন যে আদর্শটি নির্ধারণ করে তা নীতিসংগত হওয়া প্রয়োজন এবং এর জন্য নীতিবিজ্ঞানের

উপর তাকে নির্ভর করতে হয়। নীতিবিজ্ঞান ব্যক্তির আচরণের ভালত্ব ও মন্দত্ব বিচার করে। কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তির আচরণকে কখনও বিচার করা যায় না। সামাজিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তির আচরণই নীতিবিজ্ঞানের বিচার্য বিষয় এবং যেহেতু সামাজিক সম্পর্কের অর্থ ও মূল্য নিরূপণ করা সমাজদর্শনের কাজ, সেহেতু নীতিবিজ্ঞানকে সমাজদর্শনের উপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া, নীতিবিজ্ঞান ব্যক্তির পরম কল্যাণের যে আদর্শটির স্বরূপ নির্ধারণ করে, সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে নির্ধারণ করে। সমাজদর্শনের কাজ মানুষের এই পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে উদ্ভূত যে সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র, সংঘ ও প্রতিষ্ঠান, সেগুলির যৌক্তিকতা বিচার ও মূল্যাবধারণ। সুতরাং নীতিবিজ্ঞানকে পরোক্ষভাবে সমাজদর্শনের উপর নির্ভর করতে হয়।

নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল

আর একটি বিষয়ে নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শনের সম্পর্ক বর্তমান। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, 'সমাজদর্শন মানুষের সামাজিক ঐক্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।'[1] মানুষের সামাজিক ঐক্য তখনই সম্ভব ও দৃঢ় হয় যখন তা কোন আদর্শকে অবলম্বন করে বর্তমান থাকে এবং সমাজব্যবস্থাকে সেই আদর্শ অনুযায়ী গঠন করা হয়। সমাজদর্শন যে জনকল্যাণের আদর্শ বা যে আদর্শ সমাজের কথা বলে তা যদি মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণের বিরোধী হয় বা মানুষের পরমার্থ লাভের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা কখনও কার্যকরী হতে পারে না। সে কারণে নীতিবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জনকল্যাণের আদর্শকে রূপ দেবার চেষ্টা না করলে সমাজদর্শন মানুষের যে সামাজিক ঐক্যের কথা বলে তা লাভ করা সম্ভব নয়।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সমাজদর্শনের সঙ্গে নীতিবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

1. "Social Philosophy, in particular, concentrates its attention on the social unity mankind"—*Mackensie* : Outlines of Social Philosophy.

৫। সমাজদর্শন কি নীতিবিজ্ঞানের উপাঙ্গ? (Is Social Philosophy a mere appendage to Ethics)?

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (*Plato*) এবং অ্যারিস্টটল যেমন সমাজদর্শনকে নীতিবিজ্ঞানের বাড়তি অংশরূপে গণ্য করেছেন তেমনি কেউ কেউ মনে করেন যে, সমাজদর্শনকে স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে গণ্য করা চলে না। সমাজদর্শন নীতিবিজ্ঞানের উপাঙ্গ (appendage) ছাড়া কিছুই নয়। তাঁদের মতে সামাজিক সংগঠন ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শকে প্রয়োগ করে সামাজিক সংগঠন ও সম্পর্কের অর্থ ও মূল্য নির্ধারণ করাই সমাজদর্শনের একমাত্র কাজ। বস্তুতঃ, হবহাউস (*Hobhouse*) উপরিউক্ত অভিমতের সমর্থক। তাঁর মতানুসারে সামাজিক এবং রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য লাভের উপায়মাত্র; তাদের নিজেদেরই লক্ষ্যরূপে গণ্য করা চলে না, সামাজিক জীবনের উপায়স্বরূপ তাদের গণ্য করা চলে। তারা কোন্ ভাবের পোষক, তারই ভিত্তিতে তাদের ভালত্ব ও মন্দত্ব বিচার্য। হবহাউসের মতে নীতিবিদ্যা হল লক্ষ্য বা মূল্যের মতবাদ, তাকে সামাজিক সম্পর্ক বা ব্যক্তির আচরণ যার মধ্য থেকেই পাওয়া যাক না কেন। হবহাউসের (*Hobhouse*) পদ্ধতি হল প্রথমে লক্ষ্য বা আদর্শ সম্পর্কে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং তারপর সামাজিক সংগঠনের নীতিগুলিকে অবরোহাত্মক পদ্ধতিতে তা থেকে নিঃসৃত করা। সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংস্কারের যে নৈতিক ভিত্তির প্রয়োজন আছে ইংলণ্ডে বেন্থাম (*Bentham*) এবং মিল্ (*Mill*) সর্বপ্রথম তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন।

সমাজদর্শন যে সামাজিক ঘটনা ও সম্পর্কের তাৎপর্য নিরূপণের জন্য নৈতিক আদর্শের সহায়তা গ্রহণ করে না তা নয়। গিন্সবার্গ (*Ginsberg*) স্পষ্টই বলেছেন যে, সমাজদর্শনের দুটি অংশ আছে—একটি সমালোচনার দিক (critical or logical) এবং অপরটি গঠনমূলক বা সংযোগাত্মক দিক (constructive or synthetic)। দ্বিতীয় অংশটির কাজ সামাজিক আদর্শের সত্যতা নিয়ে আলোচনা করা। এই দিক থেকে বিচার করলে সমাজদর্শনের কাজ সমাজজীবনের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে নীতিবিজ্ঞানের ফলাফলগুলি প্রয়োগ করা।[1]

1. ***Ginsberg*: Sociology, P. 26.**

যেমন, সামাজিক উন্নতির প্রশ্নের ক্ষেত্রে সমাজে যা কিছু ঘটছে তাকে নৈতিক আদর্শের মানদণ্ডের সহায়তায় বিচার করার প্রশ্ন দেখা দেয়। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) সমাজদর্শনের ও নীতিবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, "সমাজদর্শনকে নীতিবিজ্ঞানের অংশরূপে অভিহিত করা যেতে পারে কিংবা নীতিবিজ্ঞানকে এর অংশরূপে অভিহিত করা যেতে পারে।" কিন্তু তাঁর মতে সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানকে পৃথক শাস্ত্ররূপেই গণ্য করা যুক্তিযুক্ত কারণ দুটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে গণ্য হওয়ার জন্য উভয়ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত মালমশলা পাওয়া যাবে।[1] অধ্যাপক কোল (*Prof. Cole*)-ও ম্যাকেঞ্জিকে এই বিষয় সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে সমাজদর্শন নীতিবিজ্ঞানের অধীনস্থ নয়, বরং নীতিবিজ্ঞানের পরিপূরক।[2]

আমাদের মতেও সমাজদর্শনকে নীতিবিজ্ঞানের উপাঙ্গরূপে গণ্য না করে তাকে পৃথক শাস্ত্ররূপে গণ্য করা উচিত, কারণ সামাজিক ঘটনার নৈতিক তাৎপর্য নিরূপণই সমাজদার্শনিকের একমাত্র কাজ নয়। তাছাড়া সমাজদর্শনের সমালোচনামূলক দিকটিও উপেক্ষার বিষয় নয়।

৬। সমাজদর্শনের ব্যবহারিক মূল্য (Practical Value of Social Philosophy) :

অনেক ব্যক্তিই দর্শনের কোন ব্যবহারিক মূল্য স্বীকার করেন না, সমাজদর্শন সম্পর্কেও তাঁরা অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। সমাজদর্শন কোন জীবিকার প্রতিশ্রুতি দেয় না, জীবনে কোন্ বৃত্তি আমরা অনুসরণ করব তার কোন নির্দেশ দেয় না। সমাজদর্শন সম্পর্কে উপরিউক্ত অভিমত স্বীকার করে নিলেও, সমাজদর্শনের কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই, বলা চলে না।

অনেকের মতে সমাজদর্শনের কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই

সমাজদর্শন সামাজিক সম্পর্ক আলোচনা করে তার তাৎপর্য নিরূপণের চেষ্টা করে। সমাজদর্শন সামাজিক নিয়ম ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের অর্থ ও

1. *Mackenzie* : Outlines of Social Philosophy, P. 16-17.
2. *Cole* : Social Theory.

উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে চায়। সমাজদার্শনিক সামাজিক সম্পর্কের যে তাৎপর্য নিরূপণ করেন ও সামাজিক নিয়ম এবং অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের যে অর্থ ও উদ্দেশ্য আবিষ্কার করেন, ব্যবহারিক জীবনে তার প্রচুর মূল্য আছে। সমাজ-দার্শনিক প্রদত্ত পূর্বোক্ত জ্ঞান আমাদের সামাজিক জীবনকে আরও ভালভাবে বুঝবার সুযোগ দেয়। সামাজিক সম্পর্কের উন্নতিসাধনের জন্য সামাজিক সম্পর্কের যথাযথ জ্ঞান লাভ করা একান্তভাবে প্রয়োজন। সমাজদার্শনিক সামাজিক সংহতির পিছনে কী শক্তিগুলি ক্রিয়া করে সেগুলি আবিষ্কার করে। কোন্ কোন্ শক্তি সামাজিক ঐক্য আনয়ন করে এবং কোন্ কোন্ শক্তি সামাজিক ঐক্য বিনষ্ট করে, সেগুলি নিরূপণ করার পর সমাজদার্শনিক সমাজের শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য সংরক্ষণে সহায়ক নীতিগুলি সমাজকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়। সমাজদার্শনিক সামাজিক ব্যাধির স্বরূপ নিরূপণ করে এবং তার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করে। কাজেই সমাজদার্শনিক সমাজের অকল্যাণ দূর করে সমাজের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।

সমাজদার্শনিক সমাজের শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য সংরক্ষণে সহায়তা করে

সমাজদর্শন জনকল্যাণের আদর্শটি নির্ধারণ করে এবং সমাজস্থ ব্যক্তি এই আদর্শ অনুসরণ করার ফলে, ব্যক্তির ব্যক্তিগত কল্যাণ ও জনকল্যাণের মধ্যে কোন সংঘাত দেখা দেয় না। সমাজদার্শনিক বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মূল্য নিরূপণ করে, তাদের দোষ-ত্রুটি আবিষ্কার করে সংশোধনের পথ নির্দেশ করে। সমাজদর্শন সমাজস্থ ব্যক্তির আচরণও নিয়ন্ত্রিত করে।

সমাজদর্শন জনকল্যাণের আদর্শটি নিরূপণ করে এবং ব্যক্তিকল্যাণের সঙ্গে জনকল্যাণের সমন্বয় সাধন করে

সমাজদর্শন সামাজিক সম্পর্কের তাৎপর্য নিরূপণ করে, জনকল্যাণের আদর্শ নিরূপণ করে মানুষকে তাদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে এবং তাদের সৎ ও দায়িত্বশীল নাগরিক রূপে সমাজ-জীবনে বসবাস করতে সহায়তা করে।

সমাজদর্শন সুখী সামাজিক জীবনের শর্তগুলি আবিষ্কার করার জন্য চেষ্টা করে এবং হবহাউস (*Hobhouse*) যখন বলেন, 'সমাজদর্শনের কাজ হল শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য মানুষের ক্ষমতার সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিপূর্ণতার ধারণাকে আমাদের সামনে তুলে ধরা,' তখন সেই কথাগুলির মধ্যে যে যথেষ্ট সত্যতা নিহিত আছে, তাকে কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না।

সমাজদর্শন সুখী সমাজ-জীবন যাপনে সহায়তা করে

সংক্ষিপ্তসার

১। সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের সম্বন্ধ খুব নিকট ও ঘনিষ্ঠ। মানুষের সামাজিক জীবনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও মূল্য নির্ণয় করে সমাজদর্শন। সমাজবিজ্ঞানের কাজ সমাজের উৎপত্তি, গঠন, বিকাশ, তার আইন-কানুন, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা এবং এসবের কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা। সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের পার্থক্য খুব সুস্পষ্ট। সমাজদর্শন আদর্শনিষ্ঠ জ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান নির্ণয় করে সমাজের প্রকৃতি কি, এর বিভিন্ন অংশ ও আচার অনুষ্ঠানের উৎপত্তি ও বিকাশ কিভাবে হয়েছে, কি জাতীয় আইন কানুন, প্রথা-পদ্ধতি রীতিনীতি সমাজে প্রচলিত আছে! সমাজদর্শন এ সকল বিষয় বিচার করে কোন এক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে—অর্থাৎ এগুলি কি হওয়া উচিত অথবা এরা কতটা আদর্শোপযোগী। সমাজবিজ্ঞান তাত্ত্বিকবিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানদান করা এর লক্ষ্য ; সমাজদর্শনের ব্যবহারিক উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞান পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয়গুলি প্রকৃতপক্ষে মানুষের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র এবং সমাজের আদর্শের সঙ্গে পরিচয় থাকলে এসকল বিষয়ের যথার্থ উপযোগিতা নির্ণয় করা যায়। সমাজদর্শন সমাজের আদর্শের বিচার করে; এজন্য সমাজবিজ্ঞানের পক্ষে সমাজদর্শনের আলোচনা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, সামাজিক তথ্যের মধ্যে সমাজের আদর্শ রূপায়িত হয় এবং এজন্য সমাজদর্শনকে সমাজবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়। সমাজের সংস্কার ও উন্নতি একমাত্র আদর্শ অনুসারে হওয়াই সম্ভব। তবু একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক—প্রথমটি করে সমাজ-জীবনের মূল্যনির্ধারণ, দ্বিতীয়টি করে সামাজিক তথ্যের আলোচনা।

২। সমাজদর্শনের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। মনোবিজ্ঞান মনের বিজ্ঞান অর্থাৎ চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার বিজ্ঞান। এক হিসেবে সমাজ ব্যক্তিমনের বহিঃপ্রকাশ।

সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞান উভয়ই মানসিক ক্রিয়া, অতএব সম্পর্কীয় বিদ্যা নয়। কিন্তু সমাজদর্শন, আদর্শনিষ্ঠ বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ বিদ্যা। মনোবিজ্ঞান এক হিসেবে ব্যক্তি-সাপেক্ষ, কেননা সকল মানসিক ক্রিয়াই ব্যক্তিমনের ক্রিয়া; কিন্তু সমাজদর্শন ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। মনোবিজ্ঞানের কাজ ব্যক্তি-চেতনা নিয়ে, সমাজদর্শনের কাজ সমষ্টিগত চেতনা নিয়ে। মনোবিজ্ঞান তাত্ত্বিক বিজ্ঞান, কিন্তু সমাজদর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগ অনস্বীকার্য। মনোবিজ্ঞানের পরিধি সমাজদর্শনের পরিধি থেকে অনেক ব্যাপক।

ম্যাকডুগাল (McDougall), ফ্রয়েড (*Freud*) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানী মানুষের সমাজ-জীবনকে কয়েকটি মানসিক বৃত্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চান। কিন্তু মানুষের সমাজ-জীবনকে কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রথার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের আচরণের পশ্চাতে মানসিক কারণ ছাড়া অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি অন্যান্য শক্তির প্রভাব আছে।

সমাজ-জীবনের মনস্তত্ত্বমূলক দিক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের চিন্তা, ইচ্ছা ও অনুভূতিকে কোন আদর্শানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব তা নির্ণয় করা সমাজদর্শনের কাজ। সমাজদার্শনিকের পক্ষে এজন্য মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মানুষের সামাজিক ঐক্যবোধ বস্তুতঃ কতকগুলি মূল মানসিক বৃত্তি থেকে উদ্ভূত—এ হল আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত অভিমত।

মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও বিভিন্ন মানুষের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে গভীর সম্বন্ধ বর্তমান তার আলোচনা থেকে সামাজিক মনোবিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে এবং তার ফলে সমাজদর্শনের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের গভীর সম্পর্ক আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

৩। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। সমাজদর্শনের কাজ সামাজিক ঐক্য ও জনকল্যাণের আদর্শ অনুসারে সামাজিক রীতিনীতি, নিয়ম-কানুন, প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতির মূল্য নির্ণয় করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। এরও উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য জনকল্যাণ। রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করেই জনকল্যাণ সাধন করা সম্ভব। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়ই আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান এবং উভয়ই মানুষের সমষ্টিগত চেতনা নিয়ে আলোচনা করে। তবে এদের মধ্যে পরিধিগত পার্থক্য আছে। সমাজদর্শন সকল রকম সামাজিক সংগঠন ও বিধিব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ তিনটি; যথা—(i) শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতি ও তার উৎপত্তি; (ii) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও নৈতিক ভিত্তি এবং (iii) রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র ও কাঠামো। সমাজদর্শনের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়টির সঙ্গেই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। সমাজদর্শনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও আদর্শ নির্ণয় করে। আদর্শচ্যুত রাষ্ট্রের অবনতি অপরিহার্য।

৪। সমাজদর্শনের সঙ্গে নীতিবিজ্ঞানের সম্পর্ক অতি নিকট ও ঘনিষ্ঠ। সমাজদর্শন সামাজিক ঐক্যের আদর্শে সামাজিক তথ্যের মূল্যাবধারণ করে, আর নীতিবিজ্ঞান সমাজে বসবাসকারী

মানুষের আচরণের ন্যায়-অন্যায় নির্ণয়ের আদর্শ স্থির করে। এজন্য সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান উভয়ই আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান এবং উভয়ই সমাজকেন্দ্রিক। তবে নীতিবিজ্ঞান ব্যক্তির আচরণের উপর বেশি গুরুত্ব দেয় এবং সমাজদর্শন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আচার-ব্যবহারের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। নীতিবিজ্ঞান ব্যক্তি-সাপেক্ষ মানসিক বিদ্যা, সমাজদর্শন ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মানসিক বিদ্যা। নীতিবিজ্ঞানে ব্যক্তি-চেতনার প্রাধান্য, আর সমাজদর্শনে সমষ্টিগত চেতনার প্রাধান্য।

এক হিসেবে উভয়ের আদর্শ এক এবং সেই আদর্শ বহুজনহিতের বা জনকল্যাণের আদর্শ। বস্তুতঃ ব্যক্তিকল্যাণ ও জনকল্যাণের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কোন প্রভেদ বা বিরোধ নেই, কেননা ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ। এজন্য সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সমাজদর্শন যে আদর্শ নির্ণয় করে তাকে নীতিসংগত হতেই হবে। এজন্য একথা বলা যেতে পারে যে, সমাজদর্শন নীতিবিজ্ঞানের অংশ বা নীতিবিজ্ঞান সমাজদর্শনের অংশ।

৫। কারও কারও মতে সমাজদর্শন নীতিবিজ্ঞানের উপাঙ্গ। হবহাউসের মতে প্রথমে আদর্শ সম্পর্কীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে তার পরে সামাজিক সংগঠনের নীতিগুলিকে অবরোহাত্মক পদ্ধতিতে তার থেকে নিঃসৃত করতে হবে। সমাজদর্শন সম্পর্কে উপরিউক্ত অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজদর্শন সমাজ-জীবনের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে নীতিবিজ্ঞানের ফলাফলগুলিকে প্রয়োগ করে সত্য, তবু সমাজদর্শনকে নীতিবিজ্ঞানের উপাঙ্গরূপে গণ্য করা চলে না; স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে গণ্য হবার মত মালমশলা উভয়েরই আছে বলে ম্যাকেঞ্জি মনে করেন। অধ্যাপক কোল তাঁকে সমর্থন করেন।

৬। অনেক ব্যক্তি সমাজদর্শনের ব্যবহারিক মূল্য স্বীকার করেন না। কিন্তু সমাজদর্শনের ব্যবহারিক মূল্য অস্বীকার করা চলে না। সমাজদর্শন সামাজিক সম্পর্কের তাৎপর্য নিরূপণ করে এবং সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের অর্থ ও উদ্দেশ্য আবিষ্কার করে। সমাজস্থ মানুষের ব্যবহারিক জীবনে এর অনেক মূল্য আছে। সমাজদার্শনিক সামাজিক ঐক্য, শৃঙ্খলা সংরক্ষণে সহায়তা করে, সমাজের ব্যাধি নিরাময়ে সচেষ্ট হয়, সমাজের অকল্যাণ দূর করে সমাজকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। সমাজদর্শন জনকল্যাণের আদর্শটি নির্ধারণ করে ব্যক্তিগত কল্যাণের সঙ্গে জনকল্যাণের সমন্বয় সাধন করে। সমাজদর্শন সুখী জীবনের শর্তগুলি আবিষ্কার করে, সমাজস্থ মানুষকে সুখী জীবন যাপনে সহায়তা করে।

তৃতীয় অধ্যায়

মানুষের সামাজিক প্রকৃতি

(The Social Nature of Man)

১। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি (The Social Nature of Man) :

অ্যারিস্টটল (*Aristotle*) বলেন, মানুষ হল সামাজিক জীব। তাঁর মতে, যে-মানুষ সমাজস্থ নয়, সে হয় পশু, নয়ত দেবতা। আদিম যুগ থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন-যাপন করে আসছে। মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিই এরূপ যে, সে অপরের সঙ্গ কামনা না করে পারে না। মানুষ কী ধরনের সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল অর্থাৎ তার সমাজ জীবনের রূপটি কিরকম ছিল সেকথা মুখ্য নয়, গৌণ। মানুষ যে কোন-না-কোন এক ধরনের সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সমাজ ছাড়া মানুষের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। ম্যাকাইভার ও পেইজ (*MacIver and Page*) বলেন, 'নিরাপত্তা, সুখ, পুষ্টি, শিক্ষা, উপকরণ, সুযোগ এবং সমাজের দেওয়া আরও বহু পরিচর্যার জন্য মানুষ সমাজের উপর নির্ভরশীল। সে তার চিন্তার উপাদানের জন্য, তার স্বপ্নের জন্য, আকাঙ্ক্ষার জন্য এবং এমন কি তার শরীর ও মনের নানারকম ব্যাধির জন্য সমাজের উপর নির্ভরশীল। সমাজে তার জন্মগ্রহণই সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা সূচিত করে।'[1]

মানুষ সামাজিক জীব

ম্যাকাইভার ও পেইজ-এর মতে মানুষ নানা বিষয়ের জন্য সমাজের উপর নির্ভরশীল

কোন কোন ব্যক্তির মতে মানুষ কোন রকম সামাজিক সম্পর্ক ছাড়াই এক প্রাকৃতিক রাজ্যে স্বাধীনভাবে বসবাস করত। কিন্তু এরকম কোন প্রাকৃতিক রাজ্যের ধারণা অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুতঃ, স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সমাজ বহির্ভূত জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, 'উদার অর্ধসভ্য মানুষের যে চিত্র, যেখানে মানুষ সকল রকম সামাজিক

---

1. *MacIver and Page* : Society : Page 8.

নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত, বনের নদী এবং স্রোতস্বিনীর জলে যে নিজের তৃষ্ণা মিটায় এবং যে প্রকৃতির বদান্য দানের ফল দ্বারা নিজের ক্ষুধা মেটায় সে-চিত্র নিছক কাব্য-কাহিনী, যার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই।'[1] বস্তুতঃ, যখন আমরা সমাজ এবং ব্যক্তির সম্পর্কের কথা চিন্তা করি তখন আমরা বিশেষ কোন এক ধরনের সমাজের কথা চিন্তা করি না; সে-সমাজ পরিবার হতে পারে, রাষ্ট্র হতে পারে বা অন্য যে-কোন সমাজ-জীবন হতে পারে। জোয়াড (*Joad*) বলেন, 'মানুষ যে কেবল সমাজেই তার প্রকৃত স্বরূপ লাভ করে তা নয়, সে হল এমন একটি জীব যে, কোন-না-কোন এক ধরনের সমাজের মধ্যে বাস করে এসেছে, যদিও তার আদিমতম সমাজ হল পারিবারিক গোষ্ঠী।'[2]

২। মানুষের সামাজিক প্রকৃতির মনস্তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক ভিত্তি (The Psychological and Philosophical basis of social Life):

মানুষের সামাজিক প্রকৃতি যদিও সর্বজনস্বীকার্য সত্য, তবু এমন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, মানুষ কেন সামাজিক? মানুষের সামাজিক প্রকৃতির মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি কী? মানুষের মধ্যে এমন কোন্ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার জন্য সে সামাজিক? মানুষের সামাজিক প্রকৃতি কি তার কোন অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য, না কোন অর্জিত বৈশিষ্ট্য?

আত্মসংরক্ষণ, আত্মবিস্তৃতি এবং আত্মপ্রকাশের তাড়না

মানুষের সামাজিক প্রকৃতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী এবং সমাজদার্শনিকরা বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর মতে মানুষের সামাজিক প্রকৃতির মূলে আছে কতকগুলি মৌলিক জৈবিক তাড়না। এই মৌলিক তাড়নাগুলি হল আত্মসংরক্ষণ (self preservation), আত্মবিস্তৃতি

---

1. *P. Gisbert*: Fundamentals of Sociology: Page 45.

2. "Not only is man a being who only attains his real nature in society, he is a being who has always lived in some form or other of society, even if his earliest society was only that of the family group."

—*C. E. M. Joad*: Guide to the Philosophy of Morals and Politics, *Seventh impression*: Page 87.

(self-perpetuation) বা বংশবৃদ্ধি এবং আত্মপ্রকাশের (self-expression) তাড়না। মানুষের নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে মানুষের আত্মসংরক্ষণের প্রকাশ ঘটে এবং এর জন্য কোন সামাজিক সংগঠনের একান্ত প্রয়োজন। আত্ম-বিস্তৃতি বা বংশবৃদ্ধির তাড়নার মূলে রয়েছে যৌন আবেগ এবং এর জন্যও প্রয়োজন অপরের সাহচর্য। মানুষের আত্মপ্রকাশের তাড়না নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং এর জন্যও একটা সামাজিক সংগঠনের একান্ত প্রয়োজন। কাজেই প্রতিটি মৌলিক তাড়নার পরিপূরণের জন্য কোন না কোন সামাজিক সংগঠনের প্রয়োজন।

ক্ষুধা, যৌন-কামনা, অহংকার এবং ভীতি

সাম্‌নার (*W. G. Sumner*) এবং কেলার (*A. G. Keller*)-এর মতে সামাজিক জীবনের মৌলিক তাড়না হল চারটি—ক্ষুধা, যৌন কামনা, অহংকার এবং ভীতি। টমাস (*W. I. Thomas*)-এর মতে সমাজ-জীবনের মূলে আছে নিরাপত্তা এবং নতুন অভিজ্ঞতালাভের ইচ্ছা, স্বীকৃতি পাবার ও অপরের ডাকে সাড়া দেবার ইচ্ছা; ম্যাকডুগাল (*McDougall*)-এর মতে মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হল তার এক সহজাত প্রবণতা, তাঁর মতে যূথ প্রবৃত্তি (herd instinct) থেকে এই সহজাত প্রবণতার উদ্ভব।

চারটি ইচ্ছা

ওয়েস্টার মার্ক (*Wester Marck*)-এর মতে মানুষের সামাজিক আচরণের মূলে রয়েছে যূথ প্রবৃত্তি নয়, এক বিশেষ ধরনের প্রবৃত্তি যাকে তিনি বলেছেন সামাজিক প্রবৃত্তি (social instinct)। এই উভয় প্রবৃত্তির মধ্যে তিনি পার্থক্য করেছেন। যূথ প্রবৃত্তি হল এমন একটা মানসিক প্রবণতা যা দাম্পত্য, মাতৃপিতৃক বা সন্তান সম্পর্কীয় অনুরাগ ছাড়াও অপরের সঙ্গে একত্র বসবাসের ইচ্ছার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রবণতার মাধ্যমে সামাজিক প্রবৃত্তির (social instinct) প্রকাশ ঘটে। এই সামাজিক প্রবৃত্তিই মানুষকে অপরের সাহচর্যে আনন্দ লাভের জন্য প্রবৃত্ত করে।

সামাজিক প্রবৃত্তি

আবার কারও কারও মতে পিতৃত্ব বা মাতৃত্বের অনুভূতিই (parental feelings) মানুষের সামাজিক প্রকৃতির মূলে বর্তমান। ফ্রয়েড (Freud)-এর

মতে মানুষের সামাজিক প্রকৃতির মূলে আছে যৌন-প্রবণতা এবং তাঁর মতে সব সামাজিক প্রবণতাই যৌন প্রবণতারই ভিন্ন রূপ। গিডিংস্ (*F.H. Giddings*) মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি মৌলিক নীতির উল্লেখ করেছেন, যাকে তিনি বলেছেন, 'সম-চেতনা' (Consciousness of kind)।' এই সম-চেতনা বলতে তিনি বোঝেন, 'এমন একটা চেতনার অবস্থা, যে অবস্থায় কোন ব্যক্তি উচ্চ বা নীচ জীবনের যে কোন অবস্থারই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন, অপর একজন চেতন ব্যক্তিকে নিজের সমপ্রকৃতি মনে করে।'

পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের অনুভূতি, যৌন উদ্দীপনা ও সমচেতনা

পূর্বোক্ত অভিমতগুলির বিস্তারিত সমালোচনায় অবতীর্ণ না হয়েও, এ সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যেতে পারে। পূর্বোক্ত অভিমতগুলির মধ্যে কিছু কিছু সত্যতা থাকলেও, অধিকাংশ অভিমতই অসম্পূর্ণ। এদের কোনটিকেই চরম অভিমত বলে গণ্য করা যায় না। ভীতি, অহংকার বা নতুন অভিজ্ঞতালাভের ইচ্ছা সামাজিক আচরণের মূল উৎস নয়। বস্তুতঃ, এগুলি মুখ্য নয়, গৌণ। মানুষ যূথ প্রবৃত্তি বা সামাজিক প্রবৃত্তির জন্য সামাজিক একথা বলার কোন অর্থ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের মধ্যে এই সকল প্রবৃত্তির উপস্থিতির কারণ নিরূপণ করা যায়। তাছাড়া, মানুষের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির (instincts) অস্তিত্বের বিষয়টি বিতর্কমূলক বিষয়। সামাজিক জীবনে পিতৃত্ব বা মাতৃত্বের অনুভূতির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা না গেলেও, এই অনুভূতিই কেবলমাত্র সামাজিক প্রকৃতির মূলে বর্তমান, একথা স্বীকার করা যেতে পারে না। গিডিংস্ (*Giddings*)-এর 'সম-চেতনা'র নীতিটি এতই ব্যাপক যে তার দ্বারা মানুষের সামাজিক প্রকৃতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ফ্রয়েড (*Freud*) সামাজিক প্রকৃতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যৌন আবেগের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু যৌন আবেগের পরিতৃপ্তি মানুষের সামাজিক প্রকৃতির একমাত্র লক্ষ্য একথা বলা চলে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোন একটি মাত্র প্রবণতার মধ্যেই মানুষের সামাজিক প্রকৃতির উৎসকে খুঁজে পাওয়া

পূর্বোক্ত অভিমতগুলির সমালোচনা

মানুষের সামাজিক প্রকৃতির স্বরূপ ও কারণ নিরূপণ করতে হলে মানুষের জীবনের প্রধান দিকগুলির আলোচনা অপরিহার্য। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*)-র মতে মানুষের জীবনের তিনটি প্রধান দিক হল—(১) বর্ধনশীল দিক (Vegetative aspect), জৈবিক দিক (Animal aspect) এবং আর একটি দিক যেটি বিশেষ করে তার নিজের দিক (An aspect that is more peculiarly. his own) অর্থাৎ কিনা বুদ্ধিবৃত্তির দিক (Rational aspect)। তাঁর মতে মানুষের সামাজিক প্রকৃতি বিচার করতে হলে পূর্বোক্ত দিকগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই তা বিচার করতে হবে। মানুষের জীবনের বর্ধনশীল দিক মানুষকে সমাজবদ্ধ জীবন যাপনে বাধ্য করেছিল। সন্তান রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন, খাদ্য ও পানীয় সঞ্চয়, উপযুক্ত আশ্রয় ও নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা এবং প্রতিকূল পরিবেশ থেকে আত্মরক্ষা করা—এসব কারণই মানুষকে সামাজিক করে তুলেছিল। এছাড়াও আছে মানুষের জীবনে নানা রকম দুর্যোগ; ঋতুচক্রের আবর্তনে কখনও প্রচণ্ড শীত, কখনও গ্রীষ্মের অসহ্য উত্তাপ, কখনও বন্যার বাঁধভাঙা প্লাবন, কখনও বা অনাবৃষ্টির রুক্ষতা। উপরন্তু আদি মানবের পক্ষ অন্যান্য বন্য জীবজন্তু এবং হিংস্র মানুষের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করার প্রশ্ন তো আছেই।

বর্ধনশীল দিক, জৈবিক দিক এবং বুদ্ধিবৃত্তির দিক

যুদ্ধ করার প্রবণতার মধ্য দিয়েই মানুষের জৈবিক দিকের প্রকাশ ঘটেছিল এবং এ কারণেও সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। প্রাণীদের মত মানুষের মধ্যেও ছিল বিবাদ, আবার সহযোগিতা; তারই ফলে গোষ্ঠী-জীবনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। মিলেমিশে বাস করতে গিয়ে যেমন মানুষে মানুষে সহযোগিতা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি আবার কখনও তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এসব কারণে স্বাভাবিকভাবে মানুষকে জন্মাবধি সামাজিক হতে হয়েছে। মানুষের মধ্যে একদিকে আছে বিচ্ছিন্ন ও বর্জন করার প্রবণতা অপরদিকে আছে যুক্ত করা ও মিলিত করার প্রবণতা। উভয় প্রবণতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সংঘবদ্ধ জীবন।

জৈবিক দিক

কিন্তু এ ছাড়াও মানুষের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যে বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ তার নিজস্ব এবং বৈশিষ্ট্যের জন্যই তার সামাজিক জীবনের এক নূতন তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব এবং এই বুদ্ধিবৃত্তিই মানুষের সঙ্গে মানুষের সহযোগিতা সুদৃঢ় করেছে। মানুষ বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে উপলব্ধি করেছে যে, একতাই বল। মানুষের জ্ঞান মানুষকে এ বিষয়ে সহায়তা করল। জ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ নিত্য নতুন প্রয়োজনীয় বস্তু উদ্ভাবন করতে লাগল এবং তার পরিবেশকে নিজের প্রয়োজনে ও উদ্দেশ্যসাধন করার কাজে লাগাতে লাগল। মানুষ যখন উপলব্ধি করল বুদ্ধি দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে জীবনকে সুন্দর করে তুলতে হবে, চিন্তাকে বাস্তবে পরিণত করতে হবে, অভিজ্ঞতার সাহায্যে আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, তখনই দেখা দিল সংঘবদ্ধ জীবনের নতুন প্রয়োজনীয়তা।[1]

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তার সমাজবন্ধনকে দৃঢ় করেছে

আদিমযুগে মানুষের জীবনরক্ষার জন্য, কেবলমাত্র টিকে থাকার জন্যই সামাজিক জীবনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগ উন্নততর জীবনের আদর্শই মানুষের সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সমাজ গঠনের মূল উদ্দেশ্য— মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ, মানুষের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু প্রকাশ ও পূর্ণ বিকাশ। এই উদ্দেশ্যকে লাভ করতে হলে, জীবনকে সুন্দর ও মাধুর্যপূর্ণ করে তুলতে হলে, একক শক্তিতে সম্ভব নয়—সংঘবদ্ধ জীবনের দ্বারাই সম্ভব। মানুষের এই জ্ঞানই সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ককে নিবিড় করে তুলেছে।

উন্নততর জীবনের আদর্শই সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছে

1. গিলবার্ট (*Gilbert*) বলেন, "মানুষের যে সামাজিক জীবন যাপনের সামর্থ্য আছে তা নয়, এ তার একান্ত প্রয়োজনও—এ কথা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। অনুভূতির বিকাশ, বুদ্ধির পক্বতা, কিছু পরিমাণে পার্থিব বস্তু ও স্বাচ্ছন্দ্য যা তার আত্মোন্নতি এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য একান্ত প্রয়োজন—এ সকল বস্তু সমাজ জীবন ছাড়া কল্পনাও করা যায় না। বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করে কোন মানুষের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটেছে—এ জানা নেই।"—*P. Gilbert*: **Fundamentals of Sociology, Page 44.**

উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে, মানুষের সামাজিক প্রকৃতিকে কয়েকটি তাড়না বা প্রয়োজনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করলে চলবে না। মানুষের সামাজিক প্রকৃতির মূল রয়েছে আরও গভীরে—মানুষের সত্তার মধ্যে রয়েছে মিশে, মানুষের সামাজিক প্রকৃতি মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। গিনস্‌বার্গ (*Ginsberg*)-এর মতে মানুষের মধ্যে রয়েছে সামাজিক আবেগ যার লক্ষ্য হল 'ব্যাপকতর মেলামেশা এবং পরস্পরের ডাকে সাড়া দেবার ইচ্ছা' (wider intercourse and reciprocal response)। এই আবেগবশতঃই মানুষ নিজের সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতা উত্তীর্ণ হয়ে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। এ কেবলমাত্র অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করার মনোভাবই নয়। এ হল অপরের স্বীকৃতি পাবার এবং অপরকে স্বীকার করে নেবার, অপরকে ডাকার এবং অপরের ডাকে সাড়া দেবার প্রবণতা। সুতরাং বলা যেতে পারে, সামাজিকতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (sociality and individuality) একই মনুষ্য প্রকৃতির দুটি ভিন্ন দিক।

সামাজিক প্রকৃতির মূল মানুষের সত্তার মধ্যেই নিহিত

সংক্ষিপ্তসার

১। মানুষের সামাজিক প্রকৃতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী এবং সমাজ-দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কারও মতে মানুষের সামাজিক প্রকৃতির মূলে রয়েছে তিনটি জৈবিক তাড়না—আত্মসংরক্ষণ, আত্মবিস্তৃতি এবং আত্মপ্রকাশ। কারও মতে এই তাড়না হল ক্ষুধা, যৌন কামনা, অহংকার এবং ভীতি। কারও মতে চারটি ইচ্ছার অস্তিত্ব রয়েছে মানুষের সামাজিক প্রকৃতির মূলে—নিরাপত্তা ও নূতন অভিজ্ঞতা লাভের ইচ্ছা, স্বীকৃতি পাবার এবং অপরের ডাকে সাড়া দেবার ইচ্ছা। ম্যাকডুগাল (*McDougall*) এবং ওয়েস্টারমার্ক (*Waster Mark*)-এর মতে মানুষের সামাজিক প্রকৃতির মূলে রয়েছে যথাক্রমে যূথ প্রবৃত্তি ও সামাজিক প্রবৃত্তি। কারও কারও মতে মাতৃত্বের ও পিতৃত্বের অনুভূতিই মানুষের সামাজিকতার কারণ। ফ্রয়েডের (*Freud*) মতে তা হল যৌন উদ্দীপনা, গিডিংস (*Giddings*)-এর মতে 'সম-চেতনা'। পূর্বোক্ত অভিমতগুলির মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকলেও, প্রায় সবগুলিই অসম্পূর্ণ।

২। মানুষ সামাজিক জীব এবং আদিমতম যুগ থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করে আসছে। এক হিসেবে মানুষ তার সবকিছু পেয়েছে সামাজিক পরিবেশ থেকে। মানুষের জীবনের তিনটি প্রধান দিক হল: (১) বর্ধনশীল দিক, (২) জৈবিক দিক এবং (৩) মানুষের নিজস্ব দিক। প্রত্যেকটি দিকই মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার সূচনা করছে। মানুষের পক্ষে একা থাকা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। প্রাণিজগতে যেমন সহযোগিতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা বর্তমান, মানুষের ক্ষেত্রেও তেমনি সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতাও বর্তমান। তবে মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি তার সমাজবন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে এবং তাকে নিছক জীবন-যাপন না করে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে প্রেরণা দিয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞান এ বিষয়ে মানুষকে প্রভূত সহায়তা করেছে। কিন্তু মানুষের সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা সবই সমাজ জীবনে সম্ভব এবং তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তার সমাজ-জীবনকে নিবিড় ও সুদৃঢ় করছে;

৩। মানুষের সামাজিক প্রকৃতির মূল রয়েছে আরও গভীরে মানুষের সত্তার মধ্যে মিশে। মানুষের মধ্যে রয়েছে নিজের সংকীর্ণ সীমা উত্তীর্ণ হয়ে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার ইচ্ছা। সামাজিকতা এবং ব্যক্তিত্ব একই মনুষ্য প্রকৃতির দুটি ভিন্ন দিক।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যক্তি এবং সমাজ

(Society and the Individual)

১। সমাজ কি? (What is Society):

যখন বহু ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলা হয়। প্রধানতঃ, দুটি বৈশিষ্ট্য থাকলে যে-কোন জনসমষ্টিকে সমাজ বলা হয়। প্রথমতঃ, বহু লোকের সংঘবদ্ধভাবে বসবাস এবং দ্বিতীয়তঃ, এই সংঘবদ্ধতার পিছনে আছে কোন একটি উদ্দেশ্য। সামাজিক সম্পর্কই সমাজের ভিত্তি।

গিস্‌বার্ট (*Gisbert*) বলেন, "সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।"[1]

সমাজের স্বরূপ

কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের যে কোন সম্পর্কই সামাজিক সম্পর্ক নয়। দুটি মানুষ একই পথ দিয়ে একই স্থানে চলেছে, কারও সঙ্গে কারও সম্পর্ক নেই। যেহেতু মানুষ দুটি একই স্থানে একই সময়ে রয়েছে বা উভয়ের দৃষ্টি একই বস্তুর উপর নিবদ্ধ, তাতেও বলা যেতে পারে না যে তাদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক বর্তমান। কিন্তু যে মুহূর্তে একজন আর একজনকে জানে বা তার সম্পর্কে সচেতন হয় বা পরস্পরকে অভিনন্দন জানায় বা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে, তখনই সামাজিকতার শুরু হয়।

সমাজ হল মানসিক ব্যাপার

এজন্য গিস্‌বার্ট (*Gisbert*) বলেন, "সামাজিকতা বা সমাজ হল একটি মানসিক ব্যাপার।"[2]

---

1. "Society, in general. consists in the complicated network of social relationship by which every human being is interconnected with his fellowmen."

—*P. Gisbert*: Fundamentals of Sociology ; Page 8.

2. "Sociality or Society is essentially a mental phenomenon."

Ibid : Page 9.

সামাজিক সম্পর্ক বলতে আমরা বুঝি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির পরস্পরের সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং কয়েকটি বিষয়ে অন্ততঃ তাদের মধ্যে যে মিল আছে সে সম্বন্ধে তাদের মধ্যে অল্পবিস্তর চেতনা থাকা।

পারস্পরিক স্বীকৃতি এবং সাদৃশ্য সামাজিক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

পারস্পরিক স্বীকৃতি (Reciprocal Recognition) তা প্রত্যক্ষই হোক বা পরোক্ষই হোক এবং সাদৃশ্য (Commonness) যে-কোন সামাজিক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অবশ্য একথা ঠিক নয় যে, সমাজের মধ্যে কেবল সাদৃশ্য ও সহযোগিতা আছে এবং কোনরূপ পরিবর্তন, বৈচিত্র্য বা পার্থক্য নেই। যে মানুষ নিয়ে সমাজ গঠিত, সেই মানুষের পরস্পরের মধ্যে আছে অনেক পার্থক্য। বস্তুতঃ, সাদৃশ্য এবং পার্থক্য, বিরোধ এবং সহযোগিতা, মতের ঐক্য এবং মতের অনৈক্য সবই সমাজে বর্তমান। তবু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, সাদৃশ্য, সহযোগিতা, মিল—এগুলিই সমাজের প্রধান ভিত্তি। যেখানে সামাজিক সম্পর্ক

সামাজিক গোষ্ঠী এবং সমাজের মধ্যে প্রভেদ

সেখানেই যখন সমাজ তখন যুক্তির দিক দিয়ে আমাদের যে কোন সামাজিক সংগঠন ও সম্পর্ককে সমাজ বলে অভিহিত করা উচিত। কিন্তু সাধারণতঃ যেসব সংগঠন কম স্থায়ী সেগুলির ক্ষেত্রে 'সামাজিক গোষ্ঠী' (Social Groups) কথাটিকে ব্যবহার করা হয়। কেননা, সমাজ বলতে বুঝি 'সমজাতীয় উদ্দেশ্য অনুসরণ করার জন্য কতকগুলি স্থায়ী সম্পর্কের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি-সমষ্টি।' সুতরাং ঐক্য, বহুত্ব, স্থায়িত্ব, এবং সংঘবদ্ধতাই হল সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য।[1]

সুতরাং সমাজ বলতে আমরা বুঝি সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের পরস্পরের সম্পর্কে সচেতনতা এবং তাদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য। কিন্তু কোন কোন সমাজ-বিজ্ঞানী, যেমন—গিন্‌সবার্গ (*Ginsberg*), এ অর্থে সমাজকে গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেন, পরোক্ষ সম্পর্ক এবং যে-সব সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা সকল

---

1. গিডিংস্ (*Giddings*) সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, সমাজ হল একই মনোভাবসম্পন্ন কতকগুলি ব্যক্তি যারা তাদের এই একই মনোভাবের কথা জানে ও উপভোগ করে এবং সেই কারণে সমজাতীয় লক্ষ্যের জন্য সমবেতভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। ("Society is a number of like-minded individuals, who know and enjoy their like-mindedness and are therefore able to work together for common ends.")

—*F. H. Giddings*: The Elements of Sociology, Page 6.

সময় সচেতন নই, সেগুলিও সমাজ-জীবনে খুবই মূল্যবান। কাজেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যে কোন ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সমাজ কথাটিকে প্রয়োগ করা যায়, সে ব্যবহার প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ হোক, সংগঠিত হোক বা অসংগঠিত হোক, সচেতন হোক বা নাই হোক, সহযোগিতামূলক হোক বা শত্রুতামূলক হোক।[1] তিনি 'সমাজ' (Society) এবং 'একটি সমাজ' (A society)—এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। 'একটি সমাজ' হল সেই সকল ব্যক্তির সমষ্টি বা গোষ্ঠী, যারা কতকগুলি আচরণ-পদ্ধতি বা কতকগুলি সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত হয়েছে এবং যারা এই বৈশিষ্ট্যের জন্য যে সকল লোক এরূপ কোন সম্পর্কের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত হয়নি তাদের থেকে পৃথক। যে-কোন রকমের জনসমষ্টি গোষ্ঠী নয়। গোষ্ঠী বলতে বুঝব যারা পরস্পরের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যুক্ত বা যাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ আছে এবং যাদের এমন একটি সংগঠন আছে যা সকলের স্বীকৃতি লাভ করে। এমন অনেক জনসমষ্টি আছে যাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং যাদের আচরণের ধারায়ও মিল আছে, অথচ যাদের কোন সংগঠন নেই।

গিনসবার্গ (*Ginsberg*)-এর মন্তব্য

'সমাজ' এবং 'একটি সমাজ'

টমাস অ্যাকুইনাস (*Thomas Aquinas*) বলেন, "সমাজ হল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের একটি স্থায়ী নৈতিক সম্মেলন, যারা একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। ("Society is a stable moral union of rational beings co-operating to a common end."—*Thomas Aquinas.*)

ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver and Page*) বলেন, "সমাজ হল আচার এবং কার্য-প্রণালী, কর্তৃত্ব এবং পারস্পরিক সাহায্য, নানারকম সমবায় এবং বিভাগ, মানুষের আচরণের নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতা—এ সকল কিছুর দ্বারা গঠিত প্রথা। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল জটিল প্রথাকেই আমরা সমাজ বলি। এ হল সামাজিক সম্পর্কের জাল।" ("Society is a system of usages and procedures, of authority and mutual aid, of many groupings and divisions, of controls of human behaviour and of liberties. This ever-changing, complex system we call society. It is the web of social relationship.")

MacIver and Page : Society, Page 5.

1. *Ginsberg* : **Sociology ; Page 40.**

(পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সমাজ কথাটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং **ব্যাপক অর্থে 'সমাজ' বলতে যে-কোন 'সামাজিক সম্পর্ক'কে বোঝায়। ক্ষুদ্রতর অর্থে 'সমাজ' হল একটি অল্পবিস্তর স্থায়ী সংগঠন (Organisation) যার মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক প্রকাশিত হয়।** সমাজ হল মানুষের বিচিত্র সামাজিক সম্পর্কের জাল, সমাজ হল বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী—যে মানবগোষ্ঠী একই উদ্দেশ্য ও স্বার্থ-সাধনের জন্য, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য একটি সংগঠনের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়। মোটামুটি একটা স্থায়ী সংগঠন থাকলেই আমরা 'সমাজ' কথাটি ব্যবহার করি।)

সমাজ হল স্থায়ী সংগঠনযুক্ত জনসমষ্টি

২। সামাজিক সম্পর্কের মনস্তত্ত্বমূলক শর্ত (The Psychological Condition of Social Relationship):

সামাজিক সম্পর্ক বলতে আমরা কি বুঝব? পূর্বেই আমরা বলেছি যে, সামাজিক সম্পর্ক হল মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে চেতনাবোধ। জড়জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক তার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে সামাজিক সম্পর্কের দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ধরা যাক—টেবিল আর বই, পৃথিবী এবং সূর্য দোয়াত এবং কলম, আগুন এবং ধোঁয়া—এদের পরস্পরের মধ্যে নিঃসন্দেহে সম্বন্ধ বর্তমান; একের অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এ সম্পর্ক কোন মতেই সামাজিক সম্পর্ক নয়, কারণ মনের বা চেতনার দিকটি এখানে অনুপস্থিত। টেবিল আর বই—এই দুটির মধ্যে সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠই হোক না কেন, এই জড়বস্তু দুটি নিজেদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন নয়, তাদের পারস্পরিক চেতনার দ্বারা তাদের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় নি। এই চেতনাবোধ না থাকলে, পরস্পর পরস্পরকে স্বীকার করে না নিলে 'সমাজের' কোন প্রশ্নই ওঠে না। ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver and Page*) বলেন, "সমাজের সেখানেই অস্তিত্ব যেখানে

সামাজিক সম্পর্ক হল মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের চেতনাবোধ

পরস্পরের স্বীকৃতি সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি

সামাজিক জীব পরস্পরের স্বীকৃতির দ্বারা নির্ধারিত ধারাতেই পরস্পরের প্রতি আচরণ করে। এভাবে নির্ধারিত যে কোন সম্পর্ককে আমরা 'সামাজিক' বলব।"[1]

সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত—এই চেতনাবোধ আছে বলেই মানুষ সামাজিক। সে কারণে অনেক সময় এই চেতনাবোধ থাকে না বলেই সমাজের মধ্যে বাস করেও মানুষ অসামাজিক হয়ে ওঠে। সুতরাং সমাজ-চেতনার দিকটিকে বাদ দিয়ে সমাজের প্রশ্ন উঠতে পারে না।

৩। ব্যক্তি বলতে আমরা কি বুঝি? (What do we mean by an Individual ?) :

(ক) ব্যক্তি কথাটির শারীরিক এবং জৈবিক অর্থ (The Physical and Biological Meanings of Individuality) :

ব্যক্তি কথাটির শারীরিক ও জৈবিক অর্থ

শারীরিক দিক থেকে আমরা ব্যক্তি বলতে বুঝি—ব্যক্তি হল 'বিশেষ' বা 'একক'। কিন্তু যখন দেখি, এককোষাত্মক জীব নিজেকে দুভাগে বিভক্ত করে এক থেকে দুইয়ে পরিণত হয়েছে তখন তাকে আমরা কি 'একক' বলে বিচার করব ?

শারীরিক দিক থেকে বিচার না করে জৈবিক দিক থেকেও ব্যক্তিকে বিচার করা যেতে পারে। জৈবিক দিক থেকে বিচার করলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় তার আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। ব্যক্তি তার পরিবেশকে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করে এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যতই প্রকাশিত হয় ততই সে হয় নিজের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর অন্ধভাবে সে নির্ভর করে না।

(খ) ব্যক্তি কথাটির সামাজিক অর্থ (The Sociological Meaning of Individuality) : সামাজিক দিক থেকে ব্যক্তি কেবলমাত্র

1. "Society exists only where social beings 'behave' towards one another in ways determined by their recognition of one another. Any relations so determined we may broadly name 'social'."

—*MacIver and Page* : Society, Page 5.

সমাজের একজন সভ্য নয়, তার থেকেও বেশী। সে হল একটি আত্মা, সে হল কর্মকর্তা এবং তার কাজের মধ্য দিয়ে তার নিজের স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। কেবলমাত্র অপরের থেকে স্বাতন্ত্র্যবোধের মধ্যেই ফুটে ওঠে না, বরং ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে তার কাজের স্বাতন্ত্র্যে, অর্থাৎ নিজের চেতনা ও বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে, অপরের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা ভেবে সে যখন কাজ করতে পারে। ব্যক্তির নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গী তার কাজের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। তার মানে এই নয় যে, একজন ব্যক্তি অপর দশজনের মত আচরণ করবে না। অনেক সময় অপরে যেরূপ আচরণ করে ব্যক্তিও সে ভাবে আচরণ করে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, সে অন্ধভাবে বিনা বিচারে অপরের কর্মপন্থা অনুসরণ করে; বরং তার ব্যক্তিত্বের দ্বারা অনুমোদিত বলেই সেই কর্মপন্থা সে অনুসরণ করে। অপরের মতামত বিনা বিচারে গ্রহণ না করে সে নিজে উদ্যোগী হয়ে কাজ করতে পারে এবং ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা তার আছে; অর্থাৎ তার চরিত্রের বল আছে যার জন্য সে তার নিজের বৈশিষ্ট্যকে বা ব্যক্তিত্বকে সমাজের দশজনের কাছে প্রকাশ করতে পারে। যে পরিমাণে মানুষ পূর্বোক্ত গুণগুলিকে প্রকাশ করতে পারে, তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় তার ব্যক্তিত্ব কতটুকু।

ব্যক্তি কথাটির সামাজিক অর্থ

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তার কাজের ও চেতনার স্বাতন্ত্র্যের মারফত ফুটে ওঠে

ব্যক্তি সেই কর্মপন্থা গ্রহণ করে যা তার ব্যক্তিত্বের দ্বারা অনুমোদিত হয়

৪। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক (The Relation of the Individual to the Society):

ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে একাধিক মতবাদ প্রচলিত আছে। যথা—(ক) **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ** (Individualism), (খ) **সমষ্টিবাদ** বা **সমাজতন্ত্রবাদ** (Collectivism or Socialism), (গ) **আঙ্গিকবাদ** (The Organic Theory) এবং (ঘ) **ভাববাদ** (Idealism) বা **গোষ্ঠিচেতনাবাদ** (The Group-mind Theory)।

ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

(ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুযায়ী সমাজ হল বিভিন্ন স্বাধীন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সমষ্টি বা সমাবেশ। এখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যে সম্বন্ধ তা হল নিছক বহিরাগত বা বাইরের যোগাযোগ। সেজন্য সমাজ হল বহু ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কৃত্রিম সমষ্টি বা সমাবেশ, যেখানে ব্যক্তি পরস্পরের উপর নির্ভর নয়, শুধুমাত্র সুবিধার খাতিরে সাধারণ লক্ষ্য সিদ্ধ করার জন্য কার্য করে।

ব্যক্তিই নিজ প্রয়োজনে সমাজ গঠন করেছে। ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমাজের সৃষ্টি, সমাজের প্রয়োজনে ব্যক্তির উৎপত্তি নয়। একেই বলা হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। ব্যক্তি হল স্বাধীন; কোন আবশ্যিক সম্পর্কে সে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়। কেবলমাত্র পার্থিব বা জাগতিক সুবিধার জন্য বা প্রয়োজনের জন্যই সে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কোন মৌলিক কারণে যে সে পরনির্ভর, তা নয়। এই মতবাদ অনুসারে সমাজ একটি কৃত্রিম বা যান্ত্রিক সংগঠন, স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক সংগঠন নয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে সমাজ স্বাধীন ব্যক্তির সমাবেশ

এ মতবাদ অনুযায়ী 'সামাজিক চুক্তি'র (Social Contract) ফলেই সমাজের উৎপত্তি। মানুষ আদিম যুগে প্রাক্ সামাজিক অবস্থায়, 'প্রকৃতি রাজ্যে' (State of Nature) বাস করত। ব্যক্তি ছিল তখন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র; ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তখনও পর্যন্ত কোন পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে নি। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে যে যার খুশীমত চলত। পরে তারা নিজ নিজ সুবিধার জন্য একটি সামাজিক চুক্তি করে সমাজ গঠন করে।' একেই বলা হয় 'সামাজিক চুক্তি মতবাদ' (Social Contract Theory)। হব্‌স, রুশো (*Hobbes, Rousseau*) প্রভৃতি লেখকগণ এ মতবাদ প্রচার করেছেন।

'সামাজিক চুক্তি'র ফলে সমাজের উৎপত্তি

হব্‌স (*Hobbes*)-এর মতে মানুষ যখন প্রাক্-সামাজিক প্রকৃতি-রাজ্যে বাস করত, তখন সে ছিল স্বার্থপর, ক্ষমতালিপ্সু এবং বিবাদ-প্রিয়। সে ছিল পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক, নিজের সুখ-সুবিধাই ছিল তার একমাত্র কাম্য বস্তু। তখন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নি এবং কোন আইন-কানুন ছিল না. যেহেতু সে

স্বাধীনভাবে বিচরণ করে জীবন যাপন করত। স্বভাবতঃ তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাহুবলের উপর নির্ভর করত এবং প্রয়োজন হলে ও সম্ভব হলে কেউ অপরের সম্পত্তি দখল করে নিত। মানুষের এই স্বার্থপরতার জন্য তাদের মধ্যে বিবাদ, কলহ লেগেই থাকত। ফলে, তখন চতুর্দিকে ছিল অরাজকতা, অশান্তি ও নিরাপত্তার অভাব। এরূপ পরিবেশে মানুষের জীবন ছিল 'নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব, কদর্য, পাশবিক এবং সংকীর্ণ' (Solitary, Poor, Nasty, Brutish and Short)। এই অবিরাম বিবাদ, কলহ এবং যুদ্ধের জীবন মানুষের কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। সুতরাং আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিই মানুষকে বাধ্য করল একটি সামাজিক চুক্তি করার জন্য। মানুষ এই অরাজক অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে শাসনকর্তা নির্বাচিত করল যাঁরা মানুষের সমাজ-জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন এবং নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করল।

হব্‌স (Hobbes)-এর মত

লক (*Locke*)-এর মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ একে অপরের সঙ্গে সদাসর্বদা যুদ্ধে বা বিবাদে রত ছিল—একথা ঠিক নয়। প্রাক্-সামাজিক প্রকৃতি-রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। এ অবস্থায় মানুষের জীবনযাত্রা প্রাকৃতিক আইন ও স্বাভাবিক আইনের (Natural Laws) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু এই আইন প্রয়োগ করার জন্য বা আইন লঙ্ঘন করলে শাস্তি দেবার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। এজন্য মানুষ একটি সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করল এবং সমাজ গঠন করল। প্রকৃতি-রাজ্যের স্থান দখল করল মানুষের গড়া সমাজ এবং প্রাকৃতিক আইনের স্থান দখল করল মানুষের প্রণীত আইন। মানুষ আর একটি চুক্তির সাহায্যে জনকল্যাণের জন্য এবং আইন প্রণয়নের জন্য একটি সরকার গঠন করল।

লক (Locke)-এর মত

রুশো (*Rousseau*)-র মতে প্রাক্-সামাজিক প্রকৃতি-রাজ্যে মানুষ সুন্দর, সহজ, সরল এবং মুক্ত উদার জীবন যাপন করত। প্রকৃতি-রাজ্য ছিল ভূ-স্বর্গ। কিন্তু এ অবস্থায় বেশী দিন বাস করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হল না। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা এবং মানুষের চিন্তার ক্রমবিকাশ এই প্রকৃতি-রাজ্যের সাম্য ও সুখ-শান্তি নষ্ট করে দিল—সংঘর্ষ, বিরোধ, বিবাদ,

হত্যা, অরাজকতার সৃষ্টি করল। অবশেষে মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি

রুশো (Rousseau)-র মত

পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন করে নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সমষ্টিগত ইচ্ছার (General Will) অধীনস্থ করল। সমষ্টিগত ইচ্ছার দ্বারাই সমাজের সাম্য রক্ষিত হল।)

সমালোচনা (Criticism):

'সামাজিক চুক্তি মতবাদ' (Social Contract Theory) নিম্নলিখিত কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। যথা,

(১) এই মতবাদ একটি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদ মনে করে ব্যক্তি সমাজ-বহির্ভূত হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে, কিন্তু তা সত্য নয়। সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে না, কারণ ব্যক্তি ও সমাজ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত।

(২) এ মতবাদের কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। এ মতবাদ অনুযায়ী প্রাক্-সামাজিক অবস্থায় মানুষ একটি চুক্তির সাহায্যে সমাজ গঠন করেছিল। কিন্তু কোনরকম চুক্তি সম্পাদন তখনই সম্ভব যখন সভ্যতার যথেষ্ট ক্রমবিকাশের ফলে মানুষ চুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু প্রাক্-সামাজিক মানুষের কোন চুক্তি সম্বন্ধে যে জ্ঞান ছিল তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া, সমাজ-বহির্ভূত প্রাকৃতিক অবস্থায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে সামাজিক চেতনা সঞ্চারের কথা ভাবা যায় না। সমাজের মধ্যে বসবাস করলেই সামাজিক চেতনা সঞ্চার হয়।

বস্তুতঃ, মানুষের সমাজ-বহির্ভূত কোন জীবনের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। মানুষ সকল সময়েই সামাজিক জীব। কোন-না-কোন সমাজ-জীবনের মধ্যেই মানুষ বসবাস করে আসছে।

(৩) প্রাক্-সামাজিক প্রকৃতি-রাজ্যের কথা কল্পনা ছাড়া কিছুই নয় এবং এ মতবাদে মনুষ্য-প্রকৃতির যে চিত্র দেওয়া হয়েছে, তা ঠিক নয়। মানুষ কোন সময়েই একাধারে একেবারে স্বার্থপর বা বিবাদ-প্রিয় ও অন্য দিকে একেবারে সরল ও শান্তিপ্রিয় ছিল না। ভাল ও মন্দ, স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা উভয় বৃত্তিই মানুষের মধ্যে সকল সময় বর্তমান ছিল।

(৪) এ মতবাদ অযৌক্তিক। মানুষের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক চেতনা থাকলেই সামাজিক চুক্তির প্রশ্ন উঠতে পারে। সমাজে বাস করার ফলেই মানুষের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যবোধের উদ্ভব হয়। যে তথাকথিত আদিম অধিবাসী প্রকৃতি-রাজ্যে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র জীবন যাপন করত তাদের মধ্যে এই সামাজিক চেতনার উদ্ভব সম্ভব ছিল না। গ্রীন (*Green*)-এর মতে সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে মানুষের চেতনা না থাকলে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন আসে না।

(৫) এই মতবাদ মনে করে সমাজ একটি চুক্তির ফল। সমাজ-জীবনে বসবাস করার ফলেই সাধারণের স্বার্থ সম্পর্কে চেতনার উদ্ভব হয়। সুতরাং সমাজ-জীবনের পূর্বে সামাজিক চুক্তির কল্পনা যেন 'ঘোড়ার সামনে গাড়ীকে জুড়ে দেওয়ার' মত ব্যাপার।

এ সকল কারণে 'সামাজিক চুক্তি মতবাদ' ভ্রান্ত বলেই বিবেচিত হয়েছে।

(খ) সমষ্টিবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ (Collectivism or Socialism) :

এ মতবাদ অনুযায়ী সমাজের জন্যই ব্যক্তির অস্তিত্ব; ব্যক্তির নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। সমাজ আছে বলেই ব্যক্তি নতুবা ব্যক্তির পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হত। সমাজ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিকে কতকগুলি দায়িত্ব দেয় এবং তার কর্মসূচীও নির্দিষ্ট করে দেয়। ব্যক্তির উচিত সেই দায়িত্ব পালন করা ও সেই নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করা। ব্যক্তির উপর সমাজের সকল রকম অধিকার আছে কিন্তু সমাজের উপর ব্যক্তির কোন অধিকার নেই।

সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে ব্যক্তির নিজস্ব কোন স্বাতন্ত্র্য নেই

প্লেটো এবং অ্যারিস্টট্ল (*Plato* এবং *Aristotle*) প্রভৃতি গ্রীক মনিষিগণ সমাজকেই বড় করে দেখেছেন এবং ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে সমাজের অধীনস্থ মনে করেছেন। সমাজের অস্তিত্বেই ব্যক্তির অস্তিত্ব। সমাজ আছে বলেই ব্যক্তি শৈশব অবস্থায় বেঁচে থাকতে পেরেছে এবং নিজেকে উন্নত ও বিকশিত করতে পেরেছে। সমাজের ভাষায় সে মনের ভাব প্রকাশ করে, সমাজের চিন্তাধারা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় এবং সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের

মাধ্যমে তার জীবন গঠন করে। অতএব সমাজের মূল্য আছে, ব্যক্তির কোন মূল্য নেই—ব্যক্তি নিতান্তই তুচ্ছ। সমাজ-জীবনের অভ্যন্তরে ব্যক্তির নিজস্ব কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। কোন রাসায়নিক সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন উপাদানগুলি নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে, সেরকম সমাজ-জীবনেও ব্যক্তি তার নিজ স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে সমাজ-জীবনের সঙ্গে মিশে যায়।

প্লেটো এবং অ্যারিস্টট্ল এর মতে ব্যক্তি সমাজের অধীন

সমালোচনা (Criticism) :

এ মতবাদ চরমপন্থী মতবাদ এবং সেহেতু গ্রহণযোগ্য নয়। এই মতবাদ অনুযায়ী সমাজই সর্বেসর্বা, ব্যক্তি নিতান্তই তুচ্ছ, ব্যক্তির কোন মূল্য নেই—এ ধারণা যথার্থ নয়। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ নয়, সমাজের বিকাশ, সমাজের উন্নতি, সমাজের অধীনস্থ ব্যক্তির বিকাশ এবং উন্নতির উপরই নির্ভর করে।

এ মতবাদ ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, ইচ্ছা আছে, অভিপ্রায় আছে। ব্যক্তির সকল কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করা বা ব্যক্তির সকল অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া সমাজের পক্ষে সম্ভব নয়। রাসায়নিক সংমিশ্রণের দৃষ্টান্ত মানুষের ক্ষেত্রে আরোপ করা যায় না। সমাজ-জীবনে অংশ গ্রহণ করেও ব্যক্তি নিজ স্বাতন্ত্র হারায় না। আমরা যে সামাজিক চেতনার কথা বলি তাও বস্তুতঃ ব্যক্তির সামাজিক চেতনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুতরাং ব্যক্তির জীবনে সমাজের প্রভাব যতই বেশী হোক না কেন ব্যক্তিকে নিতান্ত তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র সুগঠিত হলেই সমাজের নৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। ব্যক্তির নৈতিক অধঃপতনেই সমাজের অবনতি।

(গ) আঙ্গিক মতবাদ (The Organic or Organismic Theory of Society) : এই মতবাদ অনুযায়ী জীবদেহের সঙ্গে তার বিভিন্ন অংশের যে সম্পর্ক, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সেইরূপ সম্পর্ক বর্তমান। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক যান্ত্রিক নয়, আঙ্গিক (organic)। এই মতবাদ অনুসারে সমাজ কোন

ব্যক্তির যান্ত্রিক সমষ্টি নয়, পরস্পর নির্ভর এমন অংশের সমন্বয়ে একটি জীবন্ত জীবদেহ। সমাজও মানবদেহের মত একটি জীবন্ত প্রাণী, মানবদেহে যে ঐক্য দেখা যায়, সমাজদেহেও সেই ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। এই ঐক্য হল এক যথার্থ সংহতি, যেখানে সমগ্র অংশের উপর এবং অংশ সমগ্রের উপর নির্ভর। সমাজদেহের আকার ও কার্যকলাপ জীবদেহের মতনই। মানবদেহ অসংখ্য জীবকোষের দ্বারা গঠিত। সমাজ-অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি সমাজদেহের জীবকোষ। জীবদেহের বিভিন্ন অংশ যেমন পরস্পরের উপর এবং সমগ্র জীবদেহের উপর নির্ভরশীল, সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিও পরস্পরের উপর এবং সমগ্র জীবদেহের উপর নির্ভরশীল। জীবদেহের বিভিন্ন অংশের যেমন পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনি সমাজ বাদ দিয়ে ব্যক্তিরও কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। জীবদেহের বা সমগ্রের জন্যই কোষের অস্তিত্ব; সমাজ বা সমগ্রের জন্যই ব্যক্তির অস্তিত্ব। অংশের যথার্থ ক্রিয়ার উপর জীবদেহের সুস্থতা নির্ভর করে, ব্যক্তির যথাযথ ক্রিয়ার উপর সমাজের স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

Herbert Spencer, Paul Von Lilienfeld, Albert Shaffle, Rene Worms এবং অন্যান্য প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ওসমাজ দার্শনিকবৃন্দ এই মতবাদের সমর্থক। যদিও এই সকল লোকদের মধ্যে সকলেই সমাজ এবং জীবদেহের গভীর সম্পর্কের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন, তবু *Herbert Spencer* তাঁর '*Principles of Sociology*' গ্রন্থে[1], উভয়ের মধ্যে যে তুলনা তা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

হারবার্ট স্পেন্সার (*Herbert Spencer*)-এর মতে সমাজের সঙ্গে জীবদেহের কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। প্রথমতঃ, সমাজ ও জীবদেহ উভয়েরই ক্রমবৃদ্ধি আছে। দ্বিতীয়তঃ, উভয় ক্ষেত্রেই, এই ক্রমবৃদ্ধি সরল থেকে জটিল সংগঠনের দিকে। তৃতীয়তঃ, উভয় ক্ষেত্রেই গঠনের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মবিভাগ লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থতঃ, উভয় ক্ষেত্রেই অংশগুলি পরস্পর নির্ভর এবং প্রতিটি অংশের সন্তোষজনক ক্রিয়ার উপর সমগ্রের সুস্থতা নির্ভর করে এবং

---

1. *Principles of Sociology* : Page 486-450.

পঞ্চমতঃ, উভয় ক্ষেত্রেই সব কয়টি অংশ বিনষ্ট না হলেও সমগ্র বিনষ্ট হতে পারে, বা কোন কোন অংশের বিনাশ সাধিত হলেও সমগ্রের জীবন অব্যাহত থাকতে পারে।

জীবদেহের সঙ্গে সমাজের পূর্বোক্ত বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও, হারবার্ট স্পেন্সারের মতে, কয়েক বিষয়ে অসাদৃশ্যও আছে। প্রথমতঃ, জীবদেহ একটি অভিন্ন ঐক্য বা সমগ্রতা (concrete whole)। সমাজ একটি বিচ্ছিন্ন ঐক্য (discrete whole)। দ্বিতীয়তঃ, জীবদেহে চেতনা দেহের একটি ক্ষুদ্র অংশে অর্থাৎ স্নায়ুকেন্দ্রে সীমাবদ্ধ, সমাজদেহে ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন পৃথক স্নায়ুকেন্দ্রের অস্তিত্ব নেই। সে কারণে সমাজদেহে চেতনা সমগ্র সমাজদেহে ব্যাপ্ত। তৃতীয়তঃ, জীবদেহে সমগ্রের কল্যাণের জন্যই অংশের অস্তিত্ব, সমাজে অংশের কল্যাণের জন্যই সমগ্রের অস্তিত্ব, এর বিপরীত কথা সত্য নয়।

কোন কোন লেখক সমাজদেহের মধ্যেও জীবদেহের মত মস্তিষ্ক, ফুসফুস এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব কল্পনা করেন। ম্যাকাইভার ও পেইজ (*MacIver and Page*)-এর ভাষায় "সমাজদেহের কোষ হল বিভিন্ন ব্যক্তি ও এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সংগঠন হল সংঘ ও প্রতিষ্ঠান।"[1] স্পেন্সারের (*Spencer*) মতে সমাজ ও প্রাণীর মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্য আছে। জীবদেহের তিনটি পদ্ধতি—সংরক্ষণ পদ্ধতি (sustaining system), বণ্টন পদ্ধতি (distributing system) ও নিয়মিতকরণ পদ্ধতি (regulating system)। অনুরূপ তিনটি পদ্ধতি সমাজেও দেখা যায়। এই তিনটি পদ্ধতি যথাক্রমে কৃষি সম্পর্কীয় পদ্ধতি (agricultural system), পরিবহন পদ্ধতি (transport system) এবং সামরিক পদ্ধতি (military system)। কোন কোন আঙ্গিকবাদী যেমন ব্লুন্টস্‌লি (*Bluntschli*) সমাজ ও জীবদেহের তুলনাকে এতদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন যে সামাজিক সংগঠনের মধ্যে লিঙ্গগত প্রভেদ বা বৈষম্যের কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্র হল পুরুষ-প্রকৃতির সংগঠন, গীর্জা হল স্ত্রী-প্রকৃতির সংগঠন।

---

1. "Society's cells are individual persons, its organs and system are associations and institutions."

সমালোচনা (Criticism):

সামাজিক সংগঠনের ঐক্যের মধ্যে ব্যক্তির পারস্পরিক নির্ভরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করাই যদি আঙ্গিক মতবাদের সমর্থকবৃন্দের উদ্দেশ্য হয় তাহলে এই মতবাদ বিশেষ কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। কিন্তু যদি এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ প্রমাণ করতে চান যে সমাজ একটা জীবন্ত প্রাণী, তাহলেই এই মতবাদের অযৌক্তিকতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সমাজকে একটা জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করা চলে, কিন্তু উভয়কে অভিন্ন মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। অর্থাৎ **সমাজ জীবদেহের মতন** (like an organism), **জীবদেহ নয়** (not an organism)। জীবদেহের গঠন ও কার্যাবলীর সঙ্গে সমাজের গঠন ও কার্যাবলীর কিছু সাদৃশ্য থাকলেও, জীবদেহ ও সমাজের মধ্যে পার্থক্যকে উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রথমতঃ, সমাজ সম্বন্ধে 'প্রাণবান' কথাটি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নয়। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "সমাজকে এই অর্থে 'প্রাণবান' বলা হয়েছে যে সামাজিক চুক্তি মতবাদ যেভাবে সমাজকে নিছক একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে মনে করে, সমাজ তা নয় এবং স্বাভাবিকভাবে এর বিকাশ হয়েছে। কিন্তু এই ধারণাকে (অর্থাৎ সমাজ প্রাণবান) অধিক জোর দিলে—যেমন, যাঁরা আঙ্গিক ঐক্যের কথা বলেন তাঁরা দিয়েছেন—মানব-সমাজের যে নির্বাচন ক্ষমতাও আছে তাকে উপেক্ষা করা হবে।"[1]

দ্বিতীয়তঃ, সমাজস্থ ব্যক্তি ও জীবদেহের কোষের মধ্যে কোন মূলগত সাদৃশ্য নেই। ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, ইচ্ছা আছে, অভিপ্রায় ও সংকল্প আছে এবং ব্যক্তির সকল কাজই সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বহুল পরিমাণে ব্যক্তি তার স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু জীবদেহের কোষের কোন নিজস্ব অস্তিত্ব নেই বা ব্যক্তির মত তার স্বতন্ত্র ইচ্ছা, অভিপ্রায় বা সংকল্প

1. "A society is a living thing, in the sense that it is not a mere mechanical device, as the conception of contract tends to suggest but rather a natural growth. But if this is over-emphasised, as it often is by those who make use of the idea of organic unity, it is apt to lead us to ignore the element of choice that is also involved in a human society."

—*Mackenzie*: Outlines of Social Philosophy: Page 50.

নেই। জীবদেহের অংশ হিসেবে জীবদেহের অস্তিত্ব বজায় রাখাই কোষের একমাত্র কাজ, এ ভিন্ন তার কোন নিজস্ব কাজ নেই।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করলেও তার পক্ষে প্রাণে বেঁচে থাকা সম্ভব, কিন্তু কোষকে জীবদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে সঙ্গে সঙ্গেই তা নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়া, ব্যক্তিরই অনুভূতি আছে, চেতনা আছে, কিন্তু সমাজের স্বতন্ত্র কোন অনুভূতি বা চেতনা নেই। জীবদেহের চেতনাশক্তি মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত থাকে, কিন্তু যাকে সামাজিক চেতনা বলা হয় তা সমাজস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

চতুর্থতঃ, জীবদেহের মৃত্যু আছে, কিন্তু মানবসমাজ যদিও পরিবর্তনশীল, তবু তার জীবদেহের মত কোন মৃত্যু নেই।

পঞ্চমতঃ, কোন জীবকোষের পক্ষে এক সঙ্গে দুটি জীবদেহের অংশীভূত হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু একই ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক সামাজিক সংগঠনের সভ্য হতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, জীবদেহ থেকেই জীবদেহের উৎপত্তি ঘটেছে, কিন্তু সমাজ কখনও এভাবে উদ্ভূত হয় না।

সপ্তমতঃ, সমাজস্থ প্রতিটি ব্যক্তির একটি স্বতন্ত্র জীবন আছে যাকে সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দেওয়া যায় না। এই মতবাদ সামাজিক ঐক্যের উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করে যে সমাজস্থ প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণকে উপেক্ষা করে।

সমাজের সঙ্গে জীবদেহের কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও পূর্বোক্ত কারণে এ সাদৃশ্যকে খুব বেশী দূর টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। সমাজের সঙ্গে জীবদেহের যে তুলনা তাকে একটা রূপক (metaphor) হিসেবেই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "সমাজকে যদি জীব বলতে হয়, এ হল বহু জীব নিয়ে একটি জীব, যার প্রত্যেকটিরই একটি স্বতন্ত্র জীবন আছে।"[1]

1. "If it is an organism it is at least an organism of organisms, each one of which has a life of its own."

—*Mackenzie*: Outlines of Social Philosophy; Page 58.

আঙ্গিক মতবাদের মূল্য (Value of the Organic Theory of Society): গিন্‌সবার্গ (*Ginsberg*) তাঁর '*Psychology of Society*' গ্রন্থে[1] আঙ্গিক মতবাদের কয়েকটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ, এ মতবাদ সঠিকভাবেই নির্দেশ করে যে, সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই নিবিড় এবং এই পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা সমাজ গঠিত। এ হিসাবে সমাজকে 'আঙ্গিক' (organic) বলা যেতে পারে, কিন্তু এই অর্থে নয় যে, সমাজ কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের সমতুল্য। আঙ্গিক কথাটিকে যখন আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করি তখন তার অর্থ হল একটি সমগ্রতা (whole) বা অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধের দ্বারা গঠিত এবং যার অংশগুলি পরস্পরের সম্বন্ধের দ্বারা সংরক্ষিত।

এ মতবাদ সমাজ ও ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্দেশ করে

দ্বিতীয়তঃ, এ মতবাদ সঠিকভাবেই নির্দেশ করে যে, সমাজ কোন যান্ত্রিক বা কৃত্রিম সংগঠন নয়, বরং একটি সজীব সংস্থা যার একটি স্বাভাবিক বিকাশ আছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সমাজ অন্য জীবদেহের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে তুলনীয় নয়। কারণ সমাজের নিজের বিকাশের বা উৎপাদনের কোন ক্ষমতা নেই এবং জীবদেহের মত তার কোন মৃত্যুও নেই। জীবদেহের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সমাজে দেখতে পাওয়া যায়—পরিবেশের সংগে খাপ খাইয়ে চলা এবং সামঞ্জস্য-সাধনের নমনীয়তা (Plasticity of adjustment)। সমাজ যান্ত্রিক বা কৃত্রিম সমষ্টিমাত্র নয়।

সমাজ যান্ত্রিক বা কৃত্রিম সংগঠন নয়

তৃতীয়তঃ, আঙ্গিক মতবাদ থেকে এই বিষয়ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সমাজের আকস্মিক ও পুরোপুরি পরিবর্তন সাধন কঠিন ব্যাপার এবং অন্যান্য সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে কোন সামাজিক সমস্যার আলোচনা ও সমাধান সম্ভব নয়। বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের মধ্যে এমন এক নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান যে, অন্যান্য সমস্যা

সমাজের আকস্মিক ও পুরোপুরি পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়

[1] *Ginsberg* : The Psychology of Society ; Page 118.

উপেক্ষা করে বিচ্ছিন্নভাবে কোন একটি সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

গিন্‌সবার্গ (*Ginsberg*) বলেন, "এ মতবাদের পূর্বোক্ত মূল্য আছে, কিন্তু এর অসুবিধা হল সেখানে যেখানে লোকেরা সমাজের সঙ্গে জীবদেহের কয়েকটি বিষয়ের সাদৃশ্য অবলোকন করে সামাজিক একতার দিকটিকে অতিরঞ্জিত করেন। শুধু তাই নয়, যদি সবচেয়ে উন্নত সমাজকেও গ্রহণ করা যায় তবে দেখা যাবে যে, জৈবিক মতবাদ ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃত সম্পর্ককে বর্ণনা করতে পারে না।"[1]

(ঘ) ভাববাদ বা গোষ্ঠীচেতনাবাদ (Idealism or Group Mind Theory): ভাববাদীদের মতে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক যান্ত্রিক (Mechanical) বা আঙ্গিক (Organic) নয়। সমাজের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক সে সম্পর্ক হল আধ্যাত্মিক সম্পর্ক, অন্তরের সম্পর্ক। সমাজ হল স্বাধীন সচেতন সত্তার সংগঠন (free association of self-conscious spirits)। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের বৃহত্তর সত্তাই হল তার সামাজিক সত্তা, মানুষের আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতা আসে সমাজের মাধ্যমেই। সমাজ-বহির্ভূত মানুষের পক্ষে জীবনের পরমকল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়। মানুষ সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। জন্ কেয়ার্ড (*John Caird*) ভাববাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যক্তির এবং সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে বলেছেন যে, "সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তি প্রকৃত মানুষ নয়, সে মানবতার একটি খণ্ডমাত্র। যে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উপাদান মানুষের জীবনের সারবস্তু সে তার থেকে বঞ্চিত।"[2] তাঁর মতে সামাজিক সম্পর্ক ব্যক্তি-জীবনের অবিচ্ছেদ্য

সমাজ স্বাধীন সচেতন সত্তার সংগঠন

জন্ কেয়ার্ড (*John Caird*)-এর মন্তব্য

1. M. *Ginsberg*: Psychology of Society; Page 118.

2. "The abstract individual (apart from society) is not truly man but only a fragment of humanity, a being devoid of moral and spiritual elements which are of the essence of man's life."

—*John Caird*: Introduction to Philosophy of Religion; Page 229.

অংশ। ব্যক্তি তার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির পূর্ণ তাৎপর্য তখনই উপলব্ধি করতে পারে যখন সে তার স্বতন্ত্র সত্তাকে, তার স্বতন্ত্র জীবন ও অস্তিত্বকে বিশ্বসত্তার কাছে উৎসর্গ করে। সুতরাং সমাজ আসে ব্যক্তির আগে। অবশ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাড়া যেমন দেহের কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনি বিশেষকে ছাড়া সমগ্রের বা ব্যক্তিকে ছাড়া সমাজের কোন অস্তিত্ব নেই। তবু সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ঠিক আঙ্গিক সম্পর্ক নয়, এ হল আধ্যাত্মিক সম্পর্ক।

ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক

ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) সমাজের ঐক্যের স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন, "আধ্যাত্মিক ঐক্যই (Spiritual Unity) বোধ হয় এর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। এ হল এমন একটা ঐক্য যা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক জীব অর্থাৎ মানুষেই লাভ করতে সক্ষম।"[1] মানুষ স্বাধীন আত্মসচেতন জীব। মানুষ যে জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কার্য করে সে বিষয়ে সে সচেতন। সে পশুপক্ষীর মত প্রবৃত্তিবশে চালিত হয়ে সমষ্টিগত কল্যাণ সাধন করে না। সমাজ হল একটি আধ্যাত্মিক সংগঠন যার মধ্যে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠন রয়েছে এবং এই সংগঠনগুলি জনকল্যাণের আদর্শকে সামনে রেখে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

সমাজ হল বহু জীব নিয়ে একটি জীব

ভাববাদীরা সমাজকে জীবদেহরূপে কল্পনা না করে সমাজকে একটি মন বা এক বৃহত্তর চেতনারূপে কল্পনা করেছেন। এই মতবাদ অনুসারে সমাজ একটি বৃহত্তর মন (greater mind) যা ব্যক্তিমনের নিছক সমষ্টি মাত্র নয়। সমাজস্থ সভ্যদের মন ছাড়াও সমাজের একটা অতিরিক্ত মন আছে। এই মতবাদকে নানাভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রাচীন এবং আধুনিক উভয় যুগের চিন্তাবিদই এই মতবাদ সমর্থন করেছেন। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক্' (Republic) গ্রন্থে সমাজকে মানুষের মনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। হেগেল (Hegel)-এর মতে সমস্ত

সমাজ হল এক বৃহত্তর চেতনা

1. It is perhaps best characterised as spiritual unity. It is a kind of unity of which only spiritual beings—i.e. persons—would seem to be capable. —*Mackenzie*: Outlines of Social Philosophy; Page 58

বিশ্বজগৎ এক বিশ্বচেতনা (Absolute Consciousness) বা বিশ্বমনের প্রকাশ। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এই বিশ্বমনেরই প্রকাশ। হেগেলের মতে 'এই মর্ত্যে স্বর্গীয় ভাবের মূর্তরূপ হল রাষ্ট্র' (The state is the Divine Idea on earth)। গ্রীন (*T. H. Green*), ব্রাডলে (*F. H. Bradley*), বোসাঙ্কয়েট (*B. Bosanquet*) প্রভৃতি খ্যাতনামা ভাববাদী দার্শনিকবৃন্দ অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই সকল ভাববাদী দার্শনিকবৃন্দ ছাড়াও কয়েকজন খ্যাতনামা সমাজবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীও উপরিউক্ত মতবাদ পোষণ করেন।

ম্যাকডুগালের অভিমত

[1]মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল (*W. McDougall*) তাঁর 'The Group Mind' গ্রন্থে স্পষ্টই বলেছেন যে, সমাজের যে মানসিক জীবন তা কোন সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মানসিক জীবনের সমষ্টি নয়। তিনিও সমষ্টিগত চেতনার একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে প্রতিটি সামাজিক গোষ্ঠীর একটা নিজস্ব চেতনা আছে, যা গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের চেতনার অতিরিক্ত।

এস্‌পিনাস-এর মতবাদ

খ্যাতনামা সমাজবিজ্ঞানী এস্‌পিনাস (*Espinas*) মনে করেন, সমাজের একটা সমষ্টিগত চেতনা আছে। তাঁর মতে সমাজ ব্যক্তির মতনই বাস্তব, এবং তাকে একটি যান্ত্রিক সমষ্টিরূপে গণ্য করা চলে না। সমাজ যদি ব্যক্তির মতনই বাস্তব হয়, তাহলে সমাজের ব্যক্তির মতনই মন আছে মেনে নিতে হবে।

দুরখীম্‌-এর অভিমত

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী দুরখীম্‌ (*Durkheim*)-এর মতে সমাজ তার অংশের সমষ্টির তুলনায় বৃহত্তর এবং ব্যক্তিমন ছাড়াও সামাজিক মনের বা সমষ্টিগত চেতনার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। দুরখীমের মতে সমাজস্থ পারস্পরিক সম্পর্ক থেকেই এই সমষ্টিগত চেতনার উদ্ভব। ব্যক্তি-মনের তুলনায় সমাজ-মনের বুদ্ধিগত এবং নৈতিক শ্রেষ্ঠতা বর্তমান। প্রতিটি সামাজিক গোষ্ঠীর নিজ বৈশিষ্ট্যমূলক মন আছে এবং সমাজ-মনের দ্বারাই ব্যক্তি-মন নিয়ন্ত্রিত হয়।

---

1. "The Society have a mental life which is not the mere sum of the mental lives of its units existing as independent units......"
—*McDougall* : The Group Mind, 2nd Edition : Page 10

সমালোচনা (Criticism) :

ভাববাদীরা সমাজ এবং ব্যক্তির নিবিড় সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার জন্য যদি উভয়ের সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বলে অভিহিত করেন তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু ব্যক্তির মন বা চেতনার অতিরিক্ত কোন সমষ্টিগত মন বা চেতনা বা সামাজিক মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করলে নানারকম দার্শনিক সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমতঃ, মন কি কেবলমাত্র মানসিক প্রক্রিয়া, না তার অতিরিক্ত কিছু?—এ বিষয়ে নানারকম মতভেদ আছে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিমন ছাড়াও 'গোষ্ঠীমন' (Group mind) বা 'গোষ্ঠীচেতনার' বা 'সামাজিক মনের' (Social mind) স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিষয়টিও নানারকম বিতর্কমূলক দার্শনিক ও মনস্তত্ত্বমূলক সমস্যার সৃষ্টি করে। এ সকল সমস্যার আলোচনা বা সমাধান ঠিক সমাজদর্শনের বিষয়ভুক্ত নয়। ম্যাকাইভার (*MacIver*) গোষ্ঠীমনের সমালোচনায় বলেন যে, প্রকৃতিতে পৃথক পৃথক বৃক্ষ ছাড়া যেমন একটি বৃহত্তর সমষ্টিগত বৃক্ষের অস্তিত্ব নেই, তেমনি সমাজস্থ ব্যক্তির মনের অতিরিক্ত কোন বৃহত্তর সমষ্টিগত মনের অস্তিত্ব নেই। সুতরাং গোষ্ঠীমন বা সামাজিক মনকে এখানে রূপক হিসাবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

ব্যক্তি-চেতনার অতিরিক্ত সমষ্টিগত চেতনা নানারকম দার্শনিক সমস্যা সৃষ্টি করে

৫। কোন্ মতটি সন্তোষজনক?

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আমরা সেগুলি আলোচনা করেছি। প্রশ্ন হল, কোন্ মতটি গ্রহণযোগ্য? ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমষ্টিবাদ উভয়ই চরম মতবাদ, সেহেতু সন্তোষজনক নয়। একটি সমাজকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিকেই অতিরিক্ত প্রাধান্য দেয়, অপরটি ব্যক্তিকে তুচ্ছ করে সমাজকেই প্রাধান্য দেয়। আঙ্গিক মতবাদ ব্যক্তি ও সমাজের নিবিড় সম্পর্ককে প্রকাশ করতে গিয়ে সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে এবং ব্যক্তিকে জীবকোষের সঙ্গে অভিন্ন বলে কল্পনা করেছে। এ মতবাদও গ্রহণযোগ্য নয়। ভাববাদীরা ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বলে অভিহিত করেছেন এবং কেউ কেউ গোষ্ঠীমনের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা বলেছেন; 'গোষ্ঠীমনের' স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিতর্কমূলক বিষয়।

আঙ্গিক মতবাদ ও ভাববাদীদের ধারণাকে কিছুটা পরিবর্তিত করে নিলেই আমরা একটা গ্রহণযোগ্য মতবাদ পেতে পারি। আঙ্গিক মতবাদ ও ভাববাদ উভয়েই ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছে যে, ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর নির্ভরশীল। ব্যক্তি সমাজের উপর নির্ভর করে, সমাজ ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের সকল সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, সমাজস্থ ব্যক্তির পৃথক অস্তিত্ব আছে, তার ইচ্ছার স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা আছে,—সমাজের সঙ্গে তাকে একেবারে লীন করে দেওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। কোন একটি সৈন্যদলের (Army or Regiment) সঙ্গে সেই সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সৈনিকের যে সম্পর্ক, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কও তাই। সৈন্যকে বাদ দিয়ে সৈন্যদলের কথা কল্পনা করা যায় না। সেরকম ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজের কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রতিটি সৈনিকের একটা নিজস্ব সত্তা বা অস্তিত্ব আছে যাকে সৈন্যদল থেকে আলাদা করে দেখা যায়। ঠিক তেমনি সমাজের মধ্যেও ব্যক্তির একটা নিজস্ব অস্তিত্ব আছে, স্বাতন্ত্র আছে যাকে আলাদা ভাবে দেখা যেতে পারে, যাকে কোন মতেই উপেক্ষা করা যেতে পারে না। গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "সামাজিক মূল্য শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিরই মূল্য। এমনকি যেসব গুণ বা শক্তি সমাজের নিজস্ব সেগুলি বর্তমানেই হোক বা ভবিষ্যতেই হোক সভ্যদের মাধ্যমেই বাস্তবে পরিণত হয়, কারণ ব্যক্তি-জীবনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করা ছাড়া সমাজ-জীবনের কোন অর্থ হয় না।"[1]

আঙ্গিক মতবাদ ও ভাববাদীদের ধারণার সমন্বয়ে একটা সন্তোষজনক মতবাদ পাওয়া যেতে পারে

সমাজ সৈন্যদলের সঙ্গে তুলনীয়

ভাববাদীরা যে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কথা বলেছেন বা সমাজকে আধ্যাত্মিক সংগঠন (Spiritual whole) রূপে কল্পনা করেছেন, এ মতবাদ তার বিরোধী নয় বরং তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

---

1. "Social values are in the last resort Personal values. Even those qualities or powers which belong to society as such are realised only in its members, present in future; for the life of the society has no meaning except as an expression of the lives of the individuals."

—*Gisbert*: Fundamentals of Sociology: Page 56.

৮.৬। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ (Individualism and Socialism) :

(ক) **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ** (Individualism) : 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' কথাটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজ সম্পর্কে সাধারণ মতবাদ হিসেবে এই মতবাদ মনে করে যে সমাজ একটি যান্ত্রিক সংগঠন, যা কতকগুলি স্ব-নির্ভর ও আত্মপরিতুষ্ট ব্যক্তির কৃত্রিম সমষ্টি মাত্র, যেখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক বাহ্য, আন্তর নয়। রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ রাষ্ট্রের অত্যধিক নিয়ন্ত্রণ প্রথার বিরোধী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিভিন্ন অর্থ নিরূপণ করার জন্য সচেষ্ট না হয়ে আমরা মোটামুটি এর দার্শনিক তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কথাটির বিভিন্ন অর্থ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমাজের তুলনায় ব্যক্তিকেই বেশী প্রয়োজনীয় মনে করে। ব্যক্তি হল নিজেই নিজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (end in himself)। ব্যক্তির লক্ষ্য সাধনের উপায় হিসেবেই সমাজের অস্তিত্বের সার্থকতা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মানবোচিত মূল্যের (human values) উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং কোন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির লক্ষ্য সাধনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করার বিরোধিতা করে।

সমাজের তুলনায় ব্যক্তি বেশী প্রয়োজনীয়

এ মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তি নিজেই তার ভালমন্দ উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং নিজ লক্ষ্য সাধনের জন্য এবং তার উপযোগী উপায় নির্বাচন করার ব্যাপারে ব্যক্তির সকল রকম স্বাধীনতা উপভোগ করা উচিত। এর ফলে ব্যক্তি-আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে এবং আত্মবিকাশের মাধ্যমে দেশের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ব্যক্তির আত্মবিশ্বাসের উপর সবিশেষ মূল্য আরোপ করেন এবং তাঁদের মতে ব্যক্তিস্বাধীনতায় যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ, ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ন করে এবং আত্মশক্তিকে ব্যাহত করে। 'আত্মনির্ভরতাই একমাত্র সহায়তা'—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এই উক্তির প্রবল সমর্থক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে আত্ম-নির্ভরতাই সামাজিক উন্নতির উৎস। কোনরকম কর্তৃত্ব বা প্রভুত্বকেই এরা প্রীতির চক্ষে দেখে না এবং ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর বাইরে থেকে আরোপিত যে কোন রকম

আত্মবিশ্বাসের উপর গুরুত্ব

নিয়ন্ত্রণকেই এরা ধিক্কৃত করে এবং তার বিরোধিতা করে। অপরের চিন্তা ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত করার জন্য ব্যক্তির মতামত প্রকাশের এবং যে কোন সামাজিক সংগঠনের সভা হবার স্বাধীনতা তারা দাবি করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ গতানুগতিকতার তুলনায় বৈচিত্র্য ও স্থিতিশীলতা এবং প্রাচীনত্বের তুলনায় পরিবর্তনশীলতা ও নূতনত্বের সমর্থক।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ উদার গণতন্ত্রবাদ (Liberal Democracy) এবং রাষ্ট্রের অবাধ নীতি বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতি (Laissez Faire) অনুমোদন করে। এই স্বাচ্ছন্দ্য নীতির অর্থ হল, 'ব্যক্তি যা করতে চায় তাকে তা করতে দাও।'

ব্যক্তি নিজেই তার ভালমন্দ উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং নিজের কল্যাণসাধন করার জন্য, অন্য ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে ব্যক্তি যে ভাবেই কার্য সম্পাদন করুক না কেন, রাষ্ট্রের উচিত হবে না তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের ভাল করে, তবে তার ফলে সমাজেরও ভাল হবে। ব্যক্তির উন্নতি সাধন করাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য এবং ব্যক্তিকে চরম স্বাধীনতা দিলেই রাষ্ট্র তার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। ব্যক্তির স্বাধীনতায় যত কম হস্তক্ষেপ করা যায়, ততই মঙ্গল। রাষ্ট্রের উচিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ দান করা এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষা করা। মানুষ যখন স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে পরস্পরের সঙ্গে বিবাদে মত্ত হয় এবং তার ফলে সমাজ-জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হয় তখন দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র সেই প্রকৃতির মানুষদের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে। এছাড়া, ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য, বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন। সুতরাং রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হল রক্ষণকার্য। ব্যক্তির অধিকার ভোগের পথে যদি কোন অন্তরায় দেখা দেয়, রাষ্ট্রের কর্তব্য সেসব অন্তরায় দূর করা এবং যারা এসব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তাদের শাস্তি দান করা। রাষ্ট্রের আইন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখাই রাষ্ট্রের কাজ। সুতরাং রাষ্ট্রের কাজ অনেকটা নেতিবাচক। ব্যক্তি কিভাবে পরমকল্যাণ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রের প্রধান কাজ রক্ষণকার্য

লাভ করতে পারে, সে বিষয় নির্ধারণ করার দায়িত্ব ব্যক্তির উপর, রাষ্ট্রের উপর নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ হল পুলিসী কাজ (Police functions)। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে অধিক ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র হল একটি অভিশাপ বা দুষ্টগ্রহ। রাষ্ট্রের হাতে অধিক ক্ষমতা থাকার অর্থ ব্যক্তিস্বাধীনতা সংকুচিত হওয়া।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে বেসরকারী তত্ত্বাবধানে যেসব কর্ম সম্পন্ন হওয়া উচিত, তাতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ যুক্তিসংগত নয়। শিক্ষাব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য, বীমাকরণ ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজ বেসরকারী তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হওয়া যুক্তিসংগত। এ সব ব্যপারে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। বস্তুতঃ, রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হল সংরক্ষণ ও দমন; উৎসাহ দেওয়া বা উন্নতিকরণে সহায়তা করা নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝির শেষ দিকে অবাধ অনুবন্ধ নীতির উৎপত্তি। ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যধিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণের সমর্থন থেকেই এই মতবাদের উদ্ভব। অ্যাডাম্ স্মিথ্ (*Adam Smith*) এই মতবাদের একজন প্রধান উদ্যোক্তা। পরবর্তীকালে ম্যালথাস্, হার্বাট স্পেন্সার, জন স্টুয়ার্ট মিল্, কাণ্ট, ফিক্‌টে প্রভৃতি চিন্তাবিদ্‌রা এই মতবাদ সমর্থন করেন।

নানাদিক থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমর্থন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমর্থন করা হয়েছে। ব্যক্তিকে যদি কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহলে ব্যক্তির উদ্যোগের ফলে অবাধ প্রতিযোগিতা (Free Competition) দেখা দেবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজনীয় বস্তু স্বল্প মূল্যে লাভ হবে। রাষ্ট্রের অযথা হস্তক্ষেপের ফলে অবাধ প্রতিযোগিতা নষ্ট হয়। জীববিজ্ঞানের দিক থেকে এ মতবাদকে সমর্থন করা হয়েছে এভাবে যে, বিবর্তনবাদ অনুযায়ী প্রকৃতির নিয়মানুসারে যোগ্য ব্যক্তিরই বাঁচার অধিকার আছে। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তির সামর্থ্য ও ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে দুর্বলকে রক্ষা করার কোন সার্থকতা নেই। তাছাড়া, ব্যক্তি যদি নিজ নিজ কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে তবেই সামাজিক উন্নতি সম্ভব, সে কারণেও ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এ মতবাদকে সমর্থন করা হয়েছে এভাবে যে, ব্যক্তির কল্যাণ কিভাবে সাধিত হতে পারে তা নির্ধারণ করার একমাত্র যোগ্য লোক হল ব্যক্তি নিজে, রাষ্ট্র নয়। মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় সমাজ বা রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে অত্যধিক হস্তক্ষেপ করে তাহলে ব্যক্তির কর্মক্ষমতা পূর্ণভাবে বিকশিত হয় না।

রাষ্ট্রের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন বিপর্যয় দেখা দেয় যার ফলে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ব্যাহত হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের গুণ (Merits of Individualism): ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেয় এবং ব্যক্তির নিজ ক্ষমতাকে বিকশিত করার সুযোগ দেয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তিকে উদ্যোগী করে তোলে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়। অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ যে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাসকে ক্ষুণ্ন করে, এ অনেকাংশে সত্য। স্বাধীন প্রতিযোগিতা যে ব্যক্তির উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে জাগিয়ে তোলে, এও অস্বীকার করা চলে না। 'মানুষকে সব সময় লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করতে হবে, উপায় হিসেবে নয়'—এ নীতির সমর্থনের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সমুচিত মর্যাদা দান করে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দোষ (Demerits of Individualism): ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তিই নিজের ভালমন্দ সম্যক্ ভাবে বুঝতে পারে। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। নিজের ভালমন্দ নির্ধারণ করার পক্ষে ব্যক্তিই সব সময় যোগ্যতম কর্তৃপক্ষ নয়! অনেক সময় অন্ধ আবেগের বশে, ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করে কোন কোন ব্যক্তি তার লক্ষ্য লাভ করতে চায়, সেক্ষেত্রে ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া, অনেক সময় ব্যক্তি যে কাজকে নিজের কল্যাণকর বলে মনে করে তা হয়ত সমাজ-কল্যাণ বা জনকল্যাণের বিরোধী। এরূপ ক্ষেত্রেও ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। যেমন—কোন কোন অজ্ঞ, নিরক্ষর ব্যক্তি নিজের ভাল উপলব্ধি করতে পারে না বলেই সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করে না, যার ফলে সমাজের উন্নতি ব্যাহত হয়। তার জন্য রাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হয়।

ব্যক্তিই নিজের ভালমন্দ বিচার করার একমাত্র কর্তা নয়

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুযায়ী যোগ্যতমদেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে, সেহেতু দুর্বলকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের পক্ষে অযৌক্তিক কার্য—এ ধারণাও ভ্রান্ত। দুর্বল, অক্ষম, পঙ্গু ও দরিদ্র ব্যক্তিকে সবলের এবং ধনীর শোষণ ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করা

দুর্বলকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য নয়—এ ধারণা ভ্রমাত্মক

রাষ্ট্রের এবং সমাজের কর্তব্য। সমাজ-জীবনে সকলেরই সুষ্ঠুভাবে এবং সুন্দরভাবে বাঁচবার অধিকার আছে।

রাষ্ট্রের কাজ নেতিবাচক নয়

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের কাজ নেতিবাচক এবং সে কাজ-পুলিসী কাজ, সেহেতু রাষ্ট্রের কর্তব্য কেবলমাত্র ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষা করা—এ ধারণাও ভ্রান্ত। রাষ্ট্রের কর্তব্য নেতিবাচক (Negative) নয়, অস্তিবাচক (Positive)। বর্তমান সভ্য-জগতে জনকল্যাণের আদর্শই রাষ্ট্রের আদর্শ। সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তিই যাতে সুন্দর সুষ্ঠু জীবনযাপনে সক্ষম হয় রাষ্ট্রের সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্তই প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে যেমন সময় সময় বিপর্যয় দেখা দেয়, তেমনি সময় সময় ব্যক্তি অজ্ঞতার বশবর্তী ও স্বার্থ-প্রণোদিত হয়ে কার্য করার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেয়, সেরূপ ক্ষেত্রে জনকল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অবাধ প্রতিযোগিতা সমর্থন করে কিন্তু ধনবান পুঁজিপতি এবং দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার প্রশ্ন অবাস্তব। দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন।

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্র একটি অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এ ধারণা ভুল। কোন কোন ক্ষেত্রে বা কোন কোন সময়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অযৌক্তিক হলেও, সকল সময়ই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত ও অযৌক্তিক—এ নীতিও ভুল।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা অবাধ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। কিন্তু সে স্বাধীনতা যদি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে তা উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হবে। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ভিন্ন একমাত্র শক্তিশালী ব্যক্তিরাই স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং দুর্বলরা হবে তাদের ক্রীতদাস।

(খ) **সমাজতন্ত্রবাদ** (Socialism): সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ পরস্পরবিরোধী মতবাদ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে সমাজ স্বনির্ভর ব্যক্তির দ্বারা গঠিত একটি যান্ত্রিক বা কৃত্রিম সংগঠন। সমাজতন্ত্র-বাদীরা আঙ্গিক মতবাদের সমর্থক; তাঁদের মতে সমাজ হল একটি সমগ্র বা অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধের দ্বারা গঠিত এবং যার অংশগুলি পরস্পরের

সম্বন্ধের দ্বারা সংরক্ষিত। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে ব্যক্তি-কল্যাণকে জন-কল্যাণের অধীনস্থ করেই দেশের কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাস করলেও ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতাকে স্বীকার করেন না। যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজ-কল্যাণের জন্য নিয়ন্ত্রিত করা না হয় তাহলে সে স্বাধীনতা হয়ে উঠবে স্বেচ্ছাচার, যার ফলে সমাজ-জীবনে বিপর্যয় দেখা দেবে। সুতরাং ব্যক্তির কার্যকলাপ রাষ্ট্র বা সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তির কার্যকলাপকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে জনকল্যাণের আদর্শ ব্যাহত না হয়। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে রাষ্ট্রের কাজে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা নয় বরং জনকল্যাণের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে সামাজিক উন্নতিতে সহায়তা করা।

সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা স্বীকার করে না

এক হিসেবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ সমাজ-তন্ত্রবাদের উদ্ভব। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাবেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করে। ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা ব্যক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। উৎপাদনের উপকরণগুলিও ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে। এর ফলে ব্যক্তিগত মুনাফার বৃদ্ধি, অসম বণ্টন ব্যবস্থা, ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে সংঘর্ষ ও বিরোধিতা, পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ, শ্রমিকের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা, প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদনের অভাব প্রভৃতি বিষময় ফল সমাজে দেখা দেয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ সমাজতন্ত্র-বাদের উদ্ভব

সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তি-মালিকানা ও তত্ত্বাবধানের জায়গায় রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও তত্ত্বাবধানের কথা বলেছেন। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে জমি, মূলধন ইত্যাদির মালিক হবে রাষ্ট্র, ব্যক্তি নয়। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে রাষ্ট্রই উৎপাদনের উপকরণগুলিকে নিজের তত্ত্বাবধানে এনে উৎপাদন ব্যবস্থাকে সমাজকল্যাণের আদর্শানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করবে এবং বণ্টন ব্যবস্থাকেও জনকল্যাণের জন্য পরিচালিত করবে। সমাজতন্ত্রবাদীরা উৎপাদনের

উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করতে বদ্ধপরিকর।

সমাজতন্ত্রবাদীরা এমন এক সমাজ-ব্যবস্থার কথা বলেন যেখানে বর্তমানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে ব্যবধান দেখা যায় তা থাকবে না। সে সমাজ হবে বর্ণহীন ও শ্রেণীহীন এবং সমাজস্থ ব্যক্তিরা পারস্পরিক মৈত্রীসূত্রে বাঁধা থাকবে। বিশেষ এক শ্রেণীর পুঁজিপতির হাতে নয়, সাধারণের হাতেই থাকবে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন ও উৎপাদনের মালিকানা এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকেরই শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে হবে। অবাধ প্রতিযোগিতা নয়, সমষ্টিগত সহযোগিতার মাধ্যমেই সমাজকল্যাণের আদর্শকে লাভ করা যাবে।

সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে সমাজতন্ত্রী সমাজব্যবস্থায় মানুষ খুশী মনে সমাজের জন্য কাজ করবে। ব্যক্তি-মালিকানার জায়গায় রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তারা সকলেই উপলব্ধি করবে যে তারা কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধির যন্ত্রমাত্র নয়, সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্যই তারা কাজ করছে। সমাজতন্ত্রবাদ শুধুমাত্র বেঁচে থাকা নয়, সার্থকভাবে বেঁচে থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। মানুষ তখনই সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে যখন সে জানে কেবলমাত্র বেঁচে থাকার সংগ্রাম থেকে সে মুক্ত থাকতে পেরেছে।

যদিও সমাজতন্ত্রবাদ সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী, তবু তাঁদের মতে রাজনৈতিক, শিল্পগত, কৃষ্টিগত সব রকম সামাজিক সংগঠনেরই আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর কোন পরিবর্তন সাধিত না হলে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

সাম্যবাদী ব্যবস্থায় সকল ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষিত হয়

সমাজতন্ত্রবাদীরা দাবি করে যে সমাজতন্ত্রী সমাজব্যবস্থায় সকল ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। ন্যায় ও সাম্যের উপরই এই সমাজব্যবস্থার ভিত্তি। এই সমাজব্যবস্থায় সকল রকম শোষণ ও উৎপীড়নের হাত থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্ত করা হয় এবং সকলকেই সুন্দরভাবে জীবন যাপনের সুযোগ দেওয়া হয়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন সমাজতন্ত্রবাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোন কোন সমাজতন্ত্রবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলোপসাধনের কথা বলেন, অপরেরা উৎপাদনের উপকরণগুলির ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ-সাধনের কথাই বলেন, অন্যান্য বিষয়ে ব্যক্তিগত মালিকানা সমর্থন করেন। অবাধ প্রতিযোগিতার বিলোপসাধনও সমাজতন্ত্রবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুনাফার জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা সুস্থ ব্যবস্থা নয়। তাছাড়া, এ ব্যবস্থা সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের পক্ষে ক্ষতিকর ব্যবস্থা। এর ফলে অতিরিক্ত উৎপাদন, অধিক পরিমাণে বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন ও বেকারাবস্থা দেখা দেয়। এই কারণে সমাজতন্ত্রবাদীরা অবাধ প্রতিযোগিতার বিলোপসাধন এবং সমবায় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার সমর্থন করেন, যার ফলে, অর্থ, সুযোগ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমতা দেখা দেবে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন

সমাজতন্ত্রবাদ সামাজিক ঐক্যের নীতিতে বিশ্বাসী। জন্মের সময় মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কাজেই প্রতিটি মানুষকে তার অন্তর্নিহিত গুণের বিকাশ সাধনের সমান সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ কৃষ্টিগত ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণে সমর্থ হয় যেহেতু আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অবসর মত কৃষ্টিগত ক্রিয়াকলাপে যোগদানের সুযোগ এই সমাজ ব্যবস্থাতেই সম্ভব। বস্তুতঃ, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা সবরকম উৎপীড়ন, নিপীড়ন, শোষণমুক্ত সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে গঠিত এক নূতন সমাজব্যবস্থা।

সামাজিক ঐক্যের নীতিতে বিশ্বাস

অনেকে মনে করেন যে, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের হানি ঘটে। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থাতেই ব্যক্তিস্বাধীনতা যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দেওয়া হয় এবং ব্যক্তির আত্মবিকাশের যথাযথ সুযোগ দেওয়া হয়।

সমাজতন্ত্রবাদের গুণ (Merits of Socialism): ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অকল্যাণকর ফলাফল; যেমন—দারিদ্র্য, শ্রেণীবিরোধ, ধনবৈষম্য, বেকারাবস্থা, নিরাপত্তার অভাব প্রভৃতির বিলোপ সাধন এবং প্রতিটি মানুষকে সুন্দর জীবন যাপনের সুযোগ দেওয়া যে সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ হওয়া উচিত

—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া, সমাজতন্ত্রবাদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, দুর্বলকে সবলের অত্যাচার থেকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা, অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার বিলোপসাধন করে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার প্রবর্তন, সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকার দেওয়া, মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা প্রভৃতির উপর যথাযথভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সমাজতন্ত্রবাদের দোষ (Demerits of Socialism): সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, রাষ্ট্রের অত্যধিক হস্তক্ষেপের ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যাবে, প্রতিযোগিতার অভাবে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। উৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের গুণের উৎকর্ষ হ্রাস পাবে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র যদি উৎপাদন ব্যবস্থা নিজের কর্তৃত্বাধীনে আনতে চায়, তাহলে রাষ্ট্রের কাজ এত অধিক পরিমাণে বেড়ে যাবে যে, রাষ্ট্রের পক্ষে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। তৃতীয়তঃ, অনেকের মতে সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিকে জনকল্যাণের বা সমাজকল্যাণের উপায় হিসেবে একটা যন্ত্রের মতো ব্যবহার করতে চায়। ব্যক্তির যদি চিন্তার বা কার্যের স্বাধীনতা না থাকে তাহলে ব্যক্তি একটি যন্ত্রে পরিণত হয়। চতুর্থতঃ, পারিশ্রমিকের সমবণ্টন প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের তার যথাসাধ্য পরিশ্রম প্রয়োগে উৎসাহী করবে না। তাছাড়া, একজন দক্ষ কারিগর একজন অদক্ষ কারিগরের তুলনায় সমান পারিশ্রমিক লাভ করবে, তা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। পঞ্চমতঃ, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই কাজ করে, সমাজকল্যাণের কথা সাধারণতঃ চিন্তা করে না; সুতরাং এ মতবাদ মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ষষ্ঠতঃ, কোন কোন লোক এমন কথাও বলেছেন যে, সমাজতন্ত্রবাদে সমাজতন্ত্রী সমাজব্যবস্থার কথা বলা হলেও সমাজতান্ত্রিক শ্রেণীহীন (Classless) সমাজব্যবস্থা যথার্থ শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা নয়। কারণ পুঁজিপতিশ্রেণী বিলুপ্ত হলেও সমাজে এক নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হয় যার নাম পরিচালক শ্রেণী। এরা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করে রাষ্ট্রকে দলগত সুখ-সুবিধার জন্য ব্যবহার করে।

৭। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয় (Reconciliation of Individualism and Socialism) :

এখানে প্রশ্ন হল, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনই যদি আদর্শ হয়, তবে কোন্ ব্যবস্থা—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, না সমাজতন্ত্রবাদ সমাজের গ্রহণযোগ্য হবে ?

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের নীতি পরস্পর-বিরুদ্ধ। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই :

ম্যাকেঞ্জির মতে উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই

ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের নীতির মধ্যে কোন সত্যিকারের বিরোধিতা আছে বলে মনে হয় না। ব্যক্তির প্রকৃতিকে সংকুচিত ও নিস্তেজ করে সকলের কল্যাণ কখনও লাভ করা যায় না।"[1] আবার কাউকে স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে না, যদি না সে সকলের কল্যাণের জন্যই সেই স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে। এখন প্রশ্ন হল, কোন বিষয়ে মানুষকে অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া উচিত এবং কোন্ বিষয়ে তার কার্যকলাপকে অধিকতরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত ? ম্যাকেঞ্জির (*Mackenzie*) ভাষায় বলতে হয়, "সম্ভবতঃ, বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক দিকেই অগ্রসর হওয়ার দাবি এসেছে।"[2]

বস্তুতঃ, বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকেই সমাজের অগ্রসর হওয়া দরকার। এমন একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন যেখানে প্রতিটি

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হলেই আদর্শ সমাজের উদ্ভব সম্ভব

মানুষ তার ক্ষমতাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারবে এবং সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারবে। ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং সমাজ বা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ—এই উভয়ের মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্য স্থাপনের মধ্য দিয়েই এই আদর্শ সমাজ গঠিত হতে পারে। যদি ব্যক্তির স্বাধীনতাকে অত্যধিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং ব্যক্তির কার্যকলাপে রাষ্ট্র বা সমাজ যদি অত্যধিক হস্তক্ষেপ করে

1. "It does not appear, however, that there is any real opposition between the principles of Individualism and of Socialism. The good of all can certainly not be secured if the nature of each is cramped and underfed."
—*Mackenzie* : A Manual of Ethics ; Page 300.

2. "Perhaps at the present time it is chiefly in the socialistic direction that advance is demanded." —*Mackenzie* : A Manual of Ethics, Page 300.

তবে সামগ্রিক কল্যাণলাভের আশা ব্যর্থ হবে। আবার ব্যক্তিকে যদি অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহলেও তার ফল হবে বিষময়, স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারে পরিণত হবে।

রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ব্যক্তির স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রয়োজন

অতএব রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিকে কোনমতেই রাষ্ট্রের ক্রীতদাসে পরিণত করা যুক্তিসংগত হবে না। ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিতে হবে, তার ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করবার সুযোগ দিতে হবে। কোনমতেই সমাজের বা রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ব্যক্তির স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা সমীচীন নয়। জনকল্যাণের আদর্শে সমাজ গঠন করা তখনই সমীচীন হবে যখন ব্যক্তির স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের মধ্যে কোন সংঘর্ষ দেখা দেবে না।

৮। জনসাধারণের কল্যাণ বা জনকল্যাণ সম্পর্কে ধারণা (The Idea of Common Good) :

জনকল্যাণের ধারণা সমাজদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ জনকল্যাণের ধারণাই সামাজিক ঐক্যকে সম্ভব করে তোলে। সমাজ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত কোন যান্ত্রিক সমষ্টিমাত্র নয়, বরং একটি আধ্যাত্মিক সমগ্রতা, যেখানে আত্মসচেতন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তিরা সচেতন ভাবে জনকল্যাণের আদর্শকে অনুসরণ করে। যে কোন সুগঠিত সমাজব্যবস্থায় কতকগুলি লক্ষ্যকে সমগ্র সমাজের কল্যাণরূপে গণ্য করা হয় এবং সমাজস্থ ব্যক্তিরা এই সাধারণ লক্ষ্যগুলিকে লাভ করার জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

এখানে জনকল্যাণ কথাটির যথার্থ অর্থ জানা প্রয়োজন। সাধারণতঃ কোন বস্তুকে কল্যাণকর বলে ধারণা করা হয় যদি তাকে কাম্য বলে মনে করা হয়। আবার কোন কিছুকে কাম্য মনে করা হয় যদি তা কোন লক্ষ্যসাধনের উপযোগী হয়। ওষুধ রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে কল্যাণকর। কারণ ওষুধ রুগ্ন ব্যক্তির কাম্য যেহেতু ওষুধ তাকে নীরোগ হতে সহায়তা করে।

একথা ঠিক যে জনকল্যাণের জন্য যে কাজ করা হয় তার ফল সকল সময় সকলেই সমানভাবে ভোগ করতে নাও পারে। তবু তাকে সকলের পক্ষে কল্যাণকর মনে করা হয় যেহেতু সকলেই তা কাম্য বলে বিবেচনা করে। কোন পরিবারের সব সভ্য মিলে সিদ্ধান্ত করল যে পরিবারের যে-কোন সভ্যকে তার বিপদের দিনে সাহায্য করার জন্য প্রত্যেকেই মাসিক কিছু কিছু করে সঞ্চয় করবে। এক্ষেত্রে সকল সভ্যই হয়ত এ সুবিধা ভোগ করতে পারবে না, তবু এটির লক্ষ্য সমষ্টিগত কল্যাণ। তাহলে দেখা দেখা যাচ্ছে যে, সকলের কাম্য বস্তু হলেই তা জনকল্যাণ-মূলক হয়ে ওঠে, যদিও সকলে তার ফলাফল সমভাবে ভোগ করতে পারে না। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, যা কিছু জনকল্যাণমূলক তার ফল সকলে সমভাবে ভোগ করতে পারে না। দেশ স্বাধীন হলে সকল ব্যক্তিই সেই স্বাধীনতার ফল ভোগ করতে পারে। বস্তুতঃ, সভ্য সমাজে সর্বসাধারণের উপযোগী যে সকল কাজ করা হয় তার লক্ষ্য হল জনকল্যাণ এবং এ সকল কাজ যে আমরা অনুমোদন করি তার কারণ আমরা মনে করি এ সকল কাজের দ্বারা সর্বসাধারণের কল্যাণ হবে।

জনকল্যাণের অর্থ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা জনসাধারণের কল্যাণের তুলনায় ব্যক্তিগত কল্যাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু জনকল্যাণের প্রকৃতি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভ করতে পারলে দেখা যাবে যে জনসাধারণের কল্যাণের সঙ্গে ব্যক্তিগত কল্যাণের কোন বিরোধ নেই। কেউ কেউ মনে করেন জনকল্যাণ লাভ করতে হলে ব্যক্তিকে তার স্বাতন্ত্র ও স্বীয় কল্যাণ বিসর্জন দিতে হবে; কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। ডিউই (*Dewy*) এবং টাফ্‌টস্ (*Tufts*) বলেন, "তার (অর্থাৎ জনকল্যাণের) অর্থ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে বিসর্জন দেওয়া নয়; সেই সমাজ অত্যন্ত দীন যেখানে মানুষেরা ব্যক্তিগতভাবে অনুন্নত।[1] ব্যক্তির মধ্যে যেসব ভাল এবং বিশেষগুণ বা ক্ষমতা বিদ্যমান, সেগুলিকে সমাজের জন্য বিসর্জন দেওয়া বা বিকশিত না করা

জনকল্যাণ ব্যক্তি কল্যাণের বিপরীত নয়

1. 'They do not mean a sacrifice of individuals; it would be a poor kind of society whose members were personally undeveloped.'

—*Dewey and Tufts*: Ethics; Page 383.

মানেই হল সমাজকে দুর্বল করে ফেলা। জনকল্যাণের অর্থ হল অপরের কল্যাণে অংশ গ্রহণ করা এবং এই অংশ গ্রহণ করার অর্থই হল সক্রিয়ভাবে কিছু করা। প্রত্যেকে অপরের জন্য যেমন কিছু করবে তেমন কিছু পাবে। এই পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই জনকল্যাণের আদর্শ রক্ষিত ও বর্ধিত হয়। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তির আত্ম-সচেতনতা আছে এবং একমাত্র আত্মসচেতন ব্যক্তিরা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে বা কল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সক্ষম।

এই জনকল্যাণের স্বরূপ কি? নানা চিন্তাবিদ্ নানারকম উত্তর দিয়েছেন। কেউ মনে করেন, এ হল সর্বসাধারণের সুখ। কেউ মনে করেন, সদ্ ইচ্ছা, কেউ বা মনে করেন, সমাজের সকল ব্যক্তির জাগতিক কল্যাণ। গ্রীন (*Green*) বলেন, এই জনকল্যাণের স্বরূপ হল আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতা। সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, নৈতিক, সৌন্দর্য-সম্পর্কীয়—সকল প্রকার মূল্যগুলিকে (Values) লাভ করে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করতে চেষ্টা করে তবেই আসে এই পূর্ণতা বা আত্মোপলব্ধি। সমাজস্থ ব্যক্তিদের এই সব মূল্যগুলি সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং অপরের দ্বারা সৃষ্ট মূল্যগুলিকে সমাদর করতে হবে। মূল্য সৃষ্টির জন্য ও মূল্যের সমাদরের জন্য এই যে পারস্পরিক প্রচেষ্টা তার দ্বারাই সমাজের জনকল্যাণের আদর্শ রক্ষিত হয়।

ম্যাকেঞ্জির (*Mackenzie*) মতে সামাজিক ঐক্য ও কল্যাণ থেকে বিযুক্ত করে ব্যক্তি-কল্যাণের কথা ভাবাই চলে না। তাঁর মতে যা পরমকল্যাণ তা সকলের পক্ষেই কল্যাণকর এবং সকলেই সমভাবে এর অংশ গ্রহণ করতে পারে। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন যে, জনকল্যাণের ধারণার সঙ্গে সমভোগবাদের (Communism) কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই। জনকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পৃথক। সাম্যবাদ, সমষ্টিবাদ বা সমভোগবাদ শিল্প ও সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের বদলে সমষ্টিগত মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতি। কিন্তু ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*)

বলেন, "যে কল্যাণ বিশেষ করে সর্বসাধারণের কল্যাণ, তার সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও ব্যবহার বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা হতে পারে। যেমন—সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য হল সর্বসাধারণের কল্যাণ, তবু প্রত্যেকের স্বাস্থ্য তার নিজস্ব এবং তার যত্ন সে পৃথকভাবে নিতে পারে।"[1]

জনকল্যাণ ও সাম্যবাদ

সংক্ষিপ্তসার

১। সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটি—বহু লোকের সংঘবদ্ধভাবে বসবাস ও সংঘবদ্ধভাবে বসবাসের পশ্চাতে কোন সাধারণ উদ্দেশ্য। সমাজ হল মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের জাল (web) সামাজিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হল মানুষের পারস্পরিক স্বীকৃতি এবং মানুষের মধ্যে কোন না-কোন বিষয়ে সাদৃশ্য। অবশ্য সমাজ জীবনে সাদৃশ্য ও পার্থক্য দুই-ই আছে, তবে সাদৃশ্যই সমাজের প্রকৃত ভিত্তি। সমাজ ও সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, সামাজিক গোষ্ঠীর তুলনায় সমাজ অধিক স্থায়ী ও সংঘবদ্ধ। আবার 'সমাজ' ও 'একটি সমাজ'-এর মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, 'সমাজ' হচ্ছে ব্যাপক, সীমাহীন, সংগঠনবিহীন জনসমষ্টি আর 'একটি সমাজ", হচ্ছে বিশেষ সম্বন্ধ দ্বারা যুক্ত এবং কোন সুস্পষ্ট সংগঠনের মারফত গঠিত জনসমষ্টি যারা অনুরূপ আর 'একটি সমাজ' থেকে পৃথক।

২। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে চেতনাবোধই সামাজিক সম্পর্কের মনস্তত্ত্বমূলক ভিত্তি।

৩। ব্যক্তি কি? শারীরিক অর্থে ব্যক্তি সাধারণতঃ একক বা বিশেষ, জৈবিক অর্থে ব্যক্তি আত্মনিয়ন্ত্রণশীল একক যে—পরিবেশকে নিজের প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করে, এবং সামাজিক অর্থে ব্যক্তি তার কাজের ও চেতনার স্বাতন্ত্র্যের মারফত নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ ও বিকাশ করে।

৪। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নিয়ে মতভেদ আছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে ব্যক্তি একটি স্বাধীন সত্তা যে নিজের সুখ-সুবিধার জন্য অপর ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি সামাজিক চুক্তির দ্বারা সমাজকে প্রথম সৃষ্টি করে। হব্‌স (*Hobbes*), রুশো (*Rousseau*) ও লক (*Loke*) সামাজিক-চুক্তিবাদ প্রচার করেছেন। সামাজিক চুক্তিবাদ ভ্রান্ত, কারণ এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। মানুষ কখনও প্রাক্-সামাজিক অবস্থায় ছিল না এবং রাজনৈতিক চেতনার যতটা বিকাশ হলে মানুষ চুক্তি করতে পারে সেরকম রাজনৈতিক চেতনা আদিম মানুষের মধ্যে সম্ভব ছিল না। সমষ্টিবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে ব্যক্তির নিজস্ব কোন স্বাতন্ত্র্য নেই এবং সে সম্পূর্ণভাবে সমাজের অধীনস্থ। এ মতবাদও ভ্রান্ত। মানুষের স্বাধীন সত্তাকে অস্বীকার করা যায় না। আঙ্গিক মতবাদ অনুসারে মানুষ সমাজদেহের কোষমাত্র এবং সামাজিক সংঘ ও প্রতিষ্ঠান সমাজ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এ মতবাদও সম্পূর্ণ সঠিক নয়। মনুষ্য-সমাজের সঙ্গে জীবদেহের সাদৃশ্য আছে

1. "A good that is essentially common may be produced, owned and used by separate individuals. The health of a community, for instance, is a common good; yet each one has his own separate health and may separately care for it."—*Mackensie*: Outline of Social Philosophy: Page 59.

বটে, কিন্তু এদের পার্থক্যও যথেষ্ট। ব্যক্তির পৃথক অস্তিত্ব, ইচ্ছা ও সংকল্প আছে; যা জীবদেহের কোষের নেই; ব্যক্তির পৃথক চেতনা আছে, জীবকোষের চেতনা নেই; মনুষ্য সমাজ স্থায়ী, জীবদেহের মৃত্যু অনিবার্য; জীবকোষ একটি দেহে আবদ্ধ ব্যক্তি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সভ্য হতে পারে। জীব অন্য জীবের দেহ হতে জন্মলাভ করে; মনুষ্য সমাজের উদ্ভব সেভাবে হয় না। তবে আঙ্গিক মতবাদের মূল্য আছে, যেহেতু এ মতবাদ সঠিকভাবে নির্ণয় করেছে যে সমাজের ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নিবিড় সম্পর্ক, সমাজের সংগঠন স্বাভাবিক ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত এবং সামাজিক পরিবর্তন আকস্মিক নয়, উপরন্তু ধারাবাহিক ও সর্বাঙ্গিক। ভাববাদ বা গোষ্ঠীচেতনাবাদ অনুসারে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। মনুষ্য সমাজ হচ্ছে স্বাধীন সচেতন সত্তার সংগঠন বা এক বৃহত্তর বা সমষ্টিগত চেতনার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু সমষ্টিগত বা গোষ্ঠীগত চেতনার স্বরূপ দার্শনিক সমস্যার দ্বারা কণ্টকিত।

৫। আঙ্গিক মতবাদ ও গোষ্ঠীচেতনাবাদের সমন্বয়ই ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিক মতবাদ।

৬। নানা দিক থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে অনেকে সমর্থন করেছেন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে স্বাধীনভাবে বিকাশ করতে দিলেই সমাজের সর্বাধিক শুভ হবে—এরকম কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ মতবাদের অসুবিধা হচ্ছে, অত্যধিক ব্যক্তি-স্বাধীনতা সমাজকল্যাণ ব্যাহত করতে পারে, সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করার সুযোগ পেতে পারে, রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক কাজের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ সমাজে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে। জনকল্যাণের উপায় হিসেবে রাষ্ট্রের গুরুত্বকে এ মতবাদ স্বীকার করে না। সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ। সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে উৎপাদনের মালিক ক্রমশঃ হবে রাষ্ট্র; ধনী পুঁজিপতিরা নয় এবং এভাবে এক শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমাজতন্ত্রবাদ যথাযথভাবে দারিদ্র্যের বিলোপসাধন, বেকারাবস্থা দূরীকরণ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির উপর জোর দেয়। তবে এও সর্বদোষমুক্ত নয়; এতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। রাষ্ট্রের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করার সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে, ব্যক্তি একটি চেতনাযুক্ত যন্ত্রে পরিণত হতে পারে এবং এ মতবাদ কিছুটা পরিমাণে প্রকৃতিবিরুদ্ধ, উপরন্তু এ ব্যবস্থায় পরিচালক শ্রেণী পুঁজিপতি শ্রেণীর স্থান গ্রহণ করে নিজেদের স্বার্থ বৃদ্ধির সুযোগ পেতে পারে।

৭। সঠিকভাবে গ্রহণ করলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদে কোন বিরোধ নেই। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ না করে রাষ্ট্র যদি জনকল্যাণমূলক কাজ করে তবেই আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে যেখানে ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে কোন বিরোধ থাকবে না।

৮। জনকল্যাণই সামাজিক ঐক্য সম্ভব করে তোলে, সেকারণে সমাজদর্শনে জনকল্যাণের ধারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। জনকল্যাণ ও ব্যক্তি কল্যাণের মধ্যে যথার্থ কোন বিরোধ নেই। ব্যক্তি কল্যাণের মাধ্যমেই জনকল্যাণ লাভ করতে হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

সামাজিক গোষ্ঠী এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান
(Social Groups and Social Institutions)

১। ভূমিকা (Introduction) :

সমাজ হল একটা বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন, যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠনের দ্বারা গঠিত। এগুলিকে বলা হয় সামাজিক গোষ্ঠী (Social groups)। সমাজের স্বরূপ এবং ব্যক্তির সামাজিক জীবন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে হলে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির জ্ঞান একান্তই প্রয়োজনীয়। কারণ, যদিও ব্যক্তি সাধারণভাবে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যেই সম্পাদিত হয়। ব্যক্তির সামাজিক জীবনে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক গোষ্ঠীগুলি ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন আনে, চরিত্র গঠন করে এবং ব্যক্তির অভ্যাস, বিশ্বাস ও চিন্তাধারার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুতঃ, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মাধ্যমেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

২। সামাজিক গোষ্ঠীর স্বরূপ (Nature of Social Groups) :

[1]সামাজিক গোষ্ঠী কাকে বলে? বিশেষ উদ্দেশ্য লাভের জন্য সজ্ঘবদ্ধ একাধিক ব্যক্তির সমষ্টিকেই সামাজিক গোষ্ঠী বলা হয়। গিস্‌বার্ট (*Gisbert*) বলেন, "সামাজিক গোষ্ঠী হল ব্যক্তির সমষ্টি, যারা একটি স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে পরস্পরের উপর কার্য করে"।[2] যেমন—কোন রাজনৈতিক দল বা কোন ফুটবল ক্লাব।

গোষ্ঠীর প্রকৃতি

1. ম্যাকাইভার ও পেইজ (*MacIver and Page*) বলেন, গোষ্ঠী বলতে আমরা বুঝি কোন সামাজিক ব্যক্তির সমষ্টি, যারা পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। আমরা যেভাবে বুঝি তাতে গোষ্ঠীর অর্থ হচ্ছে এর ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ("By a group we mean any collection of social beings who enter into distinctive social relationship with one another. A group, then as we understand it, involves reciprocity between its members.")

—*MacIver and Page* : Society : Page 14.

2. "A social group is a collection of individuals interacting on each other under a recognizable structure."

—*Gisbert* : Fundamentals of Sociology : Page 25.

কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি মাত্রকেই সামাজিক গোষ্ঠী বলা চলে না। সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে এ জাতীয় সমষ্টির সঙ্গে কোন জড়দ্রব্যের সমষ্টির পার্থক্য নেই, যেহেতু গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক চেতনা না থাকলে সামাজিক গোষ্ঠীর কোন অস্তিত্বও নেই। যখন সমষ্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুস্পষ্ট সামাজিক সম্পর্ক থাকে এবং একটা স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে কোন সাধারণ স্বার্থ বা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিরা পরস্পরের উপর কার্য করে তখনই সামাজিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। সামাজিক গোষ্ঠী হল এক 'মানসিক সামাজিক ঐক্য' (psychosocial unity) এবং যান্ত্রিক সমষ্টি থেকে সব সময়ই পৃথক।

সমাজ (Scciety) এবং সামাজিক গোষ্ঠীর (Social Groups) মধ্যে প্রভেদ আছে। যে কোন সামাজিক গোষ্ঠীকেই সমাজ বলে গণ্য করা যেতে পারে না। সামাজিক গোষ্ঠীর তুলনায় সমাজের স্থায়িত্ব এবং সংগঠন অনেক বেশী।

সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে 'আপাত-গোষ্ঠী'র (Quasi-group) পার্থক্য আছে। সামাজিক গোষ্ঠীর একটা নির্দিষ্ট সংগঠন আছে, যা সকলের স্বীকৃতি লাভ করে ; আপাত-গোষ্ঠীর বেলায় এরূপ কোন স্বীকৃত সংগঠন নেই। অবশ্য আপাত-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির মধ্যে অনেক বিষয়ে হয়ত সাদৃশ্য থাকতে পারে। যেমন—একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত যে জনসমষ্টি, যাদের পেশাগত উদ্দেশ্য এক, কিন্তু যাদের নির্দিষ্ট কোন সংগঠন নেই। যখনই এসব ব্যক্তি সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের সংগঠিত করে তখনই আপাত-গোষ্ঠী সামাজিক গোষ্ঠীর স্তরে উন্নীত হয়। অনেক সময় দেখা যায় অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণবশতঃ ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধ হয়ে এক সুদৃঢ় সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের দাবী-দাওয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট হয় এবং এর ফলে সামাজিক-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়।

সমাজ ও সামাজিক গোষ্ঠী এবং আপাত-গোষ্ঠী

৩। গোষ্ঠী জীবনের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য (Some general characteristics of group life):

গোষ্ঠী তার অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মনে এক অখণ্ডতা বা সমগ্রতার চেতনা সৃষ্টি করে। যখন কোন ব্যক্তি কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয় বা তার মধ্যে থেকে কাজ করে তখন সে উপলব্ধি করে যে, সে কেবল নিজেকে নিয়েই কেন্দ্রীভূত নয়, সে এক অখণ্ড সমগ্রতার অংশস্বরূপ যা কোন কোন সময় তার ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাজ করতে পারে। যখন সমস্ত পরিবারটিই কোন একটি কার্য করার জন্য সংকল্পবদ্ধ, তখন সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কোন বিশেষ সভ্য উপলব্ধি করতে পারে যে এ ব্যাপারে তার অনিচ্ছার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে, গোষ্ঠী তার থেকে বড় এবং তার স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার আছে।

গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মনে সমগ্রতার চেতনা

গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ আরও অবহিত হয় যে, গোষ্ঠী তার অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের কার্যকলাপের উপর চাপ দিতে পারে। ব্যক্তির উপর এই চাপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আসতে পারে। ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে স্বাধীনভাবে খুশীমত যে-কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং সমষ্টিগত স্বার্থের সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তি-স্বার্থকে অনেক সময় বিসর্জন দিতে হয় বা ব্যক্তিকে স্বার্থমূলক কার্য সম্পাদন থেকে বিরত থাকতে হয়। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তি গোষ্ঠীর স্বার্থকেই নিজের স্বার্থ বলে মনে করে এবং তার সঙ্গেই নিজেকে অভিন্ন মনে করে।

ব্যক্তির উপর গোষ্ঠীর চাপ

সামাজিক গোষ্ঠী তার সভ্যদের মধ্যে একটা দলীয় মনোভাব (group-spirit) বা চেতনার সঞ্চার করে। গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ পরস্পরের সাহচর্য পছন্দ করে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাশীল হয়, গোষ্ঠীর সাধারণ জীবনের অংশীদার মনে করে গর্বিত বোধ করে। প্রতিটি সভ্যই গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। এই মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই ব্যক্তি নিজের স্বার্থের কথা বিস্মৃত হয়ে গোষ্ঠীর বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকে অভিন্ন মনে করে।

দলীয় মনোভাব

গোষ্ঠী-জীবন তার সভ্যদের মধ্যে এই চেতনা আনে যে, যারা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয় সেইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের কোথায় যেন কিছু পার্থক্য আছে। গোষ্ঠীর যারা সভ্য এবং গোষ্ঠীর যারা সভ্য নয়—উভয়ের মাঝে যে একটা ব্যবধান আছে, এ বোধ তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়।

সভ্য হওয়ার চেতনা

পরস্পরের আবেদনে সাড়া দেওয়া, পরস্পরের ভাব-বিনিময়ে ক্রিয়া করা সামাজিক গোষ্ঠীর সংহতি বা ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপ। গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে প্রথম শুরু হয় সংযোগ বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, কিন্তু অচিরেই সভ্যরা উপলব্ধি করে যে পারস্পরিক স্বীকৃতির প্রয়োজন। অপরের আচরণের সঙ্গে নিজের আচরণের সামঞ্জস্য সাধন, গোষ্ঠীর সাধারণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের কথা স্মরণে রেখে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা গোষ্ঠীর সংহতি বা ঐক্য সংরক্ষণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। মোটামুটি স্থায়ী কোন গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে এই পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন—পরিবারে মাতাপিতা সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সন্তান মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রদর্শন করে তার প্রতিদান দেয়।

পরস্পর ভাব-বিনিময়ে ক্রিয়া

প্রত্যেক সামাজিক গোষ্ঠীই কিছু সাধারণ সম্পত্তির মালিক। এই সম্পত্তি জাগতিক বস্তু হতে পারে বা ভাবমূলক আধ্যাত্মিক কিছু হতে পারে; নির্দিষ্ট বাসস্থান, অট্টালিকা, পতাকা, এক বা একাধিক লক্ষ্য এই জাতীয় সম্পত্তির উদাহরণ।

সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ (Division of Social groups):

বিভিন্ন আদর্শের মাপকাঠিতে এই সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন—গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বা ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বা গোষ্ঠীর স্থায়িত্বের ভিত্তিতে এবং আরও নানা ভিত্তিতে

নানা ভিত্তিতে গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ

সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ হতে পারে। এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলিই আমরা আলোচনা করব :

(২) **প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং অন্তবর্তী গোষ্ঠী :** কুলে (*C. H. Cooley*) সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে (১) প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Groups) এবং (২) মাধ্যমিক গোষ্ঠী (Secondary Groups)—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

প্রাথমিক গোষ্ঠী

প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলিকে বলা হয় মুখোমুখী গোষ্ঠী (Face-to-Face Group)। এ নামে অভিহিত করার একটা কারণও আছে। প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যে সম্পর্ক বর্তমান, সে সম্পর্ক হল প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ। মুখোমুখি পরিচয় তার বৈশিষ্ট্য। একটা নিবিড় সম্পর্ক এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গড়ে ওঠে। পরিবার, ছোট শিশুদের খেলার দল, পাড়া ইত্যাদি প্রাথমিক গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সভ্যরা পরস্পর মিলিত হয়ে এক আঙ্গিক ঐক্য গড়ে তোলে।

পূর্বোক্ত ছোট ছোট গোষ্ঠী ভিন্ন সমাজে অনেক বড় বড় গোষ্ঠী আছে। যেমন—ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল, শিক্ষকদের সমিতি ইত্যাদি। এ সব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একটা সাধারণ গোষ্ঠী-চেতনা আছে এবং সেই চেতনা-উদ্ভূত একটা ঐক্যবোধও আছে। কিন্তু ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক, সে সম্পর্ক তত প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ নয়। প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মত এদের সকলের মধ্যে কোন মুখোমুখী পরিচয় নেই। এ জাতীয় গোষ্ঠী হল মাধ্যমিক গোষ্ঠী (Secondary Groups)।

সমাজ-জীবনে প্রাথমিক বা মুখোমুখী গোষ্ঠীগুলির (Primary or Face-to-Face Group) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। পরিবারের পরেই এই প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি ব্যক্তির জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। এ সব ছোট ছোট স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির (Local Groups) নীতি ও আদর্শ ব্যক্তির চরিত্রকে

গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অনেক সময় এ সব প্রাথমিক গোষ্ঠী কোন বৃহত্তর সংগঠনের অঙ্গীভূত হয়েও নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে। যেমন, 'কলেজ ক্রিকেট ক্লাব'। এই ক্ষুদ্র সংগঠনটি 'কলেজ'—এই বৃহত্তর সংগঠনের অঙ্গীভূত, কিন্তু 'কলেজ ক্রিকেট ক্লাব' হিসেবে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রাথমিক গোষ্ঠী কৃষ্টিমূলকও হতে পারে; যেমন, কোন সাংস্কৃতিক সংগঠন। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি সুসংগঠিত হলে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায় নিবিড় অন্তরঙ্গতা, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও সহানুভূতি এবং পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করার আগ্রহ ও উৎসাহ। প্রাথমিক গোষ্ঠীর কোন সভ্য নিজের সঙ্গে সমস্ত গোষ্ঠীর একাত্মতা অনুভব করে। প্রাথমিক গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে 'আমরা' এই ভাবটা (we-feeling) খুব প্রবল হয়ে ওঠে এবং পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত কাছে টেনে নিয়ে আসে। কোন প্রাথমিক গোষ্ঠী যদি অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তাহলে সমাজ-জীবনে নানারকম দুর্নীতির আবির্ভাব ঘটে। কৃষ্টিমূলক প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি, যেমন—'সাহিত্য-সংসদ', 'দর্শন-চক্র' প্রভৃতি যদি সুসংগঠিত হয় তবে এদের সভ্যদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব খুবই প্রবল হয়; কারণ তারা তাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে যেমন সচেতন হয় তেমনই লক্ষ্যকে লাভ করার জন্যও যথেষ্ট সচেষ্ট হয়।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য

প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির বৈশিষ্ট্যই এমন যে, এর ব্যক্তির সংখ্যা সাধারণতঃ সীমিত হয়। বস্তুতঃ, গোষ্ঠীগুলির বৈশিষ্ট্যই এমন যে এর ব্যক্তির সংখ্যা সীমিত হওয়াই প্রয়োজন। এই প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচির যদি সাদৃশ্য না থাকে, তাহলে ক্রমশঃ তাদের পারস্পরিক আচরণ কৃত্রিম হয়ে পড়ে। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি সার্বিক এবং মানব সমাজের ক্রমবিকাশের সর্বস্তরে এগুলি দৃষ্ট হয়।

মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি (Secondary Groups) অর্থনৈতিক অবস্থা ও স্বার্থের ভিত্তিতে সাধারণতঃ গড়ে ওঠে। প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় মাধ্যমিক গোষ্ঠীর বিস্তৃতি একটু ব্যাপক কিন্তু প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় এ গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত কৃত্রিম। ব্যক্তির জীবন ও চরিত্রের উপর প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায়

মাধ্যমিক গোষ্ঠীর প্রভাব অনেক কম। এরূপ গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক তেমন আন্তরিক ও নিবিড় হয় না বরং এ সম্পর্ক অনেকটা 'নৈর্ব্যক্তিক, পরোক্ষ এবং বাহ্যিক' ('impersonal, secondary and formal')। এরূপ গোষ্ঠীতে সমষ্টিগত চেতনার স্থান দখল করে স্বাতন্ত্র্যভাব, সামাজিক কাজকর্ম হয়ে ওঠে নেহাত চুক্তির ব্যাপার।

মাধ্যমিক গোষ্ঠী

প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির স্থায়িত্ব অনেক বেশী। একটা ছোট-শিশুদের খেলার দলের তুলনায় শিক্ষক সমিতির স্থায়িত্ব অনেক বেশী। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি স্বাভাবিক, মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি কৃত্রিম। প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি অনেক বেশী নৈর্ব্যক্তিক ও বাহ্যিক এবং সে-কারণে আইন কানুনের মাধ্যমে মাধ্যমিক গোষ্ঠীর সভ্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Groups) এবং মাধ্যমিক গোষ্ঠী (Secondary Groups) ছাড়াও আরও এক ধরনের গোষ্ঠী আছে, যাকে বলা হয় **অন্তর্বর্তী গোষ্ঠী** (Intermediate Groups) এ জাতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক ততখানি ব্যক্তিগত নয়, যতখানি বাইরে থেকে চোখে পড়ে! অবশ্য পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা সচেতন, কিন্তু নিজেদের মধ্যে এদের সম্পর্ক অনেকটা ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্কের সমতুল্য; প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় এদের সম্পর্ক ততখানি নিবিড় নয়, আবার মাধ্যমিক গোষ্ঠীর তুলনায় এরা ততখানি কৃত্রিম নয়, সেহেতু এগুলিকে অন্তর্বর্তী গোষ্ঠী বলা হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা, পুলিস-নাগরিক প্রভৃতি অন্তর্বর্তী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

অন্তর্বর্তী গোষ্ঠী

(২) **অস্থায়ী গোষ্ঠী, স্বল্পকাল স্থায়ী গোষ্ঠী দীর্ঘকালস্থায়ী গোষ্ঠী এবং চিরস্থায়ী গোষ্ঠী :** এই সকল গোষ্ঠীগুলিকে গিসবার্ট (*Gisbert*) সংগঠনের মাত্রা বা দৃঢ়তা (Degree of Organisation) অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত করেছেন।[1]

[1] *P. Gisbert*: Fundamentals of Sociology, Page 29.

সংগঠনের মাত্রা অনুযায়ী প্রথম স্তরে দেখা যায় এমন গোষ্ঠী, সংগঠনের কথা চিন্তা বা স্থির না করেই যাদের আবির্ভাব ঘটেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যেমন, কোন দুর্ঘটনা দেখে রাজপথে সমবেত কৌতূহলী জনতা। এ হল **অস্থায়ী গোষ্ঠীর** উদাহরণ।

সংগঠনের দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায় এমন গোষ্ঠী যার ব্যক্তিরা পূর্ব থেকে সংগঠনের কথা চিন্তা করে সংঘবদ্ধ হয়েছে। যেমন—ছাত্র সংসদ, কোন বিশেষ দলের সভা ইত্যাদি। এরকম গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ যখন স্বেচ্ছায় দল পরিত্যাগ করে, গোষ্ঠীও তখন ভেঙে যায়। এ হল **স্বল্পকাল স্থায়ী গোষ্ঠীর** উদাহরণ।

সংগঠনের তৃতীয় স্তরে সংগঠন ব্যক্তিদের ইচ্ছার উপর ততখানি নির্ভর করে না যতখানি নির্ভর করে ব্যক্তিদের স্থায়ী সম্পর্কের উপর। ফলে এ জাতীয় গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব অনেক বেশী। একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এখানে ব্যক্তিরা সংঘবদ্ধ হয়। যেমন—শ্রমিক সংসদ, শিক্ষা সমিতি ইত্যাদি। এ হল **দীর্ঘকাল স্থায়ী গোষ্ঠীর** উদাহরণ।

সংগঠনের চতুর্থ স্তরে দেখা যায় সেই জাতীয় গোষ্ঠী যার সংগঠনের একটা অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্ব আছে। এই জাতীয় সংগঠন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ইচ্ছা-নির্ভর নয়। ব্যক্তির আসা-যাওয়ার উপর গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব নির্ভর করে না। যেমন—রাষ্ট্র, গ্রাম্য-সমাজ, শহর ইত্যাদি। এ হল **চিরস্থায়ী গোষ্ঠীর** উদাহরণ।

(৩) অন্তর্গোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠী (In-groups and Out-groups): সামনার (*W. G. Sumner*) গোষ্ঠীগুলিকে অন্তর্গোষ্ঠী (In-groups) এবং বহির্গোষ্ঠী (Out-groups)—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। অন্তর্গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই মধুর এবং গোষ্ঠীর প্রতি তাদের আনুগত্য খুবই প্রবল।

অন্তর্গোষ্ঠী

অন্তর্গোষ্ঠীর মধ্যে 'আমরা এই ভাবটা' (we-feeling) আছে এবং 'আমরা করি', 'আমরা অনুভব করি', 'আমরা বিশ্বাস করি'—এই সব উক্তির মাধ্যমে সেই ভাবটা প্রকাশিত হয়। যেমন—পরিবার, পাড়া (neighbourhood) হল অন্তর্গোষ্ঠীর উদাহরণ। অন্তর্গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে গোষ্ঠী-সংহতির চেতনা খুবই প্রবল থাকে।

বহির্গোষ্ঠী হল সেই গোষ্ঠী যার প্রতি অন্তর্গোষ্ঠীর সভ্যেরা শত্রুভাবাপন্ন, বা যাকে তারা কোন কারণবশতঃ পছন্দ করে না, বা যা তাদের কাছে ভীতির কারণস্বরূপ। আমাদের পাড়া আমাদের কাছে অন্তর্গোষ্ঠী, কিন্তু আমাদের কাছের পাড়া, যাদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতার ভাব লেগেই রয়েছে, আমাদের দিক থেকে সেটি বহির্গোষ্ঠী। শ্রমিকদের কাছে শ্রমিক সংসদ হল অন্তর্গোষ্ঠী, কিন্তু মালিকদের সংসদ হচ্ছে বহির্গোষ্ঠী।

বহির্গোষ্ঠী

৪। সামাজিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (Social Institutions):

সাধারণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই মানুষ সংঘ গঠন করে। এই সব সংঘের কতকগুলি অস্থায়ী এবং কতকগুলি স্থায়ী। পরিবার, গীর্জা এবং রাষ্ট্র হল স্থায়ী সংঘ। স্থায়ী সংঘগুলি তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কতকগুলি কর্ম-পদ্ধতি, বিধি ও নিয়মের উপর নির্ভর করে, যেগুলি দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করার জন্য বা সংঘের বিভিন্ন সভ্যদের সামাজিক মেলামেশাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন হয়। এই সব অনুষ্ঠান, প্রচলিত বিধি এবং কর্মপদ্ধতিগুলি স্থায়িরূপ লাভ করলে সামাজিক অনুষ্ঠানে (social institutions) পরিণত হয়। কোন কর্তৃপক্ষ এই সব অনুষ্ঠান প্রচলন করেন এবং সামাজিক গোষ্ঠীর বা সংঘের সভ্যবৃন্দ এগুলিকে স্বীকার করে নেন। যেমন—পরিবারের বিবাহ-প্রথা, গীর্জার দীক্ষাদান পদ্ধতি, রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি, কারখানার বেতন পদ্ধতি ইত্যাদি।

ইংরেজী *Institution* কথাটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'Institution' কথাটির একটি অর্থ হল প্রতিষ্ঠান। যে-কোন ধরনের সংঘই হল প্রতিষ্ঠান। পরিবার, রাষ্ট্র—এই সবই প্রতিষ্ঠান, যেহেতু এগুলি মানুষের দ্বারা তৈরী সামাজিক এক-একটি কাঠামো (Social Structure)। বার্নেস (*H. E. Barnes*) তাঁর *'Social Institution'* গ্রন্থে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, "সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল সামাজিক কাঠামো এবং যন্ত্র যার

Institution-এর দুটি অর্থ

প্রতিষ্ঠান

মাধ্যমে জনসমাজ মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ সংগঠন, পরিচালন এবং সম্পাদন করে।"[1]

দ্বিতীয় অর্থে *Institution* কথাটির অর্থ হল অনুষ্ঠান, প্রচলিত বিধি, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি। এই অর্থে 'Institution'-এর অর্থ হল সংঘ বা প্রতিষ্ঠান নয়, যে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সংঘগুলি গঠিত হয় ও তাদের কার্যকলাপ পরিচালিত হয় তাই। এই অর্থে বিবাহ-প্রথা হল *Institution*, পরিবার বা রাষ্ট্র নয়। ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver* ও *Page*) গিস্‌বার্ট (*Gisbert*), এলউড (*Ellwood*), হেয়েস (*E. C. Hayes*) প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানীরা এই অর্থে *Institution* কথাটিকে গ্রহণ করেছেন। *MacIver* ও *Page* 'Institutions' কথাটির অর্থ বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, "সেই সব প্রচলিত কর্মপদ্ধতি যার মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়।"[2]

অনুষ্ঠান

গিস্‌বার্ট (*Gisbert*)-ও 'Institution' বলতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি স্থায়ী ও স্বীকৃত কর্মপদ্ধতিকেই বুঝিয়েছেন। এলউড (*C. A. Ellwood*) 'Institution' বলতে বোঝেন, "সম্প্রদায়ের কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত, সংগঠিত এবং প্রতিষ্ঠিত একত্র বসবাস করার অভ্যাসসিদ্ধ পদ্ধতি।"[3]

হেয়েস (*E. C. Hayes*)-এর মতে 'Institution' হল একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য কোন সামাজিক গোষ্ঠীর দ্বারা গৃহীত কর্মপদ্ধতি।

সুতরাং পূর্বোক্ত লেখকবৃন্দ *Institution* কথাটির অর্থে বুঝেছেন কোন প্রচলিত বিধি বা কর্মপন্থা। সাধারণতঃ *Institution* বলতে আমরা যে প্রতিষ্ঠানকে বুঝে থাকি, তাঁর সঙ্গে এঁরা একে সমার্থক বলে মনে করেন নি।

1. "The social structure and machinery through which human society organizes, directs and executes the multifarious activities required to satisfy human needs." —*H. E. Barnes* - Social Institutions : Page 29.

2. "'the established forms or conditions of procedure characteristic of group activity' —*MacIver and Page* : Society, Page 15.

3. "Habitual ways of living together which have been sanctioned, systematised, and established by the authority of communities.; —*C. A. Ellwood* : The Psychology of Human Society ; Page 80

সমাজের সংরক্ষণ এবং তার ক্রিয়াকলাপ চালনার জন্য এই সব অনুষ্ঠান, প্রচলিত বিধি বা কর্মপন্থার একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ, এগুলির মাধ্যমেই সমাজ সভ্যদের শারীরিক এবং মানসিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে সব কার্যকলাপের প্রয়োজন সেগুলিকে সংগঠিত করে ও পরিচালিত করে। বার্নেস (*Barnes*)-এর ভাষায়, অনুষ্ঠানগুলি হল যন্ত্রবিশেষ যার মাধ্যমে সমাজ তার কার্য পরিচালনা করে।

এই সব অনুষ্ঠান বা কর্ম-পদ্ধতি সমাজকে প্রাণবান ও গতিশীল করে রাখে। এদের জন্যই সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় না। এগুলির জন্যই ব্যক্তির আচরণ জটিলতা মুক্ত হয়। এই সব অনুষ্ঠান ব্যক্তির কর্মপদ্ধতির উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের একটি নির্দিষ্ট আকার দান করে। যে-কোন ব্যক্তিকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভাবে আচরণ করতে করে। সামাজিক অনুষ্ঠান বা কর্মপদ্ধতিগুলি একই প্রকৃতিবিশিষ্ট আচরণ-পদ্ধতি ব্যক্তির সামনে তুলে ধরে তাকে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে আচরণ করতে সহায়তা করে।

সামাজিক অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য

বস্তুতঃ, এই সব সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি সমাজ-জীবনে ব্যক্তির ভূমিকা নির্ধারণ করে। এগুলির মাধ্যমে সমাজের স্থায়িত্ব রক্ষা হয়। অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই সব সামাজিক অনুষ্ঠান ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সীমিত করে এবং অনেক সময় এগুলি এতই কঠোর হয় যে ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথে এগুলি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সময় সময় এই সব অনুষ্ঠানের বেড়াজাল থেকে মানুষ মুক্তি চায় বা এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করে। অবশ্য এই সব সামাজিক অনুষ্ঠান বা কর্মপদ্ধতি যদি অত্যন্ত কঠোর ও উৎপীড়নমূলক মনে হয় তবেই ব্যক্তির মধ্যে এই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে স্থিতিশীলতা আনয়ন করে যার জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজ সহজতর হয়। এই সব প্রচলিত বিধি বা অনুষ্ঠান সমাজের সভ্যদের মধ্যে সামাজিকতার সৃষ্টি করে গোষ্ঠীর নৈতিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

৬। অনুষ্ঠান ও সংঘ (Institution and Association) :

ম্যাকাইভার (*MacIver*) সংঘ (Association) এবং প্রচলিত বিধি বা অনুষ্ঠান (Institution) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সংঘ কাকে বলে? *MacIver*-এর মতে সাধারণ স্বার্থ অনুসরণের জন্য সামাজিক ব্যক্তির যে সংগঠন তাই হল সংঘ।[1] শ্রমিক সংসদ, শিক্ষক সমিতি, সাহিত্য-সংসদ, নাট্য-সমিতি প্রভৃতি সংঘের উদাহরণ। যে-কোন জনসমষ্টিকেই সংঘ নামে অভিহিত করা যেতে পারে না। একটি সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে ম্যাকাইভার (*MacIver*) বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন। পথের ধারে দাঁড়িয়ে যে জনতা আগুন লাগা দেখছে তাকে সংঘ বলা যেতে পারে না। একই স্বার্থ (interest) তাদের এক জায়গায় সমবেত করেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্ট হয় নি। কিন্তু যদি পথের জনতা মনে করে যে, সমবেতভাবে সকলে সহযোগিতা করে আগুন নেভাবে, তখনই সেই জনসমষ্টি সংঘে পরিণত হবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

সংঘের স্বরূপ

Institution হল প্রচলিত বিধি, কর্মপদ্ধতি বা সামাজিক ব্যষ্টিসমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের রীতি (established forms of relation between social beings)। সংঘ তার চাইতে ব্যাপক, কেবলমাত্র প্রথা নয়, এ হল প্রচলিত বিধি বা কর্মপদ্ধতির উৎস। সংঘের ব্যক্তি নিরপেক্ষ (subjective) এবং ব্যক্তি-সাপেক্ষ (objective) উভয় প্রকার দিক আছে। সাধারণের ইচ্ছায় যেমন প্রচলিত বিধি গড়ে ওঠে, তেমনি সংঘও গড়ে ওঠে। কিন্তু সংঘের বেলায় কোন সাধারণ স্বার্থ এই সাধারণ ইচ্ছাকে সংগঠিত করে। প্রচলিত বিধি হল উপায় মাত্র। সংঘ প্রয়োজন অনুসারে প্রচলিত বিধি বা কর্মপদ্ধতিকে পরিবর্তিত করতে পারে, বাতিল করে দিতে পারে, নতুন বিধি গড়ে তুলতে পারে। সে কারণে

অনুষ্ঠান ও সংঘ

1. "An association is an organisation of social beings (or a body of social beings as organised) for the pursuit of some common interest or interests."

—*MacIver* : Community ; Page 24.

Institution বা প্রচলিত বিধিকে কোন মতেই বাইরের জিনিস বলে মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। ম্যাকাইভার (*MacIver*) বলেন, "কোন অনুষ্ঠান বা প্রচলিত বিধির (Institution) তাৎপর্য তার বাহ্যাংশে খুঁজে পাওয়া তেমনি ভুল, যেমন ভুল হচ্ছে কোন আচরণ ও তার বহিঃপ্রকাশকে এক মনে করা। প্রচলিত বিধি হল সামাজিক কার্যের সংগঠিত ধারা এবং সেহেতু এদের একটা বাইরের দিক আছে, যে দিকটি দেশ ও কালে প্রকাশিত।"[1] অনুষ্ঠান বা প্রচলিত বিধির একটা বাইরের দিক আছে। যেমন—কলেজ-গৃহ, যেখানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে Institution বা প্রচলিত বিধির আভ্যন্তরীণ দিকটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এই বিধি সমাজের সভ্যদের সামাজিক জীবনের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে.

মানুষ সংঘ গঠন করে, কিন্তু সংঘ গঠন করলেই সংঘের কাজ চালাবার জন্য এবং সংঘের ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতকগুলি নিয়ম বা কার্যধারার প্রয়োজন হয়। এই নিয়ম বা কার্যধারাই হল Institution বা সামাজিক বিধি। প্রত্যেকটি সংঘেরই তার নিজস্ব নিয়ম, পদ্ধতি বা কার্যধারা আছে। পরিবারের বিবাহ আছে, গীর্জার উপাসনা-পদ্ধতি আছে, রাষ্ট্রের আইন সংক্রান্ত বিধি আছে। আমরা ব্যক্তিরা সংঘের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কোন প্রচলিত বিধির (Institution) অন্তর্ভুক্ত নই। সময় সময় সংঘের সঙ্গে বিধিকে আমরা গুলিয়ে ফেলি, কিন্তু ম্যাকাইভার (*MacIver*) বলেন, এ দুটোর মধ্যে কোন গোলমাল হবার কারণ নেই। পরিবার হল একটি সংঘ, বহুবিবাহ হল একটি সামাজিক প্রথা বা বিধি। যখন কোন সংঘটিত গোষ্ঠীর কথা চিন্তা করব, তখন সেটি হল সংঘ এবং যদি প্রথা বা নিয়মের কথা চিন্তা করি তখন সেটি হল বিধি (Institution)। যখন শিক্ষায়তন বলতে বুঝি শিক্ষক এবং ছাত্র তখন সেটি হল সংঘ। যখন শিক্ষায়তন বলতে বুঝি শিক্ষা সম্পর্কীয় বিধি-ব্যবস্থা সেটা

1. "It is a mistake to find the essence of any institution in externality just as it is a mistake to make conduct equivalent to its external manifestation. Institutions are organised forms of social activity and have therefore an external aspect, an aspect in time and space."

—*MacIver* : Community Page 152.

বিধি বা অনুষ্ঠান। আমরা 'রাষ্ট্রের বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত' এমন কথা বলি, কিন্তু আমরা 'বিবাহের বা সম্পত্তি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত' এমন কথা বলি না। সংঘের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে লাভ করার পদ্ধতি—এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। পরিবারের প্রধান উদ্দেশ্য হল বংশ রক্ষা করা, কিন্তু বিবাহ, সম্পত্তি ব্যবস্থা—এগুলি হল এর প্রধান প্রথা বা নিয়ম। সেরকম ধর্মীয় সংঘগুলির উদ্দেশ্য হল ধর্ম সম্পর্কীয় প্রয়োজন মেটান, কিন্তু উপাসনা, পূজাপদ্ধতি হল এর পদ্ধতি বা প্রথা। সংঘ থাকলেই তার কার্যপদ্ধতিও থাকবে।

ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "যদিও কোন বিশেষ প্রকারের সংঘ (A mode of association) এবং এর উপায়ের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য করা যায়, কোন অনুষ্ঠান এদের উভয়ের মাঝামাঝি স্থানে আছে বলে উভয়ের বৈশিষ্ট্যের অংশ গ্রহণ করে।"[1]

সংঘ (Association) এবং অনুষ্ঠান, প্রচলিত পদ্ধতি বা প্রথা (Institution)—এই উভয়ের প্রভেদটুকু মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। সমাজ-জীবনের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠন অপরিহার্য, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি এবং অনুষ্ঠানই সামাজিক সংগঠনগুলিকে গতিশীল করে রাখে।

সংঘ এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য

গিস্বার্ট (*Gisbert*) বলেন, "Associations are things, institutions are modes and ways" অর্থাৎ "সংঘ হল বস্তু, অনুষ্ঠান হল এর বিভিন্ন পদ্ধতি।" সংঘতেই আমাদের জন্ম হয়, সেখানেই আমরা প্রতিপালিত হই এবং বড় হই কিন্তু আমরা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই কাজ করি। গিস্বার্ট (*Gisbert*)-এর মতে যদিও সমাজ-জীবনের এ দুটি উপাদান গভীরভাবে সংযুক্ত, তবু একটির বৈশিষ্ট্য অপরের বৈশিষ্ট্য নয়।

এই সব অনুষ্ঠান বা প্রচলিত বিধির মধ্যে কোন কোনটি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উদ্ভূত হয়েছে। যেমন—সম্পত্তি ব্যবস্থা, সরকার ইত্যাদি। আবার কোন

1. "But, while the distinction between a mode of association and its instruments can generally be clearly drawn. An Institution—which lies somewhat between the two—is apt to partake of the nature of both."
—*Mackenzie*: Outlines of Social Philosophy; Page 63.

2. *P. Gisbert*: Fundamentals of Sociology; Page 86.

কোন প্রচলিত বিধি বিশেষ চেষ্টার ফলে উদ্ভূত। যেমন, উত্তরাধিকার কর প্রথা (Inheritance tax)। অবশ্য কালক্রমে এই সব প্রচলিত বিধি বা অনুষ্ঠানের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে।

৭। অনুষ্ঠান এবং আচার (Institution and Customs):

প্রশ্ন হল 'Institution'-এর অর্থ যদি হয় অনুষ্ঠান,[1] পদ্ধতি বা রীতি তাহলে Custom বা 'আচারের' সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়? আচার বলতে বুঝি সামাজিক আচরণের অভ্যাসলব্ধ পদ্ধতি বা ধারা। যেমন, পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলে আমরা পরস্পরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি, এসব আচরণগুলির সামাজিক সম্পর্কের প্রতি আমরা উদাসীন নই। যদি কোন কারণে কোন আচার ভঙ্গ করা হয় তাহলে তার ফলে আমাদের মধ্যে মনস্তাপ দেখা দেয়।

আচার-এর স্বরূপ

গিস্‌বার্ট (*Gisbert*) আচারের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা —আচরণের ধারাবাহিকতা (a constant way of acting), সামাজিকতা (social in character) এবং আদর্শগত মূল্য (normative value)। যেহেতু সাধারণ অভ্যাস থেকে একে পৃথক করা যেতে পারে। যেমন, ধূমপানের অভ্যাস। সাধারণ অভ্যাসের সঙ্গে আচারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই একে 'অনুমোদিত অভ্যাস' বলে অভিহিত করা হয়। অভ্যাস হল ব্যক্তিগত বিষয়, এর কোন সামাজিক অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। আচার হল নৈর্ব্যক্তিক এবং আচারের সঙ্গে সামাজিক অনুমোদন যুক্ত।

আচারের বৈশিষ্ট্য

আচারের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত দিক আছে। আচার বলতেই আমরা বুঝি কতকগুলি স্বীকৃত কর্মপদ্ধতি যেগুলি মানুষ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে একত্রে করে থাকে। অনুষ্ঠান (Institution) বলতে আমরা বুঝি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (system of control), যা ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমার বাইরে চলে

1. *Mackenzie*ও সামাজিক অনুষ্ঠানকে ব্যাপক অর্থে এবং সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছেন। অনুষ্ঠানের ব্যাপক অর্থে 'যে কোন সংঘই অনুষ্ঠান'। যেমন—পরিবার, রাষ্ট্র। সংকীর্ণ অর্থে সামাজিক অনুষ্ঠান হল বিশেষ ধরনের উপায় বা পদ্ধতি, যার দ্বারা সংঘ গঠিত হয়, রক্ষিত হয় এবং তার বিশেষ কাজগুলি সম্পন্ন হয়।

যায়। এই নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হল অতীত এবং বর্তমান, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র যা মানুষকে তার পূর্বপুরুষ এবং বংশধরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে।

সুতরাং আচার (Custom) এবং অনুষ্ঠানের (Institution) মধ্যে যে পার্থক্য তা জাতিগত নয়, মাত্রাগত। অনুষ্ঠানেরও একটা সামাজিক এবং আদর্শগত মূল্যের দিক আছে, কিন্তু আচারের তুলনায় অনুষ্ঠান অধিক নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) এবং কম স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous)। সমাজে আচারের থেকে অনুষ্ঠানের স্বীকৃতিই বেশী। যেমন, উত্তরাধিকার ও ভদ্রতা। সমাজ অনুষ্ঠান হিসেবে উত্তরাধিকারকেই বেশী স্বীকৃতি দেয়। উত্তরাধিকারের দ্বারা পরিবারের স্থায়িত্ব রক্ষা হয়। কিন্তু আচার হিসেবে ভদ্রতার গুরুত্ব অত বেশী নয়। এ ছাড়া অধিকাংশ অনুষ্ঠানই সুনির্দিষ্ট, আচার সাধারণতঃ তেমন সুনির্দিষ্ট নয়। আচার অনুষ্ঠানে পরিণত হতে পারে যখন আচরণ সাধারণের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি লাভ করে।

আচার ও অনুষ্ঠানের পার্থক্য

৮। বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (Various Modes or forms of Social Institutions):

সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলি যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, সেই উদ্দেশ্যের দিক থেকে, সমাজ জীবনে প্রয়োজনের দিক থেকে, তাদের সাধারণতা (generality) এবং সীমাবদ্ধতার (restriction) দিক থেকে আমরা তাদের শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। যে উদ্দেশ্য তারা সিদ্ধ করে সেই উদ্দেশ্যের দিক থেকে যদি তাদের শ্রেণীভুক্ত করি তাহলে অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিভাগ হবে নিম্নরূপ।

(ক) পারিবারিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (Domestic Institution):

পারিবারিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য জৈবিক প্রয়োজন মেটান, যদিও জৈবিক প্রয়োজন ছাড়া তার অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করে। পারিবারিক

অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের প্রধান কাজ বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করা। শিশু প্রতিপালন করা এবং বৃহত্তর জীবনের জন্য শিশুকে গঠন করার দায়িত্ব পরিবারের।

(খ) শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (Educational Institutions) : ব্যাপক অর্থে সব শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত বুদ্ধিগত ও নৈতিক ক্ষমতাগুলিকে বিকশিত করে তার ব্যক্তিত্বকে সুগঠিত করা। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তির চরিত্র গঠন করে এবং বৃহত্তর সমাজ-জীবনে তার দায়িত্বগুলি পালন করার জন্য তাকে যোগ্য করে তোলে। ক্ষুদ্রতর অর্থে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি একটা বিশেষ লক্ষ্য লাভের জন্য কোন বিশেষ বিষয়ে ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং জীবনে যাতে সে তার নির্বাচিত পেশা অনুসরণ করতে পারে তার জন্য তাকে যোগ্য করে তোলে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ যেগুলি ব্যক্তির জীবন গঠনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) গঠনমূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের (Formative Institutio1s) আলোচনা করেছেন।

কতকগুলি অনুষ্ঠান আছে যেগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল শুধু কোন এক ধরনের সামাজিক ঐক্যকে টিকিয়ে না রেখে সামাজিক ঐক্য গঠন করা। এই সব গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান মূলতঃ শিক্ষামূলক, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষাবিষয়ক উদ্দেশ্য খুব সুনির্দিষ্টভাবে পরিস্ফুট হয় না। যেমন পরিবার, এর প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষামূলক, তবে তা ছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্য একে পূর্ণ করতে হয়।

(গ) অর্থনৈতিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) .Economic Institut iosn) : সমাজে কতকগুলি অনুষ্ঠান যেমন গঠনমূলক, তেমনি কতকগুলি অনুষ্ঠান আছে যারা রক্ষণমূলক; যাদের উদ্দেশ্য যতটা না মানুষের জীবনকে গঠন করা তার বেশি মানুষের জীবন রক্ষা করা। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য

খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, নিদ্রা প্রভৃতির প্রয়োজন। অর্থনৈতিক অনুষ্ঠানগুলি মানুষের এসব প্রয়োজন মেটায়। অবশ্য এ অনুষ্ঠানগুলিকে মানুষের আরও নানারকম প্রয়োজন বা দাবী; যেমন—খেলাধুলা, গানবাজনা, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি মেটাতে হয়। সেসব অনুষ্ঠানগুলিকেই আমরা অর্থনৈতিক বলে অভিহিত করতে পারি যেগুলি আমাদের বেড়ে ওঠার জন্য যেসব অভাব, সেগুলি দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই কার্যকরী হয়।

(ঘ) **শিল্পসম্পর্কীয় অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান)** (Industrial Institutions): বেড়ে ওঠার প্রয়োজন ছাড়াও মানুষের আরও কতকগুলি প্রয়োজন আছে, যেগুলির সঙ্গে তার দৈহিক ও বুদ্ধিগত দিকের সম্পর্ক আছে। তার জ্ঞান অর্জনের জন্য পুস্তক পাঠের প্রয়োজন, ঘর সাজানোর জন্য চিত্রের প্রয়োজন, গৃহনির্মাণের জন্য উপাদানের প্রয়োজন, সংগীত অনুশীলনের জন্য বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। বিভিন্ন শিল্পসম্পর্কীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান—যেমন মিল, কারখানা, শ্রমিক সংঘ, মানুষের এসব প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করে।

(ঙ) **সরকারী অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান)** (Governmental Institutions): সমাজের মধ্যে নানা ধরনের সংঘ আছে। এই সংঘগুলিকে যদি নিয়ন্ত্রিত এবং সংযোজিত করা না হয় তাহলে বিভিন্ন সংঘের মধ্যে বিরোধিতার ফলে তারা আদর্শভ্রষ্ট হবে এবং ফলে সমাজ-জীবনের শান্তি এবং ঐক্য ব্যাহত হবে। মানুষ একটি স্বীকৃত শাসনব্যবস্থার সাহায্যে বিভিন্ন সংঘগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় এই শাসনব্যবস্থা ন্যস্ত ছিল সমাজপতিদের উপর। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মধ্যে বিরোধিতার ফলে এবং আভ্যন্তরীণ অশান্তি দূর করার জন্য একটি সুসংহত শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ধীরে ধীরে আবির্ভাব ঘটল রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব বিভিন্ন সংঘ এবং প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রসারিত করল। মানুষের অধিকার ও কর্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হল। মানুষের প্রতি ন্যায়সংগত আচরণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। মানুষ যাতে স্বীকৃত

শাসন-ব্যবস্থা মেনে চলে তার জন্য প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগ করা দরকার, তাই দেখা দিল পুলিসী ও সামরিক ব্যবস্থা।

(চ) **সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান)** (Cultural Institutions): আমরা ইতিপূর্বে মানুষের তিনটি দিকের কথা উল্লেখ করেছি—(১) বর্ধনশীল দিক (Vegetative aspect), (২) জৈবিক দিক (Animal aspect) এবং আর একটি হল তার (৩) বিচার-বুদ্ধির দিক (Rational aspect)। মানুষের অগ্রগতি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উপলব্ধি করল যে তার বিচারবুদ্ধির বিকাশের দিকটিই আসল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এবং অপর দুটি সেই উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় মাত্র। বিচার-বুদ্ধির অনুশীলনকেই মানুষ করে নিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তার ফলে দেখা দিল নতুন এক ধরনের সংঘ। কেবলমাত্র শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যেই সংঘ গঠিত হল না; জ্ঞান, বুদ্ধির এবং চরিত্রের বিকাশের জন্যও সংঘ গঠিত হল। মানুষের যে আবেগ তার জৈবিক প্রবৃত্তির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে সেই আবেগ এক নতুন রূপ পরিগ্রহণ করল। সে আবেগ সূক্ষ্ম এক চিন্তামূলক আবেগ ও মনোভাবের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করল। ললিতকলার মাধ্যমে মানুষ নিজের এই আবেগ বা মনোভাবকে প্রকাশ করতে লাগল। শিক্ষা ও কলার অনুষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটল। কলা ও সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের সৃজনমূলক প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে এবং সুনির্দিষ্ট ও সুসংগত উপায়ে মানুষের সুকোমল ও সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেগকে প্রকাশ করার জন্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে। এই জাতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। সাহিত্য সংঘ, সংগীত সভা, চিত্র প্রদর্শনা প্রভৃতি এই জাতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ।

এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান মানুষের জীবনের ঐক্য এবং মূল্য সম্পর্কে চেতনাকে গভীরতর করে বিভিন্ন মনুষ্য সমাজের মধ্যে বিরোধিতাকে দূরীভূত করে, যার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নত ও দৃঢ় হওয়ার জন্য আরও অনেক নতুন নতুন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে।

(ছ) **ধর্মমূলক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান)** (Religious Institutions): অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মত ধর্মমূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সামাজিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ধর্মমূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান রূপেও গণ্য করা যেতে পারে। ধর্ম কোন পরম সত্তায় বিশ্বাস সূচনা করে, যে সত্তার সঙ্গে ব্যক্তি ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়। ধর্মের আভ্যন্তরীণ দিক হল ব্যক্তির বিশ্বাস, ধারণা, অনুভূতি ও আবেগের দিক এবং ধর্মের বাহ্য দিক হল কতকগুলি আচার ও অনুষ্ঠান—যেমন উপাসনা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ব্যক্তির ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ পায়। ধর্মের এই বাহ্য দিক থেকেই কতকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে যেগুলি বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। গীর্জা, মন্দির, মসজিদ, ধর্মসভা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ। যদিও ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় তবু ধর্মের একটা সামাজিক দিক আছে। বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান অনেক সময় সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের কেন্দ্ররূপেও কার্য করে।

(জ) **আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান)** (Recreational Institutions): খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতিরও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান রূপেও গণ্য করা যেতে পারে। ফুটবল ক্লাব, ক্রিকেট ক্লাব, নাট্য-সংঘ, সংগীত-সংঘ প্রভৃতি এই জাতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ।

(ঝ) **বন্য অনুষ্ঠান** (Barbaric Institutions): যে সকল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ তার জৈবিক আবেগকে প্রকাশ করে ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) সেই অনুষ্ঠানগুলির নাম দিয়েছেন '*Barbaric Institution*'। এই অনুষ্ঠানগুলির শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য থাকলেও, আসলে এগুলি হল জৈব আবেগকে তৃপ্ত করার একটা উপায়। আগেকার দিনে ষাঁড়ে মানুষে যে লড়াই (Bull-fight) হত, বর্তমানকালেও যে মল্লযুদ্ধ বা কুস্তির ব্যবস্থা তাহল এই জাতীয়।

৯। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের (প্রতিষ্ঠানের) পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া (Inte-actions of Institutions) :

সমাজের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান দেখতে পাই। এসব অনুষ্ঠানের পরস্পরের উপর ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সময় সময় বিরোধিতা সৃষ্টি করে যার ফলে সমাজ জীবনের নানারকম জটিলতা দেখা যায়। একথা সত্য যে, মানুষ বিচার-বুদ্ধির দ্বারাই নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে, তবু সময় সময় মানুষের এই বিচার-বুদ্ধির দিকটি তার উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। সেই কারণে এমন সব অনুষ্ঠান আছে যার নৈতিক ভিত্তি সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক সময় অধিকার অপেক্ষা বলপ্রয়োগকেই আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কিন্তু মানুষ চায় ঐক্য, সংহতি—তাই জীবনের বিরোধের উপর শেষ পর্যন্ত ঐক্যের জয় ঘটে এবং মানুষ ধীরে ধীরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে বিরোধিতা দেখে তাকে দূরীভূত করে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনবার জন্য সচেষ্ট হয়। তবে এ হল সময় সাপেক্ষ। সে কারণে সামঞ্জস্য ও বিরোধিতা পাশাপাশি চলতে থাকে এবং এর থেকে সমাজকে খুব সহজে মুক্ত করা সকল সময় সম্ভব হয় না। তবে সব রকম বিরোধিতা দূর করে ও দ্বন্দ্ব পরিহার করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে সুষম-সমন্বয় সাধন করে আদর্শ সমাজ গঠনের পরিকল্পনা মানুষের আছে এবং মানুষের সে স্বপ্ন সঠিক হবে কিনা ভবিষ্যতই তা বলতে পারে। মানুষ সভ্য, তবে তাকে আরও সভ্য হতে হবে যাতে সব রকম বিরোধ দূর করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্রিয়াটিকে আরও নিখুঁত ভাবে কার্যকরী করে তোলা যায়।

সংক্ষিপ্তসার

১। সামাজিক গোষ্ঠী হল একাধিক ব্যক্তির সমষ্টি যারা কোন স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে পরস্পরের উপর কাজ করে। গোষ্ঠীর তুলনায় সমাজের স্থায়িত্ব ও সংগঠন অনেক বেশি। আপাত-গোষ্ঠীর কোন স্বীকৃত সংগঠন নেই। গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য শ্রেণীবিভাগ হল : প্রাথমিক গোষ্ঠী ও মাধ্যমিক গোষ্ঠী। প্রাথমিক গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা মুখোমুখি সম্পর্ক, যেমন—পাড়ার ফুটবল ক্লাব। মাধ্যমিক গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের সম্পর্ক মুখোমুখি নয়, বরং নৈর্ব্যক্তিক,

পরোক্ষ এবং বাহ্যিক ; যেমন—প্রাদেশিক শিক্ষক সমিতি। এই দুই গোষ্ঠীর মাঝখানে হল অন্তর্বর্তী গোষ্ঠী, যার ব্যক্তিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই।

সংগঠনের মাত্রা অনুসারে গোষ্ঠীর স্তরভেদ আছে। প্রথম স্তরে আছে স্বতঃস্ফূর্ত গোষ্ঠী, যেমন—রাস্তার দুর্ঘটনা দেখে কৌতূহলী জনতার সমাবেশ; দ্বিতীয় স্তরে পূর্ব থেকে চিন্তা করে সংঘবদ্ধ হয়েছে এমন গোষ্ঠী, যেমন—ছাত্র-সংসদ; তৃতীয় স্তরে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অধিকতর স্থায়ী গোষ্ঠী, যেমন—শিক্ষা-সমিতি, চতুর্থ স্তরে অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্বসম্পন্ন গোষ্ঠী, যেমন—রাষ্ট্র, শহর ইত্যাদি। এছাড়া, গোষ্ঠীর অপর শ্রেণীবিভাগ হচ্ছে, অন্তর্গোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠী।

২। Institution 'প্রতিষ্ঠান' অর্থে হচ্ছে একটি সামাজিক কাঠামো যার মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্য পরিচালনা করা হয়; Institution 'অনুষ্ঠান' অর্থে সমাজের দ্বারা অনুমোদিত প্রচলিত কর্মপদ্ধতি বুঝায়। সংঘ হচ্ছে সাধারণ স্বার্থ অনুসরণের জন্য সামাজিক ব্যক্তির সংগঠন। সংঘ থাকলেই অনুষ্ঠান থাকবে; যেমন—বিদ্যালয় বলতে যদি বুঝি শিক্ষক ও ছাত্রদের সমাবেশ তবে সেটা সংঘ, আর যদি পঠন-পাঠন বা পরীক্ষা বুঝি তবে তা অনুষ্ঠান। সংঘ হল বস্তু, অনুষ্ঠান হল এর বিভিন্ন প্রথা ও পদ্ধতি। আচরণ হল সামাজিক আচরণের অভ্যাসলব্ধ পদ্ধতি বা 'অনুমোদিত অভ্যাস'। আচারের তুলনায় অনুষ্ঠান অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট।

৩। বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান আছে, যথা—পারিবারিক, যেমন—পরিবার। শিক্ষামূলক—যেমন—স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক, যেমন—ব্যাঙ্ক বা ইনসিওরেন্স কোম্পানী, শিল্প সম্পর্কীয়, যেমন—মিল, কারখানা; সরকারী, যেমন—পুলিস, বিচারালয়; সাংস্কৃতিক, যেমন—শিল্পালয়, ধর্মসম্পর্কীয়, যেমন—মন্দির, মসজিদ, গীর্জা; আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কীয়, যেমন—ফুটবল ক্লাব, বক্স, যেমন—ষাঁড়ে মানুষে লড়াই।

৪। বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক জীবনে সময়ে সময়ে জটিলতা দেখা দেয়। তবে ঐক্য ও সামঞ্জস্য সমাজ জীবনের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানই মানুষের প্রচেষ্টা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিবার

(The Family)

১। পরিবার কাকে বলে (What is a Family ?) :

সমাজ একটি বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী (Groups of men)। পরিবার সমাজের তুলনায় ক্ষুদ্রতর মানবগোষ্ঠী। বস্তুতঃ, গোষ্ঠী জীবনের প্রথম ধাপই হল পারিবারিক জীবন। জনমানবশূন্য কোন শূন্যতার মাঝখানে মানুষের জন্ম হয় না। প্রতিটি মানুষ একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে।

পরিবারের সংজ্ঞা

ম্যাকাইভার (*MacIver*) পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'পরিবার হল একটি গোষ্ঠী যা সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের জন্য সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়ী স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত হয়।'[1] পরিবার হল প্রাথমিক সামাজিক সংগঠন। কারণ পরিবার ছাড়া সমাজের অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় না। সমাজে পরিবারের অস্তিত্ব প্রাণিদেহে কোষের অস্তিত্বের সমতুল্য। পরিবার একটি প্রাথমিক গোষ্ঠী (primary group)। এটিকে প্রাথমিক গোষ্ঠীরূপে গণ্য করার কারণ, এটি এমন একটি গোষ্ঠী যার প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তা ও মুখোমুখি সম্পর্ক বর্তমান। এটিকে প্রাথমিক বলার আরও একটি কারণ হল, এটি হল প্রথম গোষ্ঠী যার মধ্যে থেকে শিশুর সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এই গোষ্ঠীতেই শিশুর জন্ম এবং এরই মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। পরিবার হল একটি সার্বিক প্রতিষ্ঠান। যেখানে মনুষ্য সমাজ সেখানেই পরিবারের অস্তিত্ব।

1. "The family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children."
—*MacIver and Page*: Society ; P. 238.

সন্তানোৎপাদনের একমাত্র স্বীকৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। পরিবার মানুষের জৈবিক প্রয়োজন সাধন করে এবং বংশগতি অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করে। অবশ্য জৈবিক প্রয়োজন ছাড়াও, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক, স্নেহ সম্পর্কীয়, আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত প্রভৃতি প্রয়োজনও পরিবার মিটিয়ে থাকে।

পরিবার সমাজের প্রাথমিক ধাপ

সাধারণতঃ পরিবারের আকার ক্ষুদ্র হয়। একক পরিবার (Individual family) গঠিত হয় স্বামী স্ত্রী এবং এক বা একাধিক সন্তান নিয়ে। সময় সময় স্বামী কিংবা স্ত্রীর আত্মীয়স্বজন তাদের সঙ্গে বসবাস করেন। কোন কোন সমাজে ভৃত্যদেরও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, ইংরেজী *Family* কথাটি এসেছে Famu'us শব্দ থেকে; যার অর্থ হল 'ভৃত্য' এবং 'famil a' শব্দটি বোঝাত 'ভৃত্যের সমষ্টিকে', যারা একই সংসারের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে 'family' বলতে কেবলমাত্র ভৃত্যদের সমষ্টিমাত্রকে না বুঝিয়ে সংসারের সব ব্যক্তিকেই বোঝাত এবং এদের সকলকেই সংসারের কর্তা অর্থাৎ পিতার সম্পত্তিরূপে গণ্য করা হত। আধুনিককালে পরিবার বলতে ভৃত্যদের আর সভ্যরূপে গণ্য করা হয় না, যদিও অনেক পরিবারেই ভৃত্য অন্তর্ভুক্ত হয়। পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদেরও আজকাল আর গৃহকর্তার সম্পত্তি বলে মনে করা হয় না। এইভাবে কালের গতিতে পারিবারিক গঠন ও ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে।

পরিবারের সঙ্গে বিবাহপ্রথাকে এক করে দেখা যুক্তিযুক্ত নয়, পরিবার একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন, বিবাহ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। বিবাহ একটি বৈধ সামাজিক অনুষ্ঠান যেটি একটি নরনারীকে তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার ও সন্তান উৎপাদনের সামাজিক অনুমোদন দান করে। বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই একটি নূতন পরিবারের আবির্ভাব ঘটে।

পরিবারের সবচেয়ে সরল রূপ হল এই একক পরিবার। পরিবারের জটিল রূপও চোখে পড়ে বহু বিবাহকারী পরিবারে (Polygamous Family) বা যৌথ পরিবারে (Joint Family)। যদিও বর্তমানে বহু যৌথ পরিবার আছে তবুও আধুনিক সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে এই

যৌথ পরিবারের ভাঙন ধরেছে এবং বর্তমানে একক পরিবার গঠনের মনোভাবই প্রবল।

একই হোক বা যৌথ হোক, পরিবার হল সমাজ-জীবনের প্রথম ধাপ। কালের গতিতে পারিবারিক জীবনের নানারকম পরিবর্তন ঘটলেও, সমাজ-জীবনে পরিবারের ভূমিকার গুরুত্ব বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় নি। পরিবারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক। গিস্বার্ট (*Gisbert*) বলেন, "এর বিভিন্ন সভ্যদের মধ্যে সাধারণতঃ যে অন্তরঙ্গতা ও স্নেহ বিরাজ করে, তাই হল এর স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্য এবং কর্মের সহযোগিতার ভিত্তি; এমন কি যখন মতের অনৈক্য এবং বিবাদ দেখা দেয় তখন অনেক সময় পরিবারের সভ্যদের মধ্যে স্নেহের তীব্রতা হচ্ছে তার কারণ।'[1]

পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

ম্যাকাইভার (*MacIver*) পরিবারের পক্ষে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা—(১) সহবাসের সম্পর্ক (a mating relationship), বিবাহ কিংবা অন্য কোন আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা (a form of marriage or other institutional arrangement)—যে ব্যবস্থা অনুযায়ী এই সহবাস সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত এবং রক্ষিত হয়, (২) নামকরণের ব্যবস্থা এবং বংশ-গণনার পদ্ধতি (a system of nomenclature, involving also a mode of reckoning descent), (৩) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (economic provision) যা সন্তানের জন্ম ও প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজন এবং (৪) একটি সাধারণ বাসস্থান (a common habitation)।

২। পরিবারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য (Distinctive Features of the Family Organization):

সমাজ-জীবনে ছোট-বড় নানারকম সামাজিক সংগঠনের (organization) অস্তিত্ব আছে। কিন্তু পরিবারের তুলনায় কোনটিরই সামাজিক

1. *P. Gisbert*: Fundamentals of Society, Page 95.

গুরুত্ব বেশী নয়। পরিবারের প্রভাব সমগ্র সমাজ-জীবনের উপর পতিত হয় এবং পারিবারিক পরিবর্তন সমগ্র সমাজ-জীবনের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটায়। পরিবারের মধ্যে ভাঙন ধরলে সমস্ত সমাজ-জীবনের ভাঙন ধরতে পারে।

ম্যাকাইভার এবং পেজ (*MacIver and Page*) 'Society' গ্রন্থে পরিবারের নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলেছেন। যথা—

(ক) বিশ্বজনীনত্ব (Universality): সমাজ-জীবনের যত রকম রূপ আছে, পরিবার হল সংঘবদ্ধ জীবনের সবচেয়ে বিশ্বজনীন রূপ। সব সমাজেই এবং সমাজ বিকাশের প্রত্যেক স্তরেই পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে। এমন কি নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যেও পারিবারিক জীবনের রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

(খ) আবেগময় ভিত্তি (Emotional Basis): বংশধারা সংরক্ষণের যে জৈবিক প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য তার উপরই বিশেষ করে পরিবারের ভিত্তি। আমাদের দৈহিক প্রবৃত্তি, মানসিক আবেগ এবং প্রবণতার প্রধান কেন্দ্র পরিবার। যেমন—সহবাস ও সন্তান উৎপাদন প্রবৃত্তি, সন্তানের প্রতি মাতাপিতার স্নেহ ও যত্ন; এ ছাড়াও আছে ভালবাসা, আবেগ, অনুরাগ, মায়া, মমতা নিজের অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি।

(গ) গঠনমূলক প্রভাব (Formative Influence): সমাজ-জীবনের প্রাথমিক রূপ হল পরিবার। পারিবারিক পরিবেশেই মানুষ প্রথম বর্ধিত হয় এবং মানুষের জীবনের উপর পরিবারের প্রভাবই সর্বাধিক। দেহ ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেই পরিবার সামাজিক জীবের চরিত্রগঠন করে থাকে।

(ঘ) সীমিত আকার (Limited Size): পরিবার হল সবচেয়ে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী-জীবন। সমাজ-জীবনের অন্যান্য সংগঠনের তুলনায় পরিবার সবচেয়ে ক্ষুদ্র, কারণ কতকগুলি জৈবিক প্রয়োজনের দ্বারা পরিবারের সংগঠন নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট হয়। একক পরিবার পরিবারের সরলতম রূপ। স্বামী-স্ত্রী এবং এক বা একাধিক সন্তান নিয়ে একক পরিবার গঠিত হয়।

(ঙ) **সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র** (Nuclear Position in the Social Structure) : অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র হল পরিবার। বস্তুতঃ, সমাজ-জীবন বহুলাংশে পরিবারেরই সমষ্টি।

(চ) **সভ্যদের দায়িত্ব** (Responsibility of the Members) : অন্য কোন রকম সংঘ বা সংগঠনের তুলনায় পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক খুবই নিবিড় এবং অন্তরঙ্গ। মানুষ প্রয়োজনে দেশের জন্য যুদ্ধ করে এবং প্রাণ বিসর্জন দেয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ পরিবারের জন্য সমস্ত জীবন ধরেই পরিশ্রম করে। পরিবার-জীবনেই নরনারীকে কেবলমাত্র নিজের প্রয়োজন ছাড়াও অপরের জন্য কঠিন কাজ করতে হয় এবং কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।

(ছ) **সামাজিক নিয়ম-কানুন** (Social Regulation) : সামাজিক বিধিনিষেধ এবং 'আইন-সম্পর্কীয় বিধি' পরিবার জীবনকে সুরক্ষিত করে, পরিবারের বিবাহ-প্রথা নিয়ন্ত্রিত করে। যদিও বিভিন্ন সমাজে এই বিবাহ-প্রথা বিভিন্ন রকম, তবু কোন একটি প্রথাকে মেনে চলতেই হয়।

(জ) **পরিবারের স্থায়িত্ব এবং অস্থায়িত্ব** (Its Permanent and Temporary Nature) : পারিবারিক সংগঠন যদিও স্থায়ী এবং বিশ্বজনীন তবু সংঘ হিসেবে পরিবার হল সবচেয়ে স্বল্প-স্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল। একই পরিবারের মধ্যে অসংখ্য পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। যে পুরুষ ও নারীকে কেন্দ্র করে একটি পরিবারের শুরু, তাদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তানদের কেন্দ্র করে নতুন পরিবার জন্মলাভ করছে। সে কারণে আমরা যখন কোন প্রাচীন পরিবারের কথা উল্লেখ করি তখন বুঝতে হবে যে, একাধিক পরিবারের বংশ পরম্পরায় তার স্থায়িত্ব বজায় রয়েছে।

৩। পরিবারের শ্রেণীবিভাগ (Types of Family) :

যদিও পরিবার একটি বিশ্বজনীন সংগঠন এবং সব সমাজে পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে, তবু পরিবারের গঠন বা রূপ সব দেশের সব সমাজে এক রকম নয়। দেশভেদে, সমাজভেদে এই পরিবারের বিভিন্ন রূপ বা গঠন দেখা যায়।

নানাদিক থেকে এই পরিবারের শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য এরূপ কয়েকটি শ্রেণীবিভাগের আলোচনা করা হচ্ছে :

(ক) **এক বিবাহকারী ও বহু-বিবাহকারী** (Monogamous and Polygamous): যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এক-বিবাহকারী পরিবারে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক একত্রে বসবাস করে। অর্থাৎ এক-বিবাহকারী পরিবারে যৌন সম্পর্ক একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বহু বিবাহকারী পরিবারে যৌন সম্পর্ক একাধিক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বহু-বিবাহ প্রথা এস্কিমো জাতিদের মধ্যেই খুব দেখা যায়। বহু বিবাহকারী পরিবার দুপ্রকারের হতে পারে—বহুপত্নীক (polygyny) এবং বহু-স্বামীক (polyandry)। বহুপত্নীক পরিবারে একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করে। যেসব সমাজের পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, সাধারণতঃ সেই সব সমাজেই এক-পুরুষের বহু স্ত্রী গ্রহণের প্রথা আছে। বহু-স্বামীক পরিবার দু-প্রকারের হতে পারে—সহোদর ভ্রাতৃক (fraternal) এবং অ-সহোদর ভ্রাতৃক (non-fraternal)। বহু-স্বামীক পরিবারের স্বামীরা যদি সহোদর ভ্রাতা হয় তবে সে পরিবারকে সহোদর-ভ্রাতৃক পরিবার বলে। আর যদি স্বামীরা সহোদর ভ্রাতা না হয়, তাহলে অ-সহোদর ভ্রাতৃক পরিবার বলা হয়। মহাভারতে দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহ সহোদর ভ্রাতৃক পরিবারের উদাহরণ। তিব্বত, সিকিম, লাডাক প্রভৃতি অঞ্চলে বর্তমানে সহোদর-ভ্রাতৃক পরিবারের অস্তিত্ব দেখা যায়। মালাবার অঞ্চলে অ-সহোদর-ভ্রাতৃক পরিবারের অস্তিত্ব এক সময় বিশেষ প্রচলিত ছিল বলে শোনা যায়।

এক-বিবাহকারী ও বহু বিবাহকারী

তবে এক-বিবাহকারী পরিবারই (monogamous family) বর্তমান কালে বিশেষভাবে প্রচলিত। শিশু-উৎপাদন এবং শিশু-প্রতিপালন—পরিবারের এ দুটি প্রধান কাজ এক-বিবাহকারী পরিবারেই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

(খ) **পিতৃবংশানুক্রমিক এবং মাতৃবংশানুক্রমিক** (Patrilineal and Matrilineal family): বংশ গণনার পদ্ধতি অনুসারে পরিবারের

পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। পিতার বংশ অনুসারে বংশ গণনা করা হয় যে পরিবার তাকে পিতৃবংশানুক্রমিক (patrilineal) পরিবার এবং মাতার বংশানুসারে বংশ গণনা করা হয় যে পরিবার তাকে মাতৃবংশানুক্রমিক (matrilineal) পরিবার বলে।

পিতৃবংশানুক্রমিক ও মাতৃবংশানুক্রমিক

(গ) পিতৃবাসস্থানিক এবং মাতৃবাসস্থানিক (Patriolocal and Matriolocal): বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রীর বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে পরিবারের এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। বিবাহের পর স্বামী যদি নিজের পিতার গৃহে স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করে তাহলে তাকে পিতৃবাসস্থানিক (patriolocal) পরিবার বলে এবং যদি বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর মাতার গৃহে বসবাস করে তাহলে তাকে মাতৃবাসস্থানিক (matriolocal) পরিবার বলে।

পিতৃবাসস্থানিক এবং মাতৃবাসস্থানিক

(ঘ) 'পিতৃকর্তৃক' এবং 'মাতৃকর্তৃক' (Patriarchal and Matriarchal): পরিবারের কর্তৃত্ব কার উপর ন্যস্ত তারই ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়। পরিবারের কর্তৃত্ব যদি পিতার হাতে থাকে, তাহলে সেই পরিবারকে 'পিতৃকর্তৃক' (patriachal বা father-right family) এবং যদি মাতার হাতে ন্যস্ত থাকে তাহলে 'মাতৃকর্তৃক' (matriarchal বা mother-right family) বলা হয়।

'পিতৃকর্তৃক এবং 'মাতৃকর্তৃক'

(ঙ) একক এবং যৌথ (Single or Individual Family and Joint Family): সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবারের পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। একক পরিবার (Individual family) গঠিত হয় স্বামী, স্ত্রী এবং এক বা একাধিক সন্তান নিয়ে। যৌথ পরিবারে বিবাহিত পুত্র (অথবা কন্যারা) স্ত্রীর (অথবা স্বামীর) সঙ্গে একই মাতাপিতার কর্তৃত্বাধীন এক সংসারে বাস করে। মাতাপিতার মৃত্যুর পর হয় তারা এক একটি ভিন্ন ভিন্ন একক পরিবার গঠন করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যেগুলি পরে আবার এক একটি যৌথ পরিবারে রূপান্তরিত হয়, অথবা, একই পরিবারের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম বা বিধি অনুসরণ করে বসবাস করতে থাকে।

একক এবং যৌথ

৪। পরিবারের উৎপত্তি (Origin of the Family) :

মর্গ্যান (*L. H. Morgan*), লাবক (*J. L. Lubbock*), ফ্রেজার (*J. G Frazer*) এবং সাম্প্রতিককালে ব্রিফ্যাল্ট (*R. Briffault*) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা পরিবারের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, আদিম সমাজে পরিবার বা বিবাহ প্রথা বলে কিছু ছিল না। পশুর মত নরনারী ইচ্ছা হলেই নিজেদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করত। কোন সংযম ছিল না, কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, বা কোন সামাজিক বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হত না। কখনও বা একদল নরনারীর মধ্যে এই যৌন সম্পর্ক সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু তাহলেও তাদের মধ্যে কোন স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হত না। পূর্বোক্ত সমাজবিজ্ঞানীদের এই মতবাদ স্বীকার করে নিলে, আমাদের এই ধারণা করতে হয় যে পরিবার কোন বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান নয়, সামাজিক ক্রমবিকাশের এক বিশেষ স্তরে পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছে। পারিবারিক জীবন-যাপন মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য নয় এবং পারিবারিক জীবন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক জীবন নয়—একথাও স্বীকার করতে হয়।

অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্ক

এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ আদিম সমাজে নরনারীর এই অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোন তথ্য উপস্থাপন করতে পারে নি। তবে বর্তমানকালেও কোন কোন দেশের সমাজের নরনারীর মধ্যে কতকগুলি প্রচলিত রীতি দেখে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে এগুলি আদিম যুগে মানব সমাজের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার অস্তিত্বের পরিচয়বাহক। উৎসব উপলক্ষে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, পত্নী বিনিময় এবং পত্নীর মাধ্যমে অতিথি আপ্যায়ন এই সকল রীতির উদাহরণ। তাছাড়া, কোন কোন উপজাতির মধ্যে এখনও পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং কোন কোন উপজাতির মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে শ্রেণীবদ্ধকরণ রীতির প্রচলন (classificatory system of relationship) উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করে বলে তাঁরা মনে করেন। শ্রেণীবদ্ধকরণ রীতি অনুসারে অধিক বয়স্ক একশ্রেণীর লোককে

মতবাদের সমর্থনে তথ্য

পিতা বা মাতা, সমবয়স্ক এক শ্রেণীর লোককে স্বামী বা স্ত্রী, এক শ্রেণীকে ভ্রাতা বা ভগ্নী এবং একশ্রেণীকে পুত্র বা কন্যা বলে সম্বোধন করা হত।

মর্গ্যানের (*Morgan*) মতে এই যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার অবস্থা থেকেই বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছে এবং নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক-বিবাহকারী পরিবারের উদ্ভব ঘটেছে।

মর্গ্যানের মতবাদের সমালোচনা

মর্গ্যান (*Morgan*) প্রমুখ উপরিউক্ত সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তাঁদের মতবাদের সমর্থনে তাঁরা যেসব প্রমাণ উপস্থিত করেছেন সেগুলিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। প্রথমতঃ, অনেক সমাজে নরনারীর মধ্যে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা বা প্রাক্ বিবাহ যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার রীতি থাকলেও তা কোন স্থায়ী রীতি নয় এবং এই সব সমাজে বিবাহ পদ্ধতি স্থায়ী সামাজিক রীতি হিসেবে প্রচলিত। সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতাব অস্তিত্ব আদিম সমাজের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার নির্দেশক হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন উপজাতির মধ্যে পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতাও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে না, যেহেতু এই সব উপজাতির মধ্যে সুনির্দিষ্ট আকারে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রয়েছে। আবার কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে এরূপ অজ্ঞতার অস্তিত্বের বিষয়টি নিছক কাল্পনিক। তৃতীয়তঃ, শ্রেণীবদ্ধকরণ পদ্ধতিকে বহির্গোষ্ঠী বিবাহের 'exogamy) নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সামাজিক রীতিরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বহির্গোষ্ঠী বিবাহের নিয়ম মেনে চলার জন্য কোন ব্যক্তি হয়ত যেসব রমণীর মধ্যে বিবাহ 'নিষিদ্ধ' তাদের 'ভগ্নী'রূপে, যাদের সঙ্গে বিবাহ সমাজ-স্বীকৃত তাদের 'পত্নী'রূপে সম্বোধন করতে পারে। বস্তুতঃ, এই পৃথিবীর কোন সমাজই অবাধিত যৌন সম্পর্ককে স্থায়ী রীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে এমন খবর পাওয়া যায় না। তাছাড়া, বহু আদিম সমাজে, যেমন—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে নরনারীর অনিয়মিত যৌন সম্পর্কের কথা জানা যায় না। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের অস্তিত্ব এদের মধ্যে বরাবরই ছিল।

বস্তুতঃ, মানব সভ্যতার বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে পরিবারের উদ্ভব ঘটেনি, মানব সমাজের আদিতেই পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। পরিবার কোন কৃত্রিম সংগঠন নয়, পরিবার ব্যবস্থা মানব প্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক। সন্তানই পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি, সন্তানোৎপাদনের জন্যই নরনারী বিবাহ করে এবং পারিবারিক জীবন যাপন করে। এ ছাড়াও যৌন আবেগ চরিতার্থ করার জন্য, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব লাভের জন্য, সন্তানের মাধ্যমে বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার জন্য, বার্ধক্যের সময় সেবা শুশ্রূষার জন্য মানুষ পরিবার গঠন করে। এ ছাড়াও আছে এমন একজন জীবনসাথী লাভের আকাঙ্ক্ষা, যে জীবনের সুখদুঃখে, ঘাত-প্রতিঘাতে এবং সাফল্য বা ব্যর্থতায় সমান অংশীদার হবে। পারিবারিক জীবনের মাধ্যমেই মানুষের ভালবাসা স্নেহ, মায়া, মমতা ও অনুরাগ লাভের ইচ্ছার পরিপূরণ ঘটে। স্বামী-স্ত্রী স্নেহ, ভালবাসা ও বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধনে বাধা পড়ে এবং পরিবারে সন্তানের আবির্ভাব এই বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে। বস্তুতঃ, মানুষের জটিল বাসনা এবং সচেতন প্রয়োজন বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে কোন-না-কোন এক ধরনের পারিবারিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে।

পরিবারের উদ্ভব কোন ঐতিহাসিক ঘটনা নয়

মানুষের কামনা ও প্রয়োজন থেকেই পরিবারের উদ্ভব

৫। পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি (Natural Basis of the Family):

পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি কি, এই প্রশ্ন সাধারণতঃ করা হয়ে থাকে—স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাসা, তাঁদের যৌন কামনা মেটাবার আকাঙ্ক্ষা না যৌন সম্পর্কের ফলে জাত সন্তানের যত্ন ও লালন পালন, কোন্‌টি পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি?

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাসা পারিবারিক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। স্বামী-স্ত্রীর গভীর ভালবাসা ও বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধন পারিবারিক জীবনকে শান্তিপূর্ণ ও সুখময় করে তোলে। কিন্তু সে কারণে এই

ভালবাসাকেই পারিবারিক জীবনের স্বাভাবিক ভিত্তি বলা চলে না। স্বামী-স্ত্রীর যৌন কামনার পরিতৃপ্তিও পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি হতে পারে না, যেহেতু এই জাতীয় কামনা খুবই ক্ষণস্থায়ী। এত ক্ষণস্থায়ী ভিত্তির উপর পারিবারিক জীবনের সুদৃঢ় সৌধ নির্মিত হতে পারে না, কাজেই শেষোক্ত বিকল্পই গ্রহণযোগ্য, শিশুর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণই পারিবারিক জীবনের স্বাভাবিক ভিত্তি।

শিশুই পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি

উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবন একান্তই স্বাভাবিক। সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিপালন অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। শিশু যখন প্রথম জন্মগ্রহণ করে তখন সে একান্ত অসহায়। মাতাপিতার যত্ন ছাড়া তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কি কারণে মাতাপিতার স্নেহ এবং আবেগ সন্তানের জন্য ধাবিত হয় তার মনস্তত্ত্বমূলক আলোচনার কথা বাদ দিলেও একটা জিনিস অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে যে পারিবারিক জীবনের মাধ্যমেই সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন এবং বিকাশ যথাক্রমে সম্ভব হয়। সন্তানের দায়িত্ব মাতা ও পিতার যৌথ দায়িত্ব এবং একেই বলা যেতে পারে পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি (The natural basis of the family)। কি রকম পরিবারের মাতাপিতার পক্ষে এ দায়িত্ব সন্তোষজনকভাবে পালন করা সম্ভব, সে প্রশ্ন এখানে স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। একক পরিবারেই (Monogamic Family) সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন প্রভৃতির দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা যায়। মাতাপিতা তাঁদের সবটুকু আন্তরিকতা দিয়ে এ দায়িত্ব পালনে ব্রতী হন। যদিও সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিপালনের দায়িত্ব মায়ের উপরই বেশী এসে পড়ে, তবু এক মার পক্ষে এই কঠিন দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়; সেহেতু পিতার সহযোগিতা একান্তই প্রয়োজন। সুতরাং একক পরিবার যে মানুষের প্রাথমিক ও স্বাভাবিক সংঘবদ্ধ জীবন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সন্তান প্রতিপালন পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি

৬। পারিবারিক জীবন কি কৃত্রিম, না স্বাভাবিক? (Is Family Artificial or Natural?):

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্তে আসাই স্বাভাবিক যে, পারিবারিক জীবন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক জীবন। কিন্তু অনেকে এ প্রশ্ন তুলেছেন যে, পারিবারিক জীবন কি কৃত্রিম, না স্বাভাবিক?—এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে নানারকম মতভেদ দেখা দিয়েছে। যথা—

(ক) পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বস্তুবাদীদের মতামত (The Materialists' View of the Family): বস্তুবাদীরা মনে করেন যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক সে কেবল দৈহিক সম্পর্ক। পুরুষ এবং নারী দৈহিক ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করার জন্যই একত্রে বসবাস করে এবং কোন কারণে যদি এ সম্পর্কের ভাঙন ধরে তাহলে স্বামী-স্ত্রীর একত্র বসবাস করার কোন সার্থকতা নেই। সুতরাং পারিবারিক জীবন একটি কৃত্রিম সংঘবদ্ধ জীবন। সন্তান বা শিশুকে কেন্দ্র করেই যে পরিবারের অস্তিত্ব, বস্তুবাদীরা তা মনে করে না। কোন পরিবারে শিশু জন্মগ্রহণ নাও করতে পারে। বস্তুতঃ, মূল পরিবার কথাটির সঙ্গে শিশুর কোন সম্পর্ক নেই।

বস্তুবাদীদের অভিমত

'*Famulus*' কথাটির অর্থ হল গৃহ-ক্রীতদাস (Domestic Slave) এবং '*Familia*' কথাটির অর্থ হল পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ক্রীতদাসের সমষ্টি। পরবর্তীকালে পরিবার বলতে কেবলমাত্র ক্রীতদাসকেই বোঝাত না, পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তিকেই বোঝাত এবং সকলেই গৃহকর্তার সম্পত্তি। বাইবেলে ঈশ্বরের যে দশটি আদেশের কথা উল্লিখিত হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে—"তোমার প্রতিবেশীর গৃহ তুমি কামনা করো না, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রী তুমি কামনা করো না, তার পরিচারক বা পরিচারিকা, তার বলদ, তার গাধা বা প্রতিবেশীর কোন কিছুই পাবার ইচ্ছা করো না।" এই দশটি আদেশের মধ্যে শিশুর কোন উল্লেখ নেই।

অনেকেই সেই পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এখনও পরিবারকে বিচার করেন। তাঁদের মতে পরিবার ক্রীতদাসের সমষ্টি বা গৃহকর্তার সম্পত্তি না হতে পারে তবু পরিবার কৃত্রিম সংগঠন ছাড়া আর কিছুই নয়। এঁদের মতে বিবাহের

মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত মাধুর্য বা পবিত্রতা নেই; বিবাহ হল একটা কৃত্রিম চুক্তি; সন্তানের জন্ম পারিবারিক জীবনে একটি আকস্মিক ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক মূলতঃ দৈহিক সম্পর্ক, তার বেশী কিছু নয়। সুতরাং পারিবারিক জীবন মানুষের স্বাভাবিক জীবন নয়। মানুষের স্বভাবের মধ্যে পরিবার-জীবনের ভিত্তি নিহিত নেই।

(খ) পরিবার সম্পর্কে ভাববাদীদের মতামত (The Idealists' View of the Family): ভাববাদীরা বস্তুবাদীদের মতামত গ্রহণ করেন না।

ভাববাদীদের অভিমত

ভাববাদীরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভালবাসা বা দাম্পত্য অনুরাগ তাকে দৈহিক কামনার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন না। ভালবাসা এবং দৈহিক কামনা এক বস্তু নয়: বার্ট্রাণ্ড রাসেল (*Bertrand Russell*) ভাববাদী না হয়েও তাঁর '*Marriage and Morals*' গ্রন্থে বলেছেন—'একাকী বেঁচে থাকার জন্যে প্রকৃতি মানুষকে সৃষ্টি করেনি, যেহেতু মানুষ অপর একজনের সহায়তা ভিন্ন প্রকৃতির জৈবিক উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে না এবং সভ্য মানুষেরা তাদের যৌন প্রবৃত্তিকে ভালবাসা ছাড়া কখনও সম্পূর্ণভাবে মেটাতে পারে না।'[1] মানুষের সমগ্র দৈহিক এবং মানসিক সত্তা যদি এই সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে তবে তার যৌন প্রবৃত্তি কখনও পরিতৃপ্ত হয় না।

ভাববাদীরা মনে করেন যে, দৈহিক কারণে নরনারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেও ভালবাসা তাদের এক উচ্চ পবিত্র স্তরে উন্নীত করে। এই ভালবাসা নরনারীকে দৈহিক দিক থেকে পৃথক রেখেও আধ্যাত্মিক দিক থেকে অভিন্ন করে। পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, সহানুভূতি, সমবেদনাবোধ তাদের পরস্পরকে পরস্পরের খুব কাছে নিয়ে আসে, যার ফলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক হয়ে ওঠে খুব নিবিড় ও অন্তরঙ্গ। দৈহিক লালসার অন্ধ আবেগ দূরীভূত হয়ে

1. "Nature did not construct human beings to stand alone since they cannot fulfil her biological purpose except with the help of another and civilised people cannot fully satisfy their sexual instinct without love."

—*Bertrand Russell*: Marriage and Morals; Page 99.

পারস্পরিক সহায়তা, আত্মোৎসর্গ ও সহযোগিতার একই উদ্দেশ্য সাধনের এক আধ্যাত্মিক বন্ধনে তারা বাঁধা পড়ে।

ভালবাসাকে এই আধ্যাত্মিক দিক থেকে বিচার করলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হয়ে ওঠে খুবই নিবিড়। দুটি ব্যক্তির সম্পর্ক যদি কেবলমাত্র দৈহিক হয় তাহলে সে সম্পর্ক কখনও স্থায়ী হয় না। এরূপ সম্পর্ক কখনও দুটি জীবের মধ্যে স্থায়ী বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে না এবং তার দ্বারা কোনও সাধারণ উদ্দেশ্যও সাধিত হতে পারে না। পারস্পরিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে যখন দুটি নরনারী মিলিত হয় তখনই তাদের সম্পর্ক হয় স্থায়ী এবং স্থায়ী সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য উভয়কেই কতকগুলি শর্ত মেনে চলতে হয়। স্বামী-স্ত্রীর এরূপ স্থায়ী সম্পর্ক পারিবারিক সংগঠনের ভিত্তি।

পরিবারের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় যখন স্বামী-স্ত্রী যথাসময়ে হয় সন্তানের মাতা ও পিতা। সন্তানকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রার সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। সারজেণ্ট (*Sargent*)-এর মতে একটি শিশুর উপস্থিতি মাতাপিতাকে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসতে পারে ; কারণ এ সময় একই বস্তুতে তাদের ভালবাসা ও অনুরাগ কেন্দ্রীভূত হয়।[1]

সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণই পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি। তবু এমন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, সময়ের দিক থেকে সন্তান তো আগে নয়, দুটি নরনারীর বিবাহিত জীবনই আগে, তারপর তাদের মিলনেই তো সন্তান উৎপন্ন হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় বিবাহের পরে হয়ত কোন সন্তানই হল না।

সন্তানই স্বামী-স্ত্রীর সুদৃঢ় বন্ধন

সুতরাং স্বাভাবিকভাবে ধারণা করা যেতে পারে যে নরনারীর আর্কষণই মুখ্য এবং এই আকর্ষণই পরিবারের ভিত্তি। অবশ্য নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ বিবাহিত জীবনের স্বাভাবিক ভিত্তি—একথা অস্বীকার করা যায় না। তবু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা

1. "It is sometimes said and not without evidence that the presence of a child can bring parents closer to each other because they now have a common object for their love and interest".

—*W. E. Sargent* : The Psychology of Marriage and Family Life ; Page 95-96

যাবে যে সে আকর্ষণকে কোন মতেই পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে না। দুটি পুরুষের মধ্যে বা কোন বৃদ্ধ ও শিশুর মধ্যেও আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে। উভয়ের সাহচর্য হয়ত খুবই মধুর, তবু এদের কেন্দ্র করে কোন পরিবারের উদ্ভব হতে পারে না। সন্তানের সম্ভাবনাই বিবাহকে অন্য যে-কোন বন্ধন থেকে আলাদা করে রেখেছে।

জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের অভিমত

জীববিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান থেকেও সমর্থন পাওয়া যায় যে, পিতৃত্বের এবং মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষাই নরনারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির মাধ্যমেই প্রকৃতি নরনারীকে দিয়ে পৃথিবীতে জীবন প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখে। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের সহজাত প্রবৃত্তি নরনারীর জীবনে বিলম্বে দেখা দেয়। কিন্তু যখন এ প্রবৃত্তির আবির্ভাব ঘটে, তখন সেই প্রবৃত্তি স্বাভাবিকভাবেই পরিতৃপ্তি খোঁজে। যদি কোন কারণে নরনারী এ প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করতে না পারে তাহলে এ প্রবৃত্তিকে দমন করার ফলে তাদের জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে, যে জন্য অনেক ক্ষেত্রে নরনারীকে অস্বাভাবিক ভাবে এ প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করতে হয়। সুতরাং সন্তান উৎপাদন, তার যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং এরই উপর পরিবারের ভিত্তি।

৭। সুপ্রজনন বিজ্ঞান (Eugenics):

মাজ ও সুপ্রজনন-বিজ্ঞান

পরিবার-জীবনের স্বাভাবিক সুদৃঢ় ভিত্তি হচ্ছে সন্তান। সুতরাং সুস্থ সন্তান জন্মগ্রহণ করার ফলেই পরিবার জীবনের ভিত্তি স্থায়ী হতে পারে। সুস্থ সন্তানের জন্মের জন্য কি কি সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করে সুজনন বিজ্ঞান (Eugenics)। এই বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম অনুভব করেছিলেন গ্যালটন (*Galton*), যদিও পরে এই বিষয়টি জ্ঞানের একটি প্রয়োজনীয় শাখারূপে সকলের স্বীকৃতি লাভ করেছিল। গ্রীক মনীষী প্লেটো (*Plato*) সুস্থ সন্তান প্রজননের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যে শিশু জন্ম থেকে রুগ্ন ও অসুস্থ, মাতাপিতার স্বাভাবিক যত্ন সত্ত্বেও অনেক সময়

তার বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। কিন্তু বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের এত অধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে যে, উপযুক্ত চিকিৎসা এবং সেবার ফলে অনেক অসুস্থ সন্তানকেও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে সাবালক করে তোলা সম্ভব হয়. সন্তানকেও অসুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার কোন সার্থকতা নেই, যেহেতু তার ফলে সমস্ত জাতিটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এজন্য শোনা যায়, প্রাচীনকালে অনেক ক্ষেত্রে অসুস্থ সন্তানকে অনাবৃত অবস্থায় রেখে তাকে মরতে দেওয়া হত। কিন্তু এ ব্যবস্থাকে সমর্থন করা যায় না।

কারও কারও মতে অসুস্থ ও দুর্বল সন্তান বাঁচিয়ে রাখলে সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে

বর্তমান যুগে দুর্বল ও শারীরিক ত্রুটিযুক্ত সন্তানদের বাঁচিয়ে না রাখার প্রাচীন প্রথা সমাজ অনুমোদন করে না। মানুষের মানবতাবোধ ও ক্রমবর্ধমান নৈতিক চেতনা এই জাতীয় প্রথার বিরোধী। বর্তমান কালে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সমধিক উন্নতি সাধিত হওয়াতে শারীরিক ত্রুটিযুক্ত ও অসুস্থ সন্তানদের বাঁচিয়ে রেখে তাদের সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। অনেকে মনে করেন শারীরিক ত্রুটিযুক্ত সন্তানদের বাঁচিয়ে রেখে কোন লাভ নেই, যেহেতু তাদের বাঁচিয়ে রাখার ফলে সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁরা মনে করেন, এই জাতীয় সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় দুর্বল ও অসুস্থ সন্তান উৎপাদন করে এবং তার ফলে সমাজের জাতিগত উৎকর্ষ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে এবং সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

উপরিউক্ত অভিমতের সমালোচনা

কিন্তু এই জাতীয় আশংকা কতখানি যুক্তিসংগত বলা কঠিন। প্রথমতঃ, ইতিহাসই প্রমাণ করে যে দুর্বল ও শারীরিক ত্রুটিযুক্ত সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখলে সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে না। দ্বিতীয়তঃ, সন্তান মাতাপিতার বাঞ্ছিত গুণগুলি কী পরিমাণে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতে পারে সেই বিষয়টি এখনও সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয় নি। তৃতীয়তঃ, মাতাপিতার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করার উপরই ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামাজিক সাফল্য নির্ভর করে না। চতুর্থতঃ, মানুষের প্রয়োজনীয় গুণগুলি শুধুমাত্র বংশগতির উপর নির্ভর করে না। পঞ্চমতঃ, কোন মানুষ তার বয়স্ক জীবনে কী হয়ে উঠবে তা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। বস্তুতঃ অনেক

খ্যাতনামা নরনারী শিশুকালে রুগ্ন ও দুর্বল ছিল। পঞ্চমতঃ, সমাজের সভ্যদের শারীরিক শক্তি ও কর্মক্ষমতা শুধুমাত্র বংশগতির দ্বারা নির্ধারিত হয় না, উন্নত জীবনযাত্রা প্রণালীর উপরও নির্ভর করে।

পূর্বোক্ত সমালোচনার সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হলেও, একথা স্বীকার্য যে, সমাজের জাতিগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করার জন্য, সুস্থ সন্তানের জন্মদানে উৎসাহদান ও অসুস্থ সন্তানের জন্মরোধ করার প্রয়োজন আছে। সমাজের অগ্রগতির জন্যই সুস্থ সন্তানের জন্মগ্রহণ বা সুপ্রজননের একান্ত আবশ্যকতা আছে।

সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের দুটি দিক আছে—সদর্থক ও নঞর্থক। এর সদর্থক দিক হল সুস্থ ও সুন্দর সন্তান যাতে জন্মায় সে বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া। এর নঞর্থক দিক হল অসুস্থ সন্তান যাতে না জন্মায় তার ব্যবস্থা করা। যেসব নরনারী শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে অসুস্থ, সংক্রামক রোগাক্রান্ত তাদের বিবাহ অবাঞ্ছিত ও বন্ধ করা প্রয়োজন। সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ভবিষ্যতে এসব সমস্যার প্রতি যে বেশী আলোকপাত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৮। বিবাহ (Marriage) :

প্রফেসার ম্যাকেঞ্জি (*Prof. Mackenzie*) বলেন, "পরিবারের প্রাথমিক ভিত্তির একান্ত প্রয়োজনীয়তার জন্যই বিবাহ প্রথার প্রতি পবিত্রতা এবং স্থায়িত্ব আরোপ করার যথেষ্ট কারণ আছে।"[1] বিবাহ-প্রথার উপরই পরিবার নির্ভরশীল। নরনারীর সহজাত দৈহিক কামনাকে বিবাহ একটি স্থায়ী, সুদৃঢ় ও পবিত্র বন্ধনের মধ্যে রূপ দান করে। বিবাহিত জীবনে নরনারী পারস্পরিক ভালবাসার মাধ্যমে নিজেদের বিকশিত করতে পারে। দৈহিক কামনার

1. "The supreme importance of the primary basis of the family gives a sufficient ground for attaching a certain sanctity and permanence to the institution of marriage."

—*Mackenzie* : Outlines of Social Philosophy ; Page 83.

বিকৃতি মানুষের জীবনে নৈতিক অধঃপতনের সূচনা করে। বিবাহের পবিত্র বন্ধনই এই কামনাকে ভালবাসা ও পারস্পরিক বন্ধুত্বে রূপান্তরিত করে এবং পশু-প্রবৃত্তিকে বিদূরিত করে নরনারীর মনে এক আধ্যাত্মিক মনোভাবের সৃষ্টি করে। বিবাহ-প্রথা একটি সামাজিক রীতি, সমাজের কল্যাণের জন্যই সমাজ নরনারীর এই মিলনকে স্বীকার করে নেয়।

বিবাহ ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের দিক থেকেই একটি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য নরনারীর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। অবদমিত যৌন-কামনা অনেক সময় অসুস্থতা এবং মানসিক বিকৃতির সৃষ্টি করে। মানুষের যৌন আবেগ যদি বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় এবং তার সৌন্দর্যবোধ, নীতিবোধ ও ধর্মবোধের সঙ্গে যুক্ত না থাকে তাহলে মানুষ, মানুষ হয়েও পশুতে পরিণত হয়। সমাজের কল্যাণের জন্যই এই বিবাহ-প্রথার একান্ত প্রয়োজন। বিবাহ নরনারীর মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করে—মধুরতম সাহচর্য সৃষ্টি করে। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নরনারী একই সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার হয়, একই আশা-আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়, একই সন্তানের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। উভয়ের মনোভাবের এই সাদৃশ্য এমন একটি মধুর সম্পর্কের সৃষ্টি করে যা অন্য কোন রকম সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। সকল সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিবারের প্রভাবই সমাজের উপর সমধিক। বিবাহ একটি নৈতিক অনুষ্ঠান। বিবাহ কেবলমাত্র দুটি নরনারীর মধ্যে একটি নিছক চুক্তি নয়। পারস্পরিক ভালবাসা, সহানুভূতি, সমবেদনাবোধ ও সহযোগিতা জৈবিক কামনাকে আধ্যাত্মিক এবং পবিত্র বন্ধনে উন্নীত করে। বিবাহের প্রধান লক্ষ্য দৈহিক মিলনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বন্ধন সৃষ্টি করা। সুতরাং কি ব্যক্তির দিক থেকে, কি সমাজের দিক থেকে, বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বার্ট্রাণ্ড রাসেল (*Bertrand Russell*) বলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, দুটি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক যদি কিছু থাকে সে হল বিবাহ। এ পর্যন্ত যদি সেই বিষয়টি উপলব্ধি করা না হয়ে থাকে, তাহলে বিশেষ করে এই কারণে যে, স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পর

সমাজ জীবনে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা

পরস্পরকে পুলিস বলে মনে করেছে। বিবাহ যদি তার সম্ভাবনাকে লাভ করতে চায় তাহলে স্বামীকে ও স্ত্রীকে বোঝাবার জন্য অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে আইন যাই হোক না কেন, তাদের ব্যক্তিগত জীবনে তারা স্বাধীন।"[1]

৯। বিবাহ-বিচ্ছেদ (Divorce):

যদিও বিবাহের স্থায়িত্ব একান্তই বাঞ্ছনীয় তবু কোন কোন বিশেষ সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে তিন ধরনের মতামত দেখা যায়: যথা,

(ক) রক্ষণশীল মনোভাব (Conservative View): এ মনোভাব অনুযায়ী নরনারীর বিবাহ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আদর্শ পরিবারের ভিত্তি নর-নারীর স্থায়ী বিবাহ বন্ধন। কারণ, বিবাহিত নরনারীর এবং তাদের সন্তানদের নৈতিক বিকাশের জন্য বিবাহ অনুষ্ঠান একান্ত অপরিহার্য। সুতরাং সামাজিক কল্যাণ এবং সামাজিক সংহতি রক্ষণের জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদ কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। বিবাহিত নরনারী যদি খেয়ালখুশীমত বিবাহ বিচ্ছেদের সংকল্প করে তবে তাদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমাজ জীবনে বিপর্যয় দেখা দেবে; পারিবারিক জীবনের সংহতি, পবিত্রতা ও মাধুর্য নষ্ট হয়ে যাবে।

সমালোচনা (Criticism):

এই রক্ষণশীল মনোভাব সমর্থনযোগ্য নয়। বর্তমান যুগ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের যুগ। কোন নর বা নারীর পক্ষেই অসুখী এবং অবাঞ্ছিত বিবাহিত জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ, নরনারীর পারস্পরিক বন্ধুত্ব, ভালবাসা অনুরাগ, প্রীতি, সহানুভূতি ও সমবেদনাবোধ বিবাহিত জীবনকে সুখময়

1. "I believe marriage to be the best and most important relation that can exist between two human beings. If it has not often been realised hitherto, that is chiefly because husbands and wives have regarded themselves as each other's policeman. If marriage is to achieve its possibilities, husbands and wives must learn to understand that whatever the law may say, in their private lives they must be free."

—*Bertrand Russell*: Marriage and Morals.

এবং মাধুর্যপূর্ণ করে। সুতরাং বিবাহিত জীবনে যদি এ গুণগুলি অনুপস্থিত থাকে তাহলে বিবাহবন্ধন হয়ে ওঠে একটি দুঃসহ কৃত্রিম বন্ধন। *Bertrand Russell* বলেন, "যে বিবাহে কোন সন্তান হল না, সেক্ষেত্রে উভয় ব্যক্তিই যদিও ভদ্রভাবে পরস্পরের প্রতি আচরণ করে তবু বিবাহ-বিচ্ছেদই অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত সমস্যার সমাধান। কিন্তু যেখানে সন্তান বর্তমান, বিবাহের স্থায়িত্ব আমার মতে এক গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয়"।[1]

(খ) চরমপন্থী মতবাদ (Radical View): এ মতবাদ অনুযায়ী বিবাহিত নরনারীর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করা উচিত। বিবাহিত জীবন নরনারীর ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেহেতু যদি প্রয়োজন দেখা দেয় এবং উভয়ের সম্মতি থাকে তবে বিবাহ-বিচ্ছেদে কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না।

বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্য নরনারীর উভয়ের মিলনের মাধ্যমে একটি গৃহকে সুন্দর করে তোলা। কিন্তু যদি বিবাহের মাধ্যমে কোন নৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত না হয়—বিবাহিত জীবন যদি কলহ, বিবাদ, ঈর্ষা, অপ্রীতিকর মনোভাবে পূর্ণ হয় তাহলে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানের কারও পক্ষে সুখী জীবন যাপন করা সম্ভব হয় না এবং এ বিষময় জীবন তাদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এরূপ অবাঞ্ছিত বিবাহিত জীবনের পরিসমাপ্তি প্রয়োজন।

সমালোচনা (Criticism):

কিন্তু কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি থাকলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হবে—এ মতকে নৈতিক দিক থেকে সমর্থন করা যায় না। কারণ, সেক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপার হয়ে উঠবে স্বামী-স্ত্রীর খেয়ালখুশীর ব্যাপার।

1. "Where a marrirge is childless, divorce may be often the right solution, even when both parties are doing their best to behave decently, but where there are children the stability of marriage is to my mind a matter of considerable importance".

—*Bertrand Russell*: Marriage and Morals

(গ) **উদার মনোভাব (Liberal View):** উদার মতাবলম্বীদের অভিমত যে, বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করা উচিত। নরনারীর উভয়ের কেউ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা রহিত হয়, দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয় বা কোন ঘৃণ্য অপরাধজনক কার্যে লিপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ সমর্থনযোগ্য। অবশ্য আইনের পক্ষে বিবাহ-বিচ্ছেদে উৎসাহ দান করা উচিত নয়। স্বামী-স্ত্রী যদি শিথিল বিবাহবন্ধনকে ধৈর্য ও নিজেদের প্রচেষ্টায় পুনরায় সুদৃঢ় করে তুলতে পারে তবে তা হবে উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর। তবে যদি কোন প্রকারেই অবস্থার উন্নতিসাধন করা না যায় এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই স্থির সিদ্ধান্ত করে যে, উভয়ের বিবাহিত জীবন অবাঞ্ছিত পরিণতির সৃষ্টি করেছে, সেক্ষেত্রে আইনের উচিত হবে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন মঞ্জুর করা।

বস্তুতঃ বিবাহ-বিচ্ছেদের সমস্যা অত্যন্ত জটিল সামাজিক সমস্যা। যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে সমাজের সংহতি নষ্ট হয়ে যায়। বিবাহ সম্পর্কে সাধারণের মনোভাবকে উন্নত করার উপরই বিবাহ-বিচ্ছেদের সমস্যা নির্ভর করছে। সকলেই যদি মনে-প্রাণে অন্তরের সঙ্গে বিবাহের অন্তর্নিহিত আদর্শকে উপলব্ধি করে, বিবাহকে একটি নৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে মনে করে এবং পারস্পরিক ভালবাসা, অনুরাগ, প্রীতির ভিত্তিতে মধুর পারিবারিক জীবন যাপন করে তাহলে বিবাহ-বিচ্ছেদের সমস্যা এতখানি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারূপে দেখা দেবে না।

১০। পরিবার ও সমাজ (Family and Society):

পরিবারের উপরই যে সমাজের ভিত্তি এবং পরিবার যে এক হিসেবে সমাজের জনন-কোষ (germinal cell), তা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তবে সামাজিক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

পরিবার সমাজের জনন-কোষ

সমাজই তার আচার-ব্যবহার, জনমত প্রভৃতির সাহায্যে পরিবারের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করে। উদাহরণস্বরূপ বিবাহ-প্রথার উল্লেখ করা যেতে

পারে। স্বামী-স্ত্রী নির্বাচন, বিবাহসংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ ও কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অবৈধ—এই সব বিষয়ে বিধিনিষেধ নির্দেশ করে সমাজ পরিবারের বিবাহ-প্রথাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। অবশ্য সমাজভেদে এই সব নিয়মকানুনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; তাহলেও বিভিন্ন আকার ও প্রকারের প্রভেদ সত্ত্বেও পরিবার এবং সমাজ উভয়ে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত, মানব-সভ্যতার ইতিহাস তার স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে।

সমাজ পরিবারের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করে

আধুনিক যুগে রাষ্ট্রও নানাভাবে পরিবারের উন্নতি ও বিকাশের মূলে প্রেরণা যুগিয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র পরিবার-ভাতা ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অবসর-বৃত্তি অনুমোদন করে, স্বাস্থ্য ও বাস-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে, পরিবারের ঐক্য ও সংহতি আনয়ন করে, তাকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করেছে। আবার অন্যদিকে অনেক রাষ্ট্র পরিবারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করে, স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, যুবকদের মনে রাজনীতির প্রতি সক্রিয় অনুরাগ সৃষ্টি করে পরিবারের পারিবারিক পরিবেশকে এমনভাবে বিনষ্ট করেছে যে, অনেক যুবক, যুবতী মাতাপিতাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে ধারণা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

পরিবারের উপর রাষ্ট্রের প্রভাব

তাছাড়া, অনেক লেখক এবং রাজনীতিবিদ গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর (*Plato*) অভিমত অনুসরণ করে ধারণা করেছেন যে, সমাজের বিকাশের বিশেষ এক স্তরে সমাজের কতকগুলি অভাব মেটাবার জন্যই পরিবার-ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সমাজ একটু অগ্রসর হলেও পরিবারে প্রয়োজনীয় কাজের দায়িত্ব রাষ্ট্রই গ্রহণ করতে পারবে। কোন কোন লেখক এমনও ধারণা করেন যে, সব কিছু বিচারের মাপকাঠি যখন মানুষ, তখন মানুষের মঙ্গলের জন্যই পরিবারের দমন বা প্রভাব খর্ব করা প্রয়োজন। সে রকম প্রয়োজন দেখা দিলে পরিবারকে একেবারে উচ্ছেদ করে দেওয়াও যুক্তিযুক্ত হবে।

কারও কারও মতে পরিবার নিষ্প্রয়োজন

কিন্তু পূর্বোক্ত লেখকদের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যক্তির পক্ষে পরিবারের প্রয়োজন নেই—এমন সম্ভাবনা কখনও দেখা দেবে না। পরিবারের সামাজিক, মনস্তত্ত্বমূলক, নৈতিক এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বিবেচনা

করলে মনে হয় যে, পরিবার মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় একটি স্বাভাবিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান।

পরিবার ও সমাজ

পরিবার কেবলমাত্র সন্তানদের পার্থিব প্রয়োজনই মেটায় না, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ধারণা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির সঙ্গেও সন্তানদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। পারিবারিক জীবনেই মানুষের সর্বপ্রথম সমবায় জীবন (collective life) সম্পর্কে জ্ঞান জন্মায়। পরিবারের মত অতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী জীবনও পরিচালিত করতে হলে যে পারস্পরিক সহযোগিতার এবং নির্দিষ্ট কর্তব্য করার প্রয়োজন সে সম্পর্কেও মানুষ পারিবারিক জীবন থেকে জ্ঞান লাভ করে। সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক সকল বিষয়েই মানুষ প্রাথমিক শিক্ষা পরিবার জীবন থেকেই লাভ করে। এই প্রাথমিক জ্ঞানই সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে। সমাজ-জীবনের উপর পরিবারের প্রভাব কতখানি তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সমাজ-বিজ্ঞানী গিলিন (*Gillin*) এবং ব্লাকমার (*Blackmar*) বলেন, "সমাজ-জীবনের প্রথম অণু হল পরিবার। এরই মধ্যে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের শিক্ষা মানুষ লাভ করে। এখানে তারা কেবলমাত্র ধন উৎপাদনের পদ্ধতিই শিক্ষা করে না এবং সম্পত্তিতে অধিকারবোধ সম্পর্কেই তালিম পায় না, সংঘবদ্ধ জীবনে তাদের কর্তব্য এবং অধিকার সম্পর্কেও শিক্ষা লাভ করে। গৃহতেই সকল রকম সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়।"[1]

পরিবার সমাজের পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান

বিভিন্ন সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে বিচার করলে দেখা যায় মানুষ মূলতঃ পারিবারিক জীব। ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য পরিবারের উচ্ছেদ কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়; বরং বলা যেতে পারে—এ জাতীয় ধারণা স্ব-বিরোধী। এইসব ধারণা যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত হত যদি মানুষ নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মতন সমাজ-বহির্ভূত আত্মকেন্দ্রিক

---

1. **"The family represents the unit of social order. Within it people are trained for larger social life. Not only are they schooled in the art of producing wealth and trained in right of property, but also in the duties and privileges of individuals in association......It is in the home that the beginning of all forms of culture appear."**

—*Gillin and Blackmar*: Outlines of Sociology : Page 186—188.

জীবন-যাপনকে আদর্শ বলে মেনে নিত। কিন্তু এ ধারণা যে গ্রহণযোগ্য নয় ইতিপূর্বে আমরা তার আলোচনা করেছি।

একথা সত্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের অস্তিত্ব ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পথে অন্তরায়স্বরূপ দেখা যায়। অবশ্য ব্যক্তিস্বার্থ পরিবারের ও রাষ্ট্রের স্বার্থের মধ্যে কিছুটা অসংগতি থাকবেই। কিন্তু পরিবারের ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা না করে ব্যক্তি যদি নিজের স্বার্থকেই সব সময় বড় করে দেখে, তাহলে শুধু সমাজ নয় মানুষের সভ্যতাই একটা বিরাট ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। ইতিহাসও তার সাক্ষ্য বহন করে। প্রাচীন গ্রীসে সমাজের উন্নত স্তরে পারিবারিক নিয়মকানুনের শিথিলতা পরিবারের অভ্যন্তরে যে দুর্নীতির সঞ্চার করেছিল তা এক উন্নত রাষ্ট্র গঠনের পরিপন্থী ছিল না। কিন্তু রোমে পরিবার ব্যবস্থা এক সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, রোম সাম্রাজ্য উন্নতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিখরে আরোহণ করেছিল, যদিও পরে পরিবার সম্পর্কীয় বিধি নিষেধগুলি শিথিল হওয়ায় রাষ্ট্রের সেই উন্নত অবস্থার অবনতি ঘটেছিল।

ব্যক্তিস্বার্থ ও পরিবারের স্বার্থের বিরোধিতা ক্ষণস্থায়ী

বস্তুতঃ, পরিবার প্রথার উচ্ছেদের কথা ভাবাই চলে না। পুরুষ ও স্ত্রী একত্রিত হয়ে যদি একটি স্থায়ী সংগঠনের মাধ্যমে সন্তানপালনের দায়িত্ব গ্রহণ না করে, তাহলে সন্তানপালনের দায়িত্ব অপর কারও উপর অর্পণ করতে হবে। অনেকের ধারণা সমাজ অর্থাৎ রাষ্ট্রই এই দায়িত্ব গ্রহণ করার পক্ষে উপযুক্ত। রাষ্ট্রই শিশুদের লালনপালন করবে, তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদান করবে, জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেবে এবং যাতে জীবনে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার জন্য চেষ্টা করবে অর্থাৎ সমাজে পরিবারের স্থান থাকবে না।

কিন্তু এ জাতীয় অভিমত মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণার পরিচয় দান করে না। সব মাতাপিতাই শিশুদের রাষ্ট্রের কাছে অর্পণ করতে সম্মত হবে না এবং পরিবারের মধ্যে থেকে শিশুর যে স্বাতন্ত্র্য ও চরিত্রের বিকাশ পরিলক্ষিত হয়, তাও দেখা যাবে না। বস্তুতঃ, মাতাপিতার স্বার্থপূর্ণ ভালবাসা, স্নেহ,

পরিবারের দায়িত্ব রাষ্ট্রের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়

মায়া-মমতা শিশুর সর্বাঙ্গীন স্বাভাবিক বিকাশ এবং সুস্থ সমাজ-জীবন গঠনের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমান যুগে কোন কোন দেশে রাষ্ট্রকে অস্বাভাবিক প্রাধান্য দেবার জন্য পরিবারকে অবদমিত করার এক প্রচেষ্টা দেখা গেছে। কারও কারও মতে পরিবার হল বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান (bourgeois institution) এবং সে কারণে পরিবারের প্রভাব খর্ব করার জন্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয় নি, কারণ অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়ী পরিবার-জীবনের গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে।

পরিবারের প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হয়নি

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, পরিবার ছাড়া রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। পরিবারের দৃঢ় ভিত্তির উপরই সমাজের প্রতিষ্ঠা, সুতরাং পরিবারের উচ্ছেদ তো দূরের কথা, সমাজের সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পরিবারে ক্রমোন্নতি কি ভাবে সম্ভব, সমাজ দার্শনিকের কাছে তাই একটা প্রধান সমস্যা।

পরিবার ছাড়া রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না

১১। পরিবারের কার্যাবলী (Function of a family):

সমাজ অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পরিবারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সবচেয়ে অধিক এবং সমাজ জীবনের উপর এর প্রভাবও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মত পরিবারেরও কতকগুলি নির্দিষ্ট কার্য আছে, যদিও কালের গতিতে এই সব কার্যাবলীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমরা সংক্ষেপে পরিবারের কার্যাবলী এবং কিভাবে সেগুলির মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তা আলোচনা করব:

পরিবারের কার্য

(১) জৈবিক (Biological): নরনারীর জৈবিক ও দৈহিক প্রয়োজন মেটান পরিবারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ। পরিবারই সন্তানোৎপাদনের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। শিশুদের পক্ষে উপযোগী এমন পরিবেশে সন্তানের জন্মদান করা পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কার্য। এই কার্যের মাধ্যমে বংশ বিস্তার সম্ভব হয় এবং নরনারীর

জৈবিক

যৌন সম্পর্ক ও যৌন আচরণ সুনিয়ন্ত্রিত হয়। যদিও শিশু প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য বর্তমানকালে সমাজে অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটেছে, তবু সন্তানোৎপাদনের কাজ পরিবারের একচেটিয়া।

(২) **অর্থনৈতিক (Economic)**: যেহেতু শিশুপালন পরিবারের অন্যতম প্রধান কাজ, সেহেতু পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানও পরিবারের অন্যতম কাজ। এই দায়িত্ব প্রধানতঃ এসে পড়ে পিতার উপর, কারণ মাকে

অর্থনৈতিক

সাধারণতঃ শিশুর শারীরিক তত্ত্বাবধানে নিজেকে নিয়োজিত করতে হয়। কিন্তু বর্তমানকালে অনেক ক্ষেত্রে মাতাপিতা উভয়কেই পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাবার কাজে রত দেখা যায়। এমন এক সময় ছিল যখন পরিবারই ছিল অর্থনৈতিক উৎপাদনের কেন্দ্রস্বরূপ। পরিবারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি গৃহেই উৎপাদিত হত। কিন্তু নগরকেন্দ্রিক শিল্প সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন উৎপাদন কেন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছে। বর্তমানকালে মিল, কারখানা, দোকান, বাজার ব্যাঙ্ক প্রভৃতি পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যগুলি কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করছে।[১]

(৩) **শিক্ষামূলক (Educational)**: গৃহ শিশুদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র। শিশুর জন্মের পরে, প্রথম পাঁচটি বছর সে গৃহেই শিক্ষালাভ করে

শিক্ষামূলক

তারপর শিশুকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠান হয়। যদিও প্রচলিত প্রথানুযায়ী শিক্ষা দেবার দায়িত্ব অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে তবু সমাজের অতীত সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব এখনও গৃহের উপর ন্যস্ত। সমাজানুমোদিত আচরণ, সহযোগিতা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি বিষয়গুলি শিশু-সন্তানের গৃহেই শিক্ষা করে। বস্তুতঃ, গৃহের মাধ্যমেই শিশু বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়।[২]

(৪) **রক্ষণমূলক (Protective)**: সব রকম বিপদ আপদ থেকে পরিবারের সভ্যদের রক্ষা করা পরিবারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ। কিন্তু

১—২. এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

বর্তমানকালে পরিবারের সভ্যরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকার জন্য এবং পরিবারের সভ্যদের স্বার্থ পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণের উপর কেন্দ্রীভূত না থাকার জন্য, পরিবারে রক্ষণমূলক কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বস্তুতঃ স্বাস্থ্যরক্ষা, বৃদ্ধবয়সে পেন্‌সনের ব্যবস্থা চাকরির নিরাপত্তা, পুলিশী ব্যবস্থা এবং শিশু প্রতিপালন সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী নানা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কার্য। এমন অনেক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটেছে যার কাজ পরিবারের সংরক্ষণ, তবু পরিবার অনেক ব্যাপারে তার সভ্যদের শারীরিক ও নৈতিক নিরাপত্তা দিয়ে থাকে।

রক্ষণমূলক

(৫) স্নেহসম্পর্কীয় (Affectional): স্নেহ-ভালবাসা ও বন্ধুত্বের এক নিবিড় বন্ধনে সবাইকে বেঁধে রাখা পরিবারের অন্যতম কাজ। ছোট ছোট শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মাতাপিতার স্নেহ-ভালবাসার একান্ত প্রয়োজন। ছোট শিশু যেন উপলব্ধি করতে পারে যে তাকে তার মাতাপিতা ভালবাসে এবং তার মাতাপিতাও পরস্পরকে ভালবাসে। স্নেহ-ভালবাসার অভাব শিশুর ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশের পথে এক বিরাট বাধাস্বরূপ। আবার মাতাপিতার মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার অভাবও গৃহের শান্তি ও সুখ হরণ করে।

স্নেহসম্পর্কীয়

(৬) ধর্মসম্পর্কীয় (Religious): নৈতিক এবং ধর্ম সম্পর্কীয় শিক্ষা একদিন পরিবারের স্বীকৃত কার্য ছিল কিন্তু বর্তমানে অনেক মাতাপিতা এই ব্যাপারে উদাসীন কিংবা তাঁরা মনে করেন, এ কাজ পরিবারের নয়, ধর্ম প্রতিষ্ঠানের। ভালই হোক আর মন্দই হোক শিশু নিজ গৃহে নৈতিক শিক্ষালাভ করে এবং যদিও বর্তমানে ধর্মসম্পর্কীয় শিক্ষা দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বা ধর্ম সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানের উপর, তবু ঈশ্বর সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা শিশু নিজ গৃহেই লাভ করে।

ধর্মসম্পর্কীয়

(৭) আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত (Recreational): এমন এক সময় ছিল যখন গৃহই ছিল সব রকম আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্বরূপ। কিন্তু শিল্প-সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং যন্ত্রের বহুল ব্যবহারের জন্য মানুষের অবসর

সময় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনও বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। বর্তমানকালে সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মানুষকে আমোদ-প্রমোদ যোগায়। তাই গৃহের বাইরে পরিবারের সভ্যরা নানা ধরনের আমোদ-প্রমোদের সন্ধান পায়। পার্ক, খেলার মাঠ, সিনেমা, থিয়েটার, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব প্রভৃতি পরিবার-বহির্ভূত আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল। অবশ্য যদিও পরিবারের আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত কার্যাবলী হ্রাস পেয়েছে, তবুও এখন পর্যন্ত অনেক ব্যাপারে পরিবারই আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল। পরিবারের সভ্যদের মিলেমিশে বনভোজন করা, কোন দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে যাওয়া, বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে যাওয়া, ঘরের মধ্যে বসে খেলাধূলা করা এবং সবাই মিলে বসে গল্পগুজব করা ইত্যাদি পরিবারের আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত কাজের অন্তর্ভুক্ত। কোন রকম অবাঞ্ছনীয় ক্রীড়াকৌতুকে উৎসাহদান করা পরিবারের উচিত নয়। যেসব আমোদ-প্রমোদ পারিবারিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, সেগুলিতে উৎসাহ দেওয়াই পরিবারের কাজ। যদিও আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত অনেক কাজই বর্তমানে পরিবার থেকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চলে গেছে, তবু এমন কয়েক ধরনের আমোদ-প্রমোদ আছে যা একমাত্র পরিবার জীবনেই সম্ভব।

আমোদ প্রমোদ সংক্রান্ত

(৮) **মর্যাদা প্রদান সম্পর্কীয় (Status-giving) :** পরিবারের অন্যতম কাজ বৃহত্তর সমাজে পারিবারিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা। প্রতিটি পরিবার তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মর্যাদা দান করে। পরিবারের সভ্যদের কাছে পারিবারিক নামের প্রয়োজনীয়তা খুবই অধিক। কারণ এই নামই বৃহত্তর সমাজে তার মান-মর্যাদা নির্ধারণ করে। পরিবারকে প্রশংসা করলে পরিবারের সভ্যরা তাতে গর্বিত বোধ করে এবং পরিবারের মান বা মর্যাদা নষ্ট হলে ক্ষুণ্ণ ও ক্রুদ্ধ হয়। বর্তমান যুগে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, পরিবারের সভ্যরা ইতঃস্তত ছড়িয়ে থাকার জন্য, পারিবারিক মান-মর্যাদা থেকে ব্যক্তিগত মান-মর্যাদার উপরই সবিশেষে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

মর্যাদা প্রদান সম্পর্কীয়

পরিবারের এই কার্যাবলীর মাধ্যমে পরিবারের সংহতি ও ঐক্য সংরক্ষিত হয়। সাম্প্রতিক কালে পরিবার পূর্বোক্ত কার্যাবলীর মধ্যে অনেকগুলিই হারিয়েছে। পরিবারের অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদন করছে বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান; শিক্ষা সম্পর্কীয় কার্যাবলী সম্পাদন করছে বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, যদিও কিছু কিছু শিক্ষামূলক কাজ পরিবারের হাতে রয়েছে। রক্ষণমূলক কাজ সম্পাদন করছে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ধর্ম সম্পর্কীয় কাজ গ্রহণ করেছে ধর্ম প্রতিষ্ঠান। পরিবারের মর্যাদা প্রদান করার কাজও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে, তবে সন্তানোৎপাদন এবং স্নেহ সম্পর্কীয় কার্যাবলী এখনও পরিবারেই রয়েছে। মাতাপিতার স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ-ভালবাসা শিশুরা অন্য কারও কাছ থেকে পেতে পারে না।

অন্য প্রতিষ্ঠান পরিবারের কার্য করছে

পরিবারের কার্যাবলীর কিছু কিছু অংশ অপরের হাতে চলে যাওয়ার জন্য পরিবারের ঐক্য ও সংহতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ফলে বৃহত্তর সমাজের চোখেও পরিবারের প্রয়োজনীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং সমাজের ও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের উপর পরিবারের কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছে।

পরিবারের সংহতি ও ঐক্য ক্ষুণ্ণ

১২। পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ (Educational Functions of the Family) :

প্রথমতঃ, পরিবার হল স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আত্মোৎকর্ষের (Self culture) উপযুক্ত স্থল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই পরস্পরের দোষত্রুটিগুলিকে উপেক্ষা করে উভয়ের গুণগুলিকেই নিজেদের মধ্যে পরিস্ফুট করা দরকার। এরূপ মনোভাবের ফলে এক আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনকে সুদৃঢ় ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে এবং স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সহযোগিতায় জীবনের বাধাবিঘ্ন অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পারে। এর ফলে দুটি আত্মার নিবিড় ও অন্তরঙ্গ মিলন ঘটে এবং উভয়ের হৃদয় আনন্দ ও সুখে পরিপূর্ণ হয়। এজন্য বিবাহিত জীবনে বন্ধনকে সুদৃঢ়

স্বামী স্ত্রীর কর্তব্য

করার জন্য উভয়েরই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। উভয়েরই উচিত নিজের অন্ধ আবেগ ও প্রবৃত্তিকে সংযত করা, পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া, বিচার-বুদ্ধি দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত করা, উৎকট খামখেয়ালীপনা দূর করা, সকল প্রকার স্বার্থপ্রণোদিত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা। সংক্ষেপে, উভয়কেই 'অহং' ভাব থেকে মুক্ত হয়ে পরস্পরের কল্যাণের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। সার্জেণ্ট (*Sargent*) বলেন, "সকল পারিবারিক জীবনের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শর্ত হল, মাতাপিতার মধ্যে স্বার্থশূন্য ভালবাসা, যে ভালবাসা গৃহের পরিবেশকে মাধুর্যপূর্ণ করে তুলবে এবং সংসারের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তিত্বকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলবে।"[1]

শিশুর প্রতি মাতা ও পিতার কর্তব্য

সন্তানের মঙ্গলের জন্যেও মাতাপিতার নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা বিশেষ প্রয়োজন। শিশুর মন অত্যন্ত সংবেদনশীল। মাতাপিতার ব্যবহার শিশুর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাছাড়া, শিশুর মন অত্যন্ত অনুকরণপ্রবণ। মাতাপিতার আচরণের অসংগতি শিশুর কোমল মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। উদার স্নেহপূর্ণ সুন্দর ব্যবহার শিশুর মনকে মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বাধ্য করে তোলে। মাতাপিতার উচিত সন্তানের সামনে উচ্চ আদর্শ তুলে ধরা এবং এর জন্য দরকার মাতাপিতার নিজেদের আচরণকে সুন্দর করে তোলা যাতে তা শিশুদের অনুকরণের যোগ্য হয়। যে মাতাপিত নিজের অনুভূতি, আবেগ ও কার্যকলাপকে বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে তাদের পক্ষেই সম্ভব হয় সন্তানের সামনে উচ্চ মহান আদর্শ তুলে ধরা।

এছাড়াও আছে মাতাপিতার সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করার দায়িত্ব। মাতাপিতার প্রাথমিক কাজ: অবশ্য আহার, পানীয়, উপযুক্ত আশ্রয় ও স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করে সন্তানকে বড় করে তোলা। কিন্তু শিশুর চলাফেরা কথাবার্তা, ভাষা শিক্ষা দেওয়া, তার গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করা, তার প্রবৃত্তিকে

1. "The very first and most essential condition, then for successful family life is selfless love between parents, love which will enrich the atmospahre of the home and make for the complete fulfilment of each personality within the house-hold."—*W. E. Sargent*: The Psychology of Marriage and the Family Life : Page 96.

সংযত করার সুকঠিন দায়িত্বও মাতাপিতার। প্লেটো (*Plato*) তাঁর *Republic*-এ বলেছেন, 'এ কাজ উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত।' কিন্তু এ

শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে Plato-র মত

ধারণা অসংগতিপূর্ণ বলে মনে হয়। কারণ, শৈশবে শিশু যখন অসহায় এবং একান্তভাবে পরনির্ভর তখন এ দায়িত্ব মাতাপিতার পক্ষেই সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব। কারণ, সন্তানের জন্য মাতাপিতার স্নেহ স্বাভাবিক ও সহজাত। অবশ্য এ কথা বলা যেতে পারে, মাতাপিতার স্বাভাবিক স্নেহই শিশুকে প্রতিপালন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, বরং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষেই শিশুকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করা অধিকতর সুবিধাজনক। বিশেষ করে অস্বাভাবিক চরিত্রের শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত। কিন্তু শিশুর স্বাভাবিক অবস্থায় মাতাপিতার উপরেই এ দায়িত্বভার ন্যস্ত হওয়া ভাল। কারণ, পরিবার সকল সময়ই শিক্ষার কেন্দ্র, এমন কি শিশু যখন বড় হয়ে বিদ্যালয়ে যায় তখনও পরিবারের শিক্ষা-সম্পর্কীয় কাজ শেষ হয়ে যায় না। শিক্ষার কতকগুলি বিশেষ বিষয়, যেমন শিশুকে সদাচরণ ও নিয়মানুবর্তিতা শেখান, তাকে স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলির অনুশীলন করান পরিবারের কাজ। সত্যিকারের নিয়মনিষ্ঠা হল ঐচ্ছিক, এ কখনও কারও উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রের আইন হয়ত কোন নিয়ম পালন করার জন্য কাউকে

পরিবারই শিশুর শিক্ষার উপযুক্ত কেন্দ্র

বাধ্য করতে পারে, কিন্তু যদি ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই নিয়ম পালন করে তবে সেটাই হবে বাঞ্ছনীয়। যে পরিবারে সকলেই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাশীল সেই পরিবারই শিশুর শিক্ষার উপযুক্ত কেন্দ্র। পারিবারিক পরিবেশে শিশু সহজে অপরকে শ্রদ্ধা করতে শেখে, ভালবাসতে শেখে, নিয়মানুবর্তিতা এবং আরও অনেক সদ্‌গুণের অনুশীলন করার জন্য যত্নবান হয়। সুতরাং শিশুকে উপযুক্ত নাগরিক করার উত্তম প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হল সুগঠিত পরিবার, রাষ্ট্র নয়।

ম্যাকেঞ্জির (*Mackenzie*) মতে আরও একটু ব্যাপকভাবে যদি দেখা যায় তা হলেও পরিবারকে শিক্ষামূলক প্রভাব বিস্তার করার ব্যাপারে একটা

স্বাভাবিক কেন্দ্র বলে মনে করা যেতে পারে। শিক্ষা দিতে গিয়ে মানুষ নিজেও শেখে। যারা অপরিণত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে সচেষ্ট হন তাঁরা সেই প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদেরও মনের অনেক ধারণার মধ্যে যে অসংগতি আছে তাকে দূর করতে পারেন। এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেদের আত্মার উৎকর্ষ অনুভব করেন।

১৩। পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী (Economic Functions of the Family):

শিক্ষাসম্পর্কীয় কার্যাবলীর মতো পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যাবলীও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অসহায় শিশুকে প্রতিপালন করার দায়িত্ব প্রধানত: মাতার উপরেই এসে পড়ে এবং এর জন্য সাধারণত: পিতাকে পরিবার পালনের অর্থনৈতিক দায়িত্ব নিতে হয়।

অনেক সময় পরিবারের অর্থনৈতিক অভাব পারিবারিক সংহতির পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং পরিবারের শিক্ষাসম্পর্কীয় কাজের সঙ্গে এর বিরোধিতা দেখা যায়। অর্থনৈতিক কারণে হয়ত পিতাকে পরিবার থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়, মাতাকেও হয়ত বাইরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। সময় সময় এই অর্থনৈতিক চাপ পরিবারের উপর এমনভাবে এসে পড়ে যে, ছোট ছোট শিশুদেরও পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য পরিশ্রম করতে হয়, যার ফলে তাদের শিক্ষাকার্য বিশেষরূপে ব্যাহত হয়। শিশুর যে শক্তি এবং উৎসাহ শিশুর নিজের চরিত্রের বিকাশ ও শিক্ষাকার্য প্রভৃতির জন্য নিযুক্ত হওয়া দরকার, আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য সে শক্তির অযথা অপচয় ঘটে। এরূপ অবস্থায় পরিবারের শিক্ষা-সম্পর্কীয় কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

১৪। পরিবারের দুর্বলতা বা অনুপযোগিতা (Weakness of the Family):

ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) পরিবারের কতকগুলি অনুপযোগিতা বা দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে যদিও পারিবারিক জীবন-যাপনের

আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত আছে, তবু এমন কতকগুলি কারণ আছে, যেগুলি পরিবারকে দুর্বল করে দেয়, তার কার্যকারিতা খর্ব করে দেয়। শুধু তাই নয়, পরিবার-জীবনের প্রভাবও হয়ে ওঠে ক্ষতিকর।

(ক) প্রথমতঃ, পরিবারের সংহতি শিল্পের উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে। প্রাচীন সমাজে সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর পরিবারের পেশাই গ্রহণ করত, ফলে তাকে পরিবার-বহির্ভূত জীবন-যাপন করতে হত না। বর্তমানে এই শিল্পোন্নতির যুগে অনেককেই শিল্পসম্বন্ধীয় এক-একটি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করতে হয়, যার জন্য অল্প বয়সেই শিক্ষানবীশ থাকার জন্য সন্তানকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয়। সকল ক্ষেত্রে সন্তানের পক্ষে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সম্ভব হয় না এবং ফলে শিল্পের উন্নতির পক্ষে সেরকম পরিবার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, পরিবার এবং রাষ্ট্রের মধ্যেও বিরোধ দেখা দিতে পারে। এ কারণেই প্লেটো (*Plato*) বলেছিলেন যে, যারা দেশের আত্মরক্ষা এবং শাসন-ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকবে, তাদের পারিবারিক চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। অবশ্য বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকলেরই রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় কিছু না কিছু করণীয় আছে। রাষ্ট্র চায় যে, রাষ্ট্রের অধীনে প্রতিটি নাগরিক উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তার নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পন্ন করুক। কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের সঙ্গে পরিবারের উদ্দেশ্যের বিরোধ দেখা দিতে পারে, কারণ পরিবারে মাতাপিতা সন্তানকে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন তা হয়ত রাষ্ট্রের সমর্থন না পেতেও পারে।

(গ) তৃতীয়তঃ, বন্ধুত্ব এবং সঙ্গীলাভের আকাঙ্ক্ষাও পারিবারিক সংহতির বিরোধী হতে পারে। মানুষ সঙ্গী চায়, বন্ধু চায়। তাই সে পরিবারের সীমিত গণ্ডীর বাইরে গিয়ে তার বন্ধু এবং সঙ্গী নির্বাচন করতে চায় সংঘে, সভায় বা সমিতিতে। ব্যক্তির উপর পরিবারের যেমন একটা দাবী আছে, তেমনি তার উপর বৃহত্তর জগতেরও একটা দাবী আছে। যদি এই উভয় দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন করা না যায়, তাহলে হয়ত পরিবারের সংহতি নষ্ট হয়ে যায়, নয়ত বৃহত্তর জগতের দাবী অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

(ঘ) চতুর্থতঃ, শিল্প রাষ্ট্র, বন্ধু ও সঙ্গীদের সাহচর্য ছাড়াও ধর্ম, বিজ্ঞান, কলা অর্থাৎ সংক্ষেপে যাকে বলা যেতে পারে সংস্কৃতি, তার সঙ্গে পরিবারের বিরোধ দেখা দিতে পারে। পরিবারের ক্ষুদ্র স্বার্থ, আর্থিক প্রয়োজন শিল্পীর স্বাধীন কাজের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে, যার ফলে শিল্পীর লক্ষ্য ব্যাহত হতে পারে। যে ব্যক্তি ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডী তার কাজের পক্ষে অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এই সব কারণেই ব্যক্তি পরিবারের সীমিত গণ্ডী পরিত্যাগ করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার সংকল্প করে।

ম্যাকেঞ্জি বর্ণিত উপরিউক্ত অনুপযোগিতা বা দুর্বলতা ছাড়াও সমাজের আরও একটি দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পরিবারের সভ্যদের পরিবারের প্রতি গভীর কর্তব্য বোধ থাকে। সময় সময় এই কর্তব্য বোধ এতই তীব্রভাবে দেখা দিতে পারে যে, পরিবারের প্রতি কর্তব্য সাধন করতে গিয়ে পরিবারের সভ্যবৃন্দ বৃহত্তর সমাজ-জীবনের দায়িত্বের প্রতি উদাসীন হতে পারেন। পারিবারিক চেতনা তীব্র হলে জাতীয় চেতনার অনুশীলন ব্যাহত হতে পারে এবং জীবনের মূল্যগুলির যথাযথ বিচারের পথে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়াও দেখা যায় পরিবারের সভ্যদের মধ্যে পারিবারিক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ সময় সময় এতই বৃদ্ধি পায় যে পরিবারের সভ্যদের মধ্যে জীবনের প্রতি একটা হতাশার ভাব দেখা দেয়, যা সামাজিক উন্নতি ব্যাহত করতে পারে।

১৫। পরিবারের অনুপযোগিতা বা দুর্বলতা দূর করার উপায় (The Proposed Remedy to overcome the Weakness of the Family):

ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন যে পূর্বোক্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় দুর্বলতাকে দূরীভূত করা যেতে পারে যদি মাতাপিতা মনে করেন যে, সন্তানের উপরে তাঁদের যে কর্তৃত্ব তা সর্বাঙ্গীন নয়, তাঁরা হলেন পরামর্শদাতা। আসলে শিশুই হল পরিবারের সার্বভৌম কর্তা এবং পরে ঐ শিশুই হয় রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক।

ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার দিকে তাকিয়েই পরিবারের পূর্বোক্ত অসুবিধা বা দুর্বলতাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত কারণগুলি পরিবারের দুর্বলতা নয়, এগুলি বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থারই অনিবার্য পরিণতি। যদি সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা হয় তাহলে এই দুর্বলতাগুলি দূরীভূত হতে পারে।

প্রথমেই দুটি বিষয়ে অর্থাৎ শিল্পোন্নতির সঙ্গে ও রাষ্ট্রের সঙ্গে পরিবারের বিরোধের কথা বলা হয়েছে। তার কারণ বর্তমান যুগে ও অতীতে শিল্প এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এমন কতকগুলি ব্যক্তির উপর ন্যস্ত যাদের আদর্শ জনকল্যাণের আদর্শের বিরোধী। অধিকাংশ পরিবারভুক্ত ব্যক্তি যদি এসব প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য-সাধনের হাতিয়ারস্বরূপে ব্যবহৃত হয় বা কোন কারণে কর্ম থেকে বিরত হয়ে ধর্মঘট করে বা অন্যান্য কাজে লিপ্ত থাকে তাহলে শিল্পের উন্নতি যে বিশেষভাবে ব্যাহত হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

অনুপযোগিতার কারণ

অনুরূপভাবে রাষ্ট্র যদি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার নাগরিকদের উপায় হিসাবে গণ্য করে, তাহলে রাষ্ট্রের সঙ্গে পরিবারের বিরোধ অনিবার্য। কিন্তু যদি ন্যায় এবং সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হয় তাহলে পরিবারের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিরোধের কোন সংগত কারণ নেই। ব্যক্তি যদি উপলব্ধি করতে পারে যে, রাষ্ট্র জনকল্যাণের আদর্শ নিয়েই কাজ করছে, তাহলে ব্যক্তি অবশ্যই রাষ্ট্রের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন বলে মনে করবে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় একদিকে যেমন ব্যক্তির সর্ববিধ বিকাশের সম্ভাবনা আছে তেমনি আছে শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা।

তৃতীয় দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পরিবারের পক্ষে ক্ষতিকর না হয় এরূপ বন্ধুত্ব বা সাহচর্যের ব্যবস্থা করা হলে এ দুর্বলতা পরিহার করা যেতে পারে।

চতুর্থ দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, প্লেটো (*Plato*) এবং বর্তমান যুগে বার্ট্রাণ্ড রাসেল (*Bertrand Russell*) কোন কোন ব্যক্তির জন্য স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা বলেছেন। রাসেল (*Russell*) পরীক্ষামূলক বিবাহের (Trial Marriage) কথাও বলেছেন। কিন্তু একই সামাজিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তির

জন্য বিভিন্ন ধরনের নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "জীবনের অবস্থাগুলিকে যদি সাধারণভাবে সরল করে তোলা যেতে পারে তাহলে হয়ত এর অধিকতর সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যেতে পারে।"[1]

ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) পরিবারের যে তৃতীয় এবং চতুর্থ দুর্বলতার কথা বলেছেন, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে সে দুর্বলতাকে দূর করা সম্ভব। মানুষ যে পরিবারের বাইরে সঙ্গী খুঁজে বেড়ায় বা শিল্প ও ধর্ম অনুশীলনের জন্য পরিবারের ক্ষুদ্র পরিবেশ থেকে পালিয়ে বেড়াতে চায় তার কারণ মুখ্যতঃ পরিবারের বৈচিত্র্যহীন, সমবেদনাহীন পরিবেশকে এড়িয়ে যাবার ইচ্ছা এবং এর মূল কারণও অর্থনৈতিক। কিন্তু উন্নত সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তি যখন তার সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাবে তখন পরিবারই হয়ে উঠবে তার উৎসাহের কেন্দ্র।

পরিবারের শেষোক্ত দুর্বলতা সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, পরিবারের প্রতি কর্তব্য ও বৃহত্তর সমাজ-জীবনের প্রতি কর্তব্য, এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন করে পরিবারের এই দুর্বলতা দূর করা যেতে পারে। পরিবারের ক্ষুদ্র স্বার্থ অনেক সময় মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে। কিন্তু সে কারণে প্লেটো যেমন তার Republic গ্রন্থে পরিবার বর্জন করার জন্য অনুমোদন করেছেন, তা সমর্থন করা চলে না। পারিবারিক জীবনের উন্নতি সাধন করে পরিবারের সভ্যদের মনের হতাশার ভাব দূর করা যেতে পারে।

হেলেন বোসাঙ্কোয়েট (*Bosanquet*) বলেন, "যে পরিবার এত স্নেহ, এত সৌন্দর্যের উৎস তাকে যদি বর্জন করা হয় এজন্য যে, মাঝে মাঝে সে ব্যর্থ হয়, তবে তা হবে মাঝে মাঝে মেঘাচ্ছন্ন হয় বলে আকাশ থেকে সূর্যকে নির্বাসন করার সামিল।"[2]

1. 'Perhaps some general simplification of the conditions of life may provide a more satisfactory solution '

—*Mackenzie* : Outlines of Social Philosophy ; Page 3

2 "To reject the source of so much warmth and beauty because it sometimes fails, would be like banishing the sun from the sky because it is sometimes covered with clouds."

—*Helen Bosanquet* : The Family ; Page 215

সংক্ষিপ্তসার

১। পরিবার সমাজের প্রাথমিক ধাপ। ব্যক্তি সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও সমষ্টিগত জীবনের পরিচয় প্রথমে পরিবার জীবন থেকে লাভ করে। পরিবার ব্যক্তির প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র।

২। পরিবারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : (ক) সর্বজনীনতা অর্থাৎ সর্বকালে ও সকল দেশে পরিবারের অস্তিত্ব আছে, (খ) এ হচ্ছে গোষ্ঠীজীবনের আবেগময় ভিত্তি; (গ) ব্যক্তির উপর পরিবারের গঠনমূলক প্রভাব সর্বাধিক, (ঘ) এর সীমিত আকার অর্থাৎ পরিবার হল সবচেয়ে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীজীবন, (ঙ) পরিবার হল সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র, (চ) পরিবারের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব সর্বাধিক, (ছ) পরিবার হল সামাজিক নিয়মকানুনের মূল কেন্দ্র, জ পরিবার একাধারে স্থায়ী ও পক্ষান্তরে নিরত পরিবর্তনশীল।

৩। পরিবারের গঠন দেশভেদে ভিন্ন। নানাদিক থেকে পরিবারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবারকে একবিবাহকারী ও বহুবিবাহকারী, বংশ গণনার পদ্ধতি অনুসারে পিতৃবংশানুক্রমিক, এবং মাতৃবংশানুক্রমিক, বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে 'পিতৃবাসস্থানিক' এব 'মাতৃবাসস্থানিক' পরিবারের কর্তৃত্বের দিক থেকে 'পিতৃকর্তৃক' এবং 'মাতৃকর্তৃক', সম্পর্কের ভিত্তিতে 'একক' এবং 'যৌথ' প্রভৃতি শ্রেণীগুলিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

৪। পরিবারের উৎপত্তি সম্পর্কে মর্গান, লাবক, ফ্রেজার ও ব্রিফল্ট প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের মতে মানব ইতিহাসের শুরুতে কোন পরিবারের অস্তিত্ব ছিল না। নরনারীর মধ্যে পশুর মতো অনিয়মিত যৌন সম্পর্ক ছিল। বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোন স্থায়ী সম্পর্ক তারা গড়ে তুলত না। এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ তঁদের মতবাদের সমর্থনে অধুনা বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত কতকগুলি রীতির উল্লেখ করেন। যেমন, উৎসব উপলক্ষ্যে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, কোন কোন উপ-জাতিদের মধ্যে পিতৃপরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং শ্রেণীবদ্ধকরণ রীতি প্রভৃতি। মর্গানের মতে এই যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা থেকেই বিবর্তন প্রতিক্রিয়ার ফলে পরিবারের উদ্ভব। সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে, এ সকল রীতির অস্তিত্ব আদিম সমাজে যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় বহন করে না। বস্তুতঃ সন্তানকামনা, যৌন আবেগ চরিতার্থ করা, বংশগতি অক্ষুণ্ণ রাখা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রভৃতি মানুষের কামনা বাসনা থেকেই পরিবারের উদ্ভব।

৫। সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন মাতাপিতার প্রধান কর্তব্য এবং এ হল পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি।

৬। বস্তুবাদীদের মতে পারিবারিক জীবন কৃত্রিম, স্বাভাবিক নয়। বিবাহ হচ্ছে একটা চুক্তি। দৈহিক কামনা তৃপ্ত করার জন্য নরনারী একত্রে বসবাস করে। শিশুর জন্ম ও প্রতিপালন পরিবারের ভিত্তি নয়। কোন পরিবারে শিশুর জন্ম নাও হতে পারে। ভাববাদীদের

মতে বিবাহ একটি আধ্যাত্মিক বন্ধন এবং দাম্পত্য অনুরাগ ও দৈহিক কামনা অভিন্ন নয়। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় হয় সন্তানের জন্মের পর এবং সন্তান প্রতিপালন স্বামী-স্ত্রীর যৌথ পবিত্র কর্তব্য।

৭। সুস্থ সন্তানের জন্য সুপ্রজনন বিজ্ঞানের প্রয়োজন অত্যধিক। এই বিজ্ঞানের নঞর্থক দিক হচ্ছে অসুস্থ সন্তান যাতে না জন্মায় এবং সদর্থক দিক হচ্ছে সুস্থ ও সবল সন্তান যাতে জন্মায় তার ব্যবস্থা করা।

৮। নরনারীর অদমিত দৈহিক কামনা সমাজে বিশৃঙ্খলা আনে। সেজন্য সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিবাহের প্রয়োজন। মানুষের স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তিকে ন্যায়সংগতভাবে পরিচালিত করে সমাজ ও ব্যক্তির মঙ্গলসাধন করাই বিবাহ প্রথার উদ্দেশ্য। নরনারীর মধ্যে আধ্যাত্মিক বন্ধন সৃষ্টি করা বিবাহের প্রধান অবদান।

৯। রক্ষণশীলদের মতে বিবাহ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ কোন রকমেই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অসুখী বিবাহিত জীবন নরনারীর জীবনকে ক্রমশঃ অধিকতর দুঃখময় করে তোলে। এসব ক্ষেত্রে কি বিবাহ-বিচ্ছেদ বাঞ্ছনীয় নয়? চরমপন্থীদের মতে স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরকে নিয়ে সুখী না হয়, তবে তাদের সম্মতি থাকলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া ভাল। কিন্তু, এতে বিবাহ-বিচ্ছেদ কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রীর খেয়ালখুশির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। উদার মতানুসারে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একমাত্র শেষ উপায় হিসেবে সমাজ স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করবে। তবে নরনারী যদি বিবাহকে একটি নৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে গ্রহণ করে এবং দৈহিক লালসাকে দাম্পত্য-জীবনের একমাত্র বন্ধন বলে না মনে করে, তবে বিবাহ-বিচ্ছেদের সমস্যা ও প্রয়োজন সমাজে খুব কমে যাবে।

১০। পরিবারের প্রকৃতি সমাজ ও রাষ্ট্রের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। আধুনিক যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রপরিবারের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর ফলাফল ভালও হয়েছে, মন্দও হয়েছে। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে পরিবার ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, আবার অপর দিক থেকে পরিবারের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কোন কোন লেখক প্লেটোর (*Plato*) মত সমর্থন করে বলেন যে, সমাজের যে পরিস্থিতিতে পরিবারের প্রয়োজন ছিল, তা এখন আর নেই; সেজন্য পরিবার এখন নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। সময়ে সময়ে ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে পরিবার বা সমাজের অন্যান্য অঙ্গ ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের অসংগতি ঘটলেও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য পরিবার একান্ত প্রয়োজন। ইতিহাস এই একই সাক্ষ্য দেয়। শুধু সামাজিক জীব নয় জন্য এবং শিশুর যথার্থ কল্যাণের জন্য পুরুষ ও স্ত্রীর মিলিত স্থায়ী সংগঠন হিসেবে পরিবার সমাজের পক্ষে অপরিহার্য। সুষ্ঠু পারিবারিক জীবনই সমাজ ও রাষ্ট্রের যথার্থ সুদৃঢ় ভিত্তি।

১১। পরিবারের নির্দিষ্ট কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—(১) জৈবিক, (২) অর্থনৈতিক, (৩) শিক্ষামূলক, (৪) রক্ষণমূলক, (৫) স্নেহ সম্পর্কীয়, (৬) ধর্ম-সম্পর্কীয়, (৭) আমোদ-প্রমোদ

সংক্রান্ত, (৮) মর্যাদাপ্রদান সম্পর্কীয়। জৈবিক এবং স্নেহমূলক কার্যাবলী ছাড়া, অন্যান্য কার্যাবলী বর্তমানে সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। এর ফলে পরিবারের সংহতি ও ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং সমাজের ও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের উপর পরিবারের কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছে।

১২। পরিবার হল স্বামী-স্ত্রীর আত্মোৎকর্ষের কেন্দ্র এবং সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাকে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষাদান তাদের মহান কর্তব্য। শিশুর মন অতি অনুকরণপ্রবণ এবং তার মানসিক বৃত্তি অতি কোমল ও সূক্ষ্ম। এজন্য পরিবারই শিশুর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাস্থল এবং মাতাপিতাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষিকা। সুতরাং পরিবারের শিক্ষামূলক কাজের গুরুত্ব অতি বেশি।

পরিবারের অর্থনৈতিক কাজও খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেজন্য পিতাকেই সাধারণতঃ অধিক দায়িত্ব বহন করতে হয়।

১৪। পরিবারের কয়েকটি অনুপযোগিতা আছে। যেমন, (ক) বর্তমানে শিল্পোন্নতির যুগে ব্যক্তির পারিবারিক আকর্ষণ বেশি থাকলে সে প্রয়োজনানুসারে পরিবার ত্যাগ করে যেখানে সেখানে যেতে পারে না। (খ) রাষ্ট্রের আদর্শের সঙ্গে পরিবারের আদর্শের বিরোধ দেখা দিলে সেরকম পরিবার রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। (গ) ব্যক্তির পারিবারিক আকর্ষণ অধিক হলে সে বৃহত্তর সমাজের দাবী উপেক্ষা করতে পারে। (ঘ) পারিবারিক প্রয়োজন বিশেষ করে আর্থিক প্রয়োজন, অনেক সময় ব্যক্তির সাংস্কৃতিক আকর্ষণ; যেমন—সংগীত, শিল্পকলা প্রভৃতিকে ব্যাহত করে। কিন্তু পরিবারের এ সব অনুপযোগিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সমাজের দোষযুক্ত বিধি-ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত হয় এবং যদি ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠিত হয় তবে পরিবারের এসব অনুপযোগিতা নাও থাকতে পারে।

১৫। মাতাপিতা যদি নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক হয় তবে পূর্বোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় অনুপযোগিতা থেকে পরিবার মুক্ত থাকতে পারে। পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে তৃতীয় ও চতুর্থ অনুপযোগিতাকে সামাজিক সুব্যবস্থার দ্বারা পরিহার করা যায়। মোট কথা, কিছু দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পরিবার হচ্ছে সুখ ও সৌন্দর্যের অনন্ত উৎস এবং এই পরিবারকে নষ্ট হতে দিলে তার বিষময় ফল হবে সুদূরপ্রসারী।

সপ্তম অধ্যায়

সম্প্রদায়

(Community)

১। সম্প্রদায় ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Community and Society):

ইংরেজী 'Society' এবং 'Community' শব্দ দুটিকে অনেকেই সমার্থক মনে করেন। ম্যাকাইভার (*MacIver*) তাঁর *Community* গ্রন্থে[1] উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান তা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে 'Society' বা 'সমাজ' কথাটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করলে বোঝায় মানুষের ইচ্ছাকৃত যে-কোন পারস্পরিক সম্পর্ক (every willed relationship of man to man)। 'Community' বা 'সম্প্রদায়' বলতে তিনি বোঝেন সংঘবদ্ধ জীবন-যাপনের জন্য একটি স্থান বা অঞ্চল, যেমন—গ্রাম, শহর, জেলা, দেশ বা তার চেয়েও বড় কোন অঞ্চল যেখানে অবস্থিত এমন কোন জনসমষ্টি যার ব্যক্তিদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য (common characteristics), যেমন—আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদি বর্তমান আছে। অবশ্য একটি সম্প্রদায় অন্য আর একটি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অংশ হতে পারে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য সে পার্থক্য জাতিগত নয়, মাত্রাগত।

২। সম্প্রদায় বলতে কি বুঝি? (What is a Community):

সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা

ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver* ও *Page*) সম্প্রদায়ের (Community) সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, "যখন কোন ছোট বা বড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সভ্যরা এমনভাবে বসবাস করে যে তারা কোন বিশেষ স্বার্থের অংশীদার না হয়ে সাধারণ জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে, তখন সেই গোষ্ঠীকে আমরা সম্প্রদায়

1. *MacIver* : Community, Page 28

বলি।[1]" যেমন—গ্রাম্য সম্প্রদায়, শহুরে সম্প্রদায় ইত্যাদি। তাদের মতে সম্প্রদায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, এর মধ্যে মানুষের সবরকম সামাজিক সম্পর্ককে খুঁজে পাওয়া যাবে। মানুষের পক্ষে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে তার সব প্রয়োজন মেটান সম্ভব নয়, কিন্তু সে কোন উপজাতির (Tribe) অন্তর্ভুক্ত হলে তা মেটান সম্ভব।

ম্যাকাইভার (*MacIver*)-এর মতে সম্প্রদায়ের ভিত্তি হল দুটি। যথা—

(ক) **অঞ্চল** (Locality) : যে কোন সম্প্রদায় একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে। এমন কি জিপসীদের মতো ভবঘুরে যাযাবরের দলের বসবাস করার (সাময়িক হলেও) একটি বিশেষ অঞ্চল আছে। একই অঞ্চলে বসবাসকারী, সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তি একটি নিবিড় সমাজবন্ধনে বাঁধা। সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যে অঞ্চলে বসবাস করে, ক্রমশঃ সেই অঞ্চলে তাদের প্রয়োজনগুলি মেটাবার ব্যবস্থা করে নেয়। সেই নির্দিষ্ট অঞ্চল ক্রমশঃ তাদের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে সক্ষম হয়।

সম্প্রদায়ের ভিত্তি

(খ) **স্বাজাত্যবোধ** (Community Sentiment) :

একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতা (Feeling of belonging together)। বস্তুত ; একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে ভাষাগত, আচরণগত, রীতিগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ম্যাকাইভার-এর অভিমতানুসারে এই স্বাজাত্যবোধ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত অথচ তিনটি পৃথক অনুভূতির বা মনোভাবের সংমিশ্রণে গঠিত। এই তিনটি অনুভূতি বা মনোভাব হল, 'আমরা' মনোভাব ('We'-feeling), 'নির্দিষ্ট কর্ম করার মনোভাব (Role-feeling) এবং 'নির্ভরতার' মনোভাব (Dependency-feeling)। 'আমরা' এই মনোভাবের জন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের

---

1. "Whenever the members of any group, small or big, live together in such a way that they share not this or that particular interest but the basic conditions of common life, we call that group community."

—*MacIver and Page* : Society Page 8.

সঙ্গে নিজেদের একাত্মতা অনুভব করে। একই উদ্দেশ্যের উপস্থিতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। নির্দিষ্ট কর্ম করার মনোভাবের জন্য সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি মনে করে যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে তার একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে, সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে তাকে কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। 'নির্ভরতার' মনোভাবের জন্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি মনে করে যে, তার দৈহিক এবং মানসিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য সে সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর। এই স্বাজাত্যবোধ স্বত:স্ফূর্তভাবেই সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভূত হয়। কিন্তু সময় সময় এই স্বাজাত্যবোধ সৃষ্টি করার জন্য সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করা হয়।

সমাজের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের সম্প্রদায় দেখা যায়, প্রাচীনকালে শিকারী সম্প্রদায়ের (Hunting Community) অস্তিত্ব ছিল, যারা খাদ্যের অন্বেষণে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। অর্থাৎ এদের জীবনযাপনের রীতি ছিল যাযাবরদের মতো।

সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রূপ

মেষপালক সম্প্রদায় (Pastoral Community) শিকারী সম্প্রদায়ের তুলনায় বৃহত্তর। এই সম্প্রদায়ের কাজ ছিল পশু-পালন। এই সম্প্রদায় বিশেষ করে তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চলেই বসবাস করত, যেহেতু এই অঞ্চলই পশু-পালনের কাজের জন্য অধিক উপযোগী। শিকারী সম্প্রদায়ের তুলনায় এই মেষপালক সম্প্রদায় অধিকতর স্থায়ী ভাবে এক স্থানে বসবাস করত। আবার মেষপালক সম্প্রদায়ের তুলনায় কৃষক সম্প্রদায় অধিকতর স্থায়ী এবং অধিকতর সংগঠিত সম্প্রদায়। কৃষিকার্য সম্পাদন করার জন্য কৃষকদের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হত যার জন্য তারা তাদের জমির সঙ্গে বাঁধা পড়ে যেত এবং কৃষকের এক স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হত। গ্রাম্য সম্প্রদায় হল সবচেয়ে আদিম সম্প্রদায়।

গ্রাম্য সম্প্রদায়ই আদিম সম্প্রদায়

সম্প্রদায় ছোটও হতে পারে, বড়ও হতে পারে। মানুষের পক্ষে উভয় প্রকার সম্প্রদায়েরই প্রয়োজন আছে। বস্তুতঃ, বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয় না। সমাজের মধ্যে গ্রাম্য

সম্প্রদায় ও শহুরে সম্প্রদায় পাশাপাশিই অবস্থান করে। ছোট সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নিবিড় যোগাযোগ সম্ভব, কিন্তু বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক পরোক্ষ এবং বাহ্য, বস্তুতঃ একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় একটি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যেমন—একটি গ্রাম একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রদায় স্থিতিশীল নয়, গতিশীল; সে সবসময়ই এগিয়ে চলেছে। সমাজ বিজ্ঞানী নিউমিয়ার (*Neumeyer*) বলেন, "সম্প্রদায় হয় বেড়ে চলে এবং সামনের দিকে এগিয়ে চলে, অথবা সে পিছিয়ে পড়ে (either it grows and moves forward or it retrogresses)"।

উপগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব, জাতি-বিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ সম্প্রদায়ের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করে

ম্যাকাইভার (*MacIver*)-এর মতে উদ্দেশ্য এবং স্বার্থের অভিন্নতাই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগতি রক্ষা করে। এজন্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত উপগোষ্ঠীর (Sub-groups) স্বার্থের মধ্যে যদি বিরোধ বা দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাহলে সম্প্রদায়ের সংহতির মধ্যে ভাঙন ধরে। সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিবিভাগ সম্প্রদায়ের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক। আরও এক কারণে সম্প্রদায়ের সংহতি বিনষ্ট হতে পারে—সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কোন একটি গোষ্ঠী যদি অন্য গোষ্ঠীর উপর নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে সম্প্রদায়ের মধ্যে যে শান্তি তা বিনষ্ট হয় এবং সম্প্রদায়ের সংহতিও নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রভুত্ব নানাপ্রকার হতে পারে; যেমন—সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক। সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী যদি নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি সংগঠন বলে মনে করে অপরের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে তাহলে গোষ্ঠীর মধ্যে যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ তা আর সম্ভব হয় না। তার ফলেও সম্প্রদায়ের ঐক্য ও সংহতি অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হতে পারে। অবশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিবিভাগের অস্তিত্ব থাকলেও একই জাতীয় আচার, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান, ধর্ম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে পারে। সেজন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ থাকলেও একই সাধারণ জীবনযাত্রার রীতি সম্প্রদায়কে স্থায়ী ও উন্নত করতে পারে।

৩। সংঘ এবং সম্প্রদায় (Association and Community):

সংঘ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। সংঘ কাকে বলে? ম্যাকাইভার (*MacIver*) বলেন, "সমবেতভাবে এক বা একাধিক উদ্দেশ্য অনুসরণ করার জন্য কোন গোষ্ঠী যখন সংগঠিত হয় তখনই তাকে সংঘ বলা হয়।"

মানুষ তিনভাবে তার উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে। প্রতিটি মানুষ অপরের কথা চিন্তা করে **স্বতন্ত্রভাবে** নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য সচেষ্ট হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষ অপরের সঙ্গে **বিরোধিতা করে** নিজ উদ্দেশ্য-সাধন করতে পারে। তৃতীয়তঃ, অনেকে **সমবেতভাবে** তাদের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সচেষ্ট হতে পারে। যখন কোন গোষ্ঠী সমবেতভাবে কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সংগঠিত হয় তখনই সংঘের আবির্ভাব ঘটে। যেমন —কোন ফুটবল ক্লাব, শিক্ষা সমিতি, সৈন্যদল ইত্যাদি। সৈন্যদল একটি সংঘ, যেহেতু জাতিকে বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করাই সৈনিকদের উদ্দেশ্য।

যে কোন জনসমষ্টিকেই সংঘ বলে অভিহিত করা চলে না। সংগঠন ছাড়াও মানুষ একস্থানে সমবেত হতে পারে; কিন্তু তাকে কোনমতেই সংঘ বলা যাবে না। পথের জনতাও জনসমষ্টি। তাকে সংঘ হিসেবে অভিহিত করা চলবে না, যেহেতু তার কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু যখনই পথের জনতা কোন কিছুর উদ্দেশ্যে নিজেদের সংগঠিত করে তখনই সংঘের আবির্ভাব ঘটে।

(সংঘ হল এমন একটি জনসমষ্টি যা এক বা একাধিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয় বা সংগঠিত হয়। সম্প্রদায় হল স্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে এবং যাদের সভ্যদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ আছে। সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা কোন বিশেষ স্বার্থের অংশীদার না হয়ে সাধারণ জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে। গ্রাম্য সম্প্রদায়, শহুরে সম্প্রদায় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদাহরণ। সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল একাধিক। সংঘের মধ্যে মানুষ তার সব সামাজিক সম্পর্ক খুঁজে পায় না। ধরা যাক, ফুটবল ক্লাব। এই সংঘের অন্তর্ভুক্ত সভ্যবৃন্দ সংঘের মধ্যে থেকে তাদের কোন উদ্দেশ্যসাধন

সম্প্রদায় ও সংঘ

(যেমন—খেলাধূলা) করে। সংঘের বাইরে অসংখ্য প্রয়োজন আছে যা তারা এই সংঘের মধ্যে পেতে পারে না। সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষ তার সবরকম সামাজিক সম্পর্ক খুঁজে পায়। সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই তাদের উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে। এ দিক থেকে সম্প্রদায় হল স্বয়ংসম্পূর্ণ (Self-contained)। কিন্তু সংঘের অন্তর্ভুক্ত সভ্যরা তাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সংঘকে উপায় হিসেবে গ্রহণ করে এবং সে হিসেবে উদ্দেশ্য হল সংঘের বহির্ভূত বিষয়।

সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সংঘকে সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা যেতে পারে না। এ হল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একটা সংগঠন। একাধিক সংঘ একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যার ফলে সংঘের সভ্যরা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয় উদ্দেশ্য অনুসরণ করতে পারে। সংঘের থেকে সম্প্রদায় অনেক বেশী ব্যাপক। ধরা যাক, একটা ক্রিকেট ক্লাব। ক্রিকেট ক্লাব সম্পর্কে এমন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ক্লাবটা কিসের জন্য, কি কারণে এর অস্তিত্ব, এর লক্ষ্য কি? এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরও আমরা পেতে পারি। কিন্তু সম্প্রদায় সম্পর্কে এ জাতীয় প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া, সংঘের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। কোন ব্যক্তি যদি সেই উদ্দেশ্য লাভ করতে চায় তবেই সংঘের সভ্য হয়। যে লোক খেলাধূলা ভালবাসে, সে কোন ক্রীড়া-সংঘের সভ্য হয়। যে গানবাজনা ভালবাসে বা পছন্দ করে সে কোন সংগীত প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়। এ কারণে ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver and Page*) বলেন, "কোন সংঘের সভ্য হওয়ার তাৎপর্য সীমিত। একথা সত্য যে, কোন একটি সংঘ আমাদের সম্পূর্ণ আনুগত্য আকর্ষণ করতে পারে…কিন্তু বিশেষ ধরনের কোন সুবিধার জন্যই আমরা সংঘের অন্তর্ভুক্ত হই।"[1] একই সম্প্রদায়ে একাধিক সংঘ থাকতে পারে এবং একই ব্যক্তির পক্ষে একাধিক সংঘের সভ্য হওয়ার পথে কোন বাধা নেই।

1. "Membership in an association has a limited significance. It is true that an association may engage our whole devotion...But we belong to associations only by virtue of some specific interests that we possess."

—*MacIver and Page*: Society, Page 12.

কোন একটি সম্প্রদায় বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। প্রাচীনকালে সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে যে প্রভেদ তা সুনির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু বর্তমানে সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং মানুষের প্রয়োজন বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাজাতীয় সামাজিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে সম্প্রদায় ও সংঘের প্রভেদটুকু আর সুনির্দিষ্ট নেই।

কোন একটি গোষ্ঠী বা জনসমষ্টি কি সম্প্রদায়, না সংঘ—এ স্থির করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। সংঘের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সংখ্যা যতই বেড়ে যেতে থাকে ততই সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার পার্থক্য কমে আসে। কোন ধর্মীয় সংঘকে সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা যেতে পারে না। ভারতে যে হিন্দু বা মুসলমান গোষ্ঠী আছে, তাদের অনেক সময় সম্প্রদায় বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের সম্প্রদায় বলে গণ্য করা যায় না। একই কারণে এসব গোষ্ঠী পরস্পরের উপর এবং বৃহত্তর পরিবেশের উপর নির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

৪। বিশ্ব-সম্প্রদায়ের সম্ভাবনা (Possibility of a world Community):

সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা। যেহেতু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা সাধারণ জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্প্রদায়ের মধ্যেই খুঁজে পায়, সেহেতু মানুষ সম্পূর্ণভাবে সম্প্রদায়ের মধ্যে তার জীবন অতিবাহিত করতে পারে। প্রাচীন জগতে এইরকম স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় সংখ্যায় অনেক ছিল। কিন্তু আধুনিক জগতে কয়েকটি বৃহৎ জাতিকে বাদ দিলে সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায় তার স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার বৈশিষ্ট্যটি হারিয়েছে এবং সম্প্রদায়গুলি পরস্পরের উপর নির্ভর হয়ে পড়েছে।

আধুনিক জগতে স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় সংখ্যায় কম

আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতি নির্দেশ করে যে, যতদিন পর্যন্ত না একটি বিশ্ব-সম্প্রদায় গঠিত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন সম্প্রদায়ের দেখা পাব না। ওয়েনডেল্ উইলকি (*Wendell*

Wilkie) তাঁর 'One World' গ্রন্থে এই প্রকার একটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন হল, কোন বিশ্ব-সম্প্রদায়ের সংগঠন কি সম্ভব? কোন বিশ্ব-সম্প্রদায়কে সম্প্রদায়রূপে তখনই গণ্য করা সম্ভব হবে যদি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো তার দুটি বৈশিষ্ট্য থাকে,—আঞ্চলিক ঐক্য এবং আন্তর্জাতিকতার বোধ। বিশ্ব-সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক ঐক্যের কোন অসুবিধা নেই। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার সমধিক উন্নতি সাধিত হওয়াতে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে যে প্রাকৃতিক বাধাগুলি পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের পথে বাধার সৃষ্টি করত সেগুলি অনেকাংশে অপসারিত হয়েছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। বিমান ও বেতারের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলগুলি পরস্পরের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে যে, সমস্ত বিশ্বই একটি বিরাট অঞ্চলে পরিণত হয়েছে যেটি একটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সংগঠনের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু শুধুমাত্র আঞ্চলিক ঐক্যই বিশ্ব-সম্প্রদায় গঠনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। বিশ্ব-সম্প্রদায়ের সভ্যদের মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য বা আন্তর্জাতিকতা বোধ অর্থাৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতা যদি না জাগে তাহলে বিশ্ব-সম্প্রদায় কিভাবে গঠিত হতে পারে? কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যক্তিদের মধ্যে কোন আন্তর্জাতিক সচেতনতা বা বোধ এখনও পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত হয়নি এবং জাতিসংঘ[1] (League of Nations) বা সংযুক্ত জাতিপুঞ্জ (United Nations) বা অনুরূপ কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এই আন্তর্জাতিক সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারে নি। বিশ্ব সম্প্রদায়ের সম্ভাবনার কথা কোন কোন মনীষী বা চিন্তাবিদ, কোন কোন ক্ষুদ্র ও

বিশ্ব-সম্প্রদায় গঠনের জন্য আঞ্চলিক ঐক্য সুব হলেও আন্তর্জাতিক চেতনার অভাব

বিশ্ব-সম্প্রদায় গঠনের পথে বাধা

1 আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার জন্য ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এর অস্তিত্ব নেই।

দুর্বল জাতি চিন্তা করেছেন, কিন্তু পৃথিবীর জনসংখ্যার অধিকাংশই এখনও আন্তর্জাতিক চেতনায় উদ্বোধিত না হয়ে জাতীয় চেতনার বশবর্তী হয়ে কার্য করছে, কোন বিশ্ব-সম্প্রদায় গঠনের জন্য সক্রিয় পন্থা অনুসরণ করছে না।

জগতের শক্তিশালী জাতিগুলি সচেষ্ট হলে বিশ্ব-সম্প্রদায় গঠন সম্ভব।

বর্তমান সভ্য জগতের শক্তিশালী জাতিগুলি যারা বিশ্ব-সম্প্রদায় গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে, এই ব্যাপারে একান্তভাবে উদাসীন। জাতীয়তা বা দেশাত্মবোধ আন্তর্জাতিক ঐক্যের পথে একটি প্রধান অন্তরায়। বড় বড় জাতিগুলি আন্তর্জাতিক কল্যাণ সৃষ্টির জন্য প্রয়াসী না হয়ে, জাতীয় স্বার্থ লাভের জন্যই সক্রিয়। কাজেই বিশ্ব-সম্প্রদায় গঠনের জন্য আঞ্চলিক ঐক্যের অভাব না ঘটলেও মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যের একান্ত অভাব। বর্তমান জগতের শক্তিশালী জাতিগুলি বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক চেতনা সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলে বিশ্ব-সম্প্রদায় গঠনের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বাস্তবতা লাভ করতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

১। সমাজ ও সম্প্রদায়ের পার্থক্য আছে। যখন কোন ছোট বা বড় গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য একত্র হয়ে বাস করে তখন তাদের বলে সম্প্রদায়। সম্প্রদায়ের ভিত্তি দুটি, নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস ও স্বাজাত্যবোধ বা ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতা।

সম্প্রদায় বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। যেমন—শিকারী সম্প্রদায়, মেষপালক সম্প্রদায়। গ্রাম সম্প্রদায়ই আদিম সম্প্রদায়। সম্প্রদায়ভুক্ত উপগোষ্ঠীদের দ্বন্দ্ব, বিরোধিতা প্রভৃতি সমাজের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করে। এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করলে সামাজিক ঐক্য ব্যাহত হয়। তবে এক সাধারণ জীবনযাত্রা সামাজিক বিরোধিতাকে দূর করে সমাজকে রক্ষা ও উন্নত করতে পারে।

২। সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। কোন গোষ্ঠী যখন সমবেতভাবে এক ব একাধিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সংগঠিত হয় তখন তাকে সংঘ বলে। যে-কোন জনসমষ্টিই সংঘ নয়, পথের জনতা সংঘ নয়। সংঘের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকা চাই। কিন্তু সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষ তার সবরকম সামাজিক সম্পর্ক খুঁজে পায় এবং সংঘ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একটি সংগঠন। একটা সম্প্রদায় আবার বৃহত্তর কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৩। প্রশ্ন হল কোন বিশ্ব-সম্প্রদায়ের সংগঠন কি সম্ভব, বিশ্ব-সম্প্রদায় গঠনের জন্য আঞ্চলিক ঐক্য সম্ভব হলেও আন্তর্জাতিক চেতনার অভাব আছে। জগতের শক্তিশালী জাতিগুলি সচেষ্ট হলে বিশ্ব-সম্প্রদায় গঠন সম্ভব।

অষ্টম অধ্যায়

রাষ্ট্র

(The State)

১। রাষ্ট্র শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার (Various uses of the term 'State')

'রাষ্ট্র' শব্দটির সঙ্গে যদিও আমরা বিশেষভাবে পরিচিত, তবু 'রাষ্ট্রের' সংজ্ঞা নির্ণয় করা খুব সহজসাধ্য নয়। বস্তুতঃ, অনেক সময় রাষ্ট্র কথাটিকে জাতি, সম্প্রদায়, সরকার বা দেশ অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্র এগুলি থেকে স্বতন্ত্র। সে কারণে সম্প্রদায়, জনসাধারণ, দেশ, জাতি, খণ্ড-জাতি, সরকার রাষ্ট্র এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রভৃতি শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন।

(ক) **সমাজ** (Society): যখন কিছু লোক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয় তখনই তাকে সমাজ বলা হয়। ভিন্ন ভাষায়, মানুষের ইচ্ছাকৃত যে-কোন পারস্পরিক সম্পর্কই হল সমাজ। যেমন, আমরা বলি যৌথ সমাজ (Co-operative Society), বৈজ্ঞানিক সমাজ (Scientific Society) ইত্যাদি। এরূপ সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে সকল সময়ই ব্যক্তিগত সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।

(খ) **সম্প্রদায়** (Community): সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও বহু ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয় এবং এরূপ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হল একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থান এবং এর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বর্তমান কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব (common characteristics)। একই উদ্দেশ্য বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। যেমন—গ্রাম্য সম্প্রদায়, সমাজতন্ত্রবাদী সম্প্রদায় ইত্যাদি। অনেক সময় আমরা 'বিশ্ব-সম্প্রদায়' কথাও ব্যবহার করে থাকি। সমগ্র মনুষ্যজাতি যদি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একই

ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধনের পারস্পরিক সম্পর্কে যুক্ত হতে পারে, তাহলে সমগ্র মনুষ্য-জাতিকেও এক মনুষ্য সম্প্রদায় হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।

(গ) জনসাধারণ (People): যখন কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে ঐতিহ্যমূলক ও ভাগবত ঐক্য পরিলক্ষিত হয়, তখনই তাদের আমরা জনসাধারণ বলি। জনসাধারণ সকল সময়ই যে একত্রে বসবাস করে তা নয়। তবে ভাষায়, আচার-ব্যবহারে, ধর্মীয় অনুভূতি, অধিকারবোধ ও অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সমচেতনা—এগুলিই বহু লোককে জনসাধারণে পরিণত করে। যেমন —ইহুদী জনসাধারণ সকল সময়ই একত্রে বসবাস করে নি; তবু কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ভাষা, আচার-ব্যবহারের ঐক্য তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

(ঘ) দেশ (Country): দেশ বলতে বুঝি সেই ভূখণ্ড যেখানে কোন জাতি বসবাস করে। দেশ কথাটি একটু দুর্বোধ্য এবং যেভাবে দেশ কথাটিকে ব্যবহার করা হয় তাতে মনে হয় যে, এর মধ্যে ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক উভয় উপাদানই বর্তমান। সময় সময় দেশ কথাটিকে জাতির সঙ্গে একার্থক বলে মনে করা হয়। গ্রেটব্রিটেনকে দেশ বলে অভিহিত করা হলেও গ্রেটব্রিটেনের অন্তর্ভুক্ত ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ড ভিন্ন দেশ। আয়ারল্যাণ্ডকে গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত করা হলেও উভয়কে একই দেশরূপে গণ্য করা যেতে পারে না।

(ঙ) বংশ (Race): প্রাকৃতিক গঠন, মনোভাব, অভ্যাস, চিন্তাধারা অনুভূতি ও কার্যকলাপ কতকগুলি লোককে অন্যান্য লোক থেকে পৃথক করে। এসব দৈহিক, মানসিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার জন্য এসব লোককে একই বংশগত বলে অভিহিত করা হয়। যেমন, আর্য বা দ্রাবিড় বংশ। অনেক ক্ষেত্রে বংশগত পার্থক্য এত সুস্পষ্ট যে, এক বংশকে অপর বংশ থেকে পৃথক করে নেওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। যেমন, নেপালীদের সহজেই কাবলীওয়ালাদের থেকে পৃথক করে নেওয়া যায়। কিন্তু সব সময় যে বংশগত বৈশিষ্ট্য লোকদের পৃথক করে রাখবে এ রকম কোন কথা নেই। যেমন, দার্জিলিং অঞ্চলে অনেক নেপালী আছে যারা বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে নিজেদের সুন্দরভাবে মিশিয়ে দিয়েছে।

(চ) **জাতি (Nation):** জাতি হল গভীর রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমষ্টি যা সাধারণতঃ কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়িভাবে বসবাস করে এবং যাদের পরস্পরের মধ্যে ধর্মগত, সংস্কৃতিগত, ঐতিহ্যগত, ভাষা ও সাহিত্যগত প্রভৃতি কোন-না-কোন বা ঐ সকল বিষয়ে ঐক্য বর্তমান। জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রাজনৈতিক চেতনা এবং ঐক্য—চেতনা এবং ঐক্যবোধের জন্য তারা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে বা গঠন করার জন্য সচেষ্ট হয়, অথবা কোন সময়ে তারা রাষ্ট্র গঠন করেছিল। এজন্য রাজনৈতিক চেতনা ও ঐক্যবোধই জাতীয়তাবোধের ভিত্তি। গত ইংরেজ শাসনের আমলে যদিও ভারতবাসী কোন রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হয় নি তবুও তাদের মধ্যে বংশগত, ঐতিহ্যগত, ভাষাগত, ধর্মগত ও সাহিত্যগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এক সুমহান রাজনৈতিক চেতনা ও ঐক্যবোধ ভারতবাসীকে একটি জাতিতে পরিণত করেছিল।

(ছ) **খণ্ড-জাতি (Nationality):** খণ্ড-জাতি এমন একটি দল যার ব্যক্তিরা গোষ্ঠীগত, ভাষাগত বা অতীতের কোন বন্ধন বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। খণ্ড-জাতির লোকেরা যে একই ভূখণ্ডে বাস করবে এ রকম কোন কথা নেই। যেমন, বহু বাঙ্গালী ব্রহ্মদেশে এবং আন্দামানে বংশানুক্রমে বাস করা সত্ত্বেও নিজেদের বাঙালী বলে থাকে, যদিও এদের আচার-ব্যবহার স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে অনেক পরিমাণে মিলে গেছে। এজন্য জাতি এবং খণ্ড-জাতিকে অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার করা হলেও, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান।

(জ) **রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র বা সরকার (Government):** জনসাধারণ অনুমোদিত আইনের সহায়তায় সুশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করে। এই আইন প্রয়োগ করার জন্য এবং আইন লংঘনকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য একটি শাসনযন্ত্রের বা সরকারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যে কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন করে এবং আইনগুলিকে প্রয়োগ করে সেই কর্তৃপক্ষই হল সরকার। এই সরকারের কর্তৃত্ব এক বা একাধিক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকতে পারে এবং এই সরকারের শাসনের কর্তৃত্ব নিরপেক্ষ বা শর্তাধীন হতে পারে।

তাছাড়া, এই কর্তৃত্ব সমস্ত জাতির উপর এবং জাতির অংশবিশেষের উপর প্রযুক্ত হতে পারে। কাজেই সরকার এবং রাষ্ট্র এক ও অভিন্ন নয়।

২। রাষ্ট্র কাকে বলে? (What is a State ?)

বিভিন্ন লোক রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"রাষ্ট্র হল এমন একটি জনসমষ্টি যা কোন একটি সরকারের অধীন, যে সরকার অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না।" আমেরিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি উইলসন (*W. Wilson*) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনানুসারে সংগঠিত জনসমষ্টিই হল রাষ্ট্র।" অধ্যাপক হল (*Hall*) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে সর্বপ্রকার মুক্ত যে জনসমাজ তাই রাষ্ট্র।" অধ্যাপক গার্নার (*Prof. Garner*) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এইভাবে নির্দেশ করেছেন: "রাষ্ট্র হল বহু সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা গঠিত এমন এক জনসমষ্টি যা একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসবাস করে, যা সম্পূর্ণভাবে বা বহুল পরিমাণে বহিঃশক্তির শাসনমুক্ত এবং যার একটি সুসংগঠিত শাসনব্যবস্থা আছে, যার প্রতি জনসমষ্টির অধিকাংশ স্বাভাবিক আনুগত্য প্রদর্শন করে।"[1] গার্নার (*Garner*)-এর সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রের চারিটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়, যথা—(i) জনসমষ্টি, (ii) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (iii) সরকার এবং (iv) সার্বভৌমিকতা।

(i) **জনসমষ্টি (Population):** জনসমষ্টি ছাড়া কোন রাষ্ট্রের গঠন সম্ভব নয়। জনহীন শূন্যতার মাঝখানে কোন রাষ্ট্রের উদ্ভবের কথা কল্পনা করা যায় না। বিশৃঙ্খল জনসমষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। সুতরাং জনসংখ্যা রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান। রাষ্ট্রের জনসমষ্টির কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। জনসংখ্যা কমও হতে পারে, বেশীও হতে পারে।

1. **"A State is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so of external control and possessing an organised Government to which a great body of inhabitants render habitual obedience."—*Garner.***

(ii) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Territory): রাষ্ট্রের জনসমষ্টির একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী নয়, সেহেতু যাযাবর জাতির পক্ষে রাষ্ট্রগঠন করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের জনসমষ্টির মতো রাষ্ট্রের আয়তনেরও কোন নির্দিষ্ট সীমা সেই। রাষ্ট্র ক্ষুদ্রায়তনের অথবা বৃহদায়তনেরও হতে পারে।

(iii) সরকার বা শাসনতন্ত্র (Government): জনসমষ্টি যদি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে তাহলেই রাষ্ট্র গঠিত হয় না। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কোন একটি শাসনযন্ত্র বা সরকারের প্রয়োজন। সরকার রাষ্ট্রের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, নীতি ও আইন-কানুনকে কার্যে পরিণত করে। আইন-প্রণয়ন, শাসন ও বিচার—সরকারের এই তিনটি প্রধান বিভাগ বর্তমান। সরকার ছাড়া কোন রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। কোন কারণে যদি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়ে তাহলে রাষ্ট্রে দেখা দেয় অরাজকতা এবং জনসাধারণের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা থাকে না।

অনেক সময় রাষ্ট্র (State) এবং সরকারকে (Government) অভিন্ন মনে করা হয়। কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সরকারের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। সরকার রাষ্ট্রের অংশবিশেষ। সুতরাং সমগ্র রাষ্ট্রের সঙ্গে সরকারকে এক করে দেখার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। তাছাড়া, দেশের জনসমষ্টিকে নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়, আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক নিয়েই সরকার গঠিত হয়। দেশের শাসনযন্ত্র বা সরকারের নানারকম পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র হল মোটামুটি স্থায়ী। শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন ঘটলেও রাষ্ট্রের পরিবর্তন ঘটে না। রাষ্ট্র হল বস্তুনিরপেক্ষ, সরকার হল বাস্তব ঘটনা। সরকারের কার্যাবলী জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করে এবং সরকারের সংস্পর্শে আসতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য এক, সেহেতু রাষ্ট্রের কোন প্রকারভেদ নেই। কিন্তু রাষ্ট্রের সরকার বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী গঠিত হতে পারে, সেহেতু সরকারের প্রকারভেদ আছে:

(iv) সার্বভৌমিকতা (Sovereignty): সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার দুটি দিক আছে:

প্রথমতঃ, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং সর্বপ্রকারের বহিঃশক্তির শাসন থেকে মুক্ত বা স্বাধীন থাকা। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র অধিবাসীদের উপর আইন-কানুন প্রয়োগ করতে পারে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র চরম ক্ষমতার অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র সর্বপ্রকার বহিঃশাসন বা নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে বৈদেশিক ব্যাপারে নিজ নীতি নির্ধারণ করতে পারে। অবশ্য অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নানাপ্রকার চুক্তি করার জন্য রাষ্ট্রকে তার নিজের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করতে হয়; তবে তার অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রের কোন সার্বভৌমিকতা নেই। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "এর সার্বভৌমিকতার পক্ষে যা প্রয়োজন তাহল, যেসব সীমায় দ্বারা এ সীমিত হয় সেগুলি সে নিজেই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে।"[1] রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণেরই ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র বা সরকার জনসাধারণের পক্ষ থেকেই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন।

গার্নারের সংজ্ঞা রাষ্ট্রের দুটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে—একটি সামাজিক, অপরটি রাজনৈতিক, রাষ্ট্র সমাজ এবং এ ছাড়াও আরও কিছু। এই আরও কিছু হল রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা। এই কারণেই গিসবার্ট (*Gisbert*) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, রাষ্ট্র হল সমাজের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংগঠন (The supreme regulating structure of the Community)।

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি (Origin of the State) :

মানুষের সংঘবদ্ধতাই রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের উদ্ভবের কারণ। বর্তমানে রাষ্ট্রের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হলেও কিছুদিন পূর্বেও তা সম্ভবপর হয়নি। কাজেই অনেক কল্পনাপ্রসূত মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সম্পর্কে বর্তমানে গৃহীত মতবাদটি আলোচনার পূর্বে আমরা অন্যান্য কয়েকটি মতবাদও আলোচনা করব।

1. *"All that is essential to its sovereignty is that the restrictions by which it is limited should have been voluntarily adopted."*

—*Mackenzie : Outlines of Social Philosophy, Page 130.*

(ক) ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ (Theory of Divine Origin) :

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে এইটিই সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট। ঈশ্বর এই পৃথিবীর কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে তাঁর ইচ্ছাকে প্রকাশ করেন। এই প্রতিনিধিরাই সাধারণের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রকাশ করেন এবং সাধারণের নায়ক হিসেবে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই মতবাদের চরম রূপ হল, রাজা যেহেতু ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তিনি একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই দায়ী। প্রজাদের কাছে তাঁর কোন দায়িত্ব নেই। রাজাকে অমান্য করার অর্থ ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অমান্য করা।

রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি

সমালোচনা: প্রথমতঃ, ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁর নির্বাচিত কয়েকজন প্রতিনিধির কাছেই কেবলমাত্র প্রকাশিত হয়েছিল, এটি বিশ্বাসের ব্যাপার, এর সমর্থনে কোন যুক্তিসংগত তথ্য উপস্থাপিত হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, রাজা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট দায়ী, প্রজাদের নিকট নয়, এই বিষয়টি স্বীকার করে নিলে স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন করতে হয়। তৃতীয়তঃ, প্রজা উৎপীড়নকারী রাজাও ঈশ্বরের প্রতিনিধি, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসংগত নয়। চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে জনসাধারণের ইচ্ছার যে একটা ভূমিকা আছে, এই মতবাদ সেই বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে, যা যুক্তির দ্বারা স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

(খ) বল প্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force) :

এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে রয়েছে পাশবিক বলের কর্তৃত্ব। মনুষ্য সমাজের আদিম স্তরে কেবলমাত্র বলবান ব্যক্তিই যে দুর্বল ব্যক্তিকে বশীভূত করার জন্য সচেষ্ট হয় তা নয়, বলশালী গোষ্ঠী দুর্বল গোষ্ঠীকে বশীভূত করে তার উপর কর্তৃত্ব করত। এইভাবে উপজাতির (tribes) উদ্ভব হয়। এই উপজাতির মধ্যে আবার সংঘর্ষ দেখা দিল, তখন বিজয়ী উপজাতি বিজিত উপজাতিদের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করল। উপজাতিগুলি আরও বিস্তৃতি লাভ করে রাজ্যে এবং রাজ্যগুলি ক্রমশঃ সাম্রাজ্যে পরিণত হল।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে রয়েছে পাশবিক বল

সমালোচনা : প্রথমতঃ, পাশবিক বল রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উপাদান হতে পারে, কিন্তু একমাত্র উপাদান নয়। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, ধর্মের বন্ধন, রাজনৈতিক চেতনা প্রভৃতি অন্যান্য উপাদানগুলিও রাষ্ট্রের গঠনে প্রয়োজনীয় উপাদান রূপে গণ্য। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি, পাশবিক বল নয়।

(গ) পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ : (Patriarchal and Matriarchal Theories) :

কোন কোন লেখকের মতে পরিবারের সম্প্রসারণ থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। এ সম্পর্কে দুটি মতবাদ প্রচলিত—পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে আদিমতম সমাজে পরিবারের পিতাই ছিল গৃহকর্তা এবং পিতার দিক থেকেই উত্তরাধিকার, বংশ প্রভৃতি নির্ধারিত হত। আধুনিক কালের লেখকদের মধ্যে স্যার হেনরী মেইন (*Sir Henry Maine*)-ই এই মতবাদের সমর্থক। ম্যাক্লেনান (*Mclennan*), মর্গান (*Morgan*), জেঙ্কস (*Jenks*) প্রভৃতি মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থক। এই মতবাদ অনুসারে আদিমতম সমাজে পরিবারে ছিল মাতারই কর্তৃত্ব এবং উত্তরাধিকার, বংশ প্রভৃতি মাতার দিক থেকেই নির্ধারিত হত।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পিতার এবং মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে মাতার দিক থেকেই উত্তরাধিকারীর বংশ প্রভৃতি নির্ধারিত হত।

সমালোচনা : যেসব কারণবশতঃ পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয় সেগুলি হল, প্রথমতঃ, আদিমতম সমাজে পিতৃতান্ত্রিক বা মাতৃতান্ত্রিক, কোন প্রকার পরিবারই সর্বজনীন ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, কারও কারও মতে সমাজ সংগঠনের আদিমতম রূপ হল উপজাতি (Tribe), পরিবার নয়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে রক্তের সম্বন্ধই একমাত্র উপাদান নয়, অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের যেমন রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার অস্তিত্ব আছে। চতুর্থতঃ, এই মতবাদ পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান তা উপেক্ষা করে। গার্নার (*Garner*)-এর মতে পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠন, কার্য ও

উদ্দেশ্য সকল দিক থেকেই পার্থক্য বর্তমান। উভয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে বা একটি অপরটি থেকে উদ্ভূত, এরূপ ধারণা করার পেছনে অল্পই যুক্তি রয়েছে।

(ঘ) সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory) :

এই মতবাদ অনুসারে আদিম মানুষের মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ 'প্রকৃতি রাজ্যে' (State of Nature) বাস করত। যেহেতু তখন রাষ্ট্র প্রণীত কোন আইন-কানুন ছিল না, মানুষ স্বাধীনভাবে যে যার খুশীমত চলত। কতকগুলি স্বাভাবিক আইন (Natural laws) এই সময় মানুষের যথেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু এই অবস্থায় বেশীদিন বাস করা সম্ভব নয় বলে মানুষ নিজের সুবিধার জন্য পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্রের পত্তন করল। রাষ্ট্রের উদ্ভবের পরে রাষ্ট্র প্রণীত আইন-কানুন স্বাভাবিক আইনের স্থান অধিকার করল। প্রাচীন গ্রীসের সোফিষ্ট দার্শনিকরা (Sophists) এই মতবাদ সমর্থন করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স (*Hobbes*) ও লক (*Locke*) এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক রুশো (*Rousseau*) এই মতবাদের প্রধান সমর্থক। হব্‌স-এর মতে প্রকৃতির অবস্থা হল প্রাক্-সামাজিক অবস্থা এবং এই অবস্থা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। তখন মানুষ ছিল স্বার্থপর, ক্ষমতালিপ্সু এবং বিবাদপ্রিয়। মানুষের স্বার্থপরতার জন্য মানুষের মধ্যে বিবাদ, কলহ লেগেই থাকত। ফলে, ঐ পরিবেশে মানুষের জীবন ছিল 'নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব, কদর্য, পাশবিক এবং সংকীর্ণ।' লকের মতে প্রাথমিক অবস্থা ছিল প্রাক্ রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা। এই অবস্থা ছিল শান্তি, শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতার অবস্থা। এ অবস্থায় মানুষের জীবন-যাত্রা প্রাকৃতিক আইন ও স্বাভাবিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু এই আইনের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ছিল না। এই আইন ব্যাখ্যা করার ও লঙ্ঘন করলে শাস্তি দেবার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। রুশোর মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ সুন্দর, সহজ, সরল, মুক্ত ও সুখী জীবন-যাপন করত। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা এবং মানুষের মধ্যে চিন্তার উন্মেষ এই 'প্রকৃতি রাজ্যের' সাম্য ও সুখ-শান্তি নষ্ট করল—সংঘর্ষ

সামাজিক চুক্তির ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব

বিরোধ, বিবাদ, হত্যা, অরাজকতার সৃষ্টি হল। অবশেষে মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন করে নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সমষ্টিগত ইচ্ছার অধীনস্থ করল। সমষ্টিগত ইচ্ছার দ্বারাই সমাজের সাম্য রক্ষিত হল।

সমালোচনা: প্রথমতঃ, এই মতবাদের কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাশূন্য মানুষ হঠাৎ একদিন সামাজিক চুক্তির সাহায্যে রাষ্ট্র গঠন করল, এরূপ উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ পূর্ণ স্বাধীন ছিল, এ কল্পনা যথার্থ নয়। প্রাকৃতিক অবস্থায় যথেচ্ছারিতা থাকতে পারে, প্রকৃত স্বাধীনতা থাকতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এ মতবাদ অযৌক্তিক, কেননা, মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা থাকলেই সামাজিক চুক্তির প্রশ্ন ওঠে। রাষ্ট্র উদ্ভবের পূর্বে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করা যেতে পারে না।

(ঙ) **ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (Historical or Evolutional Theory):** এই মতবাদই রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণযোগ্য মতবাদরূপে স্বীকৃত হয়েছে। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হঠাৎ কোন একদিন ঈশ্বরের খেয়াল বা মানুষের চুক্তির ফলে উদ্ভূত হয়নি।

সমাজ বিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব

মানবসমাজ বহুদিন ধরে বিবর্তিত হতে হতে বর্তমানের জটিল রূপ পরিগ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রের উদ্ভবের মূলে রয়েছে চারটি উপাদান—রক্তের সম্পর্ক (kinship), ধর্ম (religion), বল (force), এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা (political consciousness)। মানুষের স্বভাবের মধ্যেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ নিহিত। মানুষের মধ্যে রয়েছে সংঘবদ্ধ হবার এবং বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতা। সংঘবদ্ধ হবার প্রবণতা থেকেই মানুষ পরিবার গঠন করেছে এবং বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতা থেকেই মানুষ দল গঠন করেছে। রক্তের সম্বন্ধই বিভিন্ন দলের মধ্যে সংহতি বজায় রেখেছে। ঐক্যবদ্ধ বিভিন্ন পরিবার গোষ্ঠী (clan)-রূপে গণ্য হতে লাগল। রক্তের সম্পর্কই গোষ্ঠীপতিকে গোষ্ঠীর উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ করে দিল। গোষ্ঠীর সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার পর যখন রক্তের সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হয়ে

পড়ল, তখন ধর্মই ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে লাগল। সমাজ বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে তখন গোষ্ঠী সম্প্রসারিত হয়ে উপজাতি (tribe)-র সৃষ্টি হল এবং শক্তিশালী উপজাতি বল প্রয়োগ করে অন্য উপজাতিদের বশীভূত করতে লাগল। এই বল প্রয়োগকারী শক্তি ক্রমশঃ সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত হল এবং যে নায়ক এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেন মানুষ তারই আনুগত্য স্বীকার করল। এই অবস্থায় মানুষ উপজাতীয় ঐক্য সম্পর্কে সচেতন হল। মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উদ্ভব হল। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উদ্ভবের ফলে মানুষ সচেতনভাবে উপজাতিদের নায়কের আনুগত্য স্বীকার করল। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপও রাষ্ট্র উদ্ভবে নানাভাবে সহায়তা করেছে। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য সমাজ শ্রেণীর সৃষ্টি। সমাজস্থ শক্তিশালী শ্রেণীই শাসনতন্ত্র বা সরকারকে করতলগত করে নিজেদের স্থায়ী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিদের স্বার্থসিদ্ধির কার্যে নিয়োজিত করল। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উদ্ভবের ফলে মানুষের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য অনেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটল।

রক্তের সম্পর্ক, ধর্ম, বল এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা রাষ্ট্রের উদ্ভবের মূলে বর্তমান

কাজেই বিবর্তনের ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। গার্নার বলেন, "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, পাশবিক বলের ফল নয়, চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট নয় বা পরিবারের সম্প্রসারণ রূপেও একে গণ্য করা চলে না।"

৬। সমাজ এবং রাষ্ট্র (Society and State) :

অনেক সময় 'রাষ্ট্র' এবং 'সমাজ' কথা দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। রাষ্ট্র হল অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মতো একটি সামাজিক সংগঠন যদিও সমাজের যতরকম সংঘ বা প্রতিষ্ঠান আছে রাষ্ট্রের স্থান তার মধ্যে সর্বোচ্চ। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকেই সমাজের সৃষ্টি। মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করতে চায়, তার এই সহজাত আকাঙ্ক্ষাই সমাজের ভিত্তি। মানুষের যে-কোন সম্পর্কই সামাজিক সম্পর্ক নয়। মানুষ-পরস্পরের সম্পর্কে সচেতন

না হলে সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব হয় না। গিসবার্ট (*Gisbert*)-এর মতে 'পারস্পরিক স্বীকৃতি' সে প্রত্যক্ষই হোক বা পরোক্ষই হোক সামাজিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু রাষ্ট্র হল এমন একটি সংগঠন, যে কতকগুলি বিধি, নিয়ম বা আইন প্রবর্তিত করে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিকগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সংঘবদ্ধ রাখে। সমাজের মধ্যে নানা প্রতিষ্ঠান বা সংঘ বর্তমান। এই সকল সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক সময় বিরোধ দেখা দেয়। কোন একটি সংগঠনের উপর যদি এই সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার কর্তৃত্ব না থাকে তাহলে সমাজ-জীবনের ঐক্য ও শান্তি বিনষ্ট হয় এবং সমাজ-জীবনে অরাজকতা দেখা দেয়। রাষ্ট্রই সেই সংগঠন যা সমাজের বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের মধ্যে সংগতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে। সুতরাং রাষ্ট্র সমাজ, তবে গিসবার্ট যুক্তিযুক্ত ভাবেই নির্দেশ করেছেন যে, রাষ্ট্র আরও অধিক কিছু। এই অধিক কিছুই হল রাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা।

অনেকে মনে করেন, সমাজ ও রাষ্ট্র হল এক ও অভিন্ন। প্রাচীন গ্রীকরা রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলে মনে করতেন। পরবর্তী যুগে রুশো (*Rousseau*), হেগেল (*Hegel*) এবং বোসাঙ্কয়েট (*Bosanquet*)-ও সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্র এবং সমাজ এক ও অভিন্ন নয়। সমাজের পরিসর বা ক্ষেত্র রাষ্ট্রের পরিসর বা ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক ব্যাপক। রাষ্ট্র সমাজের মধ্যে একটি সংগঠন। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যাকাইভার (*MacIver*) বলেন, "রাষ্ট্র হল এমন একটি গড়ন যা সমাজের সঙ্গে সমকালীন বা সমব্যাপক নয় বরং বিশেষ উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংগঠনরূপে সৃষ্ট।"[1] সমাজের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সংগঠন আছে; যেমন—আর্থিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সংগঠন প্রভৃতি, যেগুলি মানুষের নানা ধরনের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। সমাজের অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের

1. "………The State is structure and co-extensive with society but built within it as a determinate order for the attainment of specific ends."
—*Maciver*: The Modern State, Page 40

এবং সমাজের বিভিন্ন সংঘ বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্র নিরাপত্তা দান করে। সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি সংরক্ষণের পক্ষে রাষ্ট্রই সবচেয়ে উপযুক্ত সংগঠন। সমাজের অন্তর্ভুক্ত সভ্যবৃন্দ বিভিন্ন সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের সভ্য হতে পারেন কিন্তু তাঁরা একটি মাত্র রাষ্ট্রেরই নাগরিক হতে পারেন। রাষ্ট্রের লক্ষ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে এমন কতকগুলি কার্য করতে হয়, যা অন্য কোন সামাজিক সংগঠনের পক্ষে করা সম্ভব নয়। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেসব কার্য সম্পাদন করে রাষ্ট্র বিনা প্রয়োজনে তাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করে না, সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কখনও কখনও হস্তক্ষেপ করতে হয়। তাছাড়া, মানুষের সকল রকম সামাজিক সম্পর্ক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসতে পারে না।

সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মেনে চলতে হয়। মানুষের সকল রকম সামাজিক সম্পর্ক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন না হলেও মানুষকে তার সামাজিক আচার-আচরণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় যাতে রাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে তার কোন বিরোধিতা দেখা না দেয়।

অপর পক্ষে, রাষ্ট্রেরও এমন নীতি প্রবর্তন করা উচিত নয়, যার ফলে সমাজ-জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। বস্তুতঃ সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবনের জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন। সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও সংগঠিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপরই ন্যস্ত। প্রতিটি ব্যক্তিরই নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে সমাজের অগ্রগতিতে সহায়তা করা প্রয়োজন। কিন্তু ব্যক্তির পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করার পথে যেসব অন্তরায় বর্তমান, সেগুলিকে দূরীভূত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। ন্যায়পরায়ণতার উপরই রাষ্ট্রের ভিত্তি হওয়া প্রয়োজন, সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে সমাজ-জীবনের শান্তি ও ঐক্য ব্যাহত হয়। ল্যাস্কি (*Laski*) বলেন, "আমরা রাষ্ট্রকে মেনে চলি, কারণ রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত আমাদেরই যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করে।...যখন আমরা একে মানি, আমরা প্রকৃতপক্ষে তখন নিজেদেরই মানছি, অথবা আমরা সেই শ্রেষ্ঠ

সত্তাকে মেনে চলছি যা আমাদের সঙ্গীদের সঙ্গে আমাদের অভিন্ন করে তোলে।"[1]

৫। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক ভিত্তি (The Natural Basis of the State) :

রাষ্ট্র সম্পর্কে আমরা একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হই যে, রাষ্ট্রের কি কোন স্বাভাবিক ভিত্তি আছে বা রাষ্ট্র কি একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান? এই প্রসঙ্গে এ প্রশ্নও উত্থাপন করা হয় যে, আমাদের সামাজিক জীবনে যেসব প্রাথমিক সংগঠনের অস্তিত্ব আমরা দেখি সেগুলিরও কি কোন স্বাভাবিক ভিত্তি আছে, অথবা, এরা সব কৃত্রিম? আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, পরিবার সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক সংগঠন, কৃত্রিম নয়। পরিবার ছাড়াও মানুষের শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য যেসব শিক্ষা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলিও নানা রকমের সংগঠনের সৃষ্টি করে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যখন কোন শাসনযন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন মনে হতে পারে যে এ শাসনযন্ত্র হল কৃত্রিম এবং মানুষের উপর একে জোর করে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এ নিয়ন্ত্রণ বা শাসনের ব্যাপারটি নিছক কৃত্রিম, স্বাভাবিক নয়—এ কথা বলা চলে না। প্রাণি-জগতেও দেখা যায় যে, বিভিন্ন দলের দলপতি থাকে এবং প্রয়োজনানুসারে তার নির্দেশ মানতে সমস্ত দলটিই বাধ্য হয়। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন যে এ জাতীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন মানুষের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। কিন্তু বস্তুতঃ, সমাজ-জীবনে ঐক্য বজায় রাখার জন্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের যে প্রয়োজন আছে তা অস্বীকার করা চলে না।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকবৃন্দ, নৈরাজ্যবাদী এবং মার্কসবাদীরা মনে করেন যে সমাজ স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান। সামাজিক চুক্তি মতবাদের

1. "We obey the state because in the end it most truly represents ourselves when we obey it. We are, in truth, obeying ourselves or rather we are obeying the best self which makes us one with and of our fellows."
—*Laski* : A Grammar of Politics ; 80.

সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, মানুষের সামাজিক প্রকৃতি থেকে স্বাভাবিক ভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে নি। রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্টি এবং সে কারণে একটি কৃত্রিম সংগঠন। নৈরাজ্যবাদীরাও মানুষের সামাজিক প্রকৃতি থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে মনে করেন না, কারণ রাষ্ট্র উৎপীড়নের যন্ত্র মাত্র। যে সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বর্তমান সে সমাজে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ সম্ভব নয়। নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে রহিত করে, সমাজের মধ্যে উদ্ভূত স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠনগুলির (voluntary associations) দ্বারাই রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় কার্যগুলি, যেমন আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা প্রভৃতি সম্পন্ন করতে চান। মার্কসবাদীদের মতে রাষ্ট্র মোটেও স্বাভাবিক সংগঠন নয়। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি থেকে রাষ্ট্র উদ্ভূত নয়। তাঁদের মতে এমন এক সময় ছিল যখন কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ছিল না।[1] এ্যাঙ্গেল্‌স (*Engels*) বলেন, 'অনন্তকাল ধরেই যে রাষ্ট্র অস্তিত্বশীল তা নয়। এমন অনেক সমাজের অস্তিত্ব ছিল যারা এটা ছাডাই কাজ চালিয়েছে, যাদের রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের শক্তি সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক বিশেষ স্তরে যখন সমাজে অনিবার্য কারণবশতঃ শ্রেণী বিভাগ দেখা দিয়েছিল, তখন এই শ্রেণী বিভাগের ফলেই রাষ্ট্র অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। মার্কসবাদীদের মতে রাষ্ট্র একটি বলপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠান। শোষিত শ্রেণীর উপর বল প্রয়োগ করার জন্য পুঁজিবাদীরা এই যন্ত্রের ব্যবহার করেন।"

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকবৃন্দ, নৈরাজ্যবাদী এবং মার্কসবাদীরা মনে করেন সমাজ স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান নয়

পূর্বোক্ত অভিমতগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। সামাজিক চুক্তি মতবাদ ভ্রান্ত মতবাদ। এই মতবাদের কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। নৈরাজ্যবাদীরা সমাজে উদ্ভূত স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠনগুলির দ্বারা রাষ্ট্রের কাজ চালাতে চান। কিন্তু তাঁরা লক্ষ্য করেন নি যে, এই সংগঠনগুলিরই একটির রাষ্ট্রে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। অর্থনৈতিক সম্পর্কের সাহায্যে মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে চান।

সমালোচনা

1. The Origin of the Family, Private Property and the State, P. 161.

কিন্তু শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেনি। জৈবিক ও জাগতিক প্রয়োজন ছাড়াও উচ্চতর প্রয়োজনের পরিতৃপ্তি সাধনের জন্যও রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে। রাষ্ট্র কখনও বিলুপ্ত হতে পারে না।

রাষ্ট্র স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান, এই অর্থে যে, মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে, সামাজিক প্রকৃতি তার থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। রাষ্ট্রকে মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। জৈবিক, মানসিক ও উচ্চতর, সব রকম প্রয়োজনের পরিতৃপ্তির বাসনা থেকেই মানুষ কোন সংগঠনের নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিয়েছে। অ্যারিস্টটল (*Aristotle*)-এর মতে মানুষ একটি রাজনৈতিক জীব। নিছক জীবনের প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব, কিন্তু সৎ জীবনযাপনের জন্যই এর স্থায়িত্ব। রাষ্ট্র স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান কারণ অ্যারিস্টটলের মতে পরিপূর্ণ সভ্য জীবনের সম্ভাবনা এর মধ্যে নিহিত। সময়ের দিক থেকে পরিবার আগে, কিন্তু প্রকৃতির দিক থেকে রাষ্ট্র আগে, কেননা, পরিবারের তুলনায় রাষ্ট্র অনেক বেশী উন্নত। কাজেই রাষ্ট্র স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান, কোন কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান নয়।

রাষ্ট্র মানুষের সামাজিক প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত

৬। রাষ্ট্রের ভিত্তি হল বলপ্রয়োগ (The State as Force):

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সার্বভৌমিকতা। সে কারণে কেহ কেহ বলেন, রাষ্ট্রের ভিত্তি হল বলপ্রয়োগ। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য অনেক সময় রাষ্ট্রের পক্ষে বলপ্রয়োগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্ম, বলপ্রয়োগের জন্য রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে বলে মত প্রকাশ করতেন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরাও মনে করেন যে, রাষ্ট্র হল অবাঞ্ছিত প্রতিষ্ঠান। মার্কসীয় লেখকবৃন্দ, বিশেষ করে লেনিন (*Lenin*) রাষ্ট্রকে প্রধানতঃ একটি বলপ্রয়োগের যন্ত্ররূপেই গণ্য করেন। তাঁর মতে রাষ্ট্র হল একটি শ্রেণীর দ্বারা অপর একটি শ্রেণীর শোষণের এবং উৎপীড়নের জন্য বলপ্রয়োগ করার একটি যন্ত্র।

গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, এ প্রসঙ্গে আমাদের দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সংগঠনের পক্ষে বলপ্রয়োগই কি একমাত্র বা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদান? দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের যন্ত্র হিসেবে এই বলপ্রয়োগ কতদূর পর্যন্ত করা যেতে পারে?

প্রথম প্রশ্নের প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, বলপ্রয়োগ হয় রাষ্ট্রের লক্ষ্য, কিংবা ভিত্তি, কিংবা উপায় হতে পারে। কিন্তু পূর্বোক্ত কোন অর্থেই বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় উপাদান নয়। রাষ্ট্রের 'লক্ষ্য' কোন মতেই নিছক বলপ্রয়োগ হতে পারে না, রাষ্ট্রের লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ লাভে সহায়তা করা। মানুষের এই কল্যাণের স্বরূপ কি? মানুষ চায় পরস্পরের সহায়তায় নিজেদের কষ্টসাধ্য দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে এবং এভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে ব্যাপক করে তুলতে। রাষ্ট্রের কর্তব্য এমন পরিবেশে সৃষ্টি করা যাতে মানুষ তার পূর্ণতাকে অন্ততঃ আংশিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং বলপ্রয়োগকে রাষ্ট্রের লক্ষ্যরূপে গণ্য করা যায় না। ল্যাস্কি (*Laski*) এ প্রসঙ্গে বলেন, "এ (রাষ্ট্র) বলের অধিকারী, কারণ এর কর্তব্য আছে। রাষ্ট্র আছে এজন্য যে, রাষ্ট্র অন্ততঃ সম্ভাব্যরূপে মানুষকে সক্ষম করে তার মধ্যে যা কিছু সর্বোৎকৃষ্ট তাকে উপলব্ধি করতে।"[1]

দ্বিতীয়তঃ, বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের 'ভিত্তি', অর্থাৎ বলপ্রয়োগ থেকেই রাষ্ট্র উদ্ভূত হয়েছে—একথা স্বীকার করা যেতে পারে না। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, মানুষ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধা লাভের জন্য এবং অসুবিধা দূর করার জন্য স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে। এমন কি যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের আইন ভঙ্গ করতে চায়, তারও রাষ্ট্রের প্রয়োজন, কারণ সমাজ-জীবনের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা বজায় না থাকলে তার পক্ষে অসমাজোচিত কার্যকলাপের পরিকল্পনা রচনা করাও কঠিন। যে সন্ত্রাসবাদী বলপ্রয়োগ করে রাষ্ট্রকে উৎপাটিত করতে চায় তারও কামনা এমন একটি রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র শান্তি, স্বাধীনতা

1. "It possesses power because it has duties. It exists to enable men at least potentially to realise the best that is in themselves."

—*H. J. Laski*: A Grammar of Politics, 3rd Edition, Page 25-28.

ও মৈত্রীর আদর্শে গঠিত। সুতরাং এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের উপাদান বা ভিত্তি বলপ্রয়োগ নয়। বেকার (*Baker*)-এর মতে বলপ্রয়োগ হল আইনের ভৃত্য, যে প্রভুকে নিদ্রিত হওয়া থেকে বা পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বিরত করে (Force, in a word, is a servant of the conviction called law, a servant who keeps his master either from sleeping or straying)।

সুতরাং বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের লক্ষ্য নয় বা ভিত্তি নয়, এটি হল একটি 'উপায়' মাত্র। তবে উপায় হলেও এটি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপায় নয়। গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "সম্মতি বা প্ররোচনা··· হল সবচেয়ে সুনিশ্চিত এবং মানবীয় ভিত্তি যার উপর রাষ্ট্র দাঁড়াতে পারে।"[1] ইংরেজ দার্শনিক গ্রীন (*Green*) বলেন, "সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি, বলপ্রয়োগ নয়" (Will, not force, is the basis of the State.)।

দ্বিতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে আমরা দেখতে পাই যে, বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের উপায় হলেও, এর একটা সীমা আছে এবং বর্তমান যুগে বলপ্রয়োগের কার্যকারিতা অনেকাংশেই কমে গেছে। সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত এবং সুরক্ষিত করার দায়িত্ব হল রাষ্ট্রের এবং এ কাজে মানুষের সম্মতি বা স্বীকৃতিই রাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন। মানুষের যে পারস্পরিক ইচ্ছার মিলন এবং সহযোগিতার উপর সমাজ-জীবন নির্ভরশীল বলপ্রয়োগের দ্বারা তাকে সম্ভব করা যায় না। অবশ্য এ কথা সত্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ মানুষের ইচ্ছার এই মিলন এবং সহযোগিতা সৃষ্টি করে বা এই সৃষ্টির জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে, তা সত্ত্বেও বলপ্রয়োগকে রাষ্ট্রের প্রধান উপায় বলে গণ্য করা যেতে পারে না। বস্তুতঃ, মানুষ যতক্ষণ না নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিজের কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন হয়, বাহ্যিক বলপ্রয়োগ তার শুভ বুদ্ধিকে জাগ্রত করতে পারে না। রাজনৈতিক ইতিহাসও প্রমাণ করে যে, কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা কোন রাষ্ট্রের

1. ..."Consent or persuasion is the surest and most human foundation on which the state can rest."

— *Gisbert*: Fundamentals of Sociology, Page 94.

শাসনকার্য পরিচালনা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের সম্মতি ভিন্ন রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা একান্তই অসম্ভব। ম্যাকাইভার (*MacIver*) বলেন, "জনসাধারণের সম্মতির অনুবর্তী না হলে বলপ্রয়োগ সকল সময়ই বিভেদ সৃষ্টি করে।"[1]

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, রাষ্ট্র যদিও প্রয়োজনানুসারে বলপ্রয়োগ করে, তবু বলপ্রয়োগই রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য নয় বা বলপ্রয়োগকে রাষ্ট্রের ভিত্তিরূপে গণ্য করা যেতে পারে না। রাষ্ট্র নিছক বলপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠান নয়। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "বিচক্ষণ শাসনকর্তা ভেতর ও বাহির উভয় দিক থেকেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বাসনা করে এবং যখন এরূপ সম্পর্কলাভে সে ব্যর্থ হয় তখনই বলপ্রয়োগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং বলপ্রয়োগই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য—এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। যেখানেই শাসনব্যবস্থা আছে, সেখানেই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সম্ভাবনা আছে এবং বলপ্রয়োগের দ্বারাই প্রতিরোধকে ব্যাহত করতে হয়। মাতাপিতা, শিক্ষক এবং শিল্পপতিরাও কোন-না-কোন ধরনের বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হন, তবু এ কথা কেউ বলবে না যে, তাদের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হল বলপ্রয়োগ।"[2] গিলবার্ট (*Gilbert*) বলেন, "রাষ্ট্র যদি কখনও বলপ্রয়োগ না করত, তবু রাষ্ট্র রাষ্ট্রই থাকত। বলপ্রয়োগের ভূমিকা হল পরিপূরক এবং উপায়স্বরূপ।" সুতরাং রাষ্ট্রের ভিত্তি বলপ্রয়োগ, এ মত গ্রহণযোগ্য নয়।

৭। আইন-প্রণয়ন কর্তারূপে রাষ্ট্র (The State as Lawgiver) :

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য শাসনযন্ত্র বা সরকার গঠন করা হয়। এই সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগ আছে ; যথা— (ক) **আইন-প্রণয়ন** (Legislative), (খ) **শাসন** (Administrative) এবং (গ) **বিচারবিভাগ** (Judicial)। রাষ্ট্র বিভিন্ন আইনকানুন ও

1. "Force always disrupts unless it is made subservient to common will."
MacIver : The Modern State, Page 222.

2. *Mackenzie* : Outlines of Social Philosophy ; Page 138.

প্রতিষ্ঠানের মারফত শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত করে। যে রাষ্ট্রের আইন-ব্যবস্থা যত উন্নত সে রাষ্ট্র তত বেশী সুসংগঠিত। রাষ্ট্র যেসব আইন প্রণয়ন করে, তা সকল সময়ই একপ্রকার হয় না বা কোন রাষ্ট্রে যদি একাধিক জাতি বসবাস করে, তবে কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়। তবে সকল আইনই কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা অনুমোদিত হয়। সুসংগঠিত রাষ্ট্রে সকল সময় আইনগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করার দরকার হয় না। অধিকাংশ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইনকানুন মেনে চলে এবং মনে করে যে, এ সব আইনকানুনের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্যই সাধিত হচ্ছে।

বস্তুতঃ, রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের ইচ্ছাই প্রকাশিত হয়। তবু রাষ্ট্রই যে আইন প্রয়োগ করার কর্তৃপক্ষ তা অস্বীকার করা চলে না। প্রয়োজনের সময় যদি রাষ্ট্র আইন প্রয়োগ করতে না পারে তাহলে রাষ্ট্রের প্রণীত আইনের সঙ্গে লোকপ্রথা, রীতিনীতি ও নৈতিক নিয়মের কোন পার্থক্য থাকে না। সমাজ-জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। যেমন, ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই প্রতিটি দেশে আমরা পুলিসী-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করি, যে পুলিসী-ব্যবস্থার সহায়তায় রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করে থাকে। সুতরাং বলপ্রয়োগের দিকটিকে উপেক্ষা করা সমীচিন নয়।

তবে বলপ্রয়োগকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদানরূপে গণ্য করা হলে যথাযথভাবে যাতে তা করা হয় তা দেখা দরকার। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "এ কথা সত্য যে, শেষ পর্যন্ত বল দিয়ে বলকে ঠেকাতে হবে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য তার নাগরিককে রক্ষা করা এবং আইনকে প্রয়োগ করা।" [1]

1. "It remains true, however, that in the end force must be met by force and that it is among the duties of the state to protect its citizens and enforce its laws."

—*Mackenzie*: Outlines of Social Philosophy, Page 136.

১৮। রাষ্ট্রের সামাজিক কার্যাবলী (The Social Functions of the State):

বর্তমান সমাজের এমন কতকগুলি কাজ আছে যেগুলির দায়িত্ব রাষ্ট্র ভিন্ন আর কারও পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আবার এমন কতকগুলি কাজ আছে যেগুলির দায়িত্ব কোন রাষ্ট্রই গ্রহণ করতে পারে না। ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver and Page*) রাষ্ট্রের এসব কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ করেছেন।[1]

(i) বিশেষ ধরনের কাজ যা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই করা সম্ভব (Functions Peculiar to the State): এমন কতকগুলি সামাজিক কাজ আছে যার দায়িত্ব গ্রহণ করা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। রাষ্ট্রের পক্ষেই জটিল সমাজ-জীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যেহেতু প্রয়োজনানুসারে বলপ্রয়োগ করার অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রের আছে। ব্যাপক আইনকানুন একমাত্র রাষ্ট্রই প্রণয়ন করতে পারে এবং সমাজের সকলকে সুখ-সুবিধা ও সমান সুযোগ দেওয়া একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। প্রত্যেকটি মানুষ যাতে তার সৃজনীমূলক শক্তিকে প্রকাশ করার জন্য সুস্থ ও উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে পায়, তার ব্যবস্থা করা একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব। সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক কতকগুলি কর্তব্য স্থির করাও রাষ্ট্রের কাজ। সুস্থ ও ভদ্র জীবন যাপনের জন্য সর্বনিম্ন মান রাষ্ট্রই নির্ধারণ করতে পারে। রাষ্ট্রের অধীনস্থ অন্যান্য ক্ষমতাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রেরই আছে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বর্তমান, সেগুলিকে সংযোজিত করার বিরাট দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব। ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver and Page*) বলেন, "সংক্ষেপে রাষ্ট্র হল, জনসাধারণের শৃঙ্খলা রক্ষার অছি ও অভিভাবক।"[2]

---

1. *MacIver and Page*: Society, Page 458.

2. "The state, in short, is the guarantor and the guardian of the public order." —*MacIver and Page*: Society, Page 459.

কিন্তু কেবলমাত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাতেই রাষ্ট্রের কাজ শেষ হয় না। বস্তুতঃ আইন ও শৃঙ্খলা বৃহত্তর সামাজিক নীতির প্রকাশ এবং সেই নীতির উপর রাষ্ট্রকে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। বহু প্রকারে শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়। (কাউকে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বা সকলকে সমান সুযোগ দান করে বা দুর্বলকে শক্তিশালীর বশীভূত করেও শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায়। কিন্তু ন্যায়ের ভিত্তিতেই সামাজিক রীতিনীতিগুলি নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়াই হল ন্যায় (Justice)। কিন্তু কার কতটুকু প্রাপ্য তা স্থির করাই কঠিন ব্যাপার। কঠিন হলেও এ দায়িত্ব রাষ্ট্রই পালন করতে পারে, কারণ সমাজের সকল লোকের উপর একমাত্র রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। যারা রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে এবং অপরের অধিকারে অযথা হস্তক্ষেপ করে তাদের শাস্তিবিধান করা রাষ্ট্রেরই কাজ। রাষ্ট্রের মধ্যে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখা ছাড়াও রাষ্ট্রকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হয়।' অন্যান্য বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলাও রাষ্ট্রের কাজ।

(ii) যে সকল কাজের জন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত (Functions for which the state is well adapted): এমন কতকগুলি কাজ আছে যে কাজগুলি সম্পাদন করার পক্ষে অন্যান্য সংগঠনের তুলনায় রাষ্ট্রই বেশী উপযুক্ত। প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে (Natural resources) রক্ষা করা রাষ্ট্রেরই কাজ। অনেক সময় অনেকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের অযথা অপচয় করে; সেসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একান্তই প্রয়োজন। এই কারণেই রাষ্ট্রকে দেশের সাধারণ সম্পদ ও শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনকানুন প্রণয়ন করতে হয়।

ব্যক্তিগত সম্পদকে সুরক্ষিত করা এবং উন্নত করার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। এ প্রসঙ্গে শিক্ষাদান ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা এসে পড়ে। ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষমতা ও অনন্ত সম্ভাবনা সুপ্ত হয়ে আছে, তাকে আবিষ্কার করার ও পরিপূর্ণ সুযোগ দিয়ে বিকশিত করার যে সুমহান দায়িত্ব তা অন্য কোন বেসরকারী সংগঠনের উপর সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য এ প্রসঙ্গে একটা

কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, শিক্ষানীতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের মূল দায়িত্ব থাকবে শিক্ষাবিদদের হাতে। রাষ্ট্র অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ না করে কেবলমাত্র বাইরে থেকেই সে ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করবে। শিক্ষা-সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে রাষ্ট্রের অত্যধিক হস্তক্ষেপ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ব্যাহত করবে। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "রাষ্ট্রের কাজ হবে অভিনেতাদের অভিনয় করার জন্য উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চ তৈরী করে দেওয়া, অভিনয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা নয়।"[1]

উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা ছাড়াও রাষ্ট্র সমাজকে আরও নানাভাবে উন্নত করে তুলতে পারে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য ব্যবস্থা করা, শিল্পকলাকে উৎসাহ দান করা, রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নানারকম সুখ-সুবিধার সুবন্দোবস্ত করা, জনকল্যাণ সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করা, সমাজকে নীতি-সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয় জানার সুযোগ দান করা প্রভৃতি নানা জনহিতকর কার্যের দ্বারা সমাজকে উন্নত করা রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ সকল আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

(iii) **যে সকল কাজের পক্ষে রাষ্ট্র অনুপযুক্ত** (**Furc ions for which the State is ill adapted**) : এমন অনেক ধরনের কাজ আছে যেগুলি করতে রাষ্ট্র অনুপযুক্ত এবং এ ধরনের কাজ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানই সুন্দরভাবে করতে পারে। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সমগ্র সমাজের উপর। সমাজের ব্যাপক সমস্যা সম্পর্কে উপায় নির্ধারণ করাই রাষ্ট্রের কাজ। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থ, উদ্দেশ্য অনেক সময় এতই সীমিত যে, সেখানে রাষ্ট্রের পক্ষে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। বেসরকারী ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিই এ সকল প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। এ ছাড়া আছে বৃহত্তর স্বার্থ যা মানুষকে একত্রিত করে। ধর্মসম্পর্কীয় এবং সংস্কৃতি-সম্পর্কীয় স্বার্থও এর অন্তর্ভুক্ত।

1. "Its business is to provide a suitable stage for the actors rather than to take an active part in the performances."

—*Mackensie* : Outlines of Social Philosophy, Page 188.

ব্যক্তিগত প্রয়োজন বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এসব প্রয়োজন মেটাতে রাষ্ট্র মোটেই উপযুক্ত নয়। যে সকল সংগঠনে উপর রাষ্ট্রের মতো বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত নেই, তারাই পারে এসব ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে সংরক্ষিত করতে।

(iv) যেসব কাজ রাষ্ট্র সম্পাদন করতে অক্ষম (Functions which the state is incapable of performing): রাষ্ট্রের পক্ষে জনসাধারণের মতামত প্রকাশ করাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র হয়ত প্রকাশ্যভাবে মতামত প্রকাশ করাকে বন্ধ করে দিতে পারে, কিন্তু এ হবে বলপ্রয়োগ ছাড়া কিছুই নয়। ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver and Page*) বলেন, "যে কোন মতামত সত্য বলে দাবি করে এবং এই দাবির পক্ষে বলপ্রয়োগ হল একান্তই অসংগতিপূর্ণ।"[1]

রাষ্ট্রের পক্ষে নৈতিকতা বা মানুষের নীতিবোধকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র ব্যক্তির প্রকাশ্য আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু নীতিবোধ বাইরের জিনিস নয়, অন্তরের জিনিস, তার উপর রাষ্ট্রের কোন যথার্থ কর্তৃত্ব নেই। রাষ্ট্রের পক্ষে ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব নয়। ইতিহাসই প্রমাণ করে, ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে রাষ্ট্র কতখানি বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। সামাজিক প্রথা, রীতি-নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করাও রাষ্ট্রের পক্ষে সকল সময় সম্ভব নয়।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, মানুষের আচরণের যেগুলি অন্তরঙ্গ দিক সেগুলি এবং মানুষের সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, কলা…এগুলির গতিকে হয়ত রাষ্ট্র কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন শক্তিই এগুলিকে সঞ্জীবিত করে রাখে এবং এগুলির গতিপথ নির্ধারণ করে। সে কারণে রাষ্ট্রের পক্ষে এগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা কখনও সম্ভব নয় এবং বাঞ্ছনীয় নয়।

1. "An opinion claims truth and force is entirely irrelevant to this claim." —*MacIver and Page*: Society: Page 469.

৯। রাষ্ট্র এবং নীতিবোধ (The State and Morality):

রাষ্ট্রের সঙ্গে নীতিবোধ, বা নৈতিকতার সম্পর্ক নির্ধারণ প্রসঙ্গে আমরা দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হই। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের পক্ষে নৈতিক নিয়ম মেনে চলা কতদূর সম্ভব এবং দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র ব্যক্তির মধ্যে কতটা পর্যন্ত নীতিবোধ জাগিয়ে তুলতে পারে?

প্রথম প্রশ্নটি বিতর্কমূলক। অনেকে—যেমন ম্যাকিয়াভেলি (*Machiavelli*) এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, রাষ্ট্র নৈতিক নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য নয়। রাজনৈতিক দিক থেকে ছল, চাতুরী, বিশ্বাসঘাতকতা অনেক সময় সমর্থনযোগ্য, কারণ রাজনীতিতে উদ্দেশ্য অনুযায়ী উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। যাঁরা মনে করেন রাষ্ট্রের ভিত্তি হল বলপ্রয়োগ, তাঁরা নৈতিকতার সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে করেন না। অপর দিকে প্লেটো (*Plato*), অ্যারিস্টটল (*Aristotle*), স্পিনোজা (*Spinoza*), হেগেল (*Hegel*) প্রভৃতি মনীষীগণ মনে করেন, রাষ্ট্র যে সকল আইন প্রণয়ন করে সেগুলির পিছনে নৈতিক সমর্থন থাকা প্রয়োজন। যেহেতু সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা এবং সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলি নৈতিক নিয়ম মানতে বাধ্য, রাষ্ট্র সর্বোচ্চ সামাজিক সংগঠন হিসেবে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না। তাঁদের মতে রাষ্ট্রের প্রকৃতিই হল নৈতিক। তাঁদের কাছে, যা বৈধ তা নৈতিকতার প্রকাশ। হেগেল রাষ্ট্রকে নৈতিক নিয়মের মূর্তরূপ বলে গণ্য করেন। রাষ্ট্রের যদিও বলপ্রয়োগের ক্ষমতা থাকা যুক্তিযুক্ত, তাহলেও রাষ্ট্রের ভিত্তি যে বলপ্রয়োগ নয় এ আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি। রাষ্ট্রের ভিত্তি হল ন্যায়পরায়ণতা (Justice) এবং কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা এই ন্যায়পরায়ণতার মর্যাদা রক্ষিত হতে পারে না। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "কেবলমাত্র বলের উপর যে নৈতিকতার ভিত্তি, সে নৈতিকতা নৈতিকতার অস্বীকৃতি" (....and morality founded simply on force is the negation of morality)।[1] রাষ্ট্র যদি নীতি-বিগর্হিত পন্থা অবলম্বন করে, রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত নাগরিকবৃন্দও সে সকল পন্থা অবলম্বন

1. *Mackenzie : Outlines of Social Philosophy*, *Page 138.*

করবে, ফলে সমাজ-জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা একেবারেই ভেঙে পড়বে। ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের কার্যের মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, ভাল-মন্দের বিচার উভয় ক্ষেত্রেই করা হয়। সুতরাং ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র উভয়কেই নৈতিক নিয়ম মেনে চলতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, রাষ্ট্র ব্যক্তির মধ্যে নীতিবোধ কতখানি জাগিয়ে তুলতে পারে? আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, বাধ্যতামূলক নীতিবোধ কোন নীতিবোধ বা নৈতিকতা নয়। মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজের পরমকল্যাণ লাভের জন্য নৈতিক নিয়ম মেনে চলে। এ নৈতিক নিয়ম হল বিবেকের অবদান। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে বাইরে থেকে ব্যক্তিকে নীতিনিষ্ঠ করে তোলা সম্ভব নয়। তবে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে, বিশেষ করে শিক্ষার মাধ্যমে এই নীতিবোধকে নাগরিকদের মধ্যে সক্রিয় করে তুলতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং নৈতিক শিক্ষাকে রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। তাছাড়া, আইন প্রণয়ন করেও কিছু কিছু নৈতিক অকল্যাণ দূরীভূত করা যেতে পারে। অবশ্য এ হল অনেকটা নেতিবাচক কাজ, অর্থাৎ মানুষের নীতিনিষ্ঠ হওয়ার পথে যেসব অন্তরায় দেখা দেয় এবং যেসব প্রলোভন মানুষকে নীতিভ্রষ্ট করে সেগুলিকে দূর করা। প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিকে নীতিনিষ্ঠ করে তোলা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, রাষ্ট্রের নিয়মকানুন হচ্ছে বাধ্যতার ব্যাপার আর নৈতিক নিয়মের ক্ষেত্রে মানুষ স্বেচ্ছায় নৈতিক নিয়ম মেনে চলে, কোন বাইরের চাপে বাধ্য হয়ে নৈতিক নিয়ম মানে না। সে কারণে হব্‌স (*Hobbes*), বেন (*Bain*) প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌গণ যখন বলেন যে, রাজনৈতিক নিয়মই হল নৈতিক নিয়ম, তখন রাজনৈতিক নিয়মের এবং নৈতিক নিয়মের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বর্তমান, তা তাঁরা ভুলে যান। বাধ্যতামূলক নীতিবোধ কোন নীতিবোধই নয়, সে কারণে রাষ্ট্র কাউকে নীতিনিষ্ঠ হবার জন্য বাধ্য করতে পারে না, কেবল নীতিনিষ্ঠ হবার জন্য তাকে উৎসাহিত করতে পারে।

১০। রাষ্ট্র এবং পরিবার (The State and the Family) :

মানুষের সমাজ-জীবনে রাষ্ট্র এবং পরিবার উভয়ের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারকে কেন্দ্র করেই মানুষের প্রথম জীবনের শুরু হয়। সমাজের আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব একান্ত প্রয়োজন। পরিবার রাষ্ট্রের অধীন। কি অবস্থায় বিবাহ মারফত নরনারীর মধ্যে পারিবারিক বন্ধন সৃষ্টি হতে পারে এবং কি অবস্থায় সে বন্ধন ছিন্ন করা যেতে পারে তা রাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারণ করে। তবে প্রচলিত ধর্মীয় আচার-আচরণকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি না দিয়ে পারে না। বস্তুতঃ, বিশেষ প্রয়োজন দেখা না দিলে পরিবারের আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক ব্যাপারে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে না। অধিকাংশ রাষ্ট্রে কেবলমাত্র পরিবারের পক্ষ থেকেই যখন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হয় তখনই রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে।

মানুষের সামগ্রিক জীবনের উপর রাষ্ট্র এবং পরিবার উভয়ই প্রভাব বিস্তার করে ; সেহেতু পরিবার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা বর্তমান। প্লেটো (*Plato*) এই বিরোধকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর Republic গ্রন্থে তিনি রাষ্ট্রের অভিভাবকদের তাঁদের পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছেন। পরিবারের কাজ শিশুর উপযুক্ত যত্ন নেওয়া যাতে সে সুস্থভাবে বড হয়ে উঠতে পারে। যদিও এ দায়িত্ব স্বভাবতঃই পরিবারের উপর ন্যস্ত থাকে, তবু এ দায়িত্ব রাষ্ট্রেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শিশু একটু বড় হলেই তাকে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব অনেক রাষ্ট্র নিজের হাতে গ্রহণ করে। তাছাড়া, রাষ্ট্র সন্তানের উপর মাতাপিতার ব্যবহার এবং সম্পত্তির ব্যবস্থারও নিয়ন্ত্রণ সাধন করে। অবশ্য পরিবার যদি রাষ্ট্রের আদর্শানুযায়ী সুসংগঠিত হয় তাহলে রাষ্ট্রের সঙ্গে তার বিরোধের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যেভাবে তার নাগরিকবৃন্দকে সুশিক্ষিত করে বৃহত্তর সমাজ-জীবনে তার আত্মবিকাশের পথকে প্রশস্ত করে দিতে চায়, পরিবার হয়ত তার বিরোধিতা করে এবং সেরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এবং মাতাপিতার কর্তৃত্বের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। অনেক সময় মাতাপিতা সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারটিকে অবহেলা করেন বা দারিদ্র্যবশতঃ সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে

পারেন না। অথচ বৃহত্তর জনসমাজের দাবী যে, প্রতিটি শিশুই উপযুক্ত শিক্ষালাভ করুক। এরূপ ক্ষেত্রে পারিবারিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আবার রাষ্ট্রই শিশুর পুরোপুরি দায়িত্ব গ্রহণ করুক, এ ধারণাও যুক্তিযুক্ত নয়। অনেক সময় রাষ্ট্র হয়ত নিজের কোন বিশেষ স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য ব্যক্তিকে ব্যবহার করতে পারে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল (*Bertrand Russell*) বলেন, "পরিবারের স্থান যদি রাষ্ট্র দখল করে, তাহলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা আছে। মাতাপিতা সাধারণতঃ সন্তানকে ভালবাসে এবং তাদের রাজনৈতিক পরিকল্পনার উপাদান মনে করে না। রাষ্ট্রের এরূপ মনোভাব থাকবে তা আশা করা যেতে পারে না। শাসনকর্তারা যে সকল শিশুদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন, তাদের কখনও চোখে দেখেন না এবং পরিচালকের পর্যায়ভুক্ত বলে তাঁরা মানুষকে লক্ষ্য হিসেবে মনে না করে কোন কিছু গঠনের উপাদানরূপে গণ্য করতেই হয়ত বিশেষ উপযুক্ত।"[1] এজন্য রাষ্ট্রের পক্ষে সন্তানের পুরোপুরি দায়িত্ব গ্রহণের কোন প্রশ্ন আসে না। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, পরিবারের কোন নীতি যদি রাষ্ট্রবিরোধী না হয় বা এদের মধ্যে বিরোধ দেখা না দেয়, তাহলে পরিবার রাষ্ট্রের অধীনস্থ হয়েও তার কার্য সুষ্ঠুভাবে সমাপন করতে পারে এবং রাষ্ট্রও পরিবারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে।

১১। সরকারের বিভিন্নরূপ (Forms of Government):

সরকারের রূপ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন নিয়মানুসারে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্লেটো (*Plato*) পাঁচ ধরনের সরকারের কথা বলেছেন। অ্যারিস্টটল (*Aristotle*) বলেছেন ছয় ধরনের। এ ছাড়া বিভিন্ন লেখক নানাভাবে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা কতজন লোকের উপর ন্যস্ত আছে তার ভিত্তিতে অ্যারিস্টটল (*Aristotle*) সরকারকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রত্যেকটি বিভাগের আবার দুটি করে রূপ থাকতে পারে—একটি স্বাভাবিক বা যথার্থ (normal) রূপ এবং অপরটি এর বিকৃত (Perverted)

1. *Bertrand Russell : Marriage and Morals ; Pages 171-172.*

রূপ। সরকারের উদ্দেশ্য যদি কল্যাণজনক হয় তাহলে সে সরকার স্বাভাবিক, আর সরকারের উদ্দেশ্য যদি জনকল্যাণমূলক না হয়ে স্বার্থমূলক হয় তবে সে সরকার হল বিকৃত। যদি একজন লোকের উপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে তাহলে রাজতন্ত্র (Monarchy), যদি কয়েকজনের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে তাহলে অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) এবং যদি বহুজনের হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে তবে তা হল গণতন্ত্র (Polity)। এরা হল স্বাভাবিক রূপ। এদের বিকৃত রূপ হচ্ছে যথাক্রমে: (১) স্বৈরাচারতন্ত্র (Tyranny or Despotism), (২) ধনিকতন্ত্র (Oligarchy) এবং (৩) জনতাতন্ত্র (Democracy*)। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*-)র মতে সরকারের যে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে যথার্থ মূল বিভাগ দুটি। যথা—(১) ধনিকতন্ত্র (Oligarchy) এবং (২) গণতন্ত্র (Democracy)

সাধারণতঃ সরকারকে ধনিকতন্ত্র এবং গণতন্ত্রে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়। আবার ধনিকতন্ত্র এবং গণতন্ত্রকেও শ্রেণীবিভক্ত করা যেতে পারে। ধনিকতন্ত্র হতে পারে সত্যিকারের অভিজাততন্ত্র, যাতে প্রকৃত জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তিরাই দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। এর বিপরীত ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর স্বার্থপর ক্ষমতাপ্রিয় লোক দেশের শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করতে পারে। যদি অভিজাততন্ত্রে দেশের শাসনক্ষমতা প্রকৃত গুণী ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হয় এবং শাসনকর্তারা নিজেদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রেখে জনগণের কল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন, তাহলে সে অভিজাততন্ত্র প্রকৃত গণতন্ত্রের কাছাকাছিই চলে যায়। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থা নাগরিকদের উপর ন্যস্ত হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এত অধিক ও রাষ্ট্রের আয়তন এত বৃহৎ যে, গণতান্ত্রিক শাসন প্রত্যক্ষ না হয়ে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক হতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে এই শাসনব্যবস্থা দক্ষ বা নিপুণ ব্যক্তিদের হাতে, কিংবা ধনীদের অধীনে অথবা বক্তাদের আধিপত্যে থাকতে পারে। সুতরাং ম্যাকেঞ্জির (*Mackenzie*) মতে সরকারের যে বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হয় তা খুব ধরাবাঁধা নয়। যে-কোন সুসংগঠিত সরকারকে জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হবে। কেউ কেউ মনে করেন

* 'Democracy' শব্দটি বর্তমানে সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় *Aristotle* সে অর্থে ব্যবহার করেন নি। দ্রষ্টব্য: *Bertrand Russell*: A History of Western Philosophy; Pages 189-190.

যে, সরকারের মূল্য নির্ভর করে রূপ বা আকারের উপর নয়, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের উপর। কিন্তু ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "বস্তুর নিকর্ষ তার রূপের দ্বারা প্রভাবিত হয়" (The spirit is apt to be somewhat affected by the form.)। কিন্তু কোন বস্তু বা বিষয়ের রূপ ও নিকর্ষকে কি ঐ ভাবে পৃথক করা যায়? প্রশ্ন করা যায়, কোন্ ধরনের সরকার সবচেয়ে ভালভাবে শাসনকার্য চালাতে পারে? নাগরিকদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং তাদের চিন্তা ও ইচ্ছার সঙ্গে সংগতি রেখে যারা শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন তাঁদের যে-কোন ধরনের শাসনব্যবস্থাকেই শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। আসল কথা হল, যাঁরা শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন তাঁদের জনগণের উপযুক্ত প্রতিনিধি হওয়া উচিত। তাঁরা হবেন জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং জনকল্যাণের আদর্শই হবে তাঁদের একমাত্র আদর্শ।

১২। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories of the Nature of State):

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ যদিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, তবু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও আদর্শ নির্ধারণ করার জন্য এগুলি সমাজদর্শনেরও আলোচ্য বিষয়বস্তু।[1] এ মতবাদগুলির মধ্যে মাত্র উল্লেখযোগ্য কয়েকটির আলোচনা নীচে করা হচ্ছে।

(ক) রাষ্ট্র হল ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট (The State as Personal): কোন কোন লোক মনে করেন রাষ্ট্র তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিসত্তা ছাড়াও এক অতিরিক্ত ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। একজন শরীরধারী ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আত্মসচেতনতা এবং ইচ্ছার অধিকারী। রাষ্ট্র ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হওয়ার জন্য উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির মতো রাষ্ট্রও ইচ্ছা করতে ও কাজ করতে পারে। কয়েকজন জার্মান চিন্তাবিদ এই মতবাদের সমর্থক, ব্লাঞ্ট্‌লি তাদের মধ্যে একজন। ব্লাঞ্ট্‌লি

1. *Mackenzie*: Outlines of Social Philosophy: Page 145-53

Bluntchli) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রাষ্ট্রকে পুরুষরূপে কল্পনা করেছেন।[1] তাঁর মতে রাষ্ট্র পুরুষ, গীর্জা হল স্ত্রী। সে যাই হোক, বহু বিষয়ে মানুষের কার্যাবলীর সঙ্গে রাষ্ট্রের কার্যাবলীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই এ মতবাদের সমর্থকবৃন্দ রাষ্ট্রের উপর মানুষের ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন।

সমালোচনা :

কিন্তু এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের অবশ্য কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে কিন্তু তা বলে রাষ্ট্রকে যথার্থ ব্যক্তি বা মানুষরূপে কল্পনা করা যেতে পারে না। ব্যক্তি যেমন পূর্ব থেকে বিচার-বিবেচনা করে কাজ করতে পারে বা তার কাজের জন্য যেমন তাকে দায়ী করা হয়, তেমনি যে কোন প্রতিষ্ঠানকেই দায়ী করা যেতে পারে। তা বলে তাকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা যেতে পারে না। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের ব্যাপারে দায়িত্ব কার, এ স্থির করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। কার্যতঃ, রাষ্ট্রের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় কোন এক বা একাধিক ব্যক্তির উপর যাঁরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সুতরাং বিশেষ ব্যক্তির উপরেই রাষ্ট্রের শাসনভার ন্যস্ত থাকে, রাষ্ট্রের পক্ষ হয়ে তাঁরাই কার্য পরিচালনা করেন। এজন্য রাষ্ট্রকেই ব্যক্তি মনে করা কোন কারণেই সংগত নয়। আঙ্গিক মতবাদে (Organic Theory) এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রকে পুরুষরূপে গণ্য করা শুধুমাত্র অযৌক্তিক নয়, অবাস্তব ব্যাপার।

(খ) রাষ্ট্র সম্পর্কীয় দার্শনিক মতবাদ (The Philosophical Theory of the State) : দার্শনিক *Kant*, *Fichte*, *Hegel*, *Bosanquet* এবং *Green*—এ মতবাদের সমর্থক। এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রকে অতিমানবীয় ব্যক্তি (Super Personal) রূপে কল্পনা করা হয়েছে। প্লেটো (*Plato*) এবং অ্যারিস্টটল (*Aristotle*)-এর ধারণা থেকেই রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্পর্কে এই দার্শনিক তত্ত্ব বা মতবাদের উদ্ভব। প্লেটো (*Plato*) এবং অ্যারিস্টটল (*Aristotle*)-এর মতে রাষ্ট্র হল স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের মধ্যে থেকেই মানুষ তার জীবনকে

1. চতুর্থ অধ্যায়ের ৪নং অংশ দ্রষ্টব্য।

সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে পারে। জার্মান দার্শনিক কাণ্ট (*Kant*)-ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে ঐশ্বরিক অবদান বলে কল্পনা করেছেন। কাণ্ট (*Kant*)-এর পর জার্মান দার্শনিক হেগেল (*Hegel*) রাষ্ট্রের উপর দেবত্ব বা অতিমানবীয় সত্তা আরোপ করে রাষ্ট্রকেই দেবতা বলে কল্পনা করেছেন। হেগেল (*Hegel*) বলেন, "এই মর্তে স্বর্গীয় ভাবের মূর্তরূপ রাষ্ট্র।"[1] তাঁর মতে রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করেই ব্যক্তি তার প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে, সেজন্য ব্যক্তির পরম কর্তব্য হল রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া (His highest duty is to be a member of the state)।"[2] রাষ্ট্রের ইচ্ছা রাষ্ট্রের অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়। একেই বলা হয় সর্বগত ইচ্ছা (general will)। এই সর্বগত ইচ্ছাই রাষ্ট্রের কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এজন্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। ব্যক্তি তার নাগরিক কর্তব্য যথারীতি সম্পাদন করেই নিজের সত্তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং যদি ব্যক্তি এ কর্তব্য সম্পাদন করা থেকে বিরত হয় তাহলে সে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে হারায়। হেগেলের (*Hegel*) মতে নৈতিকতা মূর্তরূপ গ্রহণ করেছে রাষ্ট্রের মধ্যে। তাঁর মতে রাষ্ট্র হল একটি আত্মসচেতন নৈতিক সত্তা।

বোসান্‌কোয়েটের (*Bosanquet*) মতবাদ অনুযায়ী মানুষের প্রকৃত ইচ্ছা এবং অপ্রকৃত ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য আছে। হবহাউস (*Hobhouse*) বলেন, "ডক্টর বোসান্‌কোয়েট (*Dr. Bosanquet*)-এর মতে আমরা যাকে জানি সেই বাস্তব ইচ্ছার অন্তরালে একটা গভীর যথার্থ ইচ্ছা আছে যা হল বাস্তব ইচ্ছার সুসংগঠিত ও সম্পূর্ণভাবে সংগতি বা সামঞ্জস্যযুক্ত রূপ।"[3] কোন ব্যক্তির ইচ্ছা যদি রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরোধী হয় তাহলে মনে করতে হবে যে সেই ব্যক্তি তার প্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অপ্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

---

1. "The State is the Divine Idea as it exists on earth."
—*Hegel*: Philosophy of History (*English Translation*). Page 41
2. *Hegel*: Philosophy of Right, Page 306.
3. "According to Dr. Bosanquet, then there is underlying the actual will of which we are aware, a deeper real will which is the actual will recognized and made completely consistent or coherent."
—*Hobhouse*: A Metaphysical Theory of State. Page 42

ব্যক্তির উর্ধ্বে রাষ্ট্রের স্থান। ব্যক্তির উর্ধ্বে রাষ্ট্রের নিজস্ব ইচ্ছা আছে, অধিকার আছে। যেহেতু সর্বগত বা সর্বসাধারণের ইচ্ছা রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, সেহেতু রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করা প্রতিটি ব্যক্তিরই অবশ্য কর্তব্য। রাষ্ট্র সকল রকম সমালোচনার উর্ধ্বে। রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির ইচ্ছার সংঘর্ষ বা বিরোধিতা দেখা দিলে ব্যক্তিকেই তার ইচ্ছা পরিবর্তিত করে রাষ্ট্রের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছার সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে।

বোসান্‌কোয়েট (*Bosanquet*) যদিও দার্শনিক মতবাদকে সমর্থন করেছেন এবং ব্যক্তির উর্ধ্বে রাষ্ট্রের স্থান নির্দিষ্ট করেছেন, তবুও ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিলোপ-সাধনের কথা তিনি সমর্থন করেন নি। রাষ্ট্রের কাজ হল ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথে যেসব অন্তরায় বর্তমান সেগুলিকে অপসারিত করে ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা। বোসান্‌কোয়েট (*Bosanquet*) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "রাষ্ট্র হল সেই সমাজ যা সাধারণত: আইনসংগতভাবে বলপ্রয়োগ করার সংগঠনরূপেই স্বীকৃত হয়ে আসছে।"[1] গ্রীন (*Green*)-ও ব্যক্তির মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের সীমা নির্দেশ করেছেন। ব্যক্তির অধিকারকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দিলেই রাষ্ট্র ব্যক্তির আনুগত্য লাভের প্রকৃত অধিকারী হয়। গ্রীন (*Green*) বলেন, "সমাজ-প্রদত্ত কতকগুলি ক্ষমতালাভের জন্য ব্যক্তির যে দাবী বা অধিকার এবং ব্যক্তির উপর ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সমাজের যে অনুরূপ দাবী, উভয় নির্ভর করছে এই শর্তের উপর যে, নৈতিক জীব হিসেবে মানুষের কর্তব্য কর্মকে পূর্ণ করার জন্য এবং নিজের ও অপরের চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্য ঐ ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে।"[2]

---

1. "The state is that society which is habitually recognised as a unit lawfully exercising force."

—*Bosanquet*: Philosophical Theory of the State; Page 189.

2. "The claim or right of the individual to have certain powers secured to him by society and the counter claim of society to exercise certain powers over the individual alike rest on the fact that these powers are necessary to the fulfilment of man's vocation as a moral being, to an effectual self-devotion to the work of the developing the perfect character in himself and others."

—*T. H. Green*: Principles of Political Obligation; Page 387.

সমালোচনা :

প্রথমতঃ রাষ্ট্র সম্পর্কীয় দার্শনিক মতবাদের সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে, এ মতবাদ যে রাষ্ট্রের কথা বলে, সে রাষ্ট্র হল আদর্শ রাষ্ট্র, কোন বাস্তব রাষ্ট্র নয়। ল্যাস্কি (*Laski*)-র মতে রাষ্ট্র সম্পর্কীয় দার্শনিক মতবাদ, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্কের যে সমস্যা তার সন্তোষজনক সমাধান করতে পারেনি।[1] এর ফলে এ মতবাদ রাজনৈতিক বাধ্যতাবোধ ব্যাখ্যা করতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। রাষ্ট্র ছাড়াও সমাজের মধ্যে নানারকম সংগঠন বর্তমান; যেমন— শিক্ষাসম্পর্কীয় সংগঠন, ধর্মীয় সংগঠন, অর্থনৈতিক সংগঠন ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ, এ মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের ইচ্ছা সকল ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয় এবং ব্যক্তির ইচ্ছা যদি রাষ্ট্রবিরোধী হয় তাহলে সেই ইচ্ছা ব্যক্তির অপ্রকৃত ইচ্ছা, প্রকৃত ইচ্ছা নয়। কিন্তু ইচ্ছার এই বিভাগ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ল্যাস্কি (*Laski*) বলেন, "ইচ্ছার বিশ্লেষণে এ মতবাদ মনস্তত্ত্বের দিক থেকে পর্যাপ্ত নয়।"[2] ইচ্ছাকে এভাবে ভাগ করা যায় না।

চতুর্থতঃ, এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র একটি অতিমানবীয় সত্তা, কিন্তু রাষ্ট্রের উপর দেবত্ব আরোপ করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়।

পঞ্চমতঃ, ল্যাস্কি (*Laski*) বলেন, "এই দার্শনিক মতবাদের আর একটি ত্রুটি হল, এ মতবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বরূপকে বুঝতে পারে না।"[3] ব্যক্তি যদিও রাষ্ট্রের অধীন, তবু তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করা সমীচিন নয়। দার্শনিক মতবাদ মানুষকে পূর্ণরূপে দেখে না। মানুষের মধ্যে যেমন বুদ্ধিবৃত্তি আছে তেমনি প্রবৃত্তি আছে; মানুষ প্রবৃত্তি এবং বিচারশক্তি উভয়ের দ্বারা

---

1. "The truth in short, is that the idealist theory of the state has not satisfactorily solved, at least in its most noble modern formulation, the essential problem of the relation between the ideal and the real."

—*Laski* : State in Theory and Practice ; Page 56.

2. "It is psychologcially inadequate in its analysis of the nature of will."

—*Laski* : State in Theory and Practice, Page 57.

3 "It is a further weakness in the idealist view that it fails to understand the nature of individuality."

—*Laski* : State in Theory and Practice , Page 58.

পরিচালিত হয়। কিন্তু এ মতবাদ মানুষের প্রবৃত্তির দিকটিকে উপেক্ষা করে মানুষের বিচারশক্তির উপরই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এই আংশিক দৃষ্টিভঙ্গীই এ মতবাদকে ত্রুটিপূর্ণ করে রেখেছে।

(গ) রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ (Marxian Theory of the State) : এই মতবাদ অনুসারে মালিকশ্রেণী কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীকে শাসন করার জন্য রাষ্ট্র একটি যন্ত্র বা উপায় (The State is the organ of class rule.)। মার্কসীয় মতবাদ রাষ্ট্রের কোন অতিমানবীয় সত্তা স্বীকার করে না। ভাববাদী দার্শনিক *Hegel, Fichte* এবং *Bosanquet* রাষ্ট্রের উপর যে আধ্যাত্মিক সত্বা আরোপ করেন মার্কসবাদ তা অস্বীকার করে। এ মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হল প্রধানতঃ বলপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে এই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যে ধনগত বৈষম্যের সৃষ্টি হল তার ফলে সমাজ কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত হল, কতকগুলি শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণের উপর নিজেদের মালিকানাকে প্রতিষ্ঠিত করল। এরাই হল পুঁজিপতি শ্রেণী। এদের সংখ্যা স্বল্প হলেও উৎপাদনের উপকরণের একচেটিয়া অধিকার এদের হাতে। এই মালিকশ্রেণী কেবলমাত্র উৎপাদনের উপকরণের একচেটিয়া অধিকারী নয়, সমাজের আইন-কানুনের প্রতিষ্ঠান, এক হিসেবে সব কিছুরই মালিক। এই মালিকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর অগণিত জনসাধারণকে শোষণ করে। শ্রমজীবীরা দিনের পর দিন শোষিত হওয়ার ফলে মালিকশ্রেণীর সঙ্গে তাদের বিরোধ বা সংঘর্ষ দেখা দেয়। তখন এই মালিকশ্রেণী রাষ্ট্রের সহায়তায় এই শ্রমিকশ্রেণীর উপর শোষণ ও দমননীতি চালায়। এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে অর্থনৈতিক সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রমিকশ্রেণী চায় মালিক শ্রেণীর হাত থেকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নিজেদের করায়ত্ত করতে।

মার্কস (*Marx*)-এর সহকর্মী এঙ্গেল্‌স (*Engels*) 'রাষ্ট্রের বিলুপ্তির' (Withering away of the State) কথা বলেছেন। সমাজের মধ্যে শ্রেণীর দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছায় যখন সমাজে মাত্র দুটি শ্রেণী থাকে—এক শোষক-

পুঁজিপতির দল আর এক শোষিত-শ্রমজীবীর দল,—যারা হল সর্বহারা; পুঁজিপতির দল আপ্রাণ চেষ্টা করে এই শোষিতকে বশীভূত করে রাখার জন্য। কিন্তু পুঁজিপতি-সমাজের আভ্যন্তরীণ বিরোধের অস্তিত্বের ফলে সেই সমাজের ভাঙন ধরে এবং শ্রমিকশ্রেণী অধিকতর শক্তির অধিকারী হয়। অবশেষে মালিকশ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হবে। সর্বহারাদের এই বিপ্লবের সঙ্গে পূর্ববর্তী বিপ্লবের পার্থক্য আছে। কার্ল মার্কস (*Karl Marx*) বলেন, "পূর্ববর্তী সব ঐতিহাসিক আন্দোলন ছিল সংখ্যালঘুদের আন্দোলন বা সংখ্যালঘুদের স্বার্থে আন্দোলন। সর্বহারাদের এই আন্দোলন হল অসংখ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে অসংখ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের সচেতন স্বাধীন আন্দোলন।"[1] পুঁজিপতিদের রাষ্ট্রের জায়গা দখল করবে শ্রমজীবীদের শাসনব্যবস্থা এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রাম বা শ্রেণীবিরোধ ততদিন একেবারে বিলুপ্ত হবে না যতদিন না জগৎ থেকে শোষকশ্রেণীকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে এক শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকবে। ধীরে ধীরে যখন বিরোধী শক্তি সম্পূর্ণভাবে বশীভূত হবে, সমাজের বুকে যখন আর কোন শ্রেণীবিরোধ থাকবে না, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকবে এবং রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ হ্রাস পাবে, তখন শেষ পর্যন্ত শ্রেণীহীন সমাজ উদ্ভূত হবে এবং রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটবে (The State will wither away)। এই শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থাই হল সমভোগবাদ (Communism)।

মার্কসীয় মতানুসারে সমভোগবাদের আদর্শই হল সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ যার দিকে সমস্ত মনুষ্যসমাজ ধাবিত হচ্ছে।

সমালোচনা:

(১) মার্কসবাদীরা মনে করেন যে রাষ্ট্র স্বভাবতঃই একটি বল প্রয়োগের যন্ত্র। একথা সত্য যে, শক্তিশালী শ্রেণী দুর্বলের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের

1. All previous historical movements were movements of minorities or in the interests of minorities. The Proletarian movement is the self-conscious independent movement of the immense majority in the interest of the immense majoirty."—*Karl Marx.*

অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে প্রয়োগ করেছে, কিন্তু তার থেকেই এই সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নয় যে রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের যন্ত্রমাত্র।

(২) আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের লক্ষ্য বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের জনকল্যাণ সাধন করা। এই রাষ্ট্রের লক্ষ্য সব রকম শোষণ ও উৎপীড়ন বন্ধ করা ও গণতন্ত্রের মূল নীতিগুলিকে কার্যকরী করে তোলা। প্রতিটি নাগরিক যাতে নিজের সুপ্ত গুণগুলিকে বিকশিত করে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া ও সকলের স্বার্থ রক্ষা করা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের লক্ষ্য। কাজেই আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগের যন্ত্ররূপে আখ্যাত করা যেতে পারে না।

(৩) মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যথার্থ নয়। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণের সাহায্যেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ ব্যাখ্যা করা সমীচীন নয়। জাগতিক প্রয়োজন ছাড়াও, অন্যান্য প্রয়োজনও রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

(৪) আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রভূত যত্ন নেওয়া হয়। শ্রমিক সংঘগুলি শ্রমিকদের কল্যাণের দিকে এতই নজর রাখে যে পুঁজিবাদীদের পক্ষে শ্রমিকদের উপরে অত্যাচার চালান খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

মার্কসবাদের সমালোচনা

(৫) মার্কসবাদ অনুসারে যখন সমাজে কোন শ্রেণীবিরোধ থাকবে না তখন রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটবে। ভবিষ্যতে যথার্থ কোন রাষ্ট্র থাকবে কি থাকবে না —তা নিয়ে আলোচনা চলতে পারে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। যা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত তাহল দূর কল্পনার বিষয় যার কোন বিজ্ঞানসম্মত রূপ স্থির করা যায় না। এ প্রসঙ্গে মার্কসবাদ অবৈজ্ঞানিক মতবাদে পরিণত হচ্ছে।

(৬) শ্রেণীহীন এবং রাষ্ট্রহীন সমাজ-ব্যবস্থা কল্পনার বিষয়; বাস্তবে এই জাতীয় সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন আদৌ সম্ভব কিনা চিন্তার বিষয়।

(ঘ) রাষ্ট্র সম্পর্কীয় যান্ত্রিক মতবাদ (The State as Mechanism): এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ রাষ্ট্রকে একটি যান্ত্রিক সংগঠন রূপে গণ্য করেন। রাষ্ট্র কোন আত্মিক ঐক্য নয়, বরং একটি কৃত্রিম যন্ত্র, যেটি মানুষ তার

কতকগুলি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য সৃষ্টি করেছে। একটি সামাজিক চুক্তি থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। একটি যন্ত্রের যেমন ইচ্ছানুসারে সংস্কার সাধন করা যেতে পারে, বা তাকে নূতন করে গঠন করা যেতে পারে, তেমনি ইতিহাসের নিয়মকে অগ্রাহ্য করেও রাষ্ট্রের অনুরূপ পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে। পুরাতন অট্টালিকাকে ধ্বংস করে যেমন তার জায়গায় নতুন একটি অট্টালিকা নির্মাণ করা যেতে পারে, তেমনি ইতিহাসের নিয়ম ও ধারাকে অগ্রাহ্য করে পুরাতন রাষ্ট্রের স্থানে নতুন রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।

এ মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তির স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য নয়। ব্যক্তির ভাল-মন্দ ব্যক্তি নিজেই নির্ধারণ করতে পারে। ব্যক্তি যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে রাষ্ট্রের কর্তব্য কেবলমাত্র তারই ব্যবস্থা করা। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন। রাষ্ট্রের কাজ হল পুলিসী কাজ—রাষ্ট্রের কাজ হল নেতিবাচক। জনকল্যাণমূলক কাজ করার এবং অকল্যাণ প্রতিহত করার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর নেই। এ মতবাদেরই অন্যতম রূপ হল স্বাচ্ছন্দ্য নীতি বা অবাধ নীতি (*Laissez Faire*)। এ মতবাদের বিরোধী মতবাদ হল সমাজতন্ত্রবাদ।

সমালোচনা :

রাষ্ট্র সম্পর্কীয় যান্ত্রিক মতবাদ যথার্থ নয় এবং সেহেতু রাষ্ট্র সম্পর্কে এটি সন্তোষজনক মতবাদরূপে গৃহীত হতে পারে না। রাষ্ট্র মানুষের দ্বারা সৃষ্ট, কিন্তু সেকারণে রাষ্ট্রকে একটি যান্ত্রিক বিষয়রূপে গণ্য করা চলে না। যেহেতু মানুষের দ্বারা সৃষ্ট সেহেতু রাষ্ট্র কোন অট্টালিকার সমতুল্য নয়। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে ইতিহাসের নিয়ম ও ধারার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। রাষ্ট্রের ভিত্তি জনগণের ইচ্ছা, কাজেই খেয়ালখুশীমত রাষ্ট্রের সংস্কারসাধন বা পুনর্গঠন সম্ভব নয়। রাষ্ট্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির যান্ত্রিক সমষ্টিমাত্র নয়, রাষ্ট্র পরস্পর নির্ভর ব্যক্তির ঐক্য, যে ব্যক্তিরা জনকল্যাণ সাধনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। রাষ্ট্রের কার্য নঞর্থক নয়, সদর্থক; কারণ যে-কোন সভ্য রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণসাধনের জন্য সংগঠনমূলক পরিকল্পনাকে কার্যকরী

করার জন্য সচেষ্ট হয়। প্রয়োজনে সব রাষ্ট্রকেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং বলপ্রয়োগ করতে হয়, জনকল্যাণের আদর্শকে কার্যকরী করার জন্যই এর প্রয়োজন দেখা দেয়।

সিদ্ধান্ত :

সামাজিক ঐক্যের রূপ হল রাষ্ট্র (The State as a Mode of Social Unity) : 'রাষ্ট্র সামাজিক ঐক্যের রূপ'—এই মতবাদই চরমপন্থী মতবাদগুলিকে এড়িয়ে একটি মধ্যপন্থা গ্রহণের সন্তোষজনক উপায়। এ মতবাদ জনকল্যাণের আদর্শকে কার্যকরী করে তুলতে পারে। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বিকাশ আছে। রাষ্ট্রকে যন্ত্ররূপে কল্পনা করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। রাষ্ট্রের বিশেষ ধরনের কাজ আছে এবং এ কাজের সীমাও নির্দিষ্ট আছে। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের কল্যাণই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। গ্রীন (*Green*) বিশেষ করে রাষ্ট্রের এই জনকল্যাণমূলক আদর্শের দিকটিকেই নির্দেশ করেছেন। একদিকে উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও অপরদিকে সর্বগ্রাসী সমাজতন্ত্রবাদকে পরিহার করে রাষ্ট্রকে সমাজ-কল্যাণের পক্ষে একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত। মানুষের জন্য রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য মানুষ নয়, কিন্তু যেহেতু ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানুষকে তার মনুষ্যত্ব ধীরে ধীরে অর্জন করতে হয়, সেজন্য কোনরূপ নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিষ্ঠান ছাড়া সে চলতে পারে না। রাষ্ট্র হচ্ছে এরূপ নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিষ্ঠান, যার বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ক্ষমতা, উপায় ও অধিকার আছে।

সংক্ষিপ্তসার

১। রাষ্ট্র সমাজ, সম্প্রদায়, জনসাধারণ, দেশ প্রভৃতি থেকে স্বতন্ত্র। সমাজ হল মানুষের ইচ্ছাকৃত যে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক বা বিভিন্ন পারস্পরিক সম্পর্কের সমষ্টিগত রূপ। সম্প্রদায় হল কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমষ্টি যারা স্বাজাত্যবোধ দ্বারা যুক্ত। এক হিসেবে সমগ্র মনুষ্যজাতিকেও একটি বৃহৎ সম্প্রদায় বলে ধরা যেতে পারে। জনসাধারণ তাকেই বলে যেখানে কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে ঐতিহ্যগত ও ভাবগত ঐক্য দেখা যায়। দেশ বলতে

1. *Mackenzie* : Outlines of Social Philosophy; Page 52.

সাধারণতঃ একটি ভূখণ্ডকে বোঝায় সেখানে কোন জাতি স্থায়িভাবে বসবাস করে। বংশ সেই রকম জনসমষ্টি যাদের প্রাকৃতিক গঠন, মনোভাব, অভ্যাস, চিন্তাধারা, অনুভূতি ও কার্য অন্য বংশগত জনসমষ্টি থেকে পৃথক করে রাখে। জাতি এক গভীর রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমষ্টি, যারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়িভাবে বাস করে এবং যাদের মধ্যে ধর্মগত, সংস্কৃতিগত, ঐতিহ্যগত, ভাষাগত, সাহিত্যগত প্রভৃতি এক বা একাধিক বিষয়ে ঐক্য বর্তমান। খণ্ডজাতি এমন একটি দল যার ব্যক্তিরা গোষ্ঠীগত, ভাষাগত বা অতীতে কোন বন্ধনের দ্বারা যুক্ত। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র বা সরকার হল এক বা একাধিক ব্যক্তির দ্বারা গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান যা আইন-প্রনয়ন করে এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও শাসনকার্য পরিচালনা করে। কিন্তু সরকার ও রাষ্ট্র এক নয়।

রাষ্ট্র হল নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসবাসকারী আইন অনুসারে সংগঠিত জনসমষ্টি যাদে একটি শাসনব্যবস্থা আছে এবং যারা বহিঃশক্তির শাসন থেকে মুক্ত। রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য: (ক) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (খ) জনসমষ্টি, (গ) সরকার বা শাসনব্যবস্থা ও (ঘ) সার্বভৌমিকতা।

২। সমাজের যত সংঘ ও প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে রাষ্ট্র সর্বোচ্চ বা সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। সমাজের অন্যান্য সংঘ ও প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করা এবং সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের কাজ। তাছাড়া, আইন-প্রণয়ন করা এবং শাসনকার্য পরিচালনা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সমাজ ও রাষ্ট্র ভিন্ন। সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল করার জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন।

৩। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক ভিত্তি কি? এ প্রশ্ন নির্ভর করছে কিন্তু অপর একটি প্রশ্নের উপর— সামাজিক জীবনে রাষ্ট্র কি একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান? একথা ঠিক যে, নিয়ন্ত্রণ ও শাসন ছাড়া সমাজ-জীবনের শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় থাকে না এবং সেই হিসাবে রাষ্ট্রের প্রয়োজন আছে বা রাষ্ট্র সমাজ-জীবনের পক্ষে একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে: কি ভাবে রাষ্ট্র সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করবে, বলপ্রয়োগের দ্বারা? অর্থাৎ বলপ্রয়োগই কি রাষ্ট্রের ভিত্তি?

৪। আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ও বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগ করতেই হয়। প্রশ্ন হল: (ক) রাষ্ট্রের পক্ষে বলপ্রয়োগ কি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদান? এবং (খ) রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের কি কোন সীমা আছে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের লক্ষ্য বা ভিত্তি নয়, একটি উপায় মাত্র। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে, বলপ্রয়োগের একটি সীমা আছে এবং জনসাধারণের সম্মতি অনুসারে ও জনকল্যাণের জন্য মাত্র বলপ্রয়োগ সমর্থনযোগ্য।

৫। রাষ্ট্রের সরকারের তিনটি বিভাগ: (ক) আইন-প্রণয়ন বিভাগ, (খ) শাসন বিভাগ ও (গ) বিচার বিভাগ। সুসংগঠিত রাষ্ট্রে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইন-কানুন মেনে চলে এবং রাষ্ট্র কেবলমাত্র প্রয়োজনানুসারে নাগরিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বলপ্রয়োগ করে থাকে।

৬। কতকগুলি বিশেষ কাজ আছে যা একমাত্র রাষ্ট্রই করতে পারে। যেমন—আইন-কানুন প্রণয়ন, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, ন্যায় অনুসারে বিচার ইত্যাদি। আবার কতকগুলি কাজ করতে রাষ্ট্রই সবচেয়ে উপযুক্ত। যেমন—দেশের সম্পদ ও শিল্প রক্ষা এবং উন্নত করা, শিক্ষার ব্যবস্থা করা, জনকল্যাণমূলক কাজ করা ইত্যাদি। অন্যদিকে কতকগুলি কাজ সম্বন্ধে রাষ্ট্র মোটেই উপযুক্ত নয়, যেমন—ধর্ম সম্পর্কীয় ও সংস্কৃতি সম্পর্কীয় কাজে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। সর্বশেষে, কোন কোন কাজ করতে রাষ্ট্র অক্ষম। যেমন—মানুষের নীতিবোধকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সে কেবল ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৭। রাষ্ট্র ও নীতিবোধের সম্পর্ক সম্বন্ধে দুটি প্রশ্ন আছে: (ক) রাষ্ট্রের পক্ষে নীতিবোধ মানা সম্ভব কিনা? এবং (খ) রাষ্ট্র ব্যক্তির নীতিবোধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিনা? প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে কারও কারও মতে রাষ্ট্র নীতি মেনে চলতে বাধ্য নয়, তার পক্ষে যা সুবিধাজনক তাই সে করবে। আবার কেউ কেউ বলেন, রাষ্ট্রের নীতি মেনে চলা প্রয়োজন, নইলে সমাজ-জীবন ভেঙে পড়বে। দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বলতে হয় যে, রাষ্ট্র ব্যক্তির নীতিবোধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, যেহেতু বাধ্যতামূলক নীতিবোধ কোন নীতিবোধই নয়।

৮। সমাজে রাষ্ট্র ও পরিবার উভয়েরই স্থান গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ পারিবারিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনুচিত। পরিবার যদি রাষ্ট্রবিরোধী না হয়, তবে শিশুর শিক্ষার ভার মাতাপিতার হাতে থাকা ভাল; রাষ্ট্র কেবল বাইরে থেকে সাধারণভাবে শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে।

৯। *Aristotle*-এর মতে সরকারের ছয়টি রূপ: স্বাভাবিক রূপ তিনটি—রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র। এদের তিনটি বিকৃত রূপ, যথাক্রমে—স্বৈরাচারতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র ও জনতাতন্ত্র। সরকারের মূল্য নির্ভর করে তার বাইরের রূপের উপর নয়, তার জনকল্যাণমূলক শাসনকার্যের দক্ষতার উপর।

১০। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে: (ক) একটি মত হল, রাষ্ট্র ব্যক্তি-সত্তাবিশিষ্ট, কিন্তু এ মত ঠিক নয়। (খ) দার্শনিক মতানুসারে রাষ্ট্র হল অতিমানবীয় ব্যক্তি যা স্বর্গীয়ভাবের মূর্ত প্রকাশ এবং ব্যক্তির উচিত বিনা দ্বিধায় রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করা। এ মতও গ্রহণযোগ্য নয়, রাষ্ট্র সমাজের একটি অংশ। কোন ব্যক্তির পৃথক সত্তাকে রাষ্ট্র গ্রাস করতে পারে না (গ) মার্কসীয় মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হল শ্রেণীবিশেষের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার এবং বর্তমানে পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রের সাহায্যে শ্রমিকশ্রেণীকে শাসন ও শোষণ করছে। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের ফলে ভবিষ্যতে শ্রেণীবিহীন সমাজ স্থাপিত হবার পর রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সমাজ হল কল্পনার বিষয়বস্তু, তার বাস্তব রূপ কেউ পূর্ব থেকে স্থির করে দিতে পারে না। (ঘ) যান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাই রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। কিন্তু এ মতও ভ্রান্ত। (ঙ) রাষ্ট্র হল সামাজিক ঐক্যের মূর্ত রূপ, এ মতবাদটিই সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য।

নবম অধ্যায়

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

(Educational Institutions)

১। শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য (Social Significance of Education) :

শিক্ষার দুপ্রকার তাৎপর্য আছে। একটি ব্যক্তিগত ও অপরটি সামাজিক। ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা হল শিক্ষার দ্বারাই ব্যক্তি তার গুণগুলিকে বিকশিত করে তুলতে পারে, তার পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধান করতে সমর্থ হয় এবং মনুষ্যত্ব অর্জনে সমর্থ হয়। কিন্তু এ ছাড়াও শিক্ষার একটা সামাজিক তাৎপর্য আছে। আদর্শ সমাজ তখনই গড়ে উঠতে পারে যখন প্রতিটি ব্যক্তি তার আচরণকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজ জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিরই উচিত অপরের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া;

সামাজিক ঐক্য ও উন্নতির জন্য শিক্ষা অপরিহার্য

কিন্তু যে ব্যক্তি বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিজের আবেগ, প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারে তার পক্ষে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা খুবই স্বাভাবিক। ব্যক্তি যদি অধিকার এবং কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন না থাকে তাহলে সমাজ-জীবনের শান্তি ও ঐক্য বিশেষ ভাবে ব্যাহত হবে এবং তাতে সমাজের উন্নতিও সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে শিক্ষিত ও নিয়মানুবর্তী করে তোলা যাতে সে তার আচরণ বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং সমাজ-জীবনের শান্তি ও ঐক্য বজায় রাখতে পারে। তাছাড়া, একমাত্র শিক্ষার মারফতই সমাজের উন্নতি সম্ভব। শিক্ষার এ হল প্রাথমিক উদ্দেশ্য। শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে গঠন করা দরকার, যাতে প্রতিটি ব্যক্তি নিজের পরিবার ও সমাজ-জীবনের গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে বৃহত্তর মনুষ্য-সমাজের কল্যাণের জন্য চিন্তা ও চেষ্টায় ব্রতী হতে পারে। শিক্ষা ভিন্ন এরূপ আদর্শের চেতনা সমাজস্থ ব্যক্তির মধ্যে আনা সম্ভব নয়।

ব্যক্তি নিয়েই সমাজ। সমাজের উন্নতি বা অগ্রগতি ব্যক্তির উন্নতি ভিন্ন কখনই সম্ভব নয়। প্রতিটি ব্যক্তিকে সমাজ জীবনে তার অবস্থান অনুযায়ী সমাজের দ্বারা নির্দেশিত কতকগুলি কর্তব্য সম্পন্ন করতে হয়। ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ববোধ ও সামাজিক চেতনা থাকলেই ব্যক্তি এই কর্তব্যগুলি সুচারু-রূপে সম্পন্ন করতে পারেন, শিক্ষার দ্বারাই ব্যক্তির মনে এই দায়িত্ববোধ ও সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করা যেতে পারে। যে সমাজে সুস্থ, শ্রমশীল, সচ্চরিত্র, আদর্শনিষ্ঠ, আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা অধিক সে সমাজ যে তত উন্নত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব গুণ একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই বিকশিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং শিক্ষা মানব সমাজের অন্যতম প্রাথমিক প্রয়োজন। শিক্ষা ভিন্ন আদর্শ সমাজের কল্পনা করা মূর্খতারই নামান্তর। এ কারণে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানাভাবে মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়, সমাজ-জীবনে সেগুলির অবদান এবং মূল্য অপরিসীম। সমাজদর্শনের কাজ এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা।

ব্যক্তির বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য

২। শিক্ষা কথাটির সাধারণ তাৎপর্য (The General Significance of Education):

ইংরেজী *Education* শব্দটি এসেছে ল্যাটিন *Educare* কথাটি থেকে, যার অর্থ হল প্রতিপালন করা (to bring up) এবং *educere*—এই ক্রিয়াপদটির সঙ্গে যুক্ত, যার অর্থ হল উৎপাদন করা (to bring forth)। এই কারণে পাশ্চাত্ত্য দেশে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হল, কেবলমাত্র ছাত্রকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করা নয়, বরং তার মধ্যে সেই সব অভ্যাস এবং মনোভাবের সৃষ্টি করা যার সহায়তায় সে কৃতিত্বের সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনের সম্মুখীন হতে পারে এবং জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে। প্লেটো (*Plato*)-র মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ছাত্রের সামর্থ্য অনুযায়ী তার দেহ ও মনের সৌন্দর্য ও পূর্ণতাকে বিকশিত করে তোলা; ভিন্ন ভাষায়, সুস্থ শরীরে একটি সুস্থ মনকে (a sound mind in a sound body) বিকশিত করে

তোলা। প্লেটো (*Plato*)-র মতে মনে জ্ঞানের সঞ্চার করাই শিক্ষার কাজ নয়, মনের মধ্যে সুপ্ত যে গুণগুলি আছে তার বিকাশ সাধন করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। অ্যারিস্টটল (*Aristotle*)-এর মতে শিক্ষার অর্থ মানুষের বৃত্তিকে বিশেষ করে তার মনকে বিকশিত করে তোলা যাতে সে সত্য, শিব এবং সুন্দরের ধারণাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং এর মধ্যেই পূর্ণ সুখ নিহিত। হোয়াইটহেড (*Whitehead*) বলেন, "শিক্ষা হল কি ভাবে জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হয় সেই কৌশল অর্জন করা।"[1]

তাঁর মতে শিক্ষা শৈশব থেকেই ছাত্রদের মনে আবিষ্কারের আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে। অপ্রয়োজনীয় এবং নিষ্ক্রিয় ধারণা ছাত্রদের মনে অনুপ্রবিষ্ট করা উচিত নয় কারণ তাহলে ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধিগত জড়তা এসে যাবে।

জন্ ডিউই (*John Dewey*)-র মতে শিক্ষা হল একটা সামাজিক প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে সামাজিক করে তোলে। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য সমাজের স্বীকৃত আদর্শের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে ব্যক্তির কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করা। শিক্ষার ব্যাপারে পরিবেশের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের মধ্যে যদি কোন অবাঞ্ছিত বিষয়ের উপস্থিতি থাকে তাহলে সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে হবে। শিক্ষাই ব্যক্তিকে সামাজিক দিক থেকে উপযুক্ত করে তোলে। ডিউই (*Dewey*)-র শিক্ষা সম্পর্কীয় ধারণা গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত।

ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) তাঁর '*Outlines of Social Philosophy*' গ্রন্থে শিক্ষার তাৎপর্যকে দুদিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে এবং সংকীর্ণ অর্থে দুভাগে নেওয়া যেতে পারে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল এমন একটা প্রক্রিয়া যা আমাদের সমস্ত জীবন ধরে চলতে থাকে এবং জীবনের সব রকম অভিজ্ঞতাই এই শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করে। তিনি বলেন, "এই অর্থে এটি হল সাধারণ প্রক্রিয়া যার দ্বারা আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় এবং যার দ্বারা মানুষ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে ও যে

1. "Education is the acquisition of the art of the utilisation of knowledge."
—*A. N. Whitehead*: The Aims of Education and Other Essays. Page 6.

বিশ্বে তারা বসবাস করে তার সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে পারে।[1] ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে আত্মোপলব্ধিকেই বোঝাচ্ছেন। আত্মোপলব্ধির (Self realisation) অর্থ হল মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা। হোয়াইটহেড (*Whitehead*) বলেন, "শিক্ষার একটিমাত্র বিষয় আছে এবং তাহল সর্বতোভাবে প্রকাশিত জীবন।"[2] যে-কোন মানুষ অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী হতে পারে, কিন্তু সব গুণগুলিই যে স্বাভাবিকভাবে পরিস্ফুট হয় তা নয়; অনেক গুণ থাকে সুপ্ত হয়ে। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারাই মানুষের এই সুপ্ত গুণকে বিকশিত করা সম্ভব এবং তারই ফলে মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত মহৎ ও বৃহৎ সত্তাকে আবিষ্কার করতে পারে। মানুষের আত্মোপলব্ধি তখনই আসে যখন তার জীবনে জ্ঞান, ইচ্ছা ও অনুভূতির পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটে।

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "সংকীর্ণ অর্থে একে মনে করা যেতে পারে—আমাদের ক্ষমতাকে বিকশিত এবং অনুশীলন করার জন্য সচেতনভাবে পরিচালিত যে কোন প্রচেষ্টা।"[3]

ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*)-র মতে ব্যাপক অর্থে যে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে সে শিক্ষার অধিকাংশই মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে লাভ করে। জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, প্রকৃতির প্রভাব ও প্রেরণা, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, জীবনের সুযোগ ও সাফল্য এবং ব্যর্থতা ও দুর্ভোগ থেকে মানুষ এই শিক্ষা লাভ করে। সংকীর্ণ অর্থে যে শিক্ষা সে শিক্ষা মানুষ সচেতনভাবেই গ্রহণ করে। একেই বোঝাতে গিয়ে ডিউই (*Dewey*) 'ইচ্ছামূলক শিক্ষা (Intentional

1. "It means, in this sense, the general process by which personality is developed and by which persons are enabled to realize their relations to one another and the universe in which they live."
—*Mackenzie*: Outlines of Social Philosophy; Page 24

2. "There is only one subject matter of education, and that is life in all its manifestations."
—*Whitehead*: The Aims of Education and other Essays; Page 10.

3. "In a narrow sense, it may be taken to mean and consciously directed effort to develop our powers."
—*Mackenzie*, Outlines of Social Philosophy; Page 24.

Education) কথাটি ব্যবহার করেছেন। সাধারণতঃ সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝায় যখন রাষ্ট্র, পরিবার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কোন একটি সংগঠনের বা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সাধনের জন্য তরুণদের ক্ষমতাকে বিকশিত করার ব্যবস্থা করেন। সমাজদর্শনে 'শিক্ষা' কথাটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ না করে সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহার করা হবে। 'শিক্ষা' কথাটিকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করলে এর সামাজিক তাৎপর্যটুকু অতি সহজেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রথমে শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে পরিবারের উপর। তারপর ধীরে ধীরে সে দায়িত্ব এসে পড়ে স্কুল ও কলেজের উপর।

৩। শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (The Ends of Education) :

যে-কোন সুসংগঠিত সমাজে শিক্ষা দেওয়ার সুমহান দায়িত্ব কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশেষ ধরনের কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করা হয়। প্রশ্ন হল এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি বা কোন আদর্শ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত করে? শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অভিমত দিয়েছেন। প্লেটো (*Plato*), অ্যারিস্টটল (*Aristotle*) এবং কোন কোন শিক্ষাবিদ্ মনে করেন, জ্ঞান অর্জনই শিক্ষার লক্ষ্য। আবার কেউ কেউ মনে করেন, সংস্কৃতিই (culture) শিক্ষার উদ্দেশ্য। সংস্কৃতি অর্থে তাঁরা বোঝেন ব্যক্তিগত মানসিক উন্নতি। হারবার্ট (*Herbert*), বার্টাণ্ড রাসেল (*Bertrand Russell*) প্রভৃতি ব্যক্তির মতানুসারে সৎ চরিত্র গঠন শিক্ষার উদ্দেশ্য। হারবার্ট স্পেন্সার (*Herbert Spencer*) পরিপূর্ণ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে-সব কর্ম করার প্রয়োজন তার জন্য শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত করে তোলাকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য মনে করেন। রুশো (*Rousseau*)-র মতে জীবনের সব গুণের স্বাভাবিক বিকাশকেই শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে নির্দেশ করা যেতে পারে। কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে উত্তম নাগরিকতাই শিক্ষার লক্ষ্য, আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, ব্যক্তির সহজাত সামর্থ্যের আত্মপ্রকাশের

শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদের অভিমত

সুযোগ দেওয়াই শিক্ষার লক্ষ্য। নান্ (*T. P. Nunn*)-এর মতে শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য। ডিউই (*John Dewey*)-র মতে সামাজিক কর্মকুশলতাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। পেস্তালোজি (*Pestalozzi*)-র মতে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব (harmonious personality) শিক্ষার লক্ষ্য।

উপরিউক্ত অভিমতগুলির মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে সত্য, তবু এই সকল অভিমতের মধ্যেই শিক্ষার উদ্দেশ্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না; কারণ এরা মানুষের জীবনের কোন বিশেষ একটি দিকের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই কারণে কোন কোন শিক্ষাবিদ শিক্ষার একাধিক উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন।

জোয়াড (*Joad*)-এর মতে শিক্ষার একাধিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আছে। তার মধ্যে তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য: যথা, (ক) ছেলেমেয়েদের জীবিকা অর্জনের জন্য উপযুক্ত করে তোলা; (খ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যাতে নাগরিক হিসেবে তারা কাজ করতে পারে তার জন্য তাদের উপযুক্ত করে তোলা এবং (গ) তাদের মধ্যে যত সুপ্তশক্তি এবং বৃত্তি আছে তাদের বিকশিত করে সৎ জীবন যাপন করার জন্য তাদের সমর্থ করে তোলা।[1]

মানুষের জীবনের যে বিভিন্ন দিকের বিকাশের কথা উপরে বলা হয়েছে, শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের মধ্যে এই সব কটিই অন্তর্ভুক্ত হবে, বিশেষ কোন একটি দিক শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ মানুষটিকে শিক্ষা দেওয়া, ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধন করা। শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করা।

সাধারণ জীবনে আমরা দেখি, একজন মানুষ একটি পরিবারভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে, একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত নাগরিক হিসেবে এবং সমস্ত মনুষ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত একজন সভ্য হিসেবে শিক্ষালাভ করে। যদিও মানুষের জীবনের এ তিনটি স্তরের মধ্যে একটা নিবিড় সংযোগ আছে তবু এ তিনটি স্তর অনুযায়ী মানুষের শিক্ষাপদ্ধতি ভিন্ন।

1. *C. E. M. Joad*: About Education, Page 23.

সমাজের মূল কেন্দ্র হল পরিবার। পরিবারের মধ্যেই ব্যক্তির প্রথম শিক্ষা শুরু হয়। পরিবারের মধুর পরিবেশ, মাতাপিতা, ভাইবোন ও আত্মীয়স্বজনের সহানুভূতি, সমবেদনা ও ভালবাসা ব্যক্তির শিক্ষা-জীবনকে করে তোলে স্বতঃস্ফূর্ত, স্থায়ী ও প্রাণবন্ত। কিন্তু যে বৃহত্তর পরিবেশে ব্যক্তিকে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রবেশ করতে হবে তার কথা যদি বিস্মৃত হওয়া যায় তাহলে এ শিক্ষা হবে স্বার্থকেন্দ্রিক, ক্ষুদ্র ও অর্থহীন। পরিবারের সীমিত গণ্ডির মধ্যে থেকে ব্যক্তির শিক্ষা যদি সীমাবদ্ধ ভাবে গড়ে ওঠে, ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি করার কথা ভাবে, উচ্চতর আশা, আকাঙ্ক্ষা, বৃহত্তর সমাজ-জীবনের চেতনা যদি তার মধ্যে না জাগে, তাহলে সমাজের দিক থেকে এরূপ ব্যক্তি উপযুক্ত ব্যক্তি নয়।* কেবলমাত্র নিজের প্রয়োজনে রুটি রোজগার করা এবং জীবনের বৃহত্তর অর্থ ও উদ্দেশ্যকে বিস্মৃত হওয়া ক্রীতদাসত্বেরই লক্ষণ।

শিক্ষার যথার্থ আদর্শ

পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে মানুষের প্রথম শিক্ষাজীবন শুরু হলেও মানুষের পরিচয় সেখানেই শেষ নয়। মানুষ একটা জাতির বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং মানুষের এই পরিচয়ে নিহিত আছে তার বৃহত্তর দায়িত্ব সাধনের কর্তব্য। তাকে তার সমাজের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে জানতে হবে, সমাজ-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে হবে।

ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা শিক্ষার উদ্দেশ্য

কিন্তু এ ছাড়াও আছে মানুষের আর এক বৃহত্তর পরিচয়। মানুষ কেবল পরিবার বা সমাজেরই সভ্য নয়; সে বৃহত্তর মনুষ্য সমাজের বা আন্তর্জাতিক

* গিসবার্ট (*Gisbert*) মানুষের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, —"মানুষ একজন পরিশ্রমী কর্মী বা একজন দক্ষ কারিগরের চেয়ে অনেক বেশী। এর থেকে বড় কথা, তাকে বৃহত্তর কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে এবং উচ্চতর আশাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে।" ("Man is far more than a hard worker or a skilful artisan; what is more, he has wide duties to discharge and higher aspiration to fulfil.")

—*P. Gisbert*: Fundamentals of Sociology; Page 220

সমাজের (International Society) সভ্য। মানুষে মানুষে বর্ণগত, দেশগত ও জাতিগত যত পার্থক্যই থাক না কেন, প্রতি মানুষের মধ্যে আছে মন এবং অনুভূতি যার দ্বারা মানুষ পরস্পরকে বুঝতে পারে, জানতে পারে, পরের দুঃখ, সহানুভূতি ও সমবেদনা উপলব্ধি করতে পারে।* বস্তুতঃ, বহু প্রভেদ ও পার্থক্য সত্ত্বেও মূল বিষয়ে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। বর্তমান যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির ফলে আন্তর্জাতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। এ কারণে কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে নিয়মকানুনের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। প্রতিটি মানুষকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে, যাতে সে তার মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, ইচ্ছামূলক এবং সৌন্দর্য সম্পর্কীয় শক্তিগুলিকে বিকশিত করে নিজের বিশ্ব-মানবত্ব উপলব্ধি করতে পারে। এর ফলে ভবিষ্যতে এক বন্ধুত্বের এবং ভালবাসার যোগসূত্রে সমস্ত জাতি বাঁধা পড়বে এবং পরস্পরের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার এই হল প্রধান লক্ষ্য—প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলা, মানুষের পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা।

শিক্ষা হল একটা গতিশীল প্রক্রিয়া। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ছাত্রদের পুঁথিগত বিদ্যা দান করা নয়। যে জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না সে জ্ঞানের ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই। হিল্ডা জেবা[1] (*Hilda Jaba*)-এর মতে আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দোষত্রুটি দেখি তার প্রধান কারণ, আমরা এখনও মনে করি যে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক আদর্শের বুঝি কোন পরিবর্তন নেই, সেগুলি স্থির ও অপরিবর্তনীয়। সে

*গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "এতে মানুষের প্রকৃতির সবচেয়ে অন্তরঙ্গ দিক—মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং তার সবচেয়ে বাহ্যিক দিক—আন্তর্জাতিক সমাজ, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়।" ("It is here that the most intimate aspect of human nature—man's personality—and its most external aspect—international society—meet."

Gisbert : Fundamentals of Sociology, Page 922.

1. *Hilda Jaba* : The Dynamics of Education, Page 195.

কারণে অনেকে মনে করেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য যুবকদের মনে কতকগুলি স্বীকৃত সত্য ও মূল্যের ধারণা অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়া; কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। হিল্ডা জেবা (*Hilda Jaba*)-এর মতে শিক্ষার্থীর অনুরাগ, সামর্থ্য, প্রবণতা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার্থী এবং তার পরিবেশের মধ্যে একটা গতিশীল আন্তরসম্পর্ক বর্তমান এবং উভয়ের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্য দিয়েই শিক্ষণীয় বিষয়ের নতুন তাৎপর্য শিক্ষার্থীর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়।

৪। বিদ্যালয়ের কার্য (The Functions of the School):

বিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজ শিশুকে শিক্ষা দান করা, শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে তাকে পড়তে, লিখতে ও অঙ্ক কষতে শেখান এবং মাধ্যমিক স্তরে একটা নির্বাচিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী তাকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু এ ছাড়াও বিদ্যালয়ের আরও গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে, বিদ্যালয়কে শিশুর চরিত্রগঠন ও ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধনের দায়িত্ব নিতে হয়। বিদ্যালয় শুধুমাত্র লেখাপড়া শিক্ষা দেবার প্রতিষ্ঠান নয়, সামাজিক শিক্ষাদানেরও একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়ের কাজ শিশুকে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের দীক্ষা দেওয়া। বিদ্যালয়ের একটা নিজস্ব পরিবেশ আছে এবং বিদ্যালয়ের কাজ শিশুকে এই পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই পরিচয়ের মাধ্যমেই বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটে, বিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশে শিশুর মধ্যে 'আমরা ভাব' (we-feeling) জাগ্রত হয়, শিশু শিক্ষা করে অপরের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করে কিভাবে কাজ করতে হয়। শিশুর শ্রেণীকক্ষ (Class room), খেলার মাঠ, এবং পাঠ্যসূচী-বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ এই 'আমরা-ভাব' জাগ্রত করার উপযুক্ত মাধ্যম।

বিদ্যালয়ের কর্তব্য

ডিউই (*Dewey*)[1] বিদ্যালয়ের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যের উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, সেই পরিবেশের সৃষ্টি করা যায় যারা শিশুর মানসিক উন্নতি সাধিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, সেই বিষয়গুলি থেকে পরিবেশকে মুক্ত রাখা যায় যারা শিশুর

1. Democracy and Education, P. 22-27.

মানসিক উন্নতি ব্যাহত হয় এবং তৃতীয়তঃ, একটি বৃহত্তর ও উচ্চতর পরিবেশের সৃষ্টি করা।

ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*)-এর মতে শিশুর আত্মবিকাশের দায়িত্ব তার উপর ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না যে জনজীবনের মাঝে সে বেড়ে উঠবে বিদ্যালয়ের কাজ তার পরিচয় তাকে দেওয়া। সে কারণে সমাজে যাদের সঙ্গে সে মিলেমিশে থাকে, তাদের ভাষা তাকে শিখতে হবে এবং এই ভাষার মধ্যেই নিহিত থাকবে সমাজের উদ্দেশ্য ও আদর্শ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা। শিশুকে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে এই শিক্ষা দিতে হবে এবং সহানুভূতির সঙ্গে তার প্রয়োজনগুলিও বিবেচনা করে দেখতে হবে।

শিশুর শিক্ষায় পরিবেশের প্রভাব

বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সমাজের ঐতিহ্যের মধ্যে যা কিছু সবচেয়ে শুভ ও শ্রেয় তার সঙ্গে শিশুর পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে সুন্দর ভাবগুলি তাদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে। যেসব নিয়মকানুন এই সব ঐতিহ্যকে সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়ী করে তুলেছে সেই নিয়মকানুন সম্বন্ধেও তাদের জ্ঞান দেওয়া, বিদ্যালয়ের কাজ।

তারপর শিশুকে পরিচিত করে তুলতে হবে তার চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে। প্রকৃতিকে জানতে শেখানোর মাধ্যমেই তার মনকে বিকশিত করে তুলতে হবে। প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে শিশু চিন্তা করতে শিখবে। তার থেকেই আসবে মানুষের জীবনকে জানার ইচ্ছা, তার থেকেই ইচ্ছে হবে মানুষের ইতিহাসকে জানতে।

শিশু শিক্ষার বিভিন্ন ধাপ

কিন্তু শুধুমাত্র জ্ঞান সঞ্চয় করে লাভ নেই, যদি না তাকে কাজে লাগান হয়। সেজন্য জ্ঞানকে যাতে কাজে লাগান হয় সে বিষয়েও শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর কল্পনা শক্তি, সৃজনী শক্তি ও মৌলিক চিন্তা শক্তিকে বিকশিত করে তুলতে হবে। যে-কোন জিনিসের প্রয়োজনের দিক এবং তার সৌন্দর্যের দিক—উভয় দিক সম্পর্কেই যাতে সে সচেতন হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর দৈহিক উন্নতির দিকেও বিদ্যালয়ের লক্ষ্য দিতে হবে। সে কারণে শিশুকে দিতে হবে খেলাধূলার সুযোগ। শিশু যাতে নির্দোষ আমোদ

প্রমোদে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং সৎ অভ্যাস অনুশীলন করতে পারে বিদ্যালয়ের সে দিকেও নজর দিতে হবে; তার ফলেই সে শিখবে কি করে সমবেতভাবে কাজ করতে হয়। তারপর বালক-বালিকা যখন সাবালক ও সাবালিকা হয়ে উঠবে তখন স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, পারিবারিক সমস্যা সম্পর্কে তাদের কিছু কিছু সুস্পষ্ট জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল (*Bertrand Russell*)-এর মতে বিদ্যালয়ের স্তরে শিশুদের সেই বিষয়গুলিই শিক্ষা দেওয়া উচিত যেগুলি সকলের প্রয়োজন। শিক্ষার পরবর্তী স্তরে কোন বিষয় সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করা উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সর্বাধিক স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন; কেননা, স্বাধীনতার সংকোচন শিশুদের মৌলিক চিন্তাশক্তির বিকাশ এবং তার বুদ্ধিগত অনুরাগের পথে বাধার সৃষ্টি করে। ছাত্রদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের যদি কোন বিষয় পাঠ করার জন্য বাধ্য করা হয় তাহলে শিক্ষার প্রতিই তাদের বীতরাগ জন্মায়। রাসেল (*Russell*) তাঁর '*Education and Social Order*'[1] গ্রন্থে বলেছেন যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ছাত্রদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য, সহযোগিতার পরিবেশের মধ্য থেকে যাতে ছাত্ররা কোন বিষয় সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসতে পারে।

সুতরাং বিদ্যালয়ের দুটি প্রধান কার্য—একটি হল শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধি করা, বুদ্ধিকে উন্নত করা, তার দৃষ্টিকে ব্যাপক করা, এবং আর একটি হল তার সামাজিক কর্মকুশলতাকে উন্নত করা, তাকে সুনাগরিক হতে শিক্ষা দেওয়া।

(৫) কারিগরী শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Technical or Vocational Education):

ইতিপূর্বে শিশুর যে শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছি, সে শিক্ষা হল সাধারণ শিক্ষা (general education), যার সহায়তায় শিশু নিজেকে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে তুলতে পারবে। কিন্তু সাধারণতঃ প্রত্যেক শিশুরই বিশেষ কোন একটি দিকে প্রবণতা থাকে এবং তার সামর্থ অনুযায়ী

1. *Bertrand Russell* : Education and Social Order, Page 82.

তাকে কোন বিশেষ এক ধরনের কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে. যার দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনে সে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে। কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যা কোন ব্যক্তি বা শিশুকে দেওয়া হয় যার সহায়তায় সে দক্ষতার সঙ্গে বিশেষ কোন কাজ করতে সমর্থ হবে। যেমন তাঁত বোনা বা কাঠের কাজ করা ইত্যাদি। এই শিক্ষা শিল্পসংক্রান্তও হতে পারে এবং কৃষিসংক্রান্তও হতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার বিরোধিতা আছে। হোয়াইটহেড (*Whitehead*) তার বিরোধিতা করে বলেন, "কারিগরী শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষার মধ্যে বিরোধের ধারণা ভ্রান্তিজনক। কারিগরী শিক্ষা যথার্থ হতে পারে না যদি তা সাধারণ শিক্ষা না হয়—সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়, যা কৌশল এবং বুদ্ধিসম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান না করে।"[1] প্রাচীন দার্শনিক প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল বৃত্তিমূলক বা কারিগরী শিক্ষাকে নিকৃষ্ট ধরনের শিক্ষা বলে গণ্য করতেন। তাঁদের মতে এই ধরনের শিক্ষা, বুদ্ধি এবং সৌন্দর্যবর্জিত।

কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু বর্তমান যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। নানা কারণে বর্তমান যুগে কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথমতঃ, আধুনিক যুগে জীবিকা অর্জনের বিষয়টি খুবই জটিল আকার ধারণ করাতে, এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান যুগ বৈশিষ্ট্য অর্জনের যুগ বা বিশেষজ্ঞের যুগ, সে কারণে প্রতিটি বৃত্তির উপযোগী বিশেষ ধরনের শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজন আছে। তৃতীয়তঃ, এই বৈজ্ঞানিক যুগে অনেক বৃত্তিতে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে হয়, যার জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন। চতুর্থতঃ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যতীত সমাজের সমষ্টিগত উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। পঞ্চমতঃ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা মানুষকে স্বাবলম্বী হয়ে জীবিকা অর্জনে সক্ষম করে।

1. The antithesis between a technical and a liberal education is fallacious. There can be no adequate technical education which is not liberal and no liberal education which is not technical: that is no education which does not import both technique and intellectual vision." —*Whitehead*: Aims of Education and Other Essays. Page 74.

সাধারণতঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলতে বিশেষ এক ধরনের শিক্ষাকেই বোঝান হয়। ডিউই (*Dewey*)-র মতে বিশেষ কোন একটি বৃত্তির দিকে নজর রেখে ব্যক্তিকে শিক্ষিত করা অসম্ভব। প্রতিটি ব্যক্তি একাধিক বৃত্তির জন্য উপযুক্ত হতে পারে এবং যে-কোন একটি বৃত্তিকে যদি অন্যান্য বৃত্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহলে তা হয়ে পড়ে অর্থহীন। কোন একজন ব্যক্তি কেবলমাত্রই শিল্পী হতে পারে না ; তার পরিবার, তার বন্ধু, তার পরিবেশ এ সবের জন্যও তার অন্যান্য বৃত্তি থাকতে পারে। সুতরাং তার শিক্ষার বৃত্তিমূলক দিকে নজর দেবার সময় তার অন্যান্য বৃত্তিগুলিকে উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত হবে না। তার বৃত্তি নিয়ে সে এত বেশী মত্ত হতে পারে বা সেই বৃত্তি এত বেশী বিশিষ্টতা অর্জন করতে পারে যে, যার ফলে সে অন্যান্য বিষয়গুলি উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য তা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।*

একটি মাত্র বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে না

বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি ব্যক্তির কোন মানসিক প্রবণতা আছে কিনা তা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করেই তবে তাকে এ সুযোগ দিতে হবে। গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "এ ধরনের তালিমের দুটি প্রয়োজনীয় দিক হল যে, বর্তমান সমাজের পক্ষে এর প্রয়োজন আছে এবং যখন যথার্থভাবে দেওয়া হয় তখন এর একটা শিক্ষাপ্রদ মূল্য আছে।"[1] তবে গিসবার্ট (*Gisbert*)-এর মতে এই তালিম কখনও সাধারণ শিক্ষার স্থান গ্রহণ করতে পারে না।

বৃত্তি নির্বাচন

* ডিউই (*Dewey*) বলেন, "শিক্ষার উদ্দেশ্য এই প্রবণতাকে উৎসাহিত করা নয়, বরং এর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা, যাতে অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক না হন, শিক্ষক কেবলমাত্র বিদ্যাভিমানী ব্যক্তি না হন বা পাদরী কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি না হন যিনি পোশাক পরেন" Hence it is not the business of education to foster this tendency but rather to safeguard against it, so that the scientific inquirer shall not be merely the scientist, the teacher merely the pedagogue, the clergyman merely one who wears the cloth and so on.)।

Dewey : Democracy and Education. Page 360.

1. "The two important things about this type of training are that it is necessary for modern society and that properly imparted, it has also an educational value." —*Gisbert* : Fundamentals of Sociology, Page 229.

ডিউই (*Dewey*) তাঁর '*Democracy and Education*' গ্রন্থে শিক্ষার বৃত্তিমূলক দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে কেন্দ্র করে নানারকম ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। অনেকে মনে করেন এই শিক্ষা হল নিছক ব্যবহারিক এবং হয়ত কেবলমাত্র অর্থকরী। তিনি বলেন, "বৃত্তি আর কিছুই নয় যা ব্যক্তির জীবনের কাজগুলিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যার ফলে কাজগুলি হয় সুসম্পাদিত এবং কাজের ফলাফলগুলি হয় তার স্বজনের পক্ষে হিতকর।"[1] সুতরাং কোন বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বলা যেতে পারে যে, আধুনিক সমাজে সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষা উভয়েরই প্রয়োজন আছে। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই এবং ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য উভয়েরই প্রয়োজন।

৬। উচ্চ শিক্ষা (Higher Education) :

উচ্চশিক্ষা বলতে সাধারণতঃ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই বুঝে থাকি। বিশ্ববিদ্যালয়ও সাধারণ শিক্ষা দিয়ে থাকে, তবে স্কুলে বা কলেজে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়, বিশ্ববিদ্যালয়েও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এক বিশেষ মর্যাদা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানকে উন্নত করে ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাপক করে, ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং বিভিন্ন ধারণা ও চিন্তার সঙ্গে ব্যক্তির পরিচয় স্থাপন করে তার চেতনাকে তীক্ষ্ণ করতে সহায়তা করে। এ শিক্ষা মানুষের রুচিকে উন্নত ও মনকে সংস্কারমুক্ত করতে সাহায্য করে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। হোয়াইটহেড (*Whitehead*) তাঁর '*Universities and their Education*' প্রবন্ধে এই বিষয়টির উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তিনি বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কল্পনা এবং

1. "A vocation means nothing but such a direction of life activities as renders them perceptibly significant to a person because of the consequences they accomplish and also useful to his association."

—*Dewey*: Democracy and Education; Page 358

অভিজ্ঞতাকে মিলিত করা।"[1] এই শিক্ষার সাহায্যে মানুষ নিজের মতামত সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারে এবং প্রয়োজনমত তাকে প্রকাশ করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আত্মবিশ্লেষণ, আত্মসংযম ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এনে দেয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হুমায়ুন কবির (*H. Kabir*)-এর মতে বিশ্ববিদ্যালয় হল সেই স্থান যেখানে মানুষ মূল্যের সর্বোচ্চ ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং সেগুলিকে তার ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয় উপাদানরূপে গ্রহণ করার সুযোগ পায়। বাটলার (*N.B. Butler*)-এর মতে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও আদর্শ হল জ্ঞানের সংরক্ষণ, জ্ঞানের প্রসার এবং জ্ঞানের ব্যাখ্যা'। মেকমূনে (*J. Macminay*)-র মতে বিশ্ববিদ্যালয় হল বিশেষ করে সাংস্কৃতিক জীবন এবং সাংস্কৃতিক প্রগতির কেন্দ্র। ল্যাস্কি (*Laski*)-র মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া কিভাবে তথ্যকে সত্যে রূপান্তরিত করতে হয়।

উচ্চশিক্ষার উপযোগিতা

নিউম্যান (*Newman*) বলেন, "এ তাকে শিক্ষা দেয় কিভাবে বস্তুকে তার যথার্থরূপে দেখতে হয়, ঠিকভাবে আসল বিষয়টিকে ধরতে হয়, চিন্তাকে জটিলতা থেকে মুক্ত করতে হয়, ভ্রান্তিকে নির্ধারণ করতে হয় ও অবান্তরকে বাতিল করতে হয়।"[2] এ শিক্ষা মানুষকে শেখায় কোন্ পরিবেশে কিভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। এ শিক্ষা মানুষের মধ্যে দেবার এবং নেবার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয় যাতে প্রয়োজনমত যেমন সে দিতে পারে, আবার প্রয়োজনমত সে গ্রহণ করতেও পারে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, জগৎ সম্পর্কে এক সংগতিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র চোখের সামনে তুলে ধরাই শিক্ষার, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য। যদি কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান শিক্ষার এই আদর্শ সামনে রেখে নিজ

1. "The task of a university is to weld together imagination and experience."

—*Whitehead*: The Aim of Education and Other Essays, Page 130

2. "It teaches him to see things as they are, to go right to the point, to disentangle a skein of thought, to detect what is sophistical; and to discard what is irrelevant."

—*J. H. Newman*: The Idea of a University; Page 177-178

কাজে ব্রতী হয়, তাহলেই সে শিক্ষা ব্যক্তির আত্মবিকাশে সহায়তা করতে পারবে এবং সমাজ-জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে পারবে।

সমাজ-জীবনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সমাজের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ দায়িত্ব আছে। সমাজকে তার অনেক কিছু দিতে হবে; কিন্তু সমাজ-জীবনের প্রকাশ্য প্রয়োজন মেটানই তার একমাত্র কাজ নয়, তার কাজ এর থেকেও বেশী। নাস (*Nash*) বলেন, "সামাজিক সংগঠনের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য আছে বলা মানে এই নয় যে, সমাজ যে সব দাবি ব্যক্ত করে কেবল সেসব দাবি সে মেটাবে। সমাজের কি চাওয়া উচিত সে সম্পর্কেও বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সচেতন করে তুলবে এবং যে সমস্ত যথার্থ অভাব সমাজের আছে সেগুলিও পূর্ণ করার চেষ্টা করবে।"[1]

অবশ্য একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাধারণ শিক্ষা সকলের পক্ষে উপযোগী হলেও উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে ব্যক্তির মানসিক প্রবণতা, গ্রহণ-ক্ষমতা বা সামর্থ্যের দিকে বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*)-র মতে এর জন্য মানুষের জীবনের সাধারণ সমস্যাগুলিকে সুস্পষ্টভাবে ও পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

৭। পরিপূরক শিক্ষা (Supplementary Education):

স্কুল, কলেজের শিক্ষা ছাড়াও ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) আরও এক প্রকার শিক্ষার কথা বলেছেন যা হল পরিপূরক শিক্ষা। আসলে স্কুল-কলেজ আমাদের যে শিক্ষা দেয় তাতেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, এ ধারণা খুবই ভ্রমাত্মক। কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করার একটা পথ নির্দেশ করাই স্কুল এবং কলেজের শিক্ষার লক্ষ্য। কিন্তু যাদের অবসর বা আর্থিক সংগতি কিংবা কোন কারণে যাদের শিক্ষাজীবনে আকস্মিকভাবে কোন বাধার সৃষ্টি হয়ে

1. "Thus to say that the university has obligations to the social order is not to say that it must satisfy only the demands which society can make articulate; a university should seek to make society of what society ought to want as well as to satisfy those wants it readily says it has."

—*Arnold S. Nash*: The University and the Modern World, Page 36.

শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে, তাদের জন্যই এই পরিপূরক শিক্ষার ব্যবস্থা। পাঠচক্র, বক্তৃতা, কিংবা শিক্ষামূলক সংঘ এই পরিপূরক শিক্ষা প্রদান করতে পারে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রতিটি ব্যক্তিকে সৎ নাগরিকে পরিণত করা এবং বৃহত্তর জীবনে তার নির্দিষ্ট সামর্থ্য ও মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী তাকে কর্তব্য সম্পাদন করার শক্তি দেওয়া। কিন্তু মানুষ সামাজিক জীব, যে শিক্ষাই সে লাভ করুক না কেন, সমাজ-জীবনে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে, সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাকে তার উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে। সে কারণে তার সামর্থ্যানুযায়ী তার নির্দিষ্ট কর্মের দিকে নজর দিতে গিয়ে তার শিক্ষাকে সংকুচিত করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। এ ছাড়াও নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমেও অনেক কিছু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী বর্তমান, কিন্তু এই বিভিন্ন শ্রেণীর-জনসাধারণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরস্পরকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টাও শিক্ষার জগতে এক প্রয়োজনীয় বিষয়।

৮। রাষ্ট্র এবং শিক্ষা (The State and Education):

শিক্ষা ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্বন্ধে দুটি মত

(রাষ্ট্র এবং শিক্ষার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে দুটি মত দেখা যায়। কোন কোন লেখক মনে করেন যে, যেহেতু শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে ভাল নাগরিকে পরিণত করা, সেহেতু শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যক্তিকে শিক্ষিত করার বিরাট এবং সুমহান দায়িত্ব কেবলমাত্র রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অপরপক্ষে, অন্যান্য লেখকরা বলেন যে রাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিজের আয়ত্তে এনে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন করেন এবং শিক্ষকদের স্বাধীনতা হরণ করে তাদের বেতনভুক চাকুরেতে পরিণত করেন। তাঁদের মতে, শিক্ষা হল সামাজিক বিষয়, রাজনৈতিক বিষয় নয় এবং শিক্ষকদের উপরই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করার দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত। শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা নির্ধারিত হওয়া দরকার তার ব্যক্তিগত মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী

এবং শিক্ষকদের শিক্ষা ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকা প্রয়োজন ও তাঁদের দায়িত্ব পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সুযোগ দেওয়া দরকার। শিক্ষা ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও শিক্ষা ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখাই যুক্তিযুক্ত।

পূর্বোক্ত দুটি মতবাদই চরম মতবাদ; সেহেতু একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত। প্রথমতঃ, শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের যে করণীয় কিছু নেই, তা ঠিক নয়। একটা সুনির্দিষ্ট সংগঠন ছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হতে পারে না এবং যেহেতু রাষ্ট্রই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশীল সংগঠন, সেহেতু রাষ্ট্রের উপর এ দায়িত্ব আংশিকভাবে না এসে পারে না। অপরপক্ষে শিক্ষাব্যবস্থার উপরে রাষ্ট্রের অত্যধিক কর্তৃত্ব বা হস্তক্ষেপ শিক্ষার বিভিন্ন প্রয়োজন, অবস্থা ও ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে শিক্ষাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন যান্ত্রিক পথে পরিচালিত করে এবং তা ব্যক্তির উন্নতি ও বিকাশের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর। তাছাড়া, শিক্ষকদের উপর অযথা আধিপত্য করে শিক্ষকদের স্বাধীনতা হরণ করা প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী। ব্রুব্যাকার (*J. S. Brubacher*) বলেন, "রাষ্ট্র যেমন স্কুল তৈরি করতে পারে তেমনি পরিবার, গীর্জা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সংগঠনও তাই পারে। সুতরাং শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার দাবী করার ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিজেকে সতর্ক রাখতে হবে।"[1] গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার বা কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিপক্ষতা করা প্রকৃত গণতন্ত্রের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ।"[2]

সুতরাং মধ্যপন্থা অবলম্বনই যুক্তিযুক্ত। শিক্ষাব্যবস্থার উপরে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হবে খুবই সীমিত। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*)-র মতে রাষ্ট্রের কাজ হল শিক্ষাব্যবস্থাকে যথার্থভাবে কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত সুযোগের ব্যবস্থা করে

1. 'The state may provide schools but so also may the family, church, industry, and other voluntary agencies. Therefore, the state must guard itself against claiming a monopoly in the education of children."
—*J. S. Brubacher*: Modern Philosophies of Education: Page 189.

2. "State monopoly of education or discrimination against any type of educational institution, is incompatible with true democracy."
—*Gisbert*: Fundamentals of Sociology: Page 235.

দেওয়া এবং এই সুযোগগুলির যথার্থ সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা। রাষ্ট্রের কাজ হল অর্থনৈতিক সাহায্যের দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা, উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা এবং তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার পূর্ণ সুযোগ দান করা। যেহেতু সমাজের বিভিন্ন বিষয় এবং শক্তিগুলিকে সংযোজন করার একমাত্র কর্তৃপক্ষ হল রাষ্ট্র, সেহেতু শিক্ষাসম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রের সকল রকম সহায়তা প্রদান করা উচিত। রাষ্ট্র শিক্ষাবিদ্‌দের সহায়তায় নতুন নতুন পরিকল্পনার সাহায্যে বা বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌দের পরিকল্পনাকে অনুমোদন করে এবং শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে-কোন পরিকল্পনাকে সহায়তা করে শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করে তুলতে পারে। রাষ্ট্রের মধ্যে সকলেই যাতে শিক্ষালাভ করার সম্পূর্ণ সুযোগ পায় তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের সব রকম প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করা, শিক্ষাব্রতী এবং উদ্যোগী ব্যক্তিদের সহায়তায় অশিক্ষা এবং অজ্ঞতাকে দূরীভূত করা।

শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকলেও তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত

উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টি হতে পারে। রাষ্ট্রের কাজ হল শিক্ষাব্যবস্থাকে সুসংহত ও সুগঠিত করতে সহায়তা করে এমন দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টি করা। ব্রুব্যাকার (*J. S. Brubacher*) বলেন, "ছাত্রকে এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে তাকে, নাগরিক হিসেবে নয়, পরন্তু ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষিত করে তোলা হবে। রাষ্ট্রের মুখপাত্র বা হাতিয়ার রূপে নয়, তাকে একটি বিশেষ লক্ষ্য হিসেবে শিক্ষিত করা হবে। তার মানে এই নয় যে, ভাল ব্যক্তির শিক্ষা এবং ভাল নাগরিক শিক্ষার মধ্যে কোন বিরোধিতা আছে; এটা হল কেবলমাত্র স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, এক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ধরনের মূল্য বর্তমান, যে বিষয়ে যে-কোন গণতন্ত্রকে অন্ততঃ অবিরত সচেতন থাকতে হবে।" [1]

---

1. **"In the way too this people will be assured of being educated as an individual and not exclusively as a citizen. He will be educated as an end and not just as mouthpiece or instrument of the state. This is not to imply that there is any necessary antithesis between the education of the good individual and the education of the good citizen but it is a reminder that there are two different kinds of value here to which a democracy at least, must be constantly sensitive"**

—*John. S. Brubacher*: **Modern Philosophies of Education; Page 14[illegible].**

৯। শিক্ষার দার্শনিক বিচার (Philosophical Evaluation of Education) :

সমাজদর্শন যেহেতু সামাজিক আদর্শ ও মূল্যের বিচার করে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আদর্শের আপেক্ষিক মূল্য বিচার করা সমাজদর্শনের কাজ। শিক্ষার লক্ষ প্রসঙ্গে যদিও এই আলোচনা করা হয়েছে তবু শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কীয় কয়েকটি দার্শনিক মতবাদের আলোচনা নীচে করা হচ্ছে :

(ক) স্বভাববাদ (Naturalism) :

স্বভাববাদ অনুসারে শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়াই শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত। এই মতের প্রধান প্রবর্তক হলেন রুশো (*Rousseau*)। রুশো গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মতে যেহেতু শিশুর বিকাশ ও বর্ধন স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া (Natural process), সেহেতু শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা যদি প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক পথে অগ্রসর না হয়ে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে অগ্রসর হয়, তাহলে সেই শিক্ষাব্যবস্থা হবে ত্রুটিপূর্ণ। শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা যেন স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হয়। বাইরে থেকে কোন বাধা যেন শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির বিকাশের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি না করে। শিশুর বৃত্তিগুলির স্বাভাবিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাও শিক্ষার আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। যান্ত্রিকভাবে পাঠ মুখস্থ করা, পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্নিহিত অর্থের তাৎপর্য উপলব্ধি না করে পাঠ্যবিষয় শিক্ষা করা এবং তার পুনরুৎপাদন করা প্রভৃতি কৃত্রিমতাপূর্ণ শিক্ষা। শিশুর শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর সহজাত বৃত্তি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবেগ, শিশুর ইচ্ছা, কামনা, বাসনা প্রভৃতির প্রকাশের সুযোগ থাকা দরকার। শিশুকে খেলাধূলার মাধ্যমে, আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বাধানিষেধ শিশুর শিক্ষাব্যবস্থার পথে এক প্রধান অন্তরায়। পাঠ্যবিষয় যেন শিশুর কাছে বোঝা বলে মনে না হয়। শিক্ষার ব্যাপারে যেন কোন বাধ্যবাধকতার মনোভাব শিশুমনে সৃষ্টি না হয়। শিশুর উপর জোর করে কতকগুলি আদর্শ চাপিয়ে দেওয়া হলে, শিশুর মনে তার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং শিক্ষার প্রতি

শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তগুলির বিকাশ শিশু আদর্শ

শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ দেখা দেবে না। শিক্ষায়তনের পরিবেশ যেন শিশুর নিকট আনন্দজনক হয়। শিশুর প্রথম দিকের শিক্ষাব্যবস্থাকে রুসো নঞর্থক শিক্ষারূপে (negative education) অভিহিত করেছেন। নঞর্থক শিক্ষা বলতে শিক্ষার অভাব বোঝায় না, বরং শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যাপারে প্রাপ্তবয়স্কের প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি বা অভাব বোঝায়। শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতি-নির্ভর, প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কেবলমাত্র প্রকৃতি প্রদত্ত।

পরবর্তীকালে রুসো প্রবর্তিত পূর্বোক্ত শিক্ষা-আদর্শ অনেক শিক্ষাবিদ যেমন, পেস্টালোৎসি (*Pestalozzi*), হারবার্ট (*Herbert*), ফ্রোয়েবেল (*Froebel*) এবং মন্টেসরী (*Montessori*) সমর্থন করেন এবং তাঁর অভিমতকে আরও সুস্পষ্ট রূপ দান করেন।

সমালোচনা :

এই মতবাদ শিক্ষার কোন যথাযথ আদর্শ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়। শিশুর সব বৃত্তিকেই স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হবার সুযোগ দেওয়াও শিক্ষার আদর্শ হতে পারে না। কারণ তাহলে শিশুর কুপ্রবৃত্তিকেও স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ দিতে হয়। কিন্তু শিশুর কুপ্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ দান না করে, সেগুলি যাতে আত্মপ্রকাশের সুযোগ না পায়, বা সেই আবেগ কোন সৎপথে পরিচালিত হয় তার ব্যবস্থা করাই যথাযথ শিক্ষার আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতি প্রদত্ত বৃত্তিগুলির অব্যাহত প্রকাশই যদি শিক্ষার আদর্শ হয় তাহলে শিক্ষাদান করার প্রয়োজন থাকে না। আর যদি মনে করা হয় শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির বিকাশ ও পরিচালনার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন তাহলে কোন শিক্ষার আদর্শ স্বীকার করা দরকার, যে আদর্শ অনুযায়ী এই পরিচালন কার্য সম্পাদিত হবে। কাজেই স্বভাববাদীদের কোন উপযুক্ত শিক্ষা-আদর্শকে স্বীকার করে নিতেই হয়।

(খ) প্রয়োগবাদ (Pragmatism) :

প্রয়োগবাদীদের মতে সফল প্রবৃত্তি (fruitful-activity) অর্থাৎ বাস্তব জীবনে কার্যকারিতাই সত্যাসত্যের মানদণ্ড। কাজেই শাশ্বত সত্যের অস্তিত্ব

নেই। সত্য সদা পরিবর্তনশীল। প্রয়োজনানুসারে সত্যেরও পরিবর্তন ঘটে। পার্স (*Peirce*), জেম্‌স (*James*), ডিউই (*Dewey*), এবং শিলার (*Schiller*) প্রয়োগবাদের সমর্থক।

প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শিক্ষার আদর্শ নিরূপণের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন ডিউই (*Dewey*)। ডিউইর মতে মানুষের কাছে সবচেয়ে বাস্তব বিষয় হল অভিজ্ঞতা (experience)। শিক্ষার আদর্শ হল মানুষের অভিজ্ঞতার গুণগত উৎকর্ষ সাধন। তাঁর মতে পুরাতন শিক্ষা আদর্শ হল ব্যক্তিকে তার অভিজ্ঞতাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে কার্যসিদ্ধ করতে শিক্ষা দেওয়া। কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে কতকগুলি শাশ্বত সত্যের শিক্ষাদান শিক্ষার আদর্শ হতে পারে না। শিক্ষার আদর্শ হল অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতার পুর্নগঠন ও পুনর্বিন্যাস (reconstruction or re-organisation of experience) যার দ্বারা অভিজ্ঞতা আরও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী-কালের অভিজ্ঞতার গতিপথ নির্ধারণে শিশুর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ কোন আদর্শের উপর নির্ভর করে শিক্ষাদান কার্য সম্পাদিত হলে, শিক্ষা ফলপ্রসূ হতে পারে না। কার্যের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষাদান করতে হবে। শিশুকে 'বলা' অপেক্ষা কার্য করতে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার আদর্শ হবে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই যেন শিশু কোন কিছুর মূল্য নিরূপণ করতে সমর্থ হয়। শিশুর চিন্তাই যেন অভিজ্ঞতাতে পারণত হয়।

অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ও পুনবিন্যাস

সমালোচনা: শিক্ষার আদর্শ বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক হওয়া উচিত এ অভিমত খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু প্রয়োগবাদীদের অভিমত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। কার্যের সফলতাই কি সত্য নির্ধারণ করে, না কোন কিছু সত্য বলেই কার্যে সফলতা লাভ হয়? উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্বীকার করে না

1. "... .....The business of education was to improve the quality of xperience that human beings had."
Selected Readings in the Philosophy of Education, Edited by Joe Park: Fourth printing, Page 73.

নিলে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন সম্ভব হত না। পদ্ধতি কোন উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত। কার্যের সাফল্যের মাপকাঠিতে পদ্ধতির মূল্য নিরূপিত হয় না। স্থায়ী ও শাশ্বত সত্যের কোন অস্তিত্ব যদি না থাকে তাহলে প্রয়োগবাদীদের শিক্ষাদর্শের স্থায়িত্বও স্বীকার করা যেতে পারে না।

(গ) বাস্তববাদ (Realism) :

বাস্তববাদীরা মনে করেন যে, শিক্ষার আদর্শ বাস্তব হওয়া প্রয়োজন। জীবনের কর্মক্ষেত্রে যা প্রয়োজনীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সেই শিক্ষা দান করা, নিছক পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত নয়। ব্যাকরণ, ছন্দ প্রভৃতি অধ্যয়ন করাতেই শিক্ষা পরিসমাপ্ত হয় না। চারপাশের পরিবেশকে ভালভাবে জানাও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। হার্বার্ট স্পেন্সার, হাক্সলি প্রভৃতি এই মতবাদের সমর্থক। বাস্তববাদীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে ভাবী জীবনে কোন বৃত্তির জন্য শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত করে তোলা। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। বাস্তববাদীরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে চান। সবরকম কুসংস্কার থেকে শিক্ষাকে দূরে রাখা একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞানমুখী শিক্ষাই ব্যক্তিকে জীবিকা সংগ্রহে সমর্থ করে। নিছক কাল্পনিক বিষয় বা অতীন্দ্রিয় সত্তার আলোচনা শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত না হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

সমালোচনা : শিক্ষা অবশ্যই বাস্তবভিত্তিক হওয়া প্রয়োজনীয় কিন্তু নিছক বৃত্তির জন্য শিক্ষা লাভ করলে শিক্ষার আদর্শ সীমিত হয়ে পড়ে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির সমগ্র মানবসত্তার বিকাশ। যে শিক্ষা সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত সেই শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কাজেই শুধু বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপরে গুরুত্ব আরোপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কলা, দর্শন, নীতি এগুলিরও যথাযথ স্থান শিক্ষার কার্যসূচীতে থাকা বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) ভাববাদ (Idealism) :

ভাববাদীদের মতে মানুষের শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত পূর্ণতালাভ। শিক্ষার আদর্শ হবে মানুষের সুপ্ত গুণগুলিকে বিকশিত করে তার পূর্ণ সত্তাকে

বিকশিত করা। ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশসাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশসাধনই শিক্ষার লক্ষ্য। সমাজের মধ্যে বসবাস করে, সামাজিক কর্তব্য পালন করে, অর্থাৎ কিনা সমাজের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ জীবন যাপন করে ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করতে হবে। ভাববাদীরা মনে করেন, জীবাত্মা বা ব্যক্তি পরমাত্মা বা বিশ্বচেতনার প্রকাশ। ব্যক্তি যে এক পরমচেতনা থেকে উদ্ভূত, যথাযথ শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে সেই চেতনার সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তিকে তার মধ্যে যে দেবত্ব প্রচ্ছন্ন তাকে বিকশিত করতে উদ্বুদ্ধ করে।

ভাববাদীরা মনে করেন যে যথাযথ শিক্ষাব্যবস্থায় সকল রকম শিক্ষার সুসম সমন্বয় সাধিত হবে। শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা নয়, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষারও শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। যে শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়ক শিক্ষাব্যবস্থায় সে শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করতে কোন বাধা নেই। কাজেই বৃত্তিমূলক শিক্ষাও প্রয়োজনীয়, তবে শিক্ষা যদি শুধুমাত্র বৃত্তির উপযোগী হয়, তাহলে সে শিক্ষা হবে একদেশদর্শী। ব্যক্তির সুপ্ত গুণগুলির বিকাশ সাধন করে ব্যক্তিকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়তা করাই শিক্ষাদানের আদর্শ।

সমালোচনা : ভাববাদীরা যে শিক্ষার আদর্শের কথা বলেছেন সেই শিক্ষা-দর্শের যথাযথ অনুধাবন কষ্টকর। প্রথমতঃ, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের বিষয়টি দুরূহ এবং কিভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে গঠিত করলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হবে তা নিরূপণ করাও সহজসাধ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য, কেননা বিষয়টি বিতর্কমূলক। তাছাড়া, ব্যক্তি কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রকাশ এই অভিমতও সকলে স্বীকার করেন না। 'আত্মোপলব্ধি' শব্দটির যথাযথ অর্থ অনেকের নিকট সুস্পষ্ট নয়।

মন্তব্য : পূর্বোক্ত মতবাদগুলির মধ্যে কোন একটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদ নয়। ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে স্বভাববাদ, প্রয়োগবাদ ও বাস্তববাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সংযুক্ত করেই যথাযথ শিক্ষার আদর্শ নিরূপিত হওয়া যুক্তিযুক্ত।

সংক্ষিপ্তসার

১। ব্যক্তি নিয়েই সমাজ। সমাজকে সুগঠিত ও উন্নত করতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে জনকল্যাণের আদর্শানুসারে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। ব্যক্তিত্বের বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

২। শিক্ষার তাৎপর্য সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের ধারণা হল, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে ব্যক্তির পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করার পদ্ধতিকে বুঝায় এবং সে অর্থে জীবনই ব্যক্তির ব্যাপক শিক্ষাক্ষেত্র। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে ব্যক্ত ও বিকাশ করার ব্যবস্থা।

৩। মানুষ একাধারে ব্যক্তি, নাগরিক ও বিশ্বমানব। ব্যক্তি হিসেবে মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র পরিবার, যেখানে মানুষ সামাজিক গুণগুলি গ্রহণ ও গঠন করার প্রথম সুযোগ পায়। ক্রমশ: মানুষ বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয় ও তার সামাজিক দায়িত্ববোধ অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং তাকে উপযুক্ত নাগরিকে পরিণত করাই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষের আন্তর্জাতিক দায়িত্বও আছে, সেজন্য তার আন্তর্জাতিক-চেতনার বিকাশও শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

৪। বর্তমানে শিশুকে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত করার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের। শিশুর আত্মবিকাশের জন্য তাকে দেশের ও জাতির ঐতিহ্য এবং ইতিহাস শিক্ষা, দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচয়, তার সৃজনীশক্তির বিকাশ ও খেলাধুলা এবং আমোদ-প্রমোদের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

৫। সাধারণ শিক্ষা ছাড়া শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী তাকে কোন-না-কোন কারিগরী শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার মধ্যে কোন বিরোধ নেই, বরং শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে তারা পরিপূরক। বস্তুতঃ, একটিমাত্র বৃত্তির মারফত শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে না, একটি বৃত্তিকে অন্যান্য বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত করে শিক্ষাব্যবস্থা গঠন করা প্রয়োজন। শিশুর মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী বৃত্তি শিক্ষা নির্ণয় করতে হবে।

৬। বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা দেয়। ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে উচ্চশিক্ষা সর্বাপেক্ষা উপযোগী। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু সমাজের প্রয়োজন মেটাবে না, সমাজের যথার্থ প্রয়োজন কি হওয়া উচিত তারও নির্দেশ দেবে।

৭। সকলেই বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় না, তাদের জন্য পরিপূরক শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন।

৮। শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের উপর থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, আবার সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়া ভাল নয়। উপযুক্ত শিক্ষাবিদ্‌গণ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করেন। রাষ্ট্র পরোক্ষভাবে সে-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে। শিক্ষা ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকলেও তার ক্ষমতা হবে সীমাবদ্ধ এবং ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত করা হবে তার লক্ষ্য।

৯। শিক্ষার আদর্শের আপেক্ষিক বিচার করার প্রসঙ্গে চারটি মতবাদ উল্লেখযোগ্য, (১) স্বভাববাদ, (২) প্রয়োগবাদ, (৩) বাস্তববাদ, (৪) ভাববাদ। কোন একটি মতবাদ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে অন্যান্য মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সংযোগই শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য আদর্শ।

দশম অধ্যায়

সাংস্কৃতিক সংঘ

(Cultural Associations)

১। সংস্কৃতি বলতে কি বুঝি? (What is the Meaning of Culture):

'সংস্কৃতি' শব্দটি ক্ষুদ্রতর ও ব্যাপকতর, দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্রতর অর্থে সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মার্জিত রুচি বা অভ্যাসজাত উৎকর্ষ। ডিউই (*Dewey*) বলেন, "সংস্কৃতি বলতে বোঝায় কোন একটা কিছু যার অনুশীলন করা হয়েছে, যা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এ হচ্ছে অপরিণত ও অমার্জিতের বিরোধী।" নৃতত্ত্ববিদরা 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করেছেন। এই অর্থে আমাদের জীবনের সব দিকগুলিই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নৈতিকতা, রীতিনীতি, মানুষের অর্জিত বিভিন্ন অভ্যাস সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যাপকতর অর্থে যখন সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন তার দুটি দিক আছে, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক।

মানুষের প্রতিটি কাজ প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক তার সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যে যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া চলেছে তার মূলে রয়েছে মানুষের কোন-না-কোন প্রয়োজন। মানুষের এই প্রয়োজনকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, পার্থিব প্রয়োজন—যার জন্য মানুষ জমি চাষ করে, খাদ্য উৎপাদন করে, নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করে, প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে খনিজ সম্পদ নিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি করে।

কিন্তু মানুষের আরও এক ধরনের প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন হল, সৌন্দর্য-সম্পর্কীয় এবং আধ্যাত্মিক (Aesthetic and Spiritual)। এরই

1. "Culture means at least something cultivated, something ripened, it is opposed to the raw crude."

—*Dewey*: Democracy and Education, Page 142

জন্য মানুষ সংগীত শিক্ষা করে, কবিতা লেখে, সাহিত্য রচনা করে। পার্থিব বস্তু সম্পর্কে যেমন মানুষের আগ্রহ কি ভাবে এই জিনিসগুলি উৎপন্ন করা যায় তেমনি উৎকর্ষমূলক প্রয়োজন সম্পর্কেও মানুষের আগ্রহ কম নয়। সে কারণে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়াও আমরা দেখি রীতি-নীতি, আচার ব্যবহারের বৈচিত্র্য, প্রচলিত প্রথা, নানা ধরনের অনুষ্ঠান, বহু রকমের প্রতিষ্ঠান এবং এগুলি মানুষের সঙ্গে তার সামাজিক পরিবেশের সম্পর্ককে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে; একে আমরা মানুষের সাংস্কৃতিক দিক বলতে পারি।

গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "এ সকল বস্তু এবং আচরণের ধারা, পার্থিব ও অপার্থিব স্বার্থ এবং সন্তোষ—এ সকল কিছুর জটিল সমগ্রতাকেই প্রাচীন এবং আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌রা 'সংস্কৃতি' নামে অভিহিত করেছেন।"[1] টাইলর (*Tylor*) বলেন, "সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজস্থ মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি নিয়ম, সংস্কার ও অন্যান্য যে-কোন বিষয়ে দক্ষতার জটিল সমাবেশ।"[2] *

'সংস্কৃতির' যে বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হল সেগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে সংস্কৃতি বলতে কেবলমাত্র মার্জিত রুচি, ব্যবহার বা অভ্যাসের

---

1. "This complex whole of objects and ways of behaviour, of material and immaterial interests and satisfactions, has been designated by early and modern anthropologists by the name of culture."
—*Gisbert*: Fundamentals of Sociology, Page 2[?]

2. "Culture is that complex whole which includes knowledge, belief art, morals, law, custom and any other capabilities acquired by men as a member of society." —*E. B. Tylor*: Primitive Culture, Page 1

* ম্যালিনস্কি (*Malinowski*) এর মতে সংস্কৃতি হল, "মানুষের তৈরি বস্তু ও একটি উপায় যার মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্য সাধন করে।" ("As the handiwork of man and as the medium through which he achieves his ends")
— *B. Malinowski*: A Scientific Theory of Culture; Page [?]

* নর্থ (*C. C North*) সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন "সংস্কৃতি হল মানুষের সৃষ্ট সেসব উপায় যেগুলি তাকে তার অভাব মেটাতে সহায়তা করে।" ("The instruments constituted by man to assist him in satisfying his wants.")
—*C. C North*: Social Problems and Social Plannings; Page 19

* সরোকিন (*P. A. Sorokin*)-এর মতে দুটি ব্যক্তির চেতন ও অচেতন ব্যবহারের যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া তার ফলে সৃষ্ট ও পরিবর্তিত যা কিছু তার সমগ্রতাই সংস্কৃতি। তাঁর মতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, কলা সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।"
—Social and Cultural Dynamics, Vol I, Page 8.

উৎকর্ষ বোঝায় না, সংস্কৃতি তার থেকেও বেশী কিছু। সংস্কৃতি হল মানুষের আচরণের সমষ্টি। মানুষের জাগতিক নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতা, তার বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কলা, নৈতিকতা, রীতিনীতি, ভাষা, মূল্যবোধ সব কিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের বিরোধিতা দেখা দেয়। মানুষ তার ব্যক্তিত্বের অনুশীলনের মাধ্যমেই এ বিরোধিতা থেকে মুক্ত হতে পারে এবং এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করতে পারে যাতে সকলে অংশ গ্রহণ করতে পারে। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) '*Culture*' বলতে এই ব্যষ্টিগত ব্যক্তিত্বের (Individual Personality) অনুশীলনকেই বুঝেছেন। শিক্ষার ব্যাপকতর এবং সংকীর্ণতর দুধরনের তাৎপর্য আছে এবং ব্যাপকতর অর্থে শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তাই হল 'সংস্কৃতি'। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "সংকীর্ণ অর্থে এ হল সমাজের জীবনে দীক্ষা লাভ করা, ব্যাপকতর অর্থে এ হল মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে উন্নত করা, যার জন্য সমাজ জীবন হল একটি উপায় মাত্র।"[1]

যথার্থ সংস্কৃতির স্বরূপ

অনেকে আবার সংস্কৃতিকে বিশেষ এক শ্রেণীর লোকদের একচেটিয়া জিনিস বলে মনে করেন, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। প্রতিটি ব্যক্তিরই সংস্কৃতিবান হওয়ার অধিকার আছে এবং নিজের চেষ্টায় সে সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে পারে। বস্তুতঃ, সংস্কৃতির মধ্যে ব্যক্তিগত এবং

* লাপিয়ার (*R T. Lapiere*)-এর মতে "সংস্কৃতি হল, কোন সমাজের সভ্যরা বংশ-পরম্পরায় যেসব আচার, প্রথা ও অনুষ্ঠান উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে সেগুলি।"

—*R T Lapiere* : Sociology ; P. 68.

* সংস্কৃতি সম্পর্কে ডিউই (*Dewey*) বলেন, "এ হল ধারণা ও কলার মূল্যাবধারণ এবং মানবীয় অনুরাগ জাগ্রত করার জন্য অনুশীলন।" ("It is cultivation with respect to appreciation of ideas and art and breed human interests.")

—*Dewey* : Democracy and Education ; Page 141.

* হোয়াইটহেড (*Whitehead*) বলেন, "সংস্কৃতি হল চিন্তার ক্রিয়াশীলতা এবং সৌন্দর্য ও মানবীয় অনুভূতিতে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা।" ("Culture is activity of thought and receptiveness to beauty and human feeling.")

—*Whitehead* : Aims of Education and Other Essays.

1. "In the narrower sense it is to be regarded mainly as a process of initiation into the life of the community ; in the wider sense it is rather the development of the spiritual nature of man, of which the life of the community is an instrument."

—*Mackensie* : Outlines of Social Philosophy, Page 228

সামাজিক দুটি দিকই আছে। 'সংস্কৃতি' মানুষের পশুভাবকে দূর করে। সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই মানুষের সঙ্গে নিম্নতর প্রাণীর পার্থক্য। সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি জানে কিভাবে বুদ্ধিমানের মতো আচরণ করতে হয়, সে পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া করতে পারে। জ্ঞান মানুষের বুদ্ধিকে উন্নত করে, সংস্কৃতি তার হৃদয়কে গঠিত করে। সংস্কৃতির সঙ্গে সামাজিক লক্ষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারে, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হলে সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত। ব্যক্তির সংস্কৃতি সমাজের জীবনকে প্রভাবিত করে, আর ব্যক্তির জীবন সমাজের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। সংস্কৃতিকে অনেক সময় কৃত্রিম বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সাধারণ উপাদানগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, মানুষের অনেক প্রয়োজনের মতন সংস্কৃতিও স্বাভাবিক, কৃত্রিম কিছু নয়।

২। সংস্কৃতি এবং সভ্যতা (Culture and Civilisation) :

'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতা' শব্দ দুটিকে অনেক সময় সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহার করা হয় যদিও তাদের সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহার করা চলে না। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নৈতিকতা, আচার-ব্যবহার এবং সমাজের সভ্য হিসেবে মানুষের অর্জিত অভ্যাস ও কর্মক্ষমতা সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। 'সভ্যতা' বলতে তাঁরা বোঝেন মনুষ্য সমাজের উন্নত স্তরে, শহরে এবং রাষ্ট্রে মানুষের যে কর্মকুশলতার আবির্ভাব ঘটেছে, তার সমষ্টি।

কোন কোন লেখক মনে করেন, মানুষের আচরণের দুটি দিক আছে—বাইরের দিক এবং ভেতরের দিক। আচরণের বাইরের দিক হল সভ্যতা, তার ভেতরের দিক হল সংস্কৃতি। এসব লেখকদের মতে সংস্কৃতির মাধ্যমেই আমাদের প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয়। আমাদের চিন্তা-ভাবনা,

কাজকর্ম, শিল্পকলা, নীতিবোধ, ধর্ম, আমোদ-প্রমোদ সব কিছুর মাধ্যমেই আমাদের সংস্কৃতির প্রকাশ। বিভিন্ন বিষয়ের আকর্ষণ ও মূল্য হল লক্ষ্য এবং বস্তু ও ক্রিয়া হল এই লক্ষ্য লাভ করার উপায়; আর মানুষ যত রকম যন্ত্র বা উপায় নির্ধারণ করেছে সেগুলি সব মিলিয়ে হল মানুষের সভ্যতা। পার্থিব ও শিল্প-সংক্রান্ত যত রকম ব্যবস্থা বা কৌশল এবং মানুষের জীবনকে পরিচালিত করার জন্য যত আর্থিক ও রাজনৈতিক সংগঠন, সবই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত।

আচরণের বাইরের দিক সভ্যতা, ভিতরের দিক সংস্কৃতি

বিভিন্ন লেখক 'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতার' মধ্যে প্রভেদ করেছেন। কাণ্ট (*Kant*)-এর মতে নৈতিকতা সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় উপাদান; সংস্কৃতি মনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, সভ্যতার সঙ্গে ব্যক্তির বাহ্য আচরণের সম্পর্ক। মেথু আরনল্ড (*Metthew Arnold*)-ও মনে করেন যে, সংস্কৃতি হল আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া, যেহেতু মানুষের সমগ্র পূর্ণতাতেই সংস্কৃতি নিহিত, আর সভ্যতা বাইরের ব্যাপার, যা বাহ্য ঘটনার উপর নির্ভর। ম্যাকাইভার (*MacIver*)-এর মতে সংস্কৃতি হল লক্ষ্য, সভ্যতা হল সেই লক্ষ্য লাভের উপায়। তাঁর ভাষায়, সভ্যতা হল সংস্কৃতির যন্ত্র, শরীর বা পরিচ্ছদস্বরূপ। সভ্যতা, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, আর সংস্কৃতি নিজেকে প্রকাশ করে কলা, সাহিত্য, ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্য দিয়ে। আমাদের সংস্কৃতি হল আমরা যা তাই, আমাদের সভ্যতা হল আমরা যা ব্যবহার করি।"[1]

গিসবার্ট (*Gisbert*)[2] বলেন, "সভ্যতা হল বাহ্যিক ও যান্ত্রিক, জনকল্যাণকর এবং উপায়ের সঙ্গেই এর সম্পর্ক। কিন্তু সংস্কৃতির কাজ যেহেতু লক্ষ্য নিয়ে,

1. The Modern State. P. 325.

2. 'Thus civilisation is external and mechanical, utilitarian and concerned only with means, while culture as dealing exclusively with ends, is internal, organic and final."

Gisbert: Fundamentals of Sociology: Page 286.

যেহেতু এ হল আভ্যন্তরীণ, আত্মিক এবং সম্পূর্ণ।' তিনি আরও বলেন, "সভ্যতা হল যা আমাদের আছে, সংস্কৃতি হল আমরা যা তাই।"[1]

সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। যথা,—

(ক) দক্ষতার ভিত্তিতে সভ্যতার পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে কিন্তু সংস্কৃতির বিচার হয় মানুষের মানসিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে। সভ্যতার পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা বাইরের উন্নতি লক্ষ্য করি, যেমন—হাতে বোনা তাঁতের তুলনায় যান্ত্রিক তাঁতের ক্ষমতা অনেক বেশী। আর শিল্পকলার ক্ষেত্রে মতবিভেদের জন্য কোন ভাল চিত্র কারও কাছে সুন্দর, কারও কাছে অসুন্দর।

(খ) সভ্যতার অবদানগুলিকে সহজেই বোঝা যায়, উপলব্ধি করা যায়। সংস্কৃতির অবদান সাধারণ মানুষ অত সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। সাধারণ লোক সামান্য শিক্ষা পেলেই আধুনিক যন্ত্রপাতির কলাকৌশল ও ব্যবহার বুঝে নিতে পারে। কিন্তু কোন লোককে কবিতা লেখা বা ছবি আঁকা ভালোভাবে শেখালেই যে সেই বিষয়ে সে দক্ষতা লাভ করবে তা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

(গ) সভ্যতার গতি যেমন দ্রুত সংস্কৃতির গতি তেমন দ্রুত নয়। সংস্কৃতির গতি অনেক সময় বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে একটা থমথমে নিশ্চল ভাব দেখা দেয়। কখনও বা সংস্কৃতি হয় পশ্চাদগামী।

(ঘ) সভ্যতার ক্ষেত্রে পরিণতি বা ফলাফল হল বড় কথা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিণতির থেকে কাজটাই হল বড়, সেটাই হল লক্ষ্য। তাছাড়া, সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা যত তীব্র, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তত তীব্র নয়। মানুষ সৌন্দর্যকে নানাভাবে উপভোগ করতে পারে, বুদ্ধির সাধনায় নানাভাবে ব্রতী হতে পারে, ধর্ম সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতাও বিভিন্নভাবে হতে পারে; এগুলি একত্রেও বিরাজ করতে পারে। কিন্তু সভ্যতার ক্ষেত্রে দেখি, আধুনিকতম সভ্যতার অবদান প্রাচীন আবিষ্কারকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

(ঙ) সভ্যতা হল ক্রমবর্ধিষ্ণু, কেননা মানুষ পুরাতনের পরিবর্তন বা উন্নতি সাধন করতে পারে কিন্তু সংস্কৃতি তা নয়। কারণ সংস্কৃতি সকলকেই নতুন করে

1. 'Civilisation is what *we* have culture is what *we* are.'—
Gisbert: Fundamentals of Sociology.

অর্জন করতে হয়। সভ্যতা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতি অর্জন করতে হয়।

পূর্বোক্ত পার্থক্যের মধ্যে সবগুলিই যে যুক্তিযুক্ত তা বলা চলে না। সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য লক্ষ্য ও উপায়ের পার্থক্যের সমতুল্য, তা বলা চলে না। কারণ সভ্যতার অবদানগুলির স্বতঃ ও পরতঃ উভয় প্রকার মূল্যই থাকতে পারে। বিজ্ঞানের অবদান যেমন বাহ্যলক্ষ্য সাধন করে, তেমনি তার নিজস্ব মূল্য আছে। সংস্কৃতির তুলনায় সভ্যতার গতি নিরবচ্ছিন্ন। এ অভিমতও যুক্তিযুক্ত নয়। হবহাউস (*Hobhouse*) এবং হোয়াইটহেড (*Whitehead*)-এর মতে নৈতিকতা ও ধর্মের সম্মুখ গতি লক্ষ্য করা যায়, কোন নিশ্চল ভাব দেখা যায় না। সংস্কৃতির তুলনায় সভ্যতার অবদানগুলির বিনিময় সহজতর, এ অভিমতও যুক্তিযুক্ত নয়। আধুনিক আবিষ্কারগুলির বিনিময় যেমন সহজ এই আবিষ্কারগুলির পিছনে যে জ্ঞানের ব্যাপার রয়েছে, তা তেমন সহজে অপরকে জানানো যায় না।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রভেদ থাকলেও একটির সঙ্গে আর একটির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। জাতি এবং ব্যক্তির সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সংস্কৃতির উন্নতি সাধিত হয় এবং সভ্যতার অবদানকে উপেক্ষা করে সংস্কৃতি নিজেকে বিকশিত বা উন্নত করতে পারে না। কাজেই 'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতা' সমার্থক শব্দ নয় বা এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সভ্যতাকে সংস্কৃতির একটি দিকরূপে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত।

৩। সংস্কৃতির সামাজিক তাৎপর্য (The Social Significance of Culture):

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, সংস্কৃতির সামাজিক এবং ব্যক্তিগত উভয় দিকই বর্তমান। সাধারণতঃ মনে করা হয় সংস্কৃতি হল ব্যক্তিগত ব্যাপার, মানুষকে

সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে কোন বিরোধ নেই

নিজের চেষ্টায় সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে হয় এবং খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই এর অধিকারী হতে পারে। তবে সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে কোন বিরোধ নেই, সকলেরই এতে অধিকার আছে। মানুষ তার প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বিরোধে মত্ত হয়, কিন্তু সংস্কৃতিকে

কেন্দ্র করে এ জাতীয় বিরোধিতা দেখা যায় না। বিজ্ঞান, কলা, শিল্প, দর্শন এসবের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন মতবাদ ও মতভেদ দেখা যায় তাহল সভ্যতার বিভেদ বা বিরোধ, সংস্কৃতির বিরোধ নয়। প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য মানুষে মানুষে যে বিরোধিতা এবং যে প্রতিযোগিতা দেখা যায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সংস্কৃতির বিরোধ আমরা লক্ষ্য করি সে কেবল তার প্রাথমিক অবস্থায়; সংস্কৃতির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলেই এ বিরোধিতা মিলিয়ে যায়।

সংস্কৃতি যদিও ব্যক্তিগত অনুশীলনের ব্যাপার তবু এর একটা সামাজিক দিক আছে। সংস্কৃতির প্রথম শুরু গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। তারপর এই সংস্কৃতি অনেকটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে এবং কালে এই সংস্কৃতি সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে বিশেষ কয়েকজন লোকের মধ্যে। সাহিত্য, কলা, দর্শন এসবের প্রকৃত সমজদার অল্প লোকই, তবে এসব জটিল বিষয়কে সহজতর করার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে অধিক সংখ্যক লোক এসবের রসাস্বাদ করতে পারে। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "তবু এ বিষয়ে জোর দেওয়া ভাল যে সংস্কৃতিকে আভিজাত্যের একচেটিয়া দখল থেকে মুক্ত করার মধ্যে নিহিত রয়েছে ভবিষ্যতের আশা।"[1]

কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করলেই সংস্কৃতির সামাজিক তাৎপর্যের বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। প্রথমতঃ, সমাজকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি বেঁচে থাকতে পারে না। আবার প্রতিটি মনুষ্যসমাজের একটা সংস্কৃতি আছে।

সমাজকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে সমাজ বাঁচে না

সংস্কৃতি যেমন ব্যক্তির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য তেমনি সামাজিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যও সাধন করে। সংস্কৃতি সামাজিক বা সংহতি সংরক্ষণে সহায়তা করে। সংস্কৃতি সমাজের ঐক্য কল্যাণের পরিপোষক। সংস্কৃতি সমাজকে প্রভাবিত করে, আর সমাজ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখে। সংস্কৃতি মানুষের মনে মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে তার সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। সংস্কৃতি সমাজের সভ্যদের মধ্যে

---

1. "Yet it is well to insist that the hope of the future lies in rescuing culture from its aristocratic exclusiveness"
—*Mackenzie* : Outlines of Social Philosophy ; 239.

'আমরা-ভাব' (we-feeling) জাগিয়ে তুলে সবাইকে এক ঐক্য ও বন্ধুত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলে। সামাজিক ঐক্য দৃঢ় করার ব্যাপারে সংস্কৃতি সংহতি শক্তি রূপে ক্রিয়া করতে পারে। আবার সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। কাজেই সংস্কৃতি সামাজিক ঐক্য ছাড়াও, আন্তর্জাতিক ঐক্য সৃষ্টি করার পক্ষে সহায়ক।

৪। **সংস্কৃতিই জীবনের লক্ষ্য (Culture as the End of Human Life) :**

মানুষের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের মাধ্যমেই নিহিত আছে মানুষের জীবনের পরমকল্যাণ। মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যখন কামনা, বাসনা, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ইত্যাদি নিম্নতর বৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখনই তার আত্ম-বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি মানুষের জীবনের পরম-কল্যাণ লাভের পক্ষে সহায়ক। যে ব্যক্তি সংস্কৃতিসম্পন্ন সে তার প্রকৃতি বা স্বভাবকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য যত্নবান হয়। জ্ঞানের অধিকারী হওয়া বা সুন্দর বস্তুর অধিকারী হওয়াই সংস্কৃতি নয়; সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি যে ব্যক্তি মানসিক প্রবণতা অর্জন করেছেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি। প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের মধ্যে যা সুন্দর তার প্রকৃত তাৎপর্য বা মূল্য উপলব্ধি করতে তিনিই সক্ষম। কাজেই পার্থিব জগতের মাপকাঠিতে যদি তিনি দীন ও নিঃস্ব হন, আসলে তিনি এক মহান সম্পদের, এক অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী।

বস্তুতঃ, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবনের পরমমূল্যগুলির সৃষ্টি ও মূল্যাবধারণের প্রচেষ্টা থেকেই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির উৎপত্তি ঘটে থাকে। বুদ্ধি সম্পর্কীয় নৈতিক ও সৌন্দর্য সম্পর্কীয় মূল্যগুলির সমন্বয় থেকেই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির উদ্ভব। অবশ্য সমাজভেদে এই মূল্যেরও পার্থক্য ঘটে।

৫। **সাংস্কৃতিক সংঘের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Cultural Associations) :**

সংঘের উদ্ভব হয় তখন যখন কিছু লোক কোন একটি সাধারণ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বা কোন সাধারণ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হয়। ম্যাকাইভার

ও পেজ (*MacIver and Page*) বলেন, "উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসেবেই সংঘ উদ্ভূত হয়।"[1] লক্ষ্যের তারতম্য অনুযায়ী সংঘের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। যখন কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসায়গত স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সমেবেত হয় তখন তাদের আমরা ব্যবসায়ী সংঘ বলি। অনুরূপভাবে যখন সংস্কৃতির অনুশীলনকেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যরূপে নির্ধারণ করে কিছু লোক সংঘবদ্ধ হয় তখন তাকে আমরা সাংস্কৃতিক সংঘ বলি। যেমন—'পাঠচক্র', 'শিল্পচক্র', 'সংগীত সংঘ' ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক সংঘের মধ্যেই জীবনের সামাজিক এবং সংস্কৃতির দিকগুলির এক সমন্বয় দেখা যায়। সাংস্কৃতিক সংঘ মানুষের ব্যক্তিত্বের সৃজনমূলক দিককে পরিতৃপ্ত করে।

এই সব সাংস্কৃতিক সংঘের মারফত বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কার্য সম্পন্ন হয়। মানুষ যাতে সন্তোষজনক ভাবে তার অবসর বিনোদন করতে পারে সাংস্কৃতিক সংঘ তার উপায় নির্ধারণ করতে পারে। সাংস্কৃতিক সংঘগুলির লক্ষ্য পার্থিব উন্নতি সাধন নয়, জ্ঞানের, মনের এবং চরিত্রের উন্নতিসাধন। সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা এবং সৃজনমূলক ক্রিয়ার পরিতৃপ্তি সাধনই সব সাংস্কৃতিক সংঘের প্রাথমিক কাজ।

সাংস্কৃতিক সংঘের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা একটি সংঘকে সাংস্কৃতিক সংঘরূপে গণ্য করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, যে ভাবে অংশ গ্রহণ করা হয় (**The mode of participation**) সেইটি নির্ধারণ করে যে, কোন সংঘ সাংস্কৃতিক সংঘ, না অন্য কোন সংঘ। কোন সাংস্কৃতিক সংঘ একটি প্রাথমিক গোষ্ঠী বা জনসমষ্টি হতে পারে, বা একাধিক গোষ্ঠীর সমন্বয় হতে পারে, বা কোন কেন্দ্রীয় সংগঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান হতে পারে। যদি এই প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত না হন তাহলে সাংস্কৃতিক সংঘের উদ্দেশ্য কখনও সাধিত হতে পারে না। যদি কোন 'সংগীত সংঘের' সভ্যরা সংগীত চর্চার জন্য সমবেত না হন তাহলে সেই সংঘটিকে থাকতে পারে কি ভাবে?

1. **"Associations develop as means or modes of attaining interests."**
—***MacIver and Page : Society*, Page 437.**

অর্থাৎ কিনা সাংস্কৃতিক সংঘের সভ্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতা বর্তমান। তবে সব সাংস্কৃতিক সংঘের সভ্যদের যোগাযোগ যে একই ভাবে হবে, সেরকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন, আন্তর্জাতিক এমন সাহিত্যিক সংঘ আছে যার সভ্যরা পত্র বা পত্রিকাদির মারফত নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখেন।) সাংস্কৃতিক সংঘের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক উভয় দিকই বর্তমান। কোন অর্থনৈতিক সংঘের কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য নেই। অর্থনৈতিক সংঘের কোন কোন সদস্য সংঘের সঙ্গে কোন রকম ব্যক্তিগত সম্পর্ক না রেখেও লাভবান হতে পারে। সাংস্কৃতিক সংঘে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়; কিন্তু অন্যান্য সংঘে মেলামেশা নয়, মেলামেশার ফলে যা পাওয়া যায় বা যা তার ফল (product) সেটাই বড় ।

দ্বিতীয়তঃ, বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের স্বাধীনতা (The liberty of alternatives) সাংস্কৃতিক সংঘের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একাধিক সাংস্কৃতিক সংঘ পাশাপাশি থাকতে পারে। একটির সঙ্গে আর একটির কোন বিরোধের প্রশ্ন ওঠে না। সে কারণে আমরা খুব ছোট সীমানার মধ্যেও একাধিক সাংস্কৃতিক সংঘ দেখতে পাই। মানুষ নানাভাবে শিল্পকলার অনুশীলনে ব্রতী হতে পারে, নানাভাবে আমোদ-প্রমোদ করতে পারে, বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক সংঘ গঠন করতে পারে।

এ বিষয়ে যে-কোন অর্থনৈতিক সংঘের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংঘের পার্থক্য খুব সুস্পষ্ট। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংঘের মধ্যে যে শুধু একটা সমরূপতা (uniformity) বর্তমান তা নয়; উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সংঘকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য কোন-না-কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকে। এ আমরা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেখি না।

সাংস্কৃতিক সংঘের এ বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক। কারণ, সৃষ্টির স্বাধীনতা না থাকলে সংস্কৃতি নিশ্চল হয়ে পড়ে, সংস্কৃতির মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।) কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদি উদ্দেশ্যকে যথার্থভাবে লাভ করতে হয় তাহলে বিভিন্ন সংঘের কাজের সমন্বয় সাধন একান্তই অপরিহার্য। বিভিন্ন সংঘের মাধ্যমে

মানুষ যখন স্বাধীনভাবে সংস্কৃতির অনুশীলন করার সুযোগ পায় তখনই সংস্কৃতির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। যদি এসব সংঘগুলিকে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সংঘের উপর নির্ভর করতে হয় তবে তাদের নিজেদের স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দিতে হবে এবং ফলে সংঘগুলির যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ কখনও সম্ভব হয় না যদি তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। সে কারণে জাতির সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সাংস্কৃতিক সংঘগুলিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখাই বাঞ্ছনীয়।

সাংস্কৃতিক সংঘ ও অর্থনৈতিক সংঘের প্রভেদ

সংযোজন এবং একরূপতার শর্তগুলি (co-ordination and uniformity) যা অন্যান্য সংঘের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, সেগুলিকে যদি সাংস্কৃতিক সংঘের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তাহলে ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver and Page*)-এর মতে নৈতিক, ধর্ম এবং সৌন্দর্য সম্পর্কীয় আবেগগুলিকে বিজাতীয় বাধানিষেধের দ্বারা হাত পা বেঁধে রাখারই সমতুল্য হয়। সমশ্রেণীভুক্ত করার ব্যবস্থা অন্যান্য ক্ষেত্রে সুফল প্রদান করলেও সাংস্কৃতিক সংঘের ক্ষেত্রে তা বিপর্যয়েরই সৃষ্টি করে।

৬। সমাজের উপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রভাব (The Impact of Cultural Institutions on Society):

সমাজের উপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে মূল্যবোধের চেতনা সঞ্চার করে, জীবনের পরম লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলে, জ্ঞানের প্রসার এবং বুদ্ধি ও চরিত্রের বিকাশে সহায়তা করে। ফলে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিকে অতিক্রম করে এক বৃহত্তর জীবনের সীমানার মধ্যে পদক্ষেপ করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের সৃজনী প্রতিভার বিকাশ সাধক

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিকে তার পরমকল্যাণ লাভে সহায়তা করে

করে। শিল্প, কলা, সাহিত্যের মাধ্যমে এই সৃজনী প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। মানুষের জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি নতুন সৃষ্টি কার্যে নিযুক্ত হয়। বস্তুতঃ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য মানুষের সুপ্ত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশসাধনে ও মানুষকে চারিত্রিক পূর্ণতালাভে সহায়তা করা। ব্যক্তির জীবনের পরম লক্ষ্য আত্মোপলব্ধি বা জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ। সমাজেরও লক্ষ্য সেই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যার মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তি ও সমাজের এই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে। সমাজের উপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিক্রিয়া খুবই উল্লেখযোগ্য।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সমাজস্থ ব্যক্তিদের পারস্পরিক মেলামেশার ও পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করে। এই পারস্পরিক মেলামেশার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক পরিচয় নিবিড় হয়, ফলে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। তাছাড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে বিরোধ, সংঘাত তা দূরীভূত করে এবং সমাজের ঐক্য বা সংহতিকে সুদৃঢ় করে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সমাজের ঐক্য বা সংহতিকে সুদৃঢ় করে

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি অন্য আরও একভাবে সমাজের উপর প্রতিক্রিয়া করে। সমাজ পরিবর্তনশীল এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের মধ্যে নানা প্রকারের পরিবর্তন সাধন করে সমাজকে গতিশীল রাখে। সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির যতই বিকাশ সাধিত হয়, ততই সমাজের মধ্যেকার কুসংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রভৃতি বিদূরিত হয়, যা কিছু শুভ ও শ্রেয় তার প্রতিষ্ঠায় মানুষ ব্রতী হয়। মানুষ গতানুগতিকতা ও প্রাচীনত্বের অন্ধ মোহ থেকে মুক্ত হয়ে নতুনকে সাদরে বরণ করিতে চায়। এর ফলে সময় সময় সমাজ-জীবনে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিন্তু যা কিছু সুন্দর ও শ্রেয় শেষ পর্যন্ত সমাজ তাকে গ্রহণ করে এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমাজের বিরোধেরও সমাপ্তি ঘটে। সুতরাং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সমাজকে গতিশীল রাখে

সমাজস্থ ব্যক্তি-মনের উন্নতিসাধন করে, সমাজ-জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করে তোলে, সামাজিক ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় সহায়তা করে এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ সাধন করে আন্তর্জাতিক সৌহার্দের পথকে প্রশস্ত করে।

সমাজেরও প্রয়োজন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজ করার উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া

সমাজেরও দেখা প্রয়োজন যাতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের মধ্যে থেকে নিজ নিজ লক্ষ্য অনুযায়ী কার্য করতে পারে এবং যাতে প্রতিটি ব্যক্তি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্য হয়ে সংস্কৃতির চর্চার সুযোগ লাভ করে, সমাজের সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আবার সংস্কৃতির চর্চার ছদ্মবেশে কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যাতে অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হতে না পারে, সে দিকেও সমাজের সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। নিছক অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির অজুহাতে সমাজের নিয়মকানুন এবং কর্ম-পদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট না করে, সমাজের সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সহযোগিতা না করে তাদের অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করাও সমাজের পক্ষে অনুচিত কার্য।

সংক্ষিপ্তসার

১। সংস্কৃতির নানা সংজ্ঞা আছে। সমাজস্থ মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য ও সংস্কারের জটিল সমাবেশ হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি একাধারে ব্যক্তিগত ও পক্ষান্তরে সামাজিক।

২। সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল—সভ্যতা বাইরের বস্তু, সংস্কৃতি অন্তরের ঐশ্বর্য। সভ্যতার পরিমাপ নির্ণয় হয় দক্ষতার ভিত্তিতে, সংস্কৃতির মান নির্ণয় হয় আদর্শ বা মূল্যের দ্বারা। সভ্যতার আবেদন অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য, সংস্কৃতির আবেদন অভ্যাস ও অনুশীলনলব্ধ। সভ্যতা দ্রুতগামী, সংস্কৃতির গতি ক্রমিক, কখনও বা সংস্কৃতি পশ্চাদগামী। সভ্যতার ক্ষেত্রে কাজের ফলাফল বড় কথা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাজই প্রধান লক্ষ্য, কাজের ফলাফল ততটা নয়।

৩। সংস্কৃতিতে সকলেরই অধিকার। সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে মতবিরোধ দেখা যায় তাহল সভ্যতার বিরোধ। সংস্কৃতি অভিজাতবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তাকে সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত করার সময় এসেছে।

৪। সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনে পরমার্থ লাভের প্রতি একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে এবং তাই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য।

৫। অন্যান্য সংঘের মত সংস্কৃতি বিষয়ক সংঘ আছে এবং সাংস্কৃতিক সংঘের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এর একটা সামাজিক দিক আছে এই অর্থে যে, এর সভ্যদের মধ্যে যোগাযোগ অপরিহার্য। দ্বিতীয়তঃ, একজন একই সঙ্গে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংঘের সভ্য হতে পারে। এখানেই অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সংঘের সঙ্গে এর পার্থক্য। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সংঘে সমরূপতা ও একমতাবলম্বীতা অপরিহার্য, কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমরূপতা ও একমতাবলম্বীতার উপর জোর দেওয়ার অর্থ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা।

৬। সমাজের উপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান মানুষের সুপ্তশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশসাধনে ও মানুষকে চারিত্রিক পূর্ণতা লাভে সহায়তা করে, সমাজের ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজ জীবনকে গতিশীল করে রাখে। সমাজের উচিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজ করার সুযোগ দেওয়া, কিন্তু যাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজ-জীবনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারে সে দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

একাদশ অধ্যায়

গীর্জা

(The Church)

১। গীর্জার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Church): ধর্মের দুটি দিক আছে, একটি হল ধর্মের আভ্যন্তরীণ বা ভেতরের দিক, আর একটি হল বাইরের দিক। ধর্মের আভ্যন্তরীণ দিক হল, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বর বা কোন লোকাতীত সত্তার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যেসব ধারণা, বিশ্বাস ও অনুভূতি এবং আবেগের সৃষ্টি হয় সেগুলি, আর এর বাইরের দিক হল— উপাসনা, অনুষ্ঠান ও আচার-পদ্ধতি, যাদের মাধ্যমে এই ধর্ম সম্পর্কীয় অনুভূতি প্রকাশিত হয়। গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "যে প্রতিষ্ঠান এসব বাহ্যিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বর্তমান সময়ে গীর্জা বলা হয়।"[1]

ম্যাকাইভার (*MacIver*)-এর মতে গীর্জা হল এমন একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যা মানুষের সমাজ-জীবনের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তিনি গীর্জার দুধরনের যোগাযোগ সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, গীর্জার

'ধর্ম' দ্বিবিধ যোগাযোগ বোঝায়

মাধ্যমে মানুষ কোন লোকাতীত সত্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করে। অবশ্য ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে তারতম্য আছে এবং সকল ধর্মই সকল সময় কোন দেবতার বা অলৌকিক সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। যেমন, বৌদ্ধধর্ম কোন দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। কিন্তু বিশ্বাস বলতে আমরা বুঝি মানুষের সঙ্গে মানুষ-ঊর্ধ্ব কোন কিছুর সম্পর্ক (some relation of man to something beyond man)। দ্বিতীয়তঃ, এ ধর্মবিশ্বাস মানুষের সামাজিক সম্পর্ককেও দৃঢ় করে। গীর্জাকে কেন্দ্র করেই

---

1. "The institution concerned with the regulation of these external practices is religious institution which in modern times is called the Church."
Gisbert: Fundamentals of Sociology; Page 196.

* দ্রষ্টব্য: এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, চার্চ শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সে অর্থে চার্চ, মন্দির, মসজিদ, সিনাগগ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠানগুলিকে বোঝাচ্ছে।

মানুষের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা হয়, সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। একত্রে উপাসনা করার জন্য, প্রার্থনা করার জন্য, দরিদ্রের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে এবং শিক্ষা ও আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের মানুষ গার্জায় সমবেত হয়। এসব কাজ সকল সময়েই যে ধর্ম সম্পর্কীয় তা নয়; তবে এ সকলের অন্তরালে যে ধর্ম সম্পর্কীয় আদর্শের অনুপ্রেরণা বিদ্যমান তা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গীর্জা দুধরনের যোগাযোগ সৃষ্টি করেছে। একাধারে ঈশ্বর বা কোন লোকাতীত সত্তার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ এবং অপর দিকে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ। ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver and Page*)-এর মতে ধর্মে সাধারণতঃ দুধরনের যোগাযোগ দেখা যায়—একটি মুখ্য এবং তাহল মানুষের সঙ্গে কোন অলৌকিক শক্তির সম্পর্ক এবং আর একটি গৌণ, সে সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে মানুষের।[1]

৫। গীর্জার সামাজিক বৈশিষ্ট্য (Sociological implications of the Church):

(ক) গীর্জা সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে (The Church and Social Restraint): গীর্জাকে কেন্দ্র করে মানুষ কোন লোকাতীত সত্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করে। এই লোকাতীত সত্তায় বিশ্বাস মানুষের মনে এমন শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব সৃষ্টি করে যে, মানুষ তার বাহ্যিক আচরণকে সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি এমন এক ভাব গম্ভীরপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় যে, মানুষ তার আচরণকে সংযত না করে পারে না। বাহ্য আচরণকে সংযত করার নিয়মের নির্দেশ দিয়ে গীর্জা ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি সাধন করে। গীর্জা ব্যক্তিকে মন্দ পথ পরিহার করে সৎপথে চলার নির্দেশ দেয়, আচরণে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে শিক্ষা দেয় এবং সভ্যদের মধ্যে ঐক্যবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে।

---

1. "Religion involves generally twofold communion, that of man with a non-human power and a derivative communion of man with man."

—*MacIver and Page*: Society: Pag

(খ) **গীর্জা ও কর্তৃপক্ষ (The Church and Authority):** যেহেতু মানুষের ধর্মবিশ্বাসের বিষয়বস্তু লোকাতীত সত্তা বা অপার্থিব শক্তি মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর নয় এবং যেহেতু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যেও এই লোকাতীত সত্তাকে জানা যায় না, সেহেতু ঈশ্বরবিষয়ক উপদেশ ও বাণীর মাধ্যমেই একমাত্র এই লোকাতীত সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ক এসব বাণী ও উপদেশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ব্যাখ্যা একান্তই প্রয়োজন এবং এর দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে ধর্মযাজকদের উপর। তাঁরা ধর্মের এসব বাণীর উপযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করে ঈশ্বরের স্বরূপকে ধর্মবিশ্বাসী জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন। সে কারণে ধর্মবিশ্বাসী জনসাধারণের উপর গীর্জার প্রবল কর্তৃত্ব বর্তমান। ধর্মযাজকদের মনোভাব সাধারণতঃ রক্ষণশীল এবং তাঁরা মনে করেন যে, সব সত্যের একমাত্র ভিত্তি ও স্তম্ভ হল গীর্জা এবং তাঁরাই একমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যাঁরা ঈশ্বরের উপদেশ ও বাণীগুলিকে ব্যাখ্যা করে যথার্থ সত্যের সন্ধান মানুষকে দিতে পারেন। এজন্য ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে নানারকম অপ্রাকৃতিক ধারণাকে যুক্ত করে তাঁরা তাঁদের কর্তৃত্বকে আরও সুরক্ষিত করতে চান।

গীর্জা রক্ষণশীল এবং প্রবল কর্তৃত্বসম্পন্ন

গীর্জার এই কর্তৃত্বের ফলে মানুষের ধর্মচেতনা স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। তাদের ধর্মচেতনা কতকগুলি বাঁধাধরা ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে এবং প্রকৃত ধর্মবোধের স্থান দখল করে বাইরের কৃত্রিম নীতি, ঘোষণা ও বাণী। মানুষের বিচারশক্তি চাপা পড়ে যায়, ধর্ম হয়ে পড়ে বিচারবিমুক্ত (dogmatic) মতবাদেরই সমষ্টি। এমনকি একটা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের ধর্মের ব্যাখ্যা দেবার অধিকার থাকাতে নতুন নতুন ব্যাখ্যার পথও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

পূর্বে এই গীর্জার কর্তৃত্ব এতই ব্যাপক ছিল যে, সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সমাজ-জীবনে যে নতুন ভাব, ধারণা বা চিন্তার আবির্ভাব ঘটত সেগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং স্বাধীনভাবে প্রকাশের পথ পেত না। শুধু যে মানুষের ধর্মবিশ্বাস গীর্জার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত, তা নয়; অধিকন্তু পরোক্ষভাবে, অনেক বিষয়ে গীর্জা মানুষের সামাজিক জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করত। এর ফলে মানুষের

স্বাধীন চিন্তাধারা ব্যাহত হত ও সামাজিক চিন্তাধারার মধ্যে রক্ষণশীলতার মনোভাব দেখা দিত। অবশ্য সভ্যতার অগ্রগতি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিচারক্ষমতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই গীর্জার এই রক্ষণশীল ও অনুদার মনোভাব এবং তার একচ্ছত্র কর্তৃত্বের উপর আঘাত এসে পড়েছে।

গীর্জার সামাজিক প্রভাব

(গ) গীর্জা এবং সামাজিক পরিবেশ (The Church and the Social Environment): মানুষের সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তনশীল। মানুষের চিন্তা, ধারণা নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে, নতুন নতুন কারণ নির্ণয় করে, যার জন্য সামাজিক পরিবেশকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক সময় সামাজিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে। এদের রক্ষণশীল মনোভাব নতুন ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেয় না এবং প্রগতিশীল জনমতের বিরুদ্ধেই নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে জোর করে মানুষের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। গীর্জা চিরকালই মনে করে যে, তার সত্য হচ্ছে চিরন্তন, নিরপেক্ষ সময় ও কালের গতির সঙ্গে যেন তার কোন যোগাযোগ নেই এবং তার জ্ঞান ও বিশ্বাস অপরিবর্তনীয়; সুতরাং সকল রকম সামাজিক অনুষ্ঠানকে ধর্মীয় মাপকাঠির মানদণ্ডে বিচার করে দেখতে হবে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে। এর ফলে ধর্মের দ্বারা সমর্থিত হয়ে অনেক ক্ষতিকর সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে যেমন, ভারতে জাতিবিভাগ। ধর্মের সমর্থন থাকার জন্য এসব ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের মনে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, স্বাধীনভাবে এসব ব্যবস্থার সমালোচনা করা মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

অবশ্য যখন সমাজের অভ্যন্তরে কোন বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয় তখন ধর্মীয় অনুশাসনকে অনেক সময় লঙ্ঘন করা হয়। এমন এক সময় ছিল যখন গীর্জার অনুমোদন সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে ছিল বাধ্যতামূলক। কিন্তু পরবর্তীকালে ধর্মসম্পর্কীয় আন্দোলন ধর্ম সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি করায় বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হল এবং প্রত্যেকেই দাবী করতে লাগল যে, ধর্মের ব্যাখ্যা দিবার তিনিই একজন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। ফলে, দুটি প্রথা সমাজে দেখা

দিল। প্রথমতঃ, ধর্মের নামে নির্যাতন এবং দ্বিতীয়তঃ, ভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীকে নিজ ধর্মমতে দীক্ষিত করা। গীর্জার লক্ষ্য ছিল তার নিজের আওতার ভেতর বিশ্বের সমস্ত লোককেই নিয়ে আসা। তবে সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া এখন আর কোন মতেই সম্ভব নয়। কারণ, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ফলে এবং বহু ব্যক্তির গীর্জার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ফলে গীর্জার এই সর্বব্যাপকতার আদর্শ আর কার্যকরী হবার সুযোগ লাভ করেনি।

গীর্জার কর্তৃত্বের হ্রাস

(ঘ) **গীর্জা বলপ্রয়োগের হাতিয়ার (The Church as an instrument of Power) :** মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপর গীর্জার প্রভাব খুব বেশী। গীর্জা তার ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষকে নীতিনিষ্ঠ করে তোলার জন্য কতকগুলি বিধিনিষেধ প্রণয়ন করে। শুধু মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নয়, রাষ্ট্রের রীতিনীতিও গীর্জার দ্বারা অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া অনেক গীর্জা প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী, ফলে এসব গীর্জার কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট শক্তির অধিকারী। কিন্তু সাংসারিক বা ঐহিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য গীর্জা ধর্মের আদর্শকে পরিহার করে অতিমাত্রায় ঐহিক ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে এবং ক্রমশঃ গীর্জা রাজনৈতিক ব্যাপারেও যুক্ত হয়ে পড়ে। গীর্জার যারা কর্তৃপক্ষ তারাও ধীরে ধীরে ক্ষমতার লোভে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ধর্ম চায় সাংসারিক বিষয় থেকে স্বতন্ত্র থাকতে। সুতরাং গীর্জা যদি শক্তিলাভের জন্য উন্মত্ত হয়ে পড়ে বা অতি মাত্রায় নিজেকে ঐহিক বিষয়ের মধ্যে জড়িয়ে ফেলে তাহলে তার যে প্রাথমিক কাজ অর্থাৎ মানুষের মনে ধর্মবোধের সৃষ্টি করা, সে উদ্দেশ্য যে ব্যাহত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গীর্জা ও পার্থিব ক্ষমতা

গীর্জার পক্ষে এ হল এক উভয় সংকটের ব্যাপার। একদিকে নিজের প্রভাবকে সর্বব্যাপক করে তুলতে গীর্জা ক্রমশঃ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়ে; আবার অপরদিকে অত্যধিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ফলে গীর্জা নিজেকে ঐহিক বিষয়ে জড়িয়ে ফেলে, ফলে তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এই উভয় সংকট থেকে মুক্ত থাকতে হলে গীর্জাকে পার্থিব ক্ষমতা বা

কর্তৃত্ব থেকে দূরে থেকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে এবং মানুষের ধর্মবোধের যাতে যথার্থ বিকাশ হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৩। গীর্জার কাজ (The Functions of the Church):

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে গীর্জার দুটি ভূমিকা আছে; একটি সমাজ-ঊর্ধ্ব কাজ, মানুষের মধ্যে ধর্মবোধের উন্মেষ করা, মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে উন্নত করা। অপরদিকে গীর্জার একটি সামাজিক ভূমিকা আছে। ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver and Page*) বলেন, "...গীর্জা হল আবার একপক্ষে সাহচর্য সংস্থা, বিশ্বাসীদের ভ্রাতৃগোষ্ঠী, সামাজিক মেলামেশার ভিত্তি।"[1]

(ক) সমাজ-ঊর্ধ্ব কার্যাবলী (The Supra-social Interest):

ধর্মের উদ্ভবের অন্যতম প্রাথমিক হেতু মানুষের অপ্রাকৃত কোন শক্তির উপর নির্ভরতা বোধ (a feeling of dependence)। মানুষ যখন উপলব্ধি করল যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে সে একান্ত অসহায়, তখন সে এক শক্তির সন্ধানে সচেষ্ট হল এবং ঐ শক্তিকে সন্তুষ্ট করতে ও তার সহায়তা লাভ করতে বিভিন্ন ধরনের পূজা, উপাসনায় আশ্রয় গ্রহণ করল। মানুষের ধর্মবোধের পরবর্তী স্তরে দেখতে পাওয়া যায় এই জগতের ঐক্য সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা এবং এই ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপ এক জগৎ সত্তার কল্পনা। ধীরে ধীরে উদ্ভব হল গীর্জার এবং গীর্জাই নির্দেশ করল কি অবস্থায় মানুষ এই জাগতিক ঐক্যের চেতনা লাভ করতে পারে, এই বিশ্বজগতের অন্তরালে যে সত্তা রয়েছে তাকে উপলব্ধি করতে পারে। গীর্জাই মানুষকে বলল পরলোকের কথা, মানুষের অমরত্বের কথা।

গীর্জা মানুষের আধ্যাত্মিক প্রেরণার প্রতীক

অন্যায় কর্ম করার জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার বিধান দিল গীর্জা। সাধারণ মানুষ যখন তার দৈনন্দিন জীবনে তার আবেগকে এই জাগতিক সত্তার ব্যবস্থার সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারে না, তখনই এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার জন্য গীর্জা এনে দিল তার বিধি ও বিধান।

---

1. "—the church is at the same time a fellowship, a brotherhood to believers, basis of social intercourse."

—*MacIver and Page*: Society: Page 491.

(খ) সামাজিক উদ্দেশ্য (Social Interest): মানুষের ধর্মবোধের সঙ্গে তার সামাজিকতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান এবং মানুষের ধর্মবোধের সঙ্গে তার নীতিবোধও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সুতরাং সমাজ-জীবনের উপর গীর্জার অত্যধিক প্রভাব বা ক্ষমতা গীর্জাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অধিকারী করল। সে কারণে সমাজের মধ্যে প্রধান শক্তিগুলি সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে গীর্জাকে নিজের প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার করেছে। এতে সমাজ-জীবনে গীর্জার স্থান আরও দৃঢ় হয়েছে। গীর্জা ধর্মীয় শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক শিক্ষাদান করে। গীর্জা ব্যক্তির নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে উন্নত করে এবং তার হৃদয়কে পবিত্র ও শুদ্ধ রাখতে উপদেশ দেয়। গীর্জা তার সভ্যদের সহানুভূতি-সম্পন্ন, উদার, পরোপকারী এবং ন্যায়পরায়ণ হতে শিক্ষা দেয়। গীর্জা শিক্ষা দেয় জনসেবাই ঈশ্বর সেবা এবং সভ্যদের জনকল্যাণের জন্য কার্য করতে প্রণোদিত করে। গীর্জা সভ্যদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য সূচিত করে, সভ্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে।

গীর্জা হল সামাজিক মেলামেশার একটি প্রধান কেন্দ্র, সেহেতু গীর্জা কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া, গীর্জা হল একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। গীর্জা সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাসম্পর্কীয়, দাতব্য ও আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত বিষয়গুলিও পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রিত করে। কোন কোন গীর্জা বিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং নানা ধরনের দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। কোন কোন গীর্জা সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্যোগের সময় সমাজসেবামূলক কার্য পরিচালনা ও গঠন করে। অনেক গীর্জা দুঃস্থকে আর্থিক সাহায্য করে। কিন্তু কালক্রমে সমাজের অগ্রগতির ফলে

গীর্জার সামাজিক ভূমিকা

যখন প্রাচীন মনোভাবপন্থী ধর্মের পতন ঘটল, তখন গীর্জা এক বিপদের সম্মুখীন হল। এর প্রাচীন মনোভাব সামাজিক জীবনের অগ্রগতির পক্ষে অনুকূল নয়, কিন্তু গীর্জার পক্ষেও সম্ভব নয় তার নিজ বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে নিজেকে নতুনভাবে সংগঠিত করা। বিশেষ করে এই কারণে গীর্জার সামাজিক গুরুত্ব অনেক কমে গেছে।

তবু ইতিহাসে দেখা যায় যে, গীর্জা দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছে—এক দিকে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রচার করেছে এবং অপর দিকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক ঐতিহ্যকে প্রকাশ করেছে ও তাকে চিরস্থায়ী করে রেখেছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, গীর্জার কাজ সমাজের ঐক্য সংরক্ষিত করা—কারণ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার কাজে গীর্জা হল অন্যতম অঙ্গ। প্রতিবেশী জাতিগুলির সঙ্গে আক্রমণাত্মক ও প্রতিরোধাত্মক সম্পর্কের মাধ্যমে, সমাজস্থ বিভিন্ন শ্রেণীগুলিকে শান্ত ও অনুগত রেখে এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে গীর্জা এই ঐক্য সংরক্ষিত করে।

৪। গীর্জা এবং রাষ্ট্র (The Church and the State):

আধুনিক যুগে গীর্জার এবং রাষ্ট্রের কর্মপরিধি মোটামুটি সুনির্দিষ্ট, কাজেই একের অপরের কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ খুবই কম। কিন্তু প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে গীর্জা ও রাষ্ট্রের কর্মপরিধি এতখানি সুনির্দিষ্ট ছিল না। গীর্জার বা রাষ্ট্রের উদ্ভবের বহু পূর্বে ধর্মের অস্তিত্ব ছিল। জ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দেখল যে অজানার সব রহস্য সে ভেদ করতে পারে না। তার মনে একসঙ্গে জাগল অজানার প্রতি এক শ্রদ্ধা এবং ভীতির ভাব। উপাসনা, প্রার্থনা, অনুষ্ঠান-পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ তার শক্তির বাইরে যে অজানা শক্তি রয়েছে তার সমর্থন ও সাহায্য লাভের জন্য সচেষ্ট হল। অজানার ব্যাখ্যা হয়ে উঠল জ্ঞানের ব্যাপার, মানুষের শক্তিহীনতার রহস্য হয়ে উঠল আর এক শক্তির উৎস।

অজানার রহস্যকে ব্যাখ্যা করে লোকাতীত সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান দেবার জন্য আবির্ভাব ঘটল পুরোহিতের। সে সময় পুরোহিতের কর্তৃত্ব ছিল অপ্রতিহত, কারণ তার ক্ষমতার অধিকার সম্পর্কে কোন ব্যক্তিই কোন প্রশ্ন তুলতে সাহস করত না। সময় সময় পুরোহিত ও সমাজের দলপতি ছিল এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি, আবার সময় সময় তারা ছিল পৃথক ব্যক্তি।

মধ্যযুগেও গীর্জা ও রাষ্ট্র দুটি ভিন্ন সংগঠন ছিল না; একই সংগঠনের মধ্যে দুটি ভিন্ন শক্তি হিসেবে বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেকেই অপরের উপর নিজের কর্তৃত্বকে বিস্তৃত করতে চাইত। ধর্মযাজকরা চাইতেন কিভাবে রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রকে নিজেদের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করবেন, রাষ্ট্র-পরিচালকেরা চাইতেন গীর্জার উপর কর্তৃত্ব করতে। এ অবস্থা বহুদিন ধরে চলেছিল, তারপর রাষ্ট্র এবং গীর্জা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি লাভ করল। রাষ্ট্র এবং গীর্জার স্থান ও কার্যের স্বাতন্ত্র্য নির্দিষ্ট হল।

পরে সমাজ-জীবনে যখন গীর্জা এবং রাষ্ট্রের স্থান সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হল, তখনই প্রশ্ন দেখা দিল উভয়ের কার্যের সীমা কতদূর? রাষ্ট্রের আইন এক হিসেবে সর্বব্যাপক এবং সকলের উপর কার্যকরী, কিন্তু গীর্জার কর্তৃত্ব কেবলমাত্র তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের উপর। তাছাড়া যে-কোন সভ্য রাষ্ট্রে মানুষের ধর্মবিশ্বাস তার নাগরিকত্ব লাভের পক্ষে বাধা নয় এবং মানুষ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মমত পোষণ ও পরিবর্তন করতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রের সর্বব্যাপক ক্ষমতার তুলনায় গীর্জার ক্ষমতা কম। উপরন্তু অনেক বিষয় যা অতীতে গীর্জার কার্য ছিল বর্তমানে তা রাষ্ট্রের কার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন—শিক্ষা, বিবাহ প্রভৃতি বিষয় পূর্বে গীর্জা নিয়ন্ত্রণ করেছে, এখন এসব ক্রমশঃ রাষ্ট্রের হাতে চলে এসেছে বা চলে যাচ্ছে। শিক্ষা পূর্বে গীর্জার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে ছিল, এখন প্রধানতঃ তা রাষ্ট্রের ব্যাপার। কিন্তু এর ফলে অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে যার সমাধান সব সময় সহজ নয়। ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver and Page*) বলেন, "সোজা কথায় রাষ্ট্রকে যদি প্রকৃত নিজের কাজ করতে হয় তাহলে সে গীর্জাকে যথার্থ ধর্মসম্পর্কীয় কাজ ছেড়ে দেবে কিন্তু কোন রকম পৌর বা রাজনৈতিক কাজের নিয়ন্ত্রণ গীর্জার উপরে অর্পণ করবে না।"[1] রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো গীর্জাও একটি প্রতিষ্ঠান। সুতরাং গীর্জার পক্ষে কোন বিশেষ সুবিধা

গীর্জা ও রাষ্ট্রের পার্থক্য

1. "In a word, the state, if true to itself, will leave to the Church its true religious function but will not hand over to it the control of any office of a civic or political character."

—*MacIver and Page* : Society, Page 177

ভোগ করার প্রশ্ন ওঠে না। রাষ্ট্রেরও উচিত নয় গীর্জাকে কোন বিশেষ আনুকূল্য দান করা। গীর্জা যদি রাষ্ট্রের নিয়ম লঙ্ঘন করে তাহলে অন্য যে কোন অপরাধীর মতো তারও শাস্তি অনিবার্য।

অন্যান্য সংগঠনের প্রতি রাষ্ট্র যেরূপ আচরণ করবে গীর্জার প্রতিও তার আচরণ সেরূপ হওয়া দরকার। রাষ্ট্রের প্রধান কাজ রাজ্যের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। অবশ্য প্রতিটি মানুষ যাতে পূর্ণভাবে নিজেকে বিকশিত করে তুলতে পারে তার জন্যই এই শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। গীর্জার কাজ মানুষের মনে মূল্য বা ধর্মবোধের উন্মেষ করা ও তাকে জাগিয়ে রাখা। গীর্জা নিজের ব্যাপারে সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং রাষ্ট্র গীর্জার কাজে কোনরকম হস্তক্ষেপ না করে তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবে। আর এক দিক থেকে বলতে গেলে গীর্জার উচিত রাষ্ট্রকে নিজের মতে চলতে দেওয়া এবং রাষ্ট্রের কাজে হস্তক্ষেপ না করা। যদি কোন ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মপন্থাকে সমর্থন করতে চায়, তাতে ক্ষতি নেই; তবে সে কাজ তারা করবে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে, গীর্জার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। মোট কথা, আধ্যাত্মিক কাজের কথা ভুলে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা গীর্জার উচিত হবে না। রাষ্ট্রের এবং গীর্জার কাজ যখন স্বতন্ত্র, তখন উভয় সংগঠনকেই অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না করে নিজ নিজ কাজে ব্রতী হতে হবে।[1] এ. পি. স্টোকস (*A. P. Stokes*) বলেন, "রাষ্ট্রের উচিত নয় গীর্জাকে নিয়ন্ত্রিত করা। গীর্জার উচিত নয় রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত করা, উভয়েরই অস্তিত্ব থাকবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে জাতি এবং পৃথিবীকে সেবা করার জন্য।"

গীর্জা ও রাষ্ট্র স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রধান

৫। আধুনিক কালের গীর্জার ভূমিকা (Church Today):

সাম্প্রতিককালে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই গীর্জাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকার করতে অপারগ। বহুসংখ্যক ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর

1. "The State...should not control the church, nor the church the state, but both exist to serve the nation and the world in their respective field." —Church and State in the United States. P. 18.

দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তথাকথিত ধর্মে বিশ্বাস হারিয়েছেন। অনেকেরই ধারণা যে পুরোহিতদের মধ্যে একাংশ ভণ্ড এবং এঁদের কাজ মানুষকে ধর্ম সম্পর্কীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতারিত করে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করা। এরা হল সমাজের পরগাছা, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য কৌশলে অপরের উপার্জিত অর্থের সাহায্যে নিজের জীবিকা নির্বাহ করা। সাম্প্রতিককালে সভ্য সমাজে ধর্ম তার পূর্বতম গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে এবং সমাজের পক্ষে এটা একটা সুস্থতার লক্ষণ যে বিচারবিযুক্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এই বৈজ্ঞানিক জগতে ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এমন এক নতুন ধর্মের উদ্ভব ঘটতে পারে, যে-ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই—যে-ধর্ম কৃত্রিম আচার-অনুষ্ঠান মুক্ত এবং যে-ধর্মে মানুষের জীবনের পরমমূল্যের স্বীকৃতি বর্তমান।

গীর্জার সমস্যা

তাছাড়া গীর্জার কাজের গুরুত্বও সাম্প্রতিককালে যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। ধর্ম হল মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার। তাছাড়া, যথার্থ চিন্তাশীল ব্যক্তির ধর্মবোধ বা ধর্মবিশ্বাস কোন ঐশ্বরিক সত্তায় অন্ধ বিশ্বাস সূচনা করে না, তাঁর ধর্মবিশ্বাস ঈশ্বরের যথার্থ প্রকৃতি বা স্বরূপের উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এরূপ ব্যক্তির মনে ধর্মবোধের উন্মেষের জন্য গীর্জার কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই।

গীর্জার একটা সামাজিক ভূমিকা আছে। গীর্জা নানা ধরনের সামাজিক কার্য সম্পাদন করে থাকে কিন্তু বর্তমান সমাজে এমন অনেক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটেছে যেগুলি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান না হয়েও এই জাতীয় সামাজিক কার্য উপযুক্ততার সঙ্গে সম্পাদন করে থাকে। এই সব কারণে গীর্জার গুরুত্ব ও আধিপত্য পূর্বের তুলনায় অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

আধুনিক যুগে গীর্জা প্রমুখ ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তব্য নতুনভাবে নিরূপণ করতে হবে। যুক্তিহীন আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য মানুষকে প্রণোদিত না করে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এই সব ধর্ম প্রতিষ্ঠানের। যথার্থ ধর্মবোধ যে মানবতাবোধ থেকে বিযুক্ত নয় এই শিক্ষাই দিতে হবে মানুষকে। সংকীর্ণ

রাজনৈতিক দলাদলি থেকে ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলিকে মুক্ত থাকতে হবে এবং সকল রকম অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যগুলি যাতে মানুষ জীবনে উপলব্ধি করতে পারে তারই প্রেরণা-মানুষের মনে যোগাতে হবে। ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলিকে হতে হবে উদার, কোন রকম গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতার প্রশ্রয় তারা দেবে না এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রতি মানুষের যাতে শ্রদ্ধা জাগে, কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি যাতে বিদ্বেষ ভাব জাগ্রত না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জীবসেবা ও সমাজসেবা যে যথার্থ ধর্মবোধের পরিচায়ক, ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্তব্য হবে মানুষের মনে সে বিশ্বাস সঞ্চার করা, সকল রকম ক্ষুদ্র স্বার্থের গ্লানিমা মুক্ত হয়ে মানুষ যাতে পরহিত সাধনে ব্রতী হয় তার জন্য যত্নবান হওয়া। সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলিকে মানুষের সঙ্গে মানুষের, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর যোগসূত্র রচনা করতে হবে, মানুষকে এক ঐক্যের বন্ধনে বাঁধতে হবে, মানুষের মনে বিশ্বমানবতাবোধ জাগ্রত করে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করার প্রেরণা জাগাতে হবে, তাহলেই ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি আধুনিক যুগে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানরূপে নিজেদের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। বস্তুতঃ, মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক—এক-কথায় মানুষকে তার চারিত্রিক পূর্ণতালাভে সহায়তা করাই হবে ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান লক্ষ্য।

আধুনিক যুগে গীর্জা ও অন্যান্য ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব

ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলির আধিপত্য বর্তমান যুগে কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ন হলেও, সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এখনও এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির উপর রয়েছে। নতুন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে, নতুন কর্তব্য নিরূপণ করে কাজে অগ্রসর হলেই, পূর্বতন মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে অসম্ভব হবে না।

সংক্ষিপ্তসার

১। ধর্মের দুটি দিক—ঈশ্বর বা কোন লোকাতীত সত্তায় বিশ্বাস ও বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে যে প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে তা হল গীর্জা। গীর্জার বিবিধ কাজ, ব্যক্তির সঙ্গে পরমসত্তার যোগাযোগের পথ নির্দেশ করা এবং মানুষের সুসামাজিক সম্পর্ককে দৃঢ় করা। (এখানে গীর্জা অর্থে মন্দির, মসজিদ, সিনাগগ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের ধর্ম-প্রতিষ্ঠানকে বোঝাচ্ছে)।

২। গীর্জার সামাজিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : (ক) গীর্জা বহুল পরিমাণে মানুষের সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। (খ) ধর্মের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণের জন্য গীর্জা ধর্মভীরু মানুষের উপর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব করেছে এবং ক্রমশঃ গীর্জা রক্ষণশীলতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। (গ) নিজের কর্তৃত্ব ও প্রভাব বজায় রাখতে গিয়ে গীর্জা নানাপ্রকার অনিষ্টকারী প্রথার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়, যেমন—ধর্মের নামে নির্যাতন ও অপর ধর্মাবলম্বীকে নিজের ধর্মে দীক্ষিত করা, এর ফলে গীর্জার কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছে। গীর্জা ক্রমশঃ পার্থিব ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে যার ফলে এর উভয় সংকট উপস্থিত হয়েছে। হয় ঐহিক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকা, না হয় আধ্যাত্মিক আদর্শের জন্য পার্থিব ক্ষমতাকে বর্জন করা।

৩। গীর্জার কাজ দুটি—মানুষকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রেরণা দিয়ে তাকে পরমসত্তার সঙ্গে মিলনের পন্থা দেখিয়ে দেওয়া ও অপর দিকে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মারফত মানুষের ভ্রাতৃত্ব এবং একাত্মবোধকে দৃঢ় ও চিরস্থায়ী করা।

৪। পূর্বে গীর্জা ও রাষ্ট্রের সীমানা তত সুনির্দিষ্ট ছিল না। ক্রমে সমাজে এদের স্থান ও কার্যের স্বাতন্ত্র্য স্থিরীকৃত হল এবং ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও প্রভাব বেড়ে গেল। বস্তুতঃ, গীর্জা ও রাষ্ট্র স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রধান : এজন্য গীর্জার আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

৫। সাম্প্রতিক কালে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই গীর্জাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকার করতে নারাজ। ধর্ম সম্পর্কে মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে, গীর্জা তার পূর্বতম গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটাতে গীর্জার সামাজিক গুরুত্বও হ্রাস পেয়েছে। গীর্জা প্রমুখ ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলিকে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সকল রকম গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হয়ে সব ধর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা জাগাতে হবে এবং জীবসেবা বা সমাজসেবা যে যথার্থ ধর্ম-বোধের পরিচায়ক, ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তব্য হবে মানুষের মনে সে বিশ্বাস সঞ্চার করা।

সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মনস্তত্ত্বমূলক এবং দার্শনিক ভিত্তি

(The Psychological and Philosophical Bases of Social Institutions)

আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি সমাজ-দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেছি। এখন এই সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মনস্তত্ত্বমূলক এবং দার্শনিক ভিত্তি স্বতন্ত্রভাবে একটু আলোচনা করা যাক :

বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ যেমন নিজেদের জৈবিক আবেগ, অনুভূতিকে নানাভাবে প্রকাশ করে ; তেমনই এই সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ নিজেদের আত্মবিকশিত করার সুযোগ লাভ করে। আত্মোপলব্ধিই মানুষের জীবনের পরমকল্যাণ (Supreme good)। ব্যক্তির সুপ্ত গুণের পূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়েই এই আত্মোপলব্ধি আসে। কিন্তু এর জন্য ব্যক্তিকে সমাজের উপর নির্ভর করতে হয় এবং সমাজস্থ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান (Institution) ব্যক্তির এই আত্মবিকাশের কাজকে সহজতর করে তোলে। এই সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ব্যক্তির সৃজনী বৃত্তির স্ফুরণ হয় এবং ব্যক্তি ব্যক্তি-কল্যাণ ও জনকল্যাণের আদর্শকে সংযুক্তভাবে লাভ করার জন্য ইচ্ছুক হয়।

পরিবারের (Family) একটা মনস্তত্ত্বমূলক দিক আছে এবং তার একটা দার্শনিক দিকও আছে। পরিবারের একটা আবেগময় ভিত্তি আছে। আমাদের দৈহিক প্রবৃত্তি, মানসিক আবেগ, অনুভূতি ও প্রবণতার কেন্দ্র এই পরিবার। সহবাস ও সন্তান উৎপাদন ছাড়াও, ব্যক্তির স্নেহ, যত্ন, মায়া, মমতা, অনুরাগ, প্রীতি প্রভৃতি অনুভূতি ও আবেগ পরিবারকে কেন্দ্র করেই তার পরিতৃপ্তি খুঁজে বেড়ায়। পরিবারের দার্শনিক ভিত্তি হল—পরিবার তার অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে নৈতিক আদর্শের চেতনা ও নৈতিক গুণের উন্মেষ সাধন করে। সামাজিক দায়িত্ববোধ, পারস্পরিক সহযোগিতাবোধ ও সম্ভ্রমবোধ পরিবার তার সভ্যদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে এবং এই বোধ পরিবারের সভ্যদের জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।

সম্প্রদায়েরও (Community) একটা মনস্তত্ত্বমূলক ভিত্তি আছে। মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে চায়। মানুষের এই সংঘবদ্ধতার প্রবৃত্তি বা যূথ প্রবৃত্তি সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই পরিতৃপ্ত হয়। স্বাজাত্যবোধ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে গোষ্ঠী দায়িত্ববোধের সূচনা করে। এই বোধ মানুষের পরহিত সাধনের প্রবৃত্তিকে তীব্র করে তোলে। অবশ্য এই জাতীয় স্বাজাত্যবোধ কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও ভেদবুদ্ধির সূচনা করে। তবে সমাজের বিবর্তন ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় বোধেরও যে পরিবর্তন সাধিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সম্প্রদায়ের একটা দার্শনিক ভিত্তিও আছে। প্রতিটি সম্প্রদায়ই কতকগুলি সামাজিক আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে আদর্শগুলি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে স্বজাতিবোধের সঞ্চার করে। অবশ্য সব সম্প্রদায়ই যে এই সব সামাজিক আদর্শের দার্শনিক তাৎপর্য পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম বা উপলব্ধি করে তা নয়, তবে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই আদর্শে বিশ্বাস যে বিচার বিশ্লেষণ ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে তা বলা বাহুল্য।

রাষ্ট্রেরও (State) একটা মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে। রাষ্ট্র সমাজের সভ্যদের সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়; রাষ্ট্রের অধীনে থেকে নাগরিকরা সুশৃঙ্খলভাবে আচরণ করতে শেখে। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মূলে একটা দার্শনিক ভিত্তি আছে। সাম্য, মৈত্রী ও ন্যায়ের আদর্শ এবং সামাজিক নীতির আদর্শকে কার্যকরী করে তোলার পক্ষে রাষ্ট্রই উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান। কোন্ ধরনের রাষ্ট্র পূর্বোক্ত আদর্শকে কার্যকরী করে তুলতে পারে তা বিতর্কের বিষয়। তবে সমাজের সকল দিকের উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাষ্ট্রেরই আছে।

শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানগুলিরও (Educational Institutions) মনস্তত্ত্বমূলক ও দার্শনিক ভিত্তি আছে। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান মানুষের বৌদ্ধিক দিকটিকে সুগঠিত ও বিকশিত করতে সাহায্য করে, মানুষের সৃজনী প্রতিভাকে বিকশিত করতে সহায়তা করে মানুষের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য সাহায্য করে। এই হল শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দার্শনিক গুরুত্ব হল যে, সমাজের সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হল এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সত্য, শিব ও সুন্দর —জীবনের এই পরমমূল্যের বোধও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের মনে জাগ্রত করে। সে কারণে সভ্য সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব সমধিক। উন্নত সমাজে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি কোন্ পথে অগ্রসর হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তার নির্দেশ দান করে।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির (Cultural Institutions) মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি হল যে, এগুলি মানুষের বিভিন্ন আবেগ ও অনুভূতিকে সুস্থভাবে পরিতৃপ্তি করার কেন্দ্রস্বরূপ। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মানুষের সৃজনী প্রবৃত্তির বিকাশে সহায়তা করে। এর দার্শনিক ভিত্তি হল এই সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানুষের মনে পারস্পরিক সহযোগিতা, নীতিবোধ ও পরমমূল্যের বোধ জাগ্রত করে সামাজিক ঐক্য ও জনকল্যাণের আদর্শকে সুদৃঢ় করে তোলে। বস্তুতঃ, সমাজের গুণগত অগ্রগতি (qualitative development) শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্ভর করে।

ধর্ম-সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানেরও (Religious Institutions) মনস্তত্ত্ব-মূলক ভিত্তি আছে। কারণ ধর্মের মধ্যে মানুষের তিনটি মানসিক প্রক্রিয়া—বুদ্ধি, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের মনের এই তিনটি দিকেরই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সমাজ-দার্শনিকের চোখে যা কিছু শুভ, শ্রেয় ও সুন্দর তার প্রতি অনুরাগই যথার্থ ধর্ম সম্পর্কীয় অনুরাগ। সুতরাং যেসব প্রতিষ্ঠান যথার্থ ধর্ম প্রতিষ্ঠান তাদের উচিত মানুষের মনে এই অনুরাগ জাগ্রত করা ও বর্ধিত করা। ধর্ম সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দার্শনিক ভিত্তি হল যে, ধর্মের আচারগত দিকটির উপর গুরুত্ব না দিয়ে যদি ধর্মের প্রকৃত ভাবকে উপলব্ধি করা যায় তবে ধর্ম সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এক বিরাট ঐক্যের সূত্ররূপে সমস্ত মানুষের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে।

———

দ্বাদশ অধ্যায়

সামাজিক আদর্শ

(Social Ideals)

১। সামাজিক গতিশীলতার স্বরূপ (Nature of Social Dynamism) :

সমাজ পরিবর্তনশীল। প্রাচীন সমাজ বিবর্তনের পথে বহু স্তর বা ধাপ অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সমাজের এই পরিবর্তন আকস্মিক এবং উদ্দেশ্যহীন। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করলে দেখা যাবে যে, এ পরিবর্তন আকস্মিক বা উদ্দেশ্যহীন নয়।

সামাজিক পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, কোন কোন পরিবর্তন সমাজের অগ্রগতিতে সহায়তা করেছে, আবার কোন কোন পরিবর্তনের ফলে সমাজের অধোগতি হয়েছে। তাছাড়া, সামাজিক পরিবর্তন সম্পূর্ণভাবে মানুষের ইচ্ছানির্ভর নয়। তবে সমাজের মধ্যে যেসব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, বিরোধী মনোভাব এবং অকল্যাণকর প্রবৃত্তি সময়ে সময়ে সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ করে তাকে পশ্চাৎগামী করে তোলে, এসব সমাজস্থ ব্যক্তিদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দূর করা যেতে পারে।

সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন স্তর বা ধাপ দেখা যায়, তার মধ্যে একটা যোগসূত্র পাওয়া যেতে পারে; অর্থাৎ এ সব স্তর পরস্পর থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন নয়। একটি নিয়ামক বিধির (Regulative Principle) সহায়তায় এই বিভিন্ন স্তরের যোগসূত্রকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই নিয়ামক বিধি হল সমাজের একটি আদর্শ স্তর যাকে সমাজের সর্বশেষ (final)

স্তর বলে কল্পনা করা হয়। এই আদর্শ স্তরের সাহায্যে পূর্ববর্তী স্তরগুলির মধ্যে একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করে তাদের ক্রমবিন্যস্ত করা যায় এবং ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। যে-কোন নিয়মের বৈশিষ্ট্য হল, যা বিচ্ছিন্ন ও অসংগতিপূর্ণ তার মধ্যে সংগতি ও সমন্বয় আনা। সমাজের সর্বশেষ বা আদর্শ স্তরই এই সমন্বয় সাধনের কাজ করে।

সামাজিক স্তরের ক্রমবিন্যাস

২। সামাজিক আদর্শের তাৎপর্য (Significance of Social Ideals):

আমরা বাস্তব এবং আদর্শের মধ্যে প্রভেদ করে থাকি। বাস্তব অর্থে যা বিদ্যমান রয়েছে, যাকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এবং আদর্শ অর্থে যা উপস্থিত নেই, অথচ যাকে আমরা লাভ করতে চাই। বাস্তব ও আদর্শ বিযুক্ত নয়, অর্থাৎ বাস্তবের মধ্যেই আদর্শ সম্ভাবনারূপে সুপ্ত থাকে এবং এই সম্ভাবনাকে বিকশিত করে এই আদর্শকে লাভ করা যায়। আমরা ব্যক্তির জীবনের আদর্শের কথা বলে থাকি। এর অর্থ হল ব্যক্তির মধ্যে এমন সম্ভাবনা নিহিত আছে যার পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে আদর্শটিকে লাভ করা যায়। ব্যক্তি-জীবনের এই আদর্শই তাকে তার জীবন-পথে অগ্রসর হতে প্রেরণা দেয় এবং তার জীবনের পরমার্থ লাভ করতে সহায়তা করে।

অন্তর্নিহিত আদর্শের প্রকাশেই ব্যক্তি ও জাতির অগ্রগতি

ব্যক্তির জীবনে যেমন পরিবর্তন আছে, পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তর আছে এবং একটা নির্দিষ্ট গতিপথ আছে, সমাজ-জীবনেও তাই আছে। ব্যক্তির জীবনের মতো সমাজ-জীবনেরও দুটি রূপ আমরা লক্ষ্য করি; একটি তার বাস্তব রূপ, অপরটি তার আদর্শ রূপ। আদর্শ ছাড়া যেমন ব্যক্তির অগ্রগতি সম্ভব নয় বা তার বিপথগামী হবার সম্ভাবনা, সমাজেরও যদি সেরূপ কোন আদর্শ না থাকে তাহলে সমাজ-জীবনের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে বা সমাজ বিপথগামী হতে পারে। মানুষ তার বিচারবুদ্ধির দ্বারা সমাজের এই আদর্শকে নির্দিষ্ট করে। এ আদর্শকে কেন্দ্র করে কিন্তু লেখকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়।

ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*)[1] সমাজের ছুইটি আদর্শের আলোচনা করেছেন। যথা, (ক) অভিজাততান্ত্রিক আদর্শ (Aristocratic Ideal) এবং (খ) গণতান্ত্রিক আদর্শ (Democratic Ideal)। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, পূর্বোক্ত আদর্শ ছুটির মধ্যে একটিও সমাজের উপযুক্ত আদর্শরূপে গণ্য হতে পারে না। সমাজের প্রকৃত আদর্শ হল সাম্যবাদ (Socialism) বা সমভোগবাদ (Communism)। নীচে এই আদর্শগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক:

(ক) **অভিজাততান্ত্রিক আদর্শ** (The Aristocratic Ideal): অভিজাততন্ত্র বলতে গ্রীকরা মনে করতেন অভিজন (Aristos) বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের শাসন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা হলেন প্রকৃত জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি যাঁরা সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্যই রাষ্ট্র শাসন করেন। প্লেটো (*Plato*) তাঁর '*Republic*' গ্রন্থে 'অভিজন'দের শাসনের কথাই উল্লেখ করেছেন। কার্লাইল (*Carlyle*) এবং রাস্কিন (*Ruskin*)-এর রচনার মধ্যেও এই অভিজাততান্ত্রিক আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়।

এই আদর্শ মানুষের দক্ষতা এবং তার ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এজন্য এ আদর্শের সমর্থকেরা মনে করেন যে, সমাজের শাসনভার সদ্‌গুণসম্পন্ন, বিচক্ষণ, দক্ষ ব্যক্তিদের উপরই ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। যাদের নেতৃত্ব করার ক্ষমতা আছে, সংকটে যারা ভীত নয়, বুদ্ধি যাদের বলিষ্ঠ তারাই সমাজ বা রাষ্ট্রের শাসক হওয়ার উপযুক্ত।

অভিজাততান্ত্রিক আদর্শ ছুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। যথা, (i) ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষসাধন (Personal Development) এবং (ii) দক্ষতা (Efficiency)।

(i) **ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষসাধন** (Personal Development): মানুষকে যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহলে মানুষ স্বাধীন কার্যাবলীর মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতাকে প্রকাশিত করতে পারে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, সুযোগ পেলে সকলেই কিছু-না-কিছু যোগ্যতা দেখাতে সক্ষম হবে এবং যারা কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তারা অন্য ব্যক্তির উপর নিজেদের প্রভুত্বকে

1. *Mackenzie*: Outlines of Social Philosophy, Page 171.

প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করবে। অভিজাততান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী, যাদের মধ্যে কোন বিষয়ে উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হবে তাদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন। প্লেটো (*Plato*)-র মতে পরমকল্যাণের উপলব্ধি মাত্র কয়েকজনের দ্বারাই হতে পারে এবং তাও দীর্ঘদিন শিক্ষালাভ করার ফলস্বরূপ। তাঁর মতের বিরুদ্ধতা করে একথা বলা যেতে পারে যে, উচ্চ আদর্শ উপলব্ধি করার ক্ষমতা কারও আছে, কারও নেই—এ ঠিক নয় এবং বিশেষ শিক্ষা ছাড়াও জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে এ আদর্শকে জানা যায়। স্পিনোজা (*Spinoza*)-র মতে মানুষের পরমকল্যাণ হল সাধারণ কল্যাণ এবং সকলেই তা ভোগ করতে পারে। কিন্তু এ সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, মানুষে মানুষে নানা বিষয়ে প্রভেদ আছে এবং কতক বিষয়ে কিছু মানুষ অন্য মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠ মানুষেরাই নায়ক হবার উপযুক্ত।

(ii) **দক্ষতা (Efficiency):** দক্ষতা বলতে আমরা জনকল্যাণমূলক কাজ করার বা মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য যে কাজের ক্ষমতা তাকেই বুঝব। এ জাতীয় দক্ষতা যাদের আছে তারা নায়ক হবার উপযুক্ত। কোন ব্যক্তি নিজের ক্ষমতাকে যদি কেবল ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য নিযুক্ত করে তাহলে সে দক্ষতার কোন সামাজিক মূল্য নেই।

সমালোচনা: (Criticism):

অভিজাততান্ত্রিক আদর্শের গুণাগুণ বিচার করলে দেখা যায় যে, এ আদর্শ সংখ্যা অপেক্ষা গুণের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং দক্ষতা ও দায়িত্ববোধকে সমধিক মর্যাদা দান করে। কিন্তু এ আদর্শের ত্রুটি হল এই যে, যথার্থ শ্রেষ্ঠ বা গুণী ব্যক্তিকে কি ভাবে চেনা যাবে তার কোন ব্যবহারিক মান এ আদর্শ আমাদের দেয় না। দ্বিতীয়তঃ, এই অভিজাততন্ত্র সাধারণ ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ফলে যারা শাসিত হয় তারা এ ব্যবস্থাকে কাম্য শাসন-ব্যবস্থা বলে মনে নাও করতে পারে। তৃতীয়তঃ, প্রশ্ন হল, 'অভিজন' বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে সকল সময়ই জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করবেন তার কি নিশ্চয়তা আছে? সর্বশেষে, এই

অভিজাততন্ত্রের সমালোচনা

মুষ্টিমেয় 'অভিজন' বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যদি রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হন তাহলে সমাজ-জীবনে প্রগতির সঞ্চার সম্ভব নয়।

(খ) গণতান্ত্রিক আদর্শ (The Democratic Ideal): 'গণতান্ত্রিক' কথাটির নানারকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেহ কেহ মনে করেন যে 'গণতান্ত্রিক' শাসন হল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বা সমাজের নিম্নশ্রেণীর দ্বারা শাসন। গণতান্ত্রিক কথাটির অর্থ এভাবে গ্রহণ করে প্লেটো (*Plato*) এবং বর্তমান যুগে কার্লাইল, রাস্কিন, স্যার হেন্‌রি মেইন (*Carlyle, Ruskin, Sir Henry Maine*) প্রভৃতি গণতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন।

রাষ্ট্রপতি এব্রাহাম লিঙ্কন (*Abraham Lincoln*) গণতান্ত্রিক আদর্শের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা হল—"জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের শাসন" (Government of the people, by the people and for the people)। কিন্তু যেকোন শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, তা 'জনগণের জন্য' অর্থাৎ জনগণের কল্যাণে জনগণের দ্বারা পরিচালিত। যারা অভিজাততন্ত্রের সমর্থক তাঁরাও বলেন যে, জনকল্যাণের জন্যই অভিজন বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং গণতন্ত্রের সমালোচনা করে তাঁরা বলেন যে, গণতন্ত্র হল অরাজকতারই নামান্তর ও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনকল্যাণ সাধিত হয় না। অপরপক্ষে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, অভিজাততন্ত্র জনগণের প্রকৃত কল্যাণসাধনে অক্ষম এবং জনগণের শাসন জনগণের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া যুক্তিযুক্ত।

এখানে আসল প্রশ্ন হল, 'জনগণের শাসন' বলতে কাকে বোঝায়? জনগণের শাসন কি সকল লোকের শাসন, না মুষ্টিমেয় লোকের শাসন, যাদের লক্ষ্য হল জনকল্যাণ? গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অর্থ এই নয় যে, এই শাসন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রের সমস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হয়। গ্রীসদেশে নাগরিকদের দ্বারা প্রত্যক্ষ শাসন-ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু গ্রীসের রাষ্ট্রগুলি ছিল ক্ষুদ্র আয়তনের নগর-রাষ্ট্র এবং সেজন্য সে সকল রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকদের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হত। বৃহদায়তনের

রাষ্ট্রে যেখানে জনসংখ্যা অধিক, সেক্ষেত্রে সকলের প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে যোগদান করা সম্ভব নয়। সুতরাং বর্তমানে গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে এমন এক জনসমষ্টির শাসন, যেখানে জনগণের প্রতিনিধিরা শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা

গণতান্ত্রিক আদর্শের স্বপক্ষে যুক্তি হল এই যে, এ আদর্শের ভিত্তি হল সাধারণের সম্মতি এবং সেজন্য এ শাসন-ব্যবস্থা জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ শাসন-ব্যবস্থাতেই জনগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নিহিত। গণতান্ত্রিক আদর্শ স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ। এ আদর্শ সকলের স্বার্থরক্ষার প্রতি সচেতন। এ আদর্শ জনসাধারণের মনে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটায় এবং মানুষকে উদ্যোগী ও উদ্যমী করে তোলে। এ আদর্শ ন্যায় ও নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এ আদর্শের বিপক্ষে যুক্তি হল, এ আদর্শে গঠিত যে শাসন-ব্যবস্থা তাহল অজ্ঞ, মূর্খ, দুষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খলের শাসন। এই আদর্শ গুণের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে, সংখ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। যেহেতু এ দলীয় শাসন, সেহেতু দলগত স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এ শাসন জনকল্যাণের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে এবং যেহেতু এ শাসন অশিক্ষিত ও অকর্মণ্যের শাসন, সেহেতু এ শাসন-ব্যবস্থা যথার্থ প্রগতিশীল হতে পারে না। অজ্ঞ ও অকর্মণ্য শাসকবর্গ যথার্থ কোন নতুন ভাব, চিন্তা ও ধারণাকে গ্রহণ করে শাসন-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনে ব্যর্থ হন। সে কারণে এ শাসন-ব্যবস্থা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির পথে অনেক সময় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

৩। স্বাধীনতা, মৈত্রী ও সাম্য (Liberty, Fraternity and Equality):

গণতান্ত্রিক আদর্শের যাঁরা সমর্থক তাঁরা মনে করেন যে, গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তি হল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী। অনেকে মনে করেন, সমাজের আদর্শ হওয়া উচিত স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী ও ন্যায়বোধ। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*)-র মতে জনগণের শাসনই গণতন্ত্রের মুখ্য কথা হওয়া উচিত

নয়। তাঁর মতে যথার্থ রাষ্ট্রীয় আদর্শ জনকল্যাণমূলক হওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রের সকলেরই জনকল্যাণ সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। বস্তুতঃ, গণতন্ত্রের সমর্থকরা স্বাধীনতা, মৈত্রী ও সাম্য কথাগুলির দ্বারা গণতন্ত্রের এই জনকল্যাণ-মূলক আদর্শেরই ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং এ সকল কথাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

(ক) স্বাধীনতা (Liberty): আদর্শ সমাজে যে স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হয় সে স্বাধীনতা হল ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা। ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করলেও দেখা দরকার যে, এক ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে যেন অপর ব্যক্তির স্বাধীনতার কোন সংঘর্ষ বা বিরোধিতা না ঘটে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার যদি একটা সীমারেখা না থাকে তাহলে সে স্বাধীনতা হয়ে উঠবে উচ্ছৃঙ্খলতা। ম্যাকাইভার (*MacIver*) বলেন, "স্বাধীনতা হল জীবনের একটি শর্ত; এ কোন বিশেষ ধরনের জীবন নয়। কোন বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একে ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত এ হল এক বস্তুনিরপেক্ষ ব্যাপার যার কোন বিচার চলে না।"[1] অবশ্য সাধারণ-কল্যাণের ধারণাই ব্যক্তির এই স্বাধীনতাকে সীমিত করে। ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। ব্যক্তির কতকগুলি বিষয়ে অধিকার পক্ষান্তরে অপর কতকগুলি বিষয়ে তার কর্তব্য নির্দেশ করে। যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তির মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বর্তমান। ব্যক্তি যা চিন্তা করে বা ধারণা করে স্বাধীনভাবে তাকে তা ব্যক্ত করতে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ব্যক্তি কখন তার মত প্রকাশ করবে, কখন করবে না সে সম্পর্কে তার যদি চেতনা না থাকে তাহলে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত অপবাদ আরোপের প্রয়াসে পরিণত হবে। অপরদিকে, আইন যদি মতামত প্রকাশের অধিকারকে সংকুচিত করতে চায়, তাহলে তা ব্যক্তির এবং সমাজ-জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। কেননা, ব্যক্তি তার নতুন নতুন চিন্তাধারাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবে না এবং সাহিত্য, কলা

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই স্বাধীনতা সম্ভব

1 "Liberty is a condition and not a kind of life. Until it is defined within a definite situation, it is an abstract thing which can not be adjudged."
—*MacIver*: Community; Page 328.

প্রভৃতি সৃষ্টিমূলক অবদানের দ্বারা সমাজও পুষ্ট হতে পারবে না। কিন্তু যদি এই অধিকারকে একেবারেই নিয়ন্ত্রিত করা হয় তাহলে সমাজ-জীবনে বিপর্যয় দেখা দেবে। সেজন্য সমাজের স্বাধীনতা কখনই 'নিয়ন্ত্রণবিহীনতা' নয়।

আসল কথা হল, মানুষ যখনই অপর মানুষের ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করে নেবে, এক ভ্রাতৃত্ববোধের ধারণাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে, তখনই মানুষ নিজের স্বাধীনতার দ্বারা অপরের স্বাধীনতাকে ব্যহত করবে না। কিন্তু যদি মানুষের স্বাধীনতা জনকল্যাণের আদর্শকে ক্ষুণ্ন করে তাহলে সেই স্বাধীনতা আংশিক-ভাবে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। লাস্কি (*Laski*) বলেন, "স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সেই পরিবেশকে যত্নপূর্বক সংরক্ষিত করা যেখানে মানুষ তার শ্রেষ্ঠ সত্তাকে উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ করে।"[1]

(খ) মৈত্রী বা ভ্রাতৃত্ব (Fraternity): যে-কোন সামাজিক আদর্শের মূলে এই মৈত্রী বা ভ্রাতৃত্ব বর্তমান। মানুষের মধ্যে যদি ভ্রাতৃত্ববোধ না জাগে এবং তাদের ব্যক্তিগত সুখ যে সমষ্টিগত সুখ ভিন্ন লাভ করা যায় না —এ ধারণা যদি তাদের না আসে তাহলে সামাজিক ঐক্য লাভ করা সম্ভব নয়। অ্যারিস্টটল (*Aristotle*)-এর মতে ন্যায়বোধের ভিত্তি হল মিত্রতা। তিনি বলেন যে, ভ্রাতৃত্ব বা মিত্রতা সাম্যের ভিত্তিতেই সম্ভব। *Stoics*-রাও বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বলেছেন। কাণ্ট (*Kant*) প্রতিটি ব্যক্তিকে এক আদর্শ সমাজের সভ্যরূপে গণ্য করে কাজ করার কথা বলেছেন। খ্রীষ্টধর্মও বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বলেছে।

(গ) সাম্য (Equality): সাম্য কথাটির অর্থ হল 'সমতা' অর্থাৎ মানুষে মানুষে সমতা। সাধারণতঃ সাম্য অর্থে আমরা বুঝি সমাজস্থ সকল ব্যক্তির সমান সুযোগ-সুবিধার কথা। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, গণতন্ত্রের অন্যতম আদর্শ যে স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতার লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে তার সত্তার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া। কিন্তু সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি যদি সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে না পারে

সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক

1. "By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves."—*Laski*.

তাহলে ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং সাম্য এবং স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক। একটিকে ছাড়া আর একটির কোন অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

সাম্যের বিভিন্ন রূপ আছে। অর্থনৈতিক, আইনগত, রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক বা ব্যক্তিগত হতে পারে।

(i) অর্থনৈতিক সাম্য (Economic Equality): মানুষকে যদি তার আত্মোপলব্ধির বা আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ দিতে হয় তাহলে ধনগত বৈষম্যকে দূরীভূত করে মানুষকে অর্থনৈতিক সাম্য প্রদান করা অবশ্যই কর্তব্য। সমভোগবাদী এবং সাম্যবাদীরা অধিকারসাম্যের কথা বলেন। কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া অধিকারসাম্য সম্ভব নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বৈষম্য হেতু শ্রেণীবিরোধের সৃষ্টি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আদর্শে রাষ্ট্র গঠিত হলে সমাজের বুক থেকে এই অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হবে।

কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্য মানে ধনের সমবণ্টন নয়। সকল মানুষের প্রয়োজন, পেশা এবং কর্মশক্তি এক নয়। একজন কবি বা দার্শনিক ও একজন বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজনকে এক করে দেখা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং পেশা অনুযায়ী তাদের প্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান এবং এক্ষেত্রে জোর করে কোন ধনসাম্য নিয়ে আসা মানে ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা।

তাছাড়া, মানুষকে তার কর্মক্ষমতার দ্বারাই নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু সব মানুষের কর্মক্ষমতা এক নয়, সুতরাং কর্মক্ষমতার সমতা যদি না থাকে, অধিকারের সমতার প্রশ্ন আসে কি ভাবে? সুতরাং অর্থনৈতিক সাম্য বলতে বোঝায় যে, প্রতিটি ব্যক্তিকে তার বিশেষ প্রয়োজন বা অভাবগুলি মেটাবার সুযোগ দেওয়া। পূর্ণ ধনসাম্য প্রতিষ্ঠা করা কোন মতেই যুক্তিসংগত নয়। ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রয়োজনের স্বরূপ ও কর্মশক্তি অনুযায়ী তার অধিকারের কথা স্মরণ রেখে জনকল্যাণের আদর্শানুযায়ী যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করা হয় তাই যথার্থ অর্থনৈতিক সাম্য।

(ii) আইনগত সাম্য (Legal Equality): এর অর্থ আইনের চোখে সমতা। আইনের চোখে সকলে সমান হলেও, সমাজ-জীবনে মানুষে মানুষে যদি সমতা না থাকে, তাহলে আইনের চোখে সমতার কোন অর্থ হয় না। সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হলেই আইনের সাম্য আসতে পারে।

(iii) রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য (Political Equality): রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য অর্থে বোঝায় রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগের সমতা। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলকেই যদি রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগের, যেমন—নির্বাচন, সরকারী চাকরিতে যোগদান ইত্যাদি অধিকার দেওয়া হয় তবেই এই সাম্য আসতে পারে।

(iv) সামাজিক ও ব্যক্তিগত সাম্য (Social and Individual Equality) : সমাজ দার্শনিকের দৃষ্টিতে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সাম্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু সমাজ-দার্শনিকের আদর্শ হল সামাজিক ঐক্য। সামাজিক সাম্য থেকেই ব্যক্তিগত সাম্য উদ্ভূত হয়। সমাজে আমরা মানুষের সঙ্গে মানুষের নানারকম পার্থক্য প্রত্যক্ষ করি। বর্ণ, শ্রেণী, জাতি, ধর্ম, অর্থ প্রভৃতির ভিত্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। এ জাতীয় বৈষম্যকে দূরীভূত করতে পারলেই সামাজিক সাম্য আসতে পারে। যখনই সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হবে, তখনই প্রতিটি মানুষ আত্মোপলব্ধির এবং আত্মবিকাশের সমান সুযোগ লাভ করবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের যত প্রভেদ থাক না কেন, একই মানবতা সকলের মধ্যে বর্তমান। *Mackenzie*-র মতে "বিশ্বে আমাদের যে বিশেষ স্থান তার কারণ আমরা একই মানবতার অন্তর্ভুক্ত এবং এর তুলনায় অন্য সব বৈষম্য নিতান্তই তুচ্ছ।"[1] মানুষের সঙ্গে মানুষের যে বৈষম্য তার কতকগুলি যে অন্যান্য বৈষম্যের তুলনায় অধিকতর মৌলিক তা অস্বীকার করা চলে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের শ্রেণীগত, পদমর্যাদাগত বা ঐশ্বর্যগত, যে পার্থক্য তা নেহাতই তুচ্ছ। জাতিগত পার্থক্যের উপরও তেমন গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে না যদি আমরা মানুষের ঐক্যের কথা চিন্তা করি। *Plato*-র ভাষায় কোন মানুষ সোনার, কোন মানুষ রূপোর, আবার কোন মানুষ নিকৃষ্ট ধাতুর তৈরি। *Aristotle*-ও মনে করতেন যে, কেউ স্বভাবতঃ স্বাধীন, কেউ বা ক্রীতদাস। কিন্তু প্রতি যুগেই যাঁরা মানবতাবাদ প্রচার করেছেন তাঁরা মানুষের সঙ্গে মানুষের এই বৈষম্যকে কোন স্বীকৃতি দেননি। মানবতার কথা চিন্তা করলেই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করার, মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং মানবতাই ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে। সব মানুষ সমান, মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই—এ ভাব মানুষকে ভাবতে শেখায়। এই মানবতার ভাব উপলব্ধি করতে পারলেই সব বৈষম্য দূরীভূত হবে।

৪। ন্যায়পরতা (Justice) :

সামাজিক আদর্শের আলোচনায় 'ন্যায়পরতা'র আলোচনা একান্তই অপরিহার্য, যেহেতু গণতন্ত্রের আদর্শ—'স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী' ন্যায়পরতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং 'ন্যায়পরতা'র প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

1......It is our common humanity that gives us our unique position in the universe and that all other differences are comparatively insignificant."

—*Mackenzie* : Outlines of Social Philosophy ; Page 178

ন্যায়পরতা (Justice): এ কথাটির নানারকম অর্থ করা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, ন্যায়পরতা হল শক্তিশালীর ক্ষমতা। প্লেটো (*Plato*) মনে করেন, ন্যায়পরতা হল যার যা প্রাপ্য তাকে তাই দেওয়া। আইনের ক্ষেত্রে ন্যায়পরতা হল পক্ষপাতশূন্যতা। সমাজ-জীবনে যদি কোন ব্যক্তি মনে করে অপরে তার স্বার্থ এবং অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে, তাহলে আইনের ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ পক্ষপাতশূন্য বিচারের দ্বারা তার দাবীকে বিচার করে দেখেন এবং তাকে তার অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ন্যায়পরতার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের শাসকবর্গ রাষ্ট্র শাসন করেন। প্রশ্ন হল, রাষ্ট্রের শাসকবর্গের লক্ষ্য কি? রাষ্ট্রের শাসকবর্গের লক্ষ্য হল ব্যক্তির আত্ম-বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয়—

বণ্টনমূলক ও সংশোধন-মূলক ন্যায়পরতা

(১) রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে পারে এরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক ব্যবস্থা কি? (২) বিভিন্ন পরিবর্তনের মাঝেও এই ব্যবস্থাকে কি ভাবে রক্ষা করা যেতে পারে? (৩) এ সমাজ ব্যবস্থা ব্যাহত হলে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কি ভাবে সম্ভব? অ্যারিস্টটল (*Aristotle*)-এর মতে প্রথম প্রশ্নটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বণ্টনমূলক ন্যায়পরতা (Distributive Justice) এবং দ্বিতীয়টি ও তৃতীয়টির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সংশোধনমূলক ন্যায়পরতা (Corrective Justice)।

(i) **বণ্টনমূলক ন্যায়পরতা** (Distributive Justice): এই ধারণা অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তিকে তার সামর্থ্য, মানসিক প্রবণতা এবং শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তিকে তার যোগ্যতা ও ক্ষমতানুযায়ী নিজ নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি ব্যক্তি যাতে তার নিজ নিজ স্থানে সামর্থ্যানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তার পথে যাবতীয় প্রতিবন্ধক রাষ্ট্র অপসারিত করার জন্য সচেষ্ট হতে পারে। শিক্ষার সাহায্যে তার শক্তিকে বিকশিত করা এবং তার কাজের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা সম্ভব, যাতে প্রতিটি ব্যক্তি নিজ নিজ স্থানে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য সচেষ্ট হয়। কাজ করার জন্য যে সব উপকরণের প্রয়োজন রাষ্ট্রের উচিত সেগুলি সরবরাহ করা।

(ii) **সংশোধনমূলক ন্যায়পরতা** (Corrective Justice) : ন্যায়পরতার যেমন একটা সদর্থক দিক আছে তেমন তার একটা নঞর্থক দিকও আছে। যদিও রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তিকে তার নিজ নিজ কাজে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব তবু নানা কারণে সেই ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। হয়ত ব্যক্তিরা তাদের নিজ নিজ কাজ মনোযোগ সহকারে নাও করতে পারে বা ব্যক্তিদের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিতে পারে। হয়ত কোন ব্যক্তি অপরের কাজে অবাঞ্ছিত-ভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে বা কোন ব্যক্তি আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত হতে পারে—এ সব কিছুই জনকল্যাণের আদর্শকে ব্যাহত করতে পারে। এ অবস্থায় উচিত একটি শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করা, যে সংগঠন এই সকল জনকল্যাণের আদর্শকে অব্যাহত রাখতে পারে। সংশোধনমূলক ন্যায়পরতা সম্পর্কীয় এমন কতকগুলি সার্বভৌম নীতি রচনা করা যেতে পারে, যেগুলি সামাজিক নীতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

৫। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ (Socialistic Ideal) :

সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। সমাজতন্ত্র-বাদীরাও স্বাধীনতা, সাম্য এবং ন্যায়পরায়ণতাকেই সমাজের আদর্শ বলে স্বীকার করেছেন, তবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী একটু ভিন্ন। তাঁদের মতে গণতন্ত্র পুঁজিবাদেরই ফলস্বরূপ। গণতন্ত্রের বহু ত্রুটি বা দোষ আছে। যেহেতু গণতন্ত্রের ভিত্তি দলীয় শাসন, সেহেতু বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্য নানাপ্রকার ছল-চাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করে। নির্বাচনে জয়ী হবার পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যেসব জনকল্যাণমূলক আদর্শের কথা প্রচার করে, ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পর, তারা সেই আদর্শের কথা বিস্মৃত হয়। তাছাড়া, গণতান্ত্রিক আদর্শ পুঁজিবাদের দোষ বা ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থাকে সর্বপ্রকার শ্রেণীবিরোধ, দুর্নীতি, শোষণ, নিপীড়ন থেকে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে। সেকারণে সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ই যথার্থ সামাজিক আদর্শ।

সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে গণতন্ত্রের আদর্শ, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতা একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদী সমাজব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রকাশিত হতে পারে। এই সমাজব্যবস্থায় মানুষ সুখী ও উন্নত জীবনযাপন করতে পারে। সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তি মালিকানা বা তত্ত্বাবধানের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও তত্ত্বাবধানের পক্ষপাতী। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে জমি ও মূলধনের মালিক হবে রাষ্ট্র, মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি নয়। রাষ্ট্র যদি উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে তাহলে অসম বণ্টন-ব্যবস্থা, ধনী ও দরিদ্র অর্থাৎ পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধ এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা, প্রভৃতি দূরীভূত হবে এবং সমাজ যথার্থ জনকল্যাণমূলক আদর্শানুযায়ী পরিচালিত হবে।

৬। কম্যুনিজম্ বা সমভোগবাদের আদর্শ (Communist Ideal):

কম্যুনিজম্ বা সমভোগবাদের আদর্শ প্রচার করেন কার্ল মার্কস (*Karl Marx*) এবং তাঁর বন্ধু ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ (*Frederic Engels*)। উভয়ের প্রচারিত এই রাজনৈতিক মতবাদই মার্কসীয় মতবাদ নামে পরিচিত। ১৮৪৮ সালে '*Communist Manifesto*'-তে মার্কস এবং এঙ্গেলস্ কম্যুনিজমের মূল সূত্র প্রকাশ করেন। এই মূলসূত্রগুলি সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হচ্ছে:

(ক) **ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা (The materialistic interpretation of history):** মার্কসবাদীদের মতে জড়ই চরম সত্তা; চেতন, অচেতন, মানসিক, সামাজিক সব কিছুই জড়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জড় থেকেই প্রাণ, মন, চেতনা সব কিছুর উৎপত্তি। কোন অলৌকিক সত্তার অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বরের ধারণা অলীক কল্পনা মাত্র। সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক মানুষের জীবনের সব রকম পরিবর্তনের মূলে রয়েছে মানুষের জীবনের যে জড়বাদী ভিত্তি তার পরিবর্তন। মার্কসবাদীদের মতে তাহল পণ্য-উৎপাদন পদ্ধতি, যা সামাজিক অগ্রগতি সংক্রান্ত বিধি বা নিয়মকানুনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সামাজিক জীবনে বিবিধ পরিবর্তন সূচনা করে।

জড়ই চরম সত্তা

মার্কসবাদাদের মতে অর্থনৈতিক উপাদানের দ্বারাই ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত। কলা, ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান আইনকানুন এবং সব রকম সামাজিক সংগঠন উৎপাদন ব্যবস্থার ফল। এই পণ্য-উৎপাদন রীতির পরিবর্তন ঘটলেই সামাজিক পরিবর্তন দেখা দেয়। কোন চিরন্তন ভাব বা আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্র জীবনকে গঠন বা পরিচালিত করে না। উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে যখন পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থার সামঞ্জস্য থাকে না, তখনই সমাজ-জীবনে বিপ্লব দেখা দেয়। দাস যুগ থেকে সামন্ত যুগ এবং সামন্ত যুগ থেকে ধনতান্ত্রিক যুগ—সমাজের এই যে রূপান্তর তার মূলে রয়েছে এই উৎপাদন রীতি সংক্রান্ত পরিবর্তন। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে সব পরিবর্তন বর্তমানে সূচিত হচ্ছে, সেগুলি তার ধ্বংস ডেকে আনবে এবং সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটাবে।

কলা, ধর্ম, সাহিত্য বিজ্ঞান, আইন কানুন সবই উৎপাদন ব্যবস্থার ফল

(খ) শ্রেণী সংগ্রাম মতবাদ (Theory of class-struggle): মার্কসবাদীদের মতে এ পর্যন্ত সমাজে যেসব উৎপাদন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে সেগুলি সমাজে দুটি প্রধান অর্থনৈতিক শ্রেণীর (economic class) সৃষ্টি করেছে। এই দুই শ্রেণী হল শোষক শ্রেণী এবং শোষিত শ্রেণী। এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত, সে কারণে দুই শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। এই শ্রেণী সংঘর্ষই সমাজের রূপান্তর ঘটায়। এই সংঘর্ষের ফলে শোষিত শ্রেণী কর্তৃক শোষক শ্রেণী সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হয় এবং নূতন উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ-ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। বস্তুতঃ, ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে এই ভাবেই।

দুটি শ্রেণী—শোষক এবং শোষিত

(গ) উদ্বৃত্তমূল্য মতবাদ (Theory of Surplus Value): মার্কসবাদীদের মতে কোন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হওয়া উচিত দ্রব্য-উৎপাদনের জন্য যে শ্রম ব্যয় করা হয় তার দ্বারা, কিন্তু শ্রমিকরা দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য যে শ্রম ব্যয় করে, তার সম্পূর্ণ মজুরি লাভ করে না। দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য এবং দ্রব্য উৎপাদনের জন্য শ্রমিকরা যে মজুরি পায়, উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাকে উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus

উদ্বৃত্ত মূল্য ধনিক-শ্রেণী আত্মসাৎ করে

Value) বলে। এই উদ্বৃত্ত মূল্য ন্যায়তঃ শ্রমিকদের প্রাপ্য কিন্তু পুঁজিপতিরা এই উদ্বৃত্ত মূল্য শ্রমিকদের প্রতারিত করে নিজেরাই হস্তগত করে।

(ঘ) সামাজিক গণবিপ্লব (Social Revolution): এইভাবে উদ্বৃত্ত মূল্য ক্রমাগত আত্মসাৎ করার জন্য পুঁজিপতিদের ধন দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ধনবৃদ্ধি তাদের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিপতিদের করায়ত্ত হবার ফলে শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবে। এর ফলে ক্রয়শক্তির অতিরিক্ত পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, আকস্মিকভাবে বস্তুর মূল্য বা চাহিদা হ্রাস পাবে, উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে এবং বেকার অবস্থার সৃষ্টি হবে। এর ফলে সাধারণের দুঃখ-দুর্দশা তীব্রতর হবে এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের মনে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হবে। এ ছাড়াও মূলধন ও উৎপাদন সামগ্রীর একচেটিয়া অধিকারী হওয়ার জন্য স্বল্প সংখ্যক ধনিক শ্রেণীর হাতে ধন সঞ্চিত হতে থাকবে এবং শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুঃখ-দারিদ্র্য ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় স্পষ্টতঃই দুটি শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটবে—একদল ধনি পুঁজিপতি, যারা প্রচুর বিত্ত ও শক্তির অধিকারী এবং অপরদিকে একদল সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী, যারা দুঃখ-দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় নিপীড়িত। এর অনিবার্য পরিণতি সামাজিক গণবিপ্লব। ক্ষুদ্র শ্রমিকশ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গণবিপ্লবের মাধ্যমে ধনিক শ্রেণীর হাত থেকে অধিকার ও শক্তি কেড়ে নেবার জন্য সচেষ্ট হবে।

উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিপতিদের হস্তগত হওয়ার কুফল

শ্রমিকশ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গণবিপ্লবের মাধ্যমে ধনিকশ্রেণীর হাত থেকে অধিকার ও শক্তি কেড়ে নেবার জন্য সচেষ্ট হবে

(ঙ) শ্রমিক শ্রেণীর কর্তৃত্ব ও একনায়কত্ব (Dictatorship of the proletariat): পুঁজিপতি শ্রেণী কঠিন প্রতিরোধ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও গণবিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণী ধনিকশ্রেণীর হাত থেকে সমস্ত শক্তি ও অধিকার কেড়ে নিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। বিপ্লবের ফলকে স্থায়ী করার জন্য শ্রমিকশ্রেণী সমস্ত রকম ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে, সমগ্র উৎপাদন সামগ্রী নিজেদের করায়ত্ত করবে এবং নিজেদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করে

শ্রমিক শ্রেণী ধনিকশ্রেণীকে পরাভূত করে নিজেদের কর্তৃত্ব ও একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবে

তারই ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পুনর্গঠন করবে। এতদিন পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল পুঁজিবাদীদের হাতে শ্রমিকদের শোষণ করার যন্ত্রস্বরূপ কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা করায়ত্ত করার পর পুঁজিপতিদের বিলোপসাধনের জন্য এই রাষ্ট্রকে ব্যবহার করবে।

(চ) রাষ্ট্রের বিলোপসাধন (The withering away of the states): ধীরে ধীরে শ্রমিক কর্তৃক ও একনায়কত্ব মানুষের উপর মানুষের সর্বপ্রকার শোষণ ব্যবস্থা রহিত করবে এবং সকল রকম শ্রেণী বৈষম্যের বিলোপসাধন করবে। যখন শ্রেণী বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজন থাকবে না, রাষ্ট্রেরও বিলোপ ঘটবে। কাজেই শ্রমিক বিপ্লবের পর রাষ্ট্র বিলুপ্ত হবে।

সকল রকম শোষণ ব্যবস্থা রহিত

(ছ) শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা (The classless society): শ্রমিক কর্তৃত্ব ও একনায়কত্বের লক্ষ্য হল শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থায় শোষকশ্রেণী ও শোষণ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটবে, সকল ব্যক্তিই সাধ্যমত উৎপাদনে সহায়তা করবে। উৎপাদন সামগ্রীর উপর সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সকলেরই লভ্য হবে। এই শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থাই কম্যুনিজমের স্বপ্ন।

শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই কম্যুনিজমের স্বপ্ন

সমালোচনা (Criticism):

অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকেই মার্কসবাদের বা কম্যুনিজমের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে এই সমালোচনা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে:

(ক) ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা একদেশদর্শী মতবাদ। গিডিংস্, হবহাউস, গিনস্‌বার্গ, সোরোকিন গোল্ডেনউইসার প্রমুখ খ্যাতনামা সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে ইতিহাস কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না, অর্থনৈতিক ছাড়াও ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, ধনসম্পর্কীয়, মনস্তাত্ত্বিক এবং আরও অন্যান্য

ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ

উপাদানের প্রভাব দেশের ইতিহাসের উপর পতিত হয়। কাজেই ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষজনক।

(খ) মার্কসীয় মতে শ্রমের পরিমাণই দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যোগান ও চাহিদা, প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য বিষয় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে। সুতরাং উদ্‌বৃত্ত মূল্য সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয়।

শ্রমের পরিমাণ দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে না

(গ) শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক নয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনিকশ্রেণী দিনের পর দিন ধনী এবং শ্রমিকশ্রেণী দিনের পর দিন দরিদ্র হতে থাকবে, উভয়ের স্বার্থের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য সাধিত হবে না, ইতিহাস তা প্রমাণ করে না। প্রায় সব ধনতান্ত্রিক দেশেই শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। তাছাড়া, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মার্কসের মতে পুঁজিবাদী শ্রেণীই কলকারখানার একমাত্র মালিক, একথা ঠিক নয়। বর্তমান যুগে দেখা যায়, সাধারণ ব্যক্তিও কলকারখানার মালিক বা বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশীদার। কলকারখানা পরিচালনার ব্যাপারে এবং লভ্যাংশ বণ্টনের ব্যাপারেও শ্রমিকদের অংশীদার করা হচ্ছে।

শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যা ইতিহাসের দ্বারা প্রমাণিত হয় না

(ঘ) কম্যুনিজম ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র স্বীকার করে না। যে সামাজিক আদর্শ মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে মর্যাদা দান করে না, সে আদর্শ সাধারণের সমর্থন লাভ করতে পারে না।

(ঙ) ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কস বলেছেন যে শিল্পের দিকে যেসব দেশ খুব বেশী অগ্রসর সেসব দেশগুলিতে, শিল্পের দিক থেকে অনগ্রসর দেশের তুলনায় সামাজিক বিপ্লব খুব তাড়াতাড়ি দেখা দেবে। কিন্তু মার্কসের এই ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণিত হয় নি। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশসমূহ শিল্পের দিক থেকে অগ্রসর। এই সব দেশে মার্কসের কথামত বিপ্লব এখনও দেখা দেয় নি।

(চ) শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাষ্ট্র সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করবে এবং তারপর রাষ্ট্রের বিলোপ সাধিত হবে, ইতিহাসের দ্বারা এ সত্য প্রমাণিত হয় নি। সোভিয়েট রাশিয়াতে রাষ্ট্র সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে কিন্তু রাষ্ট্রের বিলোপের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বস্তুতঃ, মার্কসবাদীদের শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা নিছক কাল্পনিক বস্তু বলেই মনে হয়।

(ছ) কম্যুনিজম ধর্ম, নৈতিকতা, ধ্রুব আদর্শ প্রভৃতিতে বিশ্বাসী নয়, এ সবই তাঁদের মতে উৎপাদন রীতির ফলস্বরূপ, পুঁজিবাদীদের স্বার্থসিদ্ধির কৌশল মা ত্র—এ জাতীয় মতবাদ সাধারণ মানুষের সমর্থন লাভ করে না। তাছাড়া, কম্যুনিজম হিংসা ও সশস্ত্র উপায়ের মাধ্যমেই আদর্শলাভের কথা বলে থাকে। অনেকে এই পদ্ধতিকে মানবতার আদর্শের বিরোধী বলে ধারণা করেন।

কম্যুনিজমের মূল্য (Value of Communism as a political ideal): পুঁজিবাদ ও ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিগুলির দিকে কম্যুনিজম নিপুণতার সঙ্গেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছে। যে-কোন আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার যে সকল রকম শোষণ থেকে মুক্ত থাকা দরকার, কম্যুনিজমের এই আদর্শ সকলেরই আদর্শ লাভ করেছে। বস্তুতঃ, প্রতিটি ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনীয় জীবিকা নির্বাহের জন্য দ্রব্যসামগ্রী দেওয়ার কথা বলে, ধনের সমবণ্টনের কথা উল্লেখ করে, ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে জনকল্যাণের আদর্শকে তুলে ধরে এবং সামাজিক ন্যায়পরতার (Social justice) আদর্শকে যথোচিত মর্যাদা দিয়ে কম্যুনিজম সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতিগুলিকে জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সে কারণে বর্তমান যুগে প্রতিটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রই সমাজ-তন্ত্রবাদের মূল আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সচেষ্ট।

সমাজতন্ত্রবাদ এবং কম্যুনিজম (Socialism and Communism)

অনেকে সমাজতন্ত্রবাদ এবং কম্যুনিজমকে সমার্থক বলে ধারণা করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। কম্যুনিজমের মতে শ্রমিকশ্রেণী মালিক শ্রেণীর হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুরোপুরি কম্যুনিজমের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে না। এ আদর্শে পৌঁছতে হলে সমাজকে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা বা স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এই মধ্যবর্তী সমাজব্যবস্থাই সমাজতন্ত্রবাদ। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক এবং সমভোগবাদী সমাজব্যবস্থার অন্তবর্তী অবস্থা হল সমাজ-

তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। বস্তুতঃ, এই স্তরকে মার্কস কম্যুনিজমের প্রথম স্তর এবং কম্যুনিজমকে উচ্চতর স্তর বলে উল্লেখ করেছেন।

সমাজতান্ত্রিক স্তরে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে এবং উৎপাদন-সামগ্রীর বণ্টনের নীতি হবে—প্রতিটি ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী নয়, প্রতি ব্যক্তির কর্ম অনুযায়ী। কম্যুনিজমের স্তরে রাষ্ট্রের বিলোপ সাধিত হবে এবং বণ্টনের নীতি হবে—"প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী নয়, প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী।" কম্যুনিজম বিশ্বাস করে যে সমাজতান্ত্রিক স্তরে সমাজের উৎপাদন শক্তিকে এমনভাবে বর্ধিত করা সম্ভব হবে যে সকলকেই প্রয়োজনমত প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী দেওয়া সম্ভব হবে। বস্তুতঃ, কম্যুনিজমের আদর্শে উপনীত হওয়ার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক অবস্থায় সেগুলি সাধিত হবে। রাশিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্র এখন সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্র। সোভিয়েট রাশিয়া কম্যুনিজমের স্তরে এখনও উপনীত হয়নি।

৭। কোন্ সামাজিক আদর্শটি গ্রহণযোগ্য? (Which Ideal should be accepted?):

আমরা পূর্বে অভিজাততান্ত্রিক আদর্শ, গণতান্ত্রিক আদর্শ, সমাজতন্ত্রবাদী ও সমভোগবাদের আদর্শ প্রভৃতি প্রধান প্রধান আদর্শগুলির আলোচনা করেছি।[1] প্রশ্ন হল, কোন্ আদর্শটি সমাজের আদর্শ হওয়া উচিত? পূর্বোক্ত আদর্শগুলির প্রতিটিরই দোষগুণ বর্তমান।[2] তাহলেও গণতান্ত্রিক আদর্শের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীকে উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত নয়।

আমাদের মতে, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও ন্যায়পরতা সমাজের আদর্শ হওয়া উচিত। যে কোন সমাজ বা রাষ্ট্র এই আদর্শকে সামনে রেখে যদি তার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করে তাহলেই সামাজিক ঐক্য ও জনকল্যাণের আদর্শটিকে লাভ করতে পারবে। কিন্তু যদিও আমরা গণতান্ত্রিক আদর্শকে মোটামুটি সমর্থন করছি, তবু অন্য আদর্শের সদ্গুণগুলি এ আদর্শের মধ্যে সমন্বিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। অভিজাততান্ত্রিক আদর্শ ব্যক্তির উন্নতি ও দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সমাজতন্ত্রবাদীরা ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ফলস্বরূপ যে অকল্যাণ তাকে দূর করতে চায়। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও ন্যায়পরতাই

1. চতুর্থ অধ্যায়ের ৬ (খ) অনুচ্ছেদে সমাজতন্ত্রবাদ এবং অষ্টম অধ্যায়ের ১০ (গ) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ দ্রষ্টব্য।

2. সমাজতন্ত্রবাদের গুণ ও দোষ ৭৩ ও ৭৪ পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে।

যদি সমাজের আদর্শ হয় তাহলে সেই আদর্শে গঠিত সমাজে ব্যক্তির উন্নতির দিকে যেমন লক্ষ্য রাখা হবে এবং তার দক্ষতাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে, তেমনি ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় শোষণের যে মর্মান্তিক রূপ পরিলক্ষিত হয় তাও দূরীভূত হবে। বস্তুতঃ, কোন সমাজ বা রাষ্ট্র যদি গণতান্ত্রিক আদর্শের বাইরের রূপটুকুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে গণতান্ত্রিক আদর্শের অন্তর্নিহিত স্বরূপের তাৎপর্যটুকু উপলব্ধির জন্য সচেষ্ট হয় তাহলে সমাজ বা রাষ্ট্র জনকল্যাণের আদর্শটিকে যথার্থভাবে লাভ করতে সক্ষম হবে এবং যে সামাজিক ঐক্য সমাজ দার্শনিকের লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হবে। যথা, গণতান্ত্রিক আদর্শে গণতন্ত্রের নীতি ও সমাজতন্ত্রবাদের নীতির এক সুষম সমন্বয়ই সাধিত হবে এবং এ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থা সর্বপ্রকার শোষণ, বিরোধ ও নিপীড়নমুক্ত হয়ে একটি যথার্থ জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানরূপেই স্বীকৃতিলাভ করবে। বস্তুতঃ, যাঁরা সমাজতন্ত্রবাদী গণতন্ত্রের কথা প্রচার করেন তাঁরা সমাজতন্ত্রবাদী নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের কথাই বলে থাকেন।

সংক্ষিপ্তসার

১। সমাজের পরিবর্তন আকস্মিক এবং উদ্দেশ্যহীন নয়। সমাজের পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তর আছে এবং এদের মধ্যে যোগসূত্র আছে।

২। আদর্শ ছাড়া ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। অভিজাততান্ত্রিক সমাজ-আদর্শের মতে অভিজন বা অভিজাত বংশীয় ব্যক্তিদের শাসনই সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক এবং এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত উন্নতি ও ব্যক্তিগত দক্ষতা। একমাত্র স্বাধীন মানুষ স্বাধীন কার্যাবলীর মারফত উন্নতি ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু অভিজাত তন্ত্রে সাধারণ বা কর্তার ইচ্ছার কোন স্থান নেই এবং শাসকেরা ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তার কোন প্রতিকার নেই। এছাড়া অভিজাততন্ত্র রক্ষণশীল। অপর একটি সমাজ আদর্শ হচ্ছে গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে 'জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের শাসন।' এ আদর্শের অসুবিধা হচ্ছে এতে সংখ্যার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সংখ্যাধিক্যের সহায়তায় দলীয় স্বার্থপুষ্ট অকর্মণ্য শাসকেরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করতে পারে।

৩। গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তি হল স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী ও ন্যায়বোধ। সামাজিক স্বাধীনতা ব্যক্তির অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা নয়, এ হল সমাজ নিয়ন্ত্রিত নিয়মনিষ্ঠ ব্যবহার বা

অপরের অধিকার লঙ্ঘন করে না। মৈত্রী হল মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ, যা ছাড়া সমষ্টিগত সুখলাভ হয় না। সাম্য মানে সমাজে সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ। সামাজিক সাম্যই অন্যপ্রকার সাম্যের ভিত্তি।

৪। ন্যায়পরতা দুভাবে বিচার করা যায়; যথা—(ক) বণ্টনমূলক ন্যায়পরতা যার অর্থ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সামর্থ্য, মানসিক প্রবণতা ও শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দেওয়া এবং (খ) সংশোধনমূলক ন্যায়পরতা যার অর্থ এমন কতকগুলি সার্বভৌম নীতির রচনা যেগুলি সামাজিক নীতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং এমন এক শক্তিশালী সংগঠন তৈরি যা অকল্যাণমূলক অবস্থা ও কাজের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৫। সমাজতন্ত্রবাদও স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতাকে সমাজের আদর্শ বলে মনে করে। এজন্য ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে দেশের জমি ও মূলধনের রাষ্ট্রীয়করণ প্রয়োজন। পুঁজিবাদের আধিপত্যের জন্য গণতন্ত্রে এ সম্ভব নয়। কাজেই সমাজে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা দরকার।

৬। কম্যুনিজম বা সমভোগবাদের আদর্শ প্রচার করেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্। কম্যুনিজমের মূলসূত্রগুলি হল (১) ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা, (২) শ্রেণীসংগ্রাম মতবাদ, (৩) উদ্‌বৃত্তমূল্য মতবাদ, (৪) সামাজিক গণবিপ্লব, (৫) শ্রমিক শ্রেণীর কর্তৃত্ব ও একনায়কত্ব, (৬) রাষ্ট্রের বিলোপসাধন, (৭) শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা। সমলোচনায় বলা চলে, ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা একদেশদর্শী মতবাদ। শ্রমের পরিমাণ দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে না। শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক নয়। কম্যুনিজমে ব্যক্তি স্বাধীনতা অস্বীকৃত। যে-সব দেশ শিল্পের দিক থেকে অগ্রসর সে সব দেশে খুব শীঘ্র গণবিপ্লব দেখা দেবে—মার্কসের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়নি। কম্যুনিজমের আদর্শ মানবতার আদর্শের বিরোধী। কম্যুনিজমের মূল্য—পুঁজিবাদ ও ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দোষত্রুটি কম্যুনিজম জগতের কাছে তুলে ধরেছে, সামাজিক ন্যায়পরতার আদর্শকে যথোচিত মর্যাদা দিয়েছে।

সমাজতন্ত্রবাদ এবং কম্যুনিজম এক নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা এবং কম্যুনিজম—এই উভয়ের মধ্যবর্তী স্তর হল সমাজতন্ত্রবাদ।

৭। গণতান্ত্রিক আদর্শ যদি সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও ন্যায়পরতার আদর্শকে যথার্থভাবে রক্ষা করতে পারে তবে একেই যথার্থ সামাজিক আদর্শ বলে গ্রহণ করা যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যূথ-মনোভাব

(Herd Sentiment)

১। সমাজ-জীবনে যূথের স্থান (The Herd in Social Life) :

সমাজের মধ্যে আমরা দু জাতীয় গোষ্ঠী দেখি। কতকগুলি গোষ্ঠী মোটামুটি স্থায়ী, আর কতকগুলি সাময়িকভাবে উদ্ভূত হয়। সমাজ, সংঘ, সমিতি, প্রতিষ্ঠান এগুলি কম-বেশী স্থায়ী। কিন্তু জনসাধারণ (Public), জনতা (Crowd) বা শ্রোতৃমণ্ডলী (Audience) হল অস্থায়ী জনসমষ্টি। কিন্তু যেহেতু সামাজিক ঐক্য, আদর্শ ও মূল্য সমাজ-দার্শনিকের আলোচ্য বিষয়বস্তু, সেহেতু এসব অস্থায়ী জনসমষ্টি, দল বা গোষ্ঠীও সমাজ-দার্শনিকের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। যদিও ক্ষণভঙ্গুরতা এসব গোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য তবু এসব দল বা গোষ্ঠী মানুষের মনের মনোভাব, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্যকে বিচিত্রভাবে প্রকাশ করে।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, সংঘবদ্ধতা মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ; মানুষ নিঃসঙ্গ একক জীবন যাপন করতে চায় না। এই সংঘবদ্ধতার ফলেই সমাজ গড়ে ওঠে, স্থায়ী সামাজিক সংগঠনের উদ্ভব হয়। আবার এই সংঘবদ্ধতার প্রেরণায় অনেক সময় ছোট-বড় নানা দলের সৃষ্টি হয়, যেগুলি স্থায়ী সামাজিক সংগঠন নয়। যূথও এরূপ অন্যতম সামাজিক গোষ্ঠী।

২। যূথ ও জনতার মধ্যে প্রভেদ (Distinction between herd and crowd) :

এক দলগত মনোভাব থেকে যূথের সৃষ্টি হয়। এই মনোভাবকে যূথ মনোভাব বলা হয়। এ মনোভাব হচ্ছে সংঘবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ হওয়ার সহজ

ও স্বাভাবিক প্রেরণা। যূথ-মনোভাবের যথার্থ প্রকাশ পশুদের মধ্যে। মানব সমাজেও এর প্রকাশ দেখা যায়। মানুষের মধ্যে চিন্তাবিহীনভাবে সামাজিক সংস্কার বা প্রথা অনুসরণ করার প্রেরণাই যূথ-মনোভাবের অবদান। 'পাছে লোকে কিছু বলে'—এই ভেবে আমরা অনেক সময় সামাজিক জীবন-যাত্রার সঙ্গে তাল রেখে চলতে চাই, যুক্তিতর্কের বিশেষ ধার তখন ধারি না। সংঘবদ্ধ হয়ে থাকার প্রেরণাই যূথ-মনোভাবের প্রধান বিষয়। অনেকে যূথ এবং জনতাকে এক বলে মনে করেন। কিন্তু যূথ ও জনতা ভিন্ন। কোন কোন পশুর ক্ষেত্রে যূথ-জীবনই স্থায়ী জীবনযাত্রার রূপ। বর্তমানে আমরা পশ্চিমবঙ্গে বহু উদ্দেশ্যহীন উদ্বাস্তুদের বসবাসকে অনেকটা যূথ-জীবন বলে অভিহিত করতে পারি। যূথের মনোভাব জনতার তুলনায় অধিকতর স্থায়ী মনোভাব। জনতার স্থায়িত্ব খুবই স্বল্প। বস্তুতঃ, জনতা কোন স্থায়ী সংগঠন বা গোষ্ঠী নয়। জনতা যেমন হঠাৎ গজিয়ে ওঠে, তেমনি আবার হঠাৎ মিলিয়ে যায়। ম্যাকাইভার ও পেইজ (*MacIver and Page*) বলেন, "জনতা বলতে বুঝব কোন একটি সামাজিক সংগঠনের মাঝে অসংগঠিত জনসমষ্টি।"[1] পথের উপর দাঁড়িয়ে যে জনসমষ্টি কোন দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বা হঠাৎ বিপদের আশঙ্কায় যে জনসমষ্টি প্রাণভয়ে দৌড়তে থাকে বা যে জনসমষ্টি কোন বাড়ীতে আগুন লাগতে দেখে সে আগুন নেভাবার জন্য ব্যবস্থা করতে থাকে—এসব জনসমষ্টি হল বিভিন্ন ধরনের জনতা। যে কোন জনসমষ্টিই অবশ্য জনতা নয়। একই পার্কে যদি অনেক লোক একসঙ্গে বসে থাকে তাহলে তাকে জনতা বলা চলে না। তাকে কেবলমাত্র লোক সমাগম বা জনসমষ্টি বলে। আবার জনতা যখন সময় সময় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে, আইন-কানুন লঙ্ঘন করে সমাজের অকল্যাণকর কাজ করে তখন এই জনতা স্বাভাবিক জনতা নয়, একে বলা যেতে পারে উচ্ছৃঙ্খল জনতা (mob)।

যূথ ও জনতার পার্থক্য

1. "We should understand the crowd as an unorganised grouping occuring within a system of social organization."

MacIver and Page : Society, Page 418

জনসমষ্টি, জনতা এবং উচ্ছৃঙ্খল জনতা, এ সবের মধ্যে কোন ধরাবাঁধা প্রভেদ নেই। কোন একটি বাগানে বেশ কিছু লোক আপন মনে বসে আছে। এ জনতা নয়, এ হল বিচ্ছিন্ন জনসমষ্টি (Aggregate) মাত্র। সেই সময় কোন জনপ্রিয় নেতা তাদের উদ্দেশ করে বক্তৃতা করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে এই জনসমষ্টি একত্রে সমবেত হল। তখন এ হয়ে উঠল জনতা (Crowd)। নেতা বক্তৃতার মাধ্যমে তাদের উত্তেজিত করে তুললেন এবং আইন ভঙ্গ করার নির্দেশ দিলেন। জনতা নেতার আদেশ মেনে নিল, সঙ্গে সঙ্গে জনতা হয়ে উঠল উচ্ছৃঙ্খল জনতা (mob)।

জনতা ও জনসমষ্টি এবং উচ্ছৃঙ্খল জনতা

Gisbert জনতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন:

(ক) সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী (Narrow Outlook): জনতা বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করে না বা বহু বিষয়ে একত্রে মনঃসংযোগ করতে পারে না। জনতা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কাজ করতেও অক্ষম এবং বিচার-বুদ্ধির দ্বারা চালিত না হয়ে সাময়িক উত্তেজনার দ্বারাই চালিত হয়।

(খ) বদ্ধমূল ধারণা (Persistency of ideas): জনতা যে বিষয়টিকে মনে স্থান দেয় তাকে কিছুতেই সহজে পরিত্যাগ করতে চায় না। সেই ধারণার সমর্থনে যেসব বিষয় উপস্থাপিত হয় সেগুলিকে জনতা গ্রহণ করে এবং অন্যান্য বিষয় খুব যুক্তিসংগত হলেও তাকে গ্রহণ করতে চায় না। সে কারণে বিপথগামী জনতাকে ঠিক পথে চালিত করা কঠিন।

(গ) নিম্ন মানসিক স্তর (Low Mental level): জনতার চিন্তা বা ধারণা খুব ব্যাপক এবং গভীর নয়, বরং খুবই সংকীর্ণ ও নিম্নস্তরের। জনতা স্থির বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করে না। সে কারণে তার চিন্তা খুবই অন্তঃসারশূন্য।

(ঘ) আবেগপ্রবণ (Emotional in Nature): জনতা আবেগের দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং এই আবেগ সংক্রামক রোগের মতো জনতার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অল্প সময়ের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে।

(ঙ) জনতা দায়িত্বজ্ঞানশূন্য (The Loss of the Sense of Responsibility): যেহেতু সমষ্টিগত দায়িত্বের কেন্দ্র নির্ণয় করা কঠিন সেহেতু জনতার মধ্যে কারও ব্যক্তিগতভাবে কোন দায়িত্ববোধ দেখা দেয় না, এর ফলে জনতার দায়িত্ববোধ বলে বিশেষ কিছু থাকে না। সময় সময় জনতা এমন দায়িত্বশূন্য আচরণ করে যে তা সমস্ত সমাজের পক্ষে কলংকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

1. *Gisbert*: Fundamentals of Sociology; Page 28

অবশ্য সময় সময় জনতা সহানুভূতি ও সমবেদনাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনকল্যাণমূলক কার্যও করে। বস্তুতঃ জনতা কোন স্থায়ী সংগঠন নয় বলে এর সংগঠনমূলক কাজ করার ক্ষমতা একান্তই সীমাবদ্ধ। তবু সমাজ-জীবনে জনতার যে একটা নিজস্ব ভূমিকা আছে তা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই।

৩। যূথ-মনোভাবের স্বরূপ (Characteristics of Herd Sentiment) :

পশু-সমাজের দলীয় অনুভূতি পশুর সংঘবদ্ধতা প্রবৃত্তিরই প্রকাশ মানুষের সমাজে এই দলগত অনুভূতি যূথ-মনোভাবের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যূথ-মনোভাব হল অনুকরণজাত সংসক্তি যা মানুষের কোন একটি দলের সংস্কার, বিশ্বাস এবং জীবনধারাকে অন্ধের মতো মেনে চলার মারফত প্রকাশিত হয়।[1] এই যূথ-মনোভাব মানুষকে নিজের দলকে অনুসরণ করার জন্য প্রবৃত্ত করে এবং দলের রীতিনীতি ও নিয়ম-ভঙ্গকারী ব্যক্তিকে বিতাড়িত করতে প্রেরণা দেয়। যূথ-মনোভাব দলের রীতিনীতিকেই বড় করে দেখে। সেই রীতিনীতি ন্যায় কি অন্যায় তা বিচার করে দেখে না। এজন্য যে সব ব্যক্তি স্বাধীনচেতা, অনেক সময় তারা সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়। দলের সংহতি বা ঐক্য বজায় রাখতে হলে তাকে দলের সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে চলতে হবে। চলিত প্রথাকে বিচার না করেই মেনে নেওয়া যূথ মনোভাবের স্বরূপ।

এই যূথ-মনোভাবের আত্মপ্রকাশ নানাভাবে ঘটতে পারে। অনেক সময় এ মনোভাব কোন কৃত্রিম নতুনত্বকেও অনুসরণ করে, অবশ্য যদি সেটা দল বা সমাজ গ্রহণ করে।

এই যূথ-মনোভাব অনেক সময় বহু বিস্তৃত আবেগের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে এবং সংক্রামক ব্যাধির মতো সমস্ত দলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

ম্যাক্‌ডুগাল (*McDougall*)-এর মতে প্রাচীনকালে সমাজের ক্রমোন্নতির ব্যাপারে এই যূথ-মনোভাব এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল।

1. *MacIver and Page* : Society : Page 418.

উন্নত সভ্য সমাজে এই যূথ-মনোভাবের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে। সামাজিক গোষ্ঠী সংগঠনের মূলে এই যূথ-মনোভাব বিশেষ করে কার্যকরী হয় এবং সমাজ যতই উন্নত হোক না কেন, সামাজিক গোষ্ঠী সংগঠনের জন্য এই যূথ-মনোভাব মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু মাত্রায় থেকে যায়। গোষ্ঠী চেতনা থেকেই স্কুল, কলেজ, গীর্জা, দল প্রভৃতির উদ্ভব। ব্যক্তি যখন পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন সে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং যখন যূথের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখন সে নিজেকে সুখী মনে করে।[1]

গিন্‌সবার্গ (*Ginsberg*)[2]-এর মতে সমাজের মধ্যে যে নৈতিক এবং ধর্মবিশ্বাস দেখা যায় তার উদ্ভব যূথ-মনোভাব থেকেই। কোন একটি সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে স্বার্থের যে অভিন্নতা দেখা যায় তার মূলে ব্যক্তির যূথ-মনোভাব। এই যূথ-মনোভাবই বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। এই যূথ-মনোভাব থেকেই সামাজিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

ম্যাকাইভার ও পেইজ (*MacIver and Page*) যূথ-মনোভাবের সঙ্গে 'অনুরূপ স্বার্থ' (Like Interest) ও 'সাধারণ স্বার্থ' (Common Interest)[3]-এর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

যূথ-মনোভাব অনেক ক্ষেত্রে অনুরূপ স্বার্থকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করে। এসব ক্ষেত্রে যূথ-মনোভাব আত্মকেন্দ্রিক ভয়, আশা, লাভালাভের ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থই এ অবস্থায় মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে বটে কিন্তু অনুকরণ প্রবৃত্তি ও যথোপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা লাভের জন্য সমস্ত দলটিই যূথের জীবনধারা অনুসরণ করে।

1. *McDougall* : An Introduction to Social Psychology ; Page 72
2. *Morris Ginsberg* : The Psychology of Society ; Page 20.
3. পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কিন্তু অনেক সময় যূথ-মনোভাব সাধারণ স্বার্থকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়। সময় সময় কোন ভাবাবেগের দ্বারা সমস্ত দলটি এমনই অনুপ্রাণিত হয় যে, সে আবেগ প্রত্যেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যখন কোন 'কলেজ ফুটবল দল' খেলায় জয়লাভ করে বা হেরে যায় তখন কলেজের সকলেই এ জাতীয় আবেগের জন্যই আনন্দে উল্লসিত হয় বা পরাজয়ের জন্য হতাশ হয়ে পড়ে। তখন দলের মধ্যে 'আমি'র ভাবটা অন্তর্হিত হয়ে 'আমরা' ভাবটা প্রাধান্য লাভ করে এবং প্রতিটি ব্যক্তি নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধকে পরিহার করে দলের সঙ্গে নিজেকে এক ও অভিন্ন মনে করে। ব্যক্তি ও সমাজের যে জটিল সম্পর্ক এ জাতীয় অবস্থায় তা সরল হয়ে পড়ে। সুতরাং যূথ-মনোভাব যেমন দলের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিকে একেবারে আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থপর করে তুলতে পারে তেমনি তাকে এক উচ্চস্তরের অবস্থায় উন্নীত করতে পারে।

যূথ-মনোভাব, অনুরূপ স্বার্থ এবং সাধারণ স্বার্থ

আদিম সমাজে সমাজের সংহতি বা ঐক্য সৃষ্টি করার জন্য যূথ-মনোভাব খুব উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিল। আদিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের চেতনা তেমন প্রবল ছিল না। এ জাতীয় সমাজের সভ্যরা সমাজের রীতিনীতি আচরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সচেষ্ট ছিল। এই যূথ-মনোভাব থেকেই যে প্রথম সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর উদ্ভব তা স্বীকার করতে হয়। স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা যেসব ব্যক্তিদের মধ্যে নেই তারা নিজেদের গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান থেকে বিযুক্ত মনে করেই অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় মনে করত। বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকেই তারা নিজেদের শক্তিমান বলে মনে করত। যেসব প্রতিষ্ঠানের তারা সভ্য সেগুলির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ খুব তীব্রভাবে প্রকাশ পেত। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই যূথ-মনোভাবের তীব্রতা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। চিন্তাশীল ও স্বাধীন মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপলব্ধি করেছেন যে, সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে এই যূথ-মনোভাব অনেক সময় ক্ষতিকর। উন্নত সমাজে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য থাকা প্রয়োজন। সমাজের বা গোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্যবশতঃ যে

যূথ-মনোভাব থেকে সমাজের ঐক্য বা সংহতি দেখা যায় তা অগ্রসর সমাজের পক্ষে শুভ নয়। উন্নত বা অগ্রসর সমাজে মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও কোন কিছুর সৃষ্টি করার ইচ্ছাই বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয় এবং নিজেদের মৌলিকতা প্রকাশ করা সত্বেও তাদের সমাজের ঐক্য বা সংহতি নষ্ট হয় না।

সংক্ষিপ্তসার

১। সমাজে স্থায়ী ও অস্থায়ী নানারকম গোষ্ঠী আছে। যূথ অন্যতম সামাজিক গোষ্ঠী।

২। এক দলগত মনোভাব থেকে যূথের সৃষ্টি। যূথ-মনোভাব হচ্ছে সমাজবদ্ধ হবার সহজ ও স্বাভাবিক প্রেরণা; এটা পশুসুলভ মনোভাব, যদিও মানুষের মধ্যে যূথ-মনোভাব আছে। যূথ ও জনতা এক নয়। জনতার বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতা, বদ্ধমূল ধারণা, নিম্নস্তরের চিন্তাধারা, আবেগ-প্রবণতা ও দায়িত্বজ্ঞানশূন্যতা।

৩। যূথ-মনোভাবে আছে অনুকরণের প্রবৃত্তি যা ব্যক্তিকে দলের সংস্কার, বিশ্বাস ও জীবনধারাকে অন্ধভাবে পালন করতে প্রেরণা দেয়। যূথ-মনোভাব অনেক সময় 'অনুরূপ' স্বার্থকে অবলম্বন করে প্রকাশ পায়, আবার অনেক সময় সাধারণ' স্বার্থকে অবলম্বন করে প্রকাশ পায়।

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ স্বার্থ

(Common Interests)

১। সামাজিক সম্পর্কের উপাদান :

মানুষের সামাজিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি জিনিস দেখতে পাই—(১) ব্যক্তিসাপেক্ষ মনোবৃত্তি (Subjective attitude) এবং (২) ব্যক্তিনিরপেক্ষ স্বার্থ (Objective interest)। দুটি ব্যক্তির মধ্যে যদি একটি সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের মনোবৃত্তি না জাগে তবে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না। তাছাড়া সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন ব্যক্তির মনোবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই ব্যক্তিগত মনোবৃত্তি ছাড়াও আর একটি বিষয় আছে সেটি হল কোন একটি বস্তু বা স্বার্থ, যাকে কেন্দ্র করে এই সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কোন একটি সাধারণ স্বার্থ বা উদ্দেশ্যই মানুষকে সংঘবদ্ধ করে।

২। স্বার্থ এবং মনোবৃত্তি (Interests and Attitudes) :

স্বার্থ এবং মনোবৃত্তি—এই দুটি হল সাপেক্ষ বিষয়, অর্থাৎ একটিকে ছাড়া আর একটির তাৎপর্য বোঝা যায় না। যখন আমরা বলি 'ভয়', ভালবাসা', 'সহানুভূতি', 'শ্রদ্ধা' তখন এরা হল ব্যক্তির মনোবৃত্তি। আর যখন বলি 'শত্রু', 'বন্ধু' তখন এসব কিছু হল স্বার্থ। যে-কোন বস্তুকে কেন্দ্র করেই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মনোবৃত্তি দেখা দিতে পারে। মনোবৃত্তি হল ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া (Subject) বা ব্যক্তির মানসিকভাব (States of Consciousness) এবং বস্তু হল স্বার্থ। ম্যাকাইভার ও পেইজ (*MacIver and Page*) বলেন, "যখন আমরা ভালবাসা বা ভয়ের কথা বলি তখন আমরা মনোবৃত্তির কথা বলছি যখন কোন বন্ধু বা শত্রুর কথা বলি, তখন স্বার্থের কথা বলছি।"[1]

---

1. "When we mention love or fear we depict an attitude, when we mention friend or enemy we indicate an interest.'

—*MacIver and Page* : Society ; Page 29

মনোবৃত্তি এবং স্বার্থ উভয়কে ঘিরেই সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি। যখন আমরা বলি লোকটি ঘৃণা করে, তখনই প্রশ্ন ওঠে কাকে কেন্দ্র করে তার মনে এই মনোবৃত্তিটি জেগেছে। কোন লোক ভয় পেয়েছে বললে, ভয়ের কারণটা কি তা আমরা জানতে চাই। অনুরূপভাবে যখন বলা হয় কারও টাকার প্রতি আকর্ষণ বা স্বার্থ রয়েছে, তখন এই স্বার্থকে কেন্দ্র করে তার মনে যে মনোবৃত্তি জেগেছে তার কথা আমরা বলি। চোর, পুলিস এবং বিচারক সকলেরই আইনে (Law) স্বার্থ আছে, কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আইনের প্রতি সকলের মনোবৃত্তি একরকম নয়, বিভিন্ন। ব্যক্তিনিরপেক্ষ স্বার্থ (Objective interest) এবং ব্যক্তিসাপেক্ষ মনোবৃত্তি (Subjective attitude)—এ উভয় বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োজন, যদি আমরা মানুষের আচরণের বাস্তব ক্ষেত্রকে ভালভাবে বুঝতে চাই।

৩। সাধারণ স্বার্থ কাকে বলে? (What is Common Interest)?:

ম্যাকাইভার ও পেইজ (*MacIver and Page*) বলেন, "সাধারণ স্বার্থের কথা আমরা তখন বলব যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একটি কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য লাভ করতে চায় যা তাদের সকলের পক্ষে এক ও অবিভাজ্য এবং তাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক সন্ধানের সমষ্টি নয় বরং যার সন্ধান তাদের সকলকে একত্রিত করে।"[1] ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সাধারণ স্বার্থ এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করলেই ম্যাকাইভার ও পেইজের মন্তব্যটি ভালভাবে উপলব্ধি করা যাবে। আমরা ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ স্বার্থ খুঁজি; কেউ টাকা চায়, কেউ খ্যাতি চায়, কেউ গাড়ি চায়। ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ভিন্ন, লক্ষ্য ভিন্ন। কিন্তু সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। ধরা যাক, বন্যায় পীড়িত ব্যক্তিদের সেবা করার জন্য কোন একটি সংঘ গঠন করা হল। এক্ষেত্রে সংঘের অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল বন্যায় পীড়িত দুঃস্থ

1. "We shall speak of common interest when two or more persons seek a goal or objective which is one and indivisible for them all, which unites them with one another in a quest that cannot be resolved merely into an aggregate of individual quests."
—*MacIver and Page*: Society; Page 440.

ব্যক্তিদের সেবাকার্য। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যক্তির মনে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে, কিন্তু সে উদ্দেশ্যর সঙ্গে সংঘের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যর কোন সম্পর্ক নেই। স্বার্থের অভিন্নতা এবং অবিভাজ্যতাই এই লক্ষ্যকে সাধারণ স্বার্থে পরিণত করে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে পৃথক করে।

সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সাধারণ স্বার্থই সমাজের সংহতি ও ঐক্য আনয়ন করে। সাধারণ স্বার্থকে কেন্দ্র করেই সামাজিক গোষ্ঠীগুলির উদ্ভব হয়। সাধারণ স্বার্থের জন্যই সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সক্রিয়তা দেখা যায়।

ব্যক্তির সাধারণ স্বার্থ দুরকমের হতে পারে। প্রথমতঃ, ব্যক্তি যে সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, সেই সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থসংরক্ষণ ব্যক্তির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হতে পারে। এই জাতীয় সাধারণ স্বার্থের আগ্রহ থেকেই 'আমরা' ভাবটা এসে যায়। কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সভ্যরা সেই সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির সাধারণ স্বার্থ নৈর্ব্যক্তিক নয়। বস্তুতঃ, গোষ্ঠী জীবনের ভিত্তি হল এই সাধারণ স্বার্থ। তবে নিজ গোষ্ঠীজীবনের সাধারণ স্বার্থের প্রতি অত্যধিক আগ্রহের বিষময় ফলরূপেই সাম্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতা প্রভৃতির উদ্ভব।

কিন্তু এ ছাড়াও ব্যক্তির আর এক জাতীয় সাধারণ স্বার্থ আছে। কোন নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে কেন্দ্রীভূত করেই এই জাতীয় সাধারণ স্বার্থ নিজেকে প্রকাশ করে। যেমন, কোন একটি বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার বা প্রমাণ করাই একদল বৈজ্ঞানিকের সাধারণ লক্ষ্য হতে পারে। একদল ধর্মপ্রচারক বিশ্বশান্তি প্রচার করাকেই তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বলে ধারণা করতে পারে। সুতরাং কেবলমাত্র কোন সামাজিক গোষ্ঠীর সীমিত স্বার্থই যে ব্যক্তির সাধারণ স্বার্থরূপে পরিগণিত হতে পারে তা নয়, কোন নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ্য (impersonal end) বা লক্ষ্যও সাধারণ স্বার্থের বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

কতকগুলি সামাজিক উদ্দেশ্য বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সাধারণ স্বার্থের বিষয় হওয়ার জন্যই সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ সম্ভব হয় এবং সমাজে ঐক্য বা সংহতি সুদৃঢ় হয়।

৪। অনুরূপ স্বার্থ এবং সাধারণ স্বার্থ (Like Interest and Common Interest) :

অনুরূপ স্বার্থ (Like Interest) এবং সাধারণ স্বার্থ (Common Interest)—এ দুটিকে আমরা প্রায় ক্ষেত্রে সমজাতীয় বলে ভুল করি। অনুরূপ স্বার্থ বলতে বুঝি যা আমাদের ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের কাছে পৃথক। সাধারণ স্বার্থ বলতে আমরা বুঝি যা সমষ্টিগত, বিচ্ছিন্ন না করেই আমরা যার অংশ গ্রহণ করি।[1]

যখন আমরা বলি প্রত্যেক মানুষ সুখ চায়, তখন যদিও প্রত্যেকটি মানুষের বস্তু বা স্বার্থ এক, তবু তাকে আমরা সাধারণ স্বার্থ বলতে পারি না। কারণ প্রতিটি ব্যক্তি পৃথক পৃথক ভাবে নিজের সুখ চায়, এ হল অনুরূপ সুখ। কিন্তু যখন বলি বন্যাত্রাণ সমিতির সভ্যরা বন্যাপীড়িত লোকদের সুখ চায়, তখন বুঝতে হবে সমিতির সভ্যদের স্বার্থ বা উদ্দেশ্য এক ও অবিভাজ্য; তাদের স্বার্থ সাধারণ, অনুরূপ নয়। অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অনুরূপ স্বার্থ থেকেই অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ স্বার্থ উদ্ভূত হয়।

৫। স্বার্থ এবং সংঘ (Interest and Association) :

কোন সাধারণ স্বার্থ লাভ করার উপায় হিসেবেই সংঘ গড়ে ওঠে। মানুষের মনোবৃত্তি (attitude) সংঘ গড়ে তুলতে পারে না, তবে গড়ে ওঠার ব্যাপারকে উৎসাহ দিতে পারে বা নিরুৎসাহ করতে পারে। যে সাধারণ স্বার্থকে কেন্দ্র করে সংঘ গড়ে ওঠে, সেই সাধারণ স্বার্থ অনেকটা স্থায়ী এবং সংঘের সভ্যদের সমষ্টিগত কাজের মাধ্যমে এই সাধারণ স্বার্থকে কার্যকরী করে তোলা যেতে পারে, যেমন—কোন ক্লাব, ইউনিয়ন, পরিবার ইত্যাদি। এসব সংগঠনের মূলে বর্তমান আছে কোন সাধারণ স্বার্থ বা সভ্যদের সমষ্টিগত কাজের মাধ্যমে লাভ করা যেতে পারে।

অবশ্য অনুরূপ স্বার্থ (Like Interest) এবং সাধারণ স্বার্থ (Common Interest) উভয়কে কেন্দ্র করেই সংঘ গড়ে উঠতে পারে। যেমন, অনুরূপ

1. "The like is what we have distributively, privately, each to himself. The common is what we have collectively, what we share without dividing up."
—*MacIver and Page*: Society; Page 32.

স্বার্থের উপর ভিত্তি করে কোন অর্থনৈতিক সংঘ গড়ে উঠতে পারে। ধরা যাক, কোন জীবনবীমা সংঘ। এ সংঘের সভ্যদের যে স্বার্থ তাহল অনুরূপ স্বার্থ। অর্থনৈতিক সংঘগুলির সঙ্গে সংঘের অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের যে সম্পর্ক তা অনেকটা লেনদেনের সম্পর্ক। কিন্তু কোন সেবা সংঘের সভ্যদের যে স্বার্থ তাহল সাধারণ স্বার্থ অর্থাৎ সমষ্টিগত কাজের মাধ্যমে কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূর্ণ করা। তবে এই দুজাতীয় স্বার্থ যে পরস্পরের বিরোধী তা নয়; উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে এবং যে কোন সংঘের, অন্ততঃ কিছু সভ্যদের, স্বার্থ অনুরূপ এবং সাধারণ উভয় প্রকারের।

এ দুজাতীয় স্বার্থ কি ভাবে একত্রে যুক্ত হয়ে পড়ে দেখা যাক। ধরা যাক, 'কলেজ ক্রিকেট দল'। এই দলের যারা সভ্য তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে। প্রত্যেকেই খেলাধূলার মাধ্যমে আনন্দ লাভ করতে চায়, সুখ্যাতি পেতে চায়, বা শরীরকে উন্নত করতে চায়। বিভিন্ন সভ্যদের এই যে ব্যক্তিগত স্বার্থ তা হল অনুরূপ স্বার্থ। কিন্তু এ ছাড়াও সভ্যদের একটা সাধারণ স্বার্থ আছে। প্রতিটি সভ্যই চায় যে শুধু তাদের ব্যক্তিগত সুনাম নয়, তাদের সমবেত খেলাধূলার মাধ্যমে কলেজেরও সুখ্যাতি হোক। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ সমষ্টিগত স্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়। কোন একজন ভাল খেলোয়াড় যদি ভালভাবে খেলে থাকে, তবে তার জন্য সে প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু যদি দলের হার হয়, তাহলে তার ব্যক্তিগত উৎকর্ষ এবং প্রশংসা তাকে তৃপ্তি দেয় না। দলের প্রতিটি সভ্য সমষ্টিগত স্বার্থের কথা চিন্তা করে। পরিবারের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই উভয় জাতীয় স্বার্থ বর্তমান। পরিবারের

অনুরূপ স্বার্থ ও সাধারণ স্বার্থ বহুক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত

প্রতিটি সভ্য নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা চিন্তা করে এবং পরিবারের সমষ্টিগত স্বার্থের কথাও চিন্তা করে। কাজেই পরিবারে অনুরূপ স্বার্থ এবং সাধারণ স্বার্থের সংযোগ আমরা লক্ষ্য করি। পরিবারের সভ্যরা যে পরস্পরের মঙ্গল কামনা করে বা একজন আর একজনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে চায় বা পরিবারের উন্নতি ও সুখ্যাতিতে তৃপ্তিবোধ করে, তার অখ্যাতিতে ক্ষুণ্ন হয়—এসব বিষয়ই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে পরিবারের সভ্যদের স্বার্থ কেবলমাত্র অনুরূপ নয়, সাধারণও

বটে। সাধারণ স্বার্থের বোধই পরিবারের ঐক্য ও সংহতির ভিত্তি। এ ছাড়াও কোন কোন সময় কোন একটি সংঘের সভ্যদের স্বার্থ প্রথমতঃ অনুরূপ হলেও শেষ পর্যন্ত সাধারণের স্বার্থের সঙ্গে মিশে যায়। ধরা যাক, কোন শ্রমিক ইউনিয়ন। এই সংসদের কর্মীদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল নিজের নিজের বেতন বৃদ্ধি করা, ছুটির ব্যবস্থা করা বা অন্যভাবে ব্যক্তিগত অবস্থার উন্নতিসাধন করা। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন এই সংসদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এর কাজে বৈচিত্র্য দেখা দেয় ও কর্মক্ষেত্র ব্যাপক হয়ে পড়ে, তখন অনুরূপ স্বার্থ সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং অনুরূপ স্বার্থ থেকে সাধারণ স্বার্থ উদ্ভূত হতে পারে।

কোন কোন লেখক সাধারণ স্বার্থ (Common Interest)-এর কোন অস্তিত্ব আছে বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে মানুষ সকল অবস্থাতেই ব্যক্তিগত সুখ কামনা করে। মানুষ যদি সাধারণ স্বার্থ চায়, সে কেবলমাত্র তার ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভ করার জন্য। এ মতবাদ নীতিবিজ্ঞানে আত্মসুখবাদ (Egoistic Hedonism) নামে পরিচিত। এ মতবাদ ভ্রান্ত, যেহেতু যে মনস্তত্ত্বকে ভিত্তি করে এ মতবাদ সমর্থন করা হয় সেটা ভ্রান্ত। প্রথমতঃ, মানুষ কেবলমাত্র নিজের সুখ কামনা করে না; তার মধ্যে স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতা উভয়ই বর্তমান। তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে সমষ্টিগত সুখ যদি আমাদের প্রত্যক্ষ কামনার বস্তু না হয় তাহলে ব্যক্তিগত সুখ লাভ করা সম্ভব হয় না। এ প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার ও পেইজ যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তা স্মরণে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে। তাঁরা বলেন, "এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, অনুরূপ স্বার্থকে এবং সাধারণ স্বার্থকে যথাক্রমে আত্ম-স্বার্থপরতা এবং নিঃস্বার্থপরতার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা উচিত হবে না। মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এসব নৈতিক শব্দ ভ্রমজনক এবং অবান্তর।"[1]

সাধারণ স্বার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করা অযৌক্তিক

সংঘের সামাজিক তাৎপর্যকে যদি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হয় তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সংঘের সভ্যদের অনুরূপ এবং সাধারণ, উভয়

1. "In this connection we should remember that like and common interests cannot be identified respectively with 'selfish' and 'unselfish' interests. Such ethical terms are misleading and irrelevant in psychological analysis." —*MacIver and Page*: *Page 424.*

প্রকার স্বার্থের সংযুক্তির মাধ্যমেই সংঘের অস্তিত্ব টিকে থাকে। সুতরাং অনুরূপ স্বার্থ থেকে সাধারণ স্বার্থ উদ্ভূত হতে পারে।

কোন সংঘই টিকে থাকতে পারে না যদি না তার সভ্যরা সংঘের সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে। এ কারণেই প্রতিটি সংঘ বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যেমন—শোভাযাত্রা, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ, উপদেশ ও বাণী, নিয়ম ও রীতি, পতাকা, চিহ্ন বা সংকেতের মাধ্যমে সংঘের ঐক্য, সংহতি ও সমস্বার্থতার কথা সকল সভ্যের সামনে তুলে ধরে। এই সাধারণ স্বার্থের ধারণা যদি সভ্যদের উদ্বুদ্ধ করে না তোলে তাহলে যে কোন সংঘ—তা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় যাই হোক না কেন, কোন মতেই টিকে থাকতে পারে না।

সংক্ষিপ্তসার

১। মানুষের সামাজিক সম্পর্কের উপাদান দুটি; যথা—(ক) মনোবৃত্তি এবং (খ) স্বার্থ; মনোবৃত্তি ব্যক্তিসাপেক্ষ, স্বার্থ ব্যক্তিনিরপেক্ষ।

২। মনোবৃত্তি ও স্বার্থ পরস্পরসাপেক্ষ। 'ভয়', 'ভালবাসা' প্রভৃতি মনোবৃত্তি। 'শত্রু'কে ভয় পাই, 'বন্ধু'কে ভালবাসি; শত্রু, বন্ধু প্রভৃতি স্বার্থ। 'মনোবৃত্তি' ও 'স্বার্থ'কে নিয়ে সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি।

৩। 'সাধারণ স্বার্থ' হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মিলিত স্বার্থ; যেমন, দুঃস্থ লোকের সাহায্যের জন্য সমিতির সভ্যদের স্বার্থ হচ্ছে 'সাধারণ স্বার্থ'। সাধারণ স্বার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে পৃথক।

৪। 'অনুরূপ স্বার্থ' ও 'সাধারণ স্বার্থ' পৃথক। একটি কাজের জন্য বহু লোক দরখাস্ত করেছে; এদের স্বার্থ অনুরূপ। বহুলোক মিলে একটি সমিতি গঠন করেছে; এদের স্বার্থ সাধারণ।

৫। কোন-না-কোন সাধারণ স্বার্থকে কেন্দ্র করে সংঘ গড়ে ওঠে। আবার অনুরূপ স্বার্থকে কেন্দ্র করেও সংঘ গড়ে উঠতে পারে। তবে অনুরূপ স্বার্থ ও সাধারণ স্বার্থ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য কারও কারও খেলাধূলা দরকার, এমন কয়েকজন ব্যক্তি মিলে ক্লাব গঠন করল। ক্লাব খেলায় জয়লাভ করলে সেটা ক্লাবের সভ্যদের সাধারণ স্বার্থ; কিন্তু যেসব সভ্যরা ভাল খেলেছে ও বাহবা পেয়েছে তাদের সেটা অনুরূপ স্বার্থ। অনেকে যেমন, আত্মসুখবাদ যাঁরা প্রচার করেন, তাঁরা মনে করেন সাধারণ স্বার্থ বলে কিছু নেই; সব স্বার্থই অনুরূপ স্বার্থ। কিন্তু এ মত সম্পূর্ণ সত্য নয়। সাধারণ স্বার্থের ধারণা না থাকলে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ধর্ম সম্পর্কীয় কোনরূপ সংঘ গড়ে উঠতে পারে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ধর্ম

(Religion)

১। ধর্মের অর্থ (The Meaning of Religion) :

ইংরেজি Religion কথাটি উদ্ভূত হয়েছে '*Religere*' শব্দ থেকে যার অর্থ হল বন্ধন (Bond)। এর থেকে ধরা যেতে পারে যে ব্যক্তির জীবনে এবং জাতির জীবনেও বটে, যা যথার্থ সংহতি আনে তাই ধর্ম। 'ধৃ-ধাতুর' সঙ্গে 'মন' প্রত্যয় যোগ করে সংস্কৃতে ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি। যা ধারণ করে তাই ধর্ম—ধর্ম শব্দটির ধাতুগত অর্থ তাই। অন্তর এবং বাহির মিলে মানুষের জীবনের যে পূর্ণ সামঞ্জস্য তার মধ্যে যা মানুষের জীবনকে ধরে রাখে, সামাজিক জীবনের বৃহত্তর ঐক্যের মধ্যে যা মানুষের জীবনকে ধরে রাখে তাকেই ধর্ম বলা যেতে পারে।

ধর্মের ধাতুগত অর্থ

নানাভাবে ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। টাইলর (*Tylor*) ধর্মের খুব ছোট সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে যে, 'ধর্ম হল আত্মিক জীবে বিশ্বাস' ('the belief in spiritual beings')। কিন্তু এ সংজ্ঞা সন্তোষজনক নয়; কেননা, এই সংজ্ঞায় আত্মিক জী'বব স্বরূপ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা হয় নি। ম্যাক্সমুলার (*Max Muller*)-এর সংজ্ঞা, 'ধর্ম হল অসীমের প্রত্যক্ষণ বা উপলব্ধি'। এ সংজ্ঞাটিও খুবই অস্পষ্ট। ক্রিস্টোফার ডসন (*Christopher Dawson*)-এর মতে 'যখন এবং যেখানে বাহ্যশক্তির উপর মানুষের নির্ভরতাবোধ জেগেছে এবং মানুষ সেই শক্তিকে নিজের থেকে বড় ও রহস্যময় বলে মনে করেছে সেখানেই ধর্মের অস্তিত্ব সূচিত হয়েছে এবং এই শক্তির সামনে উপস্থিত থেকে মানুষের মনে যে ভীতি ও আত্মঅবমাননার ভাব জাগ্রত হয়েছে তা অবশ্যই ধর্মীয় অনুভূতি যা উপাসনা ও প্রার্থনার মূলে বর্তমান।' ধর্মের এই বর্ণনাও সন্তোষজনক নয়। কারণ এই বর্ণনা খুবই ব্যাপক। এই বর্ণনা অনুযায়ী ইন্দ্রজাল ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে এবং সর্বভূতে চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হবে।

ধর্মের বিভিন্ন সংজ্ঞা

সম্পর্কে বুদ্ধি, অনুভূতি এবং ইচ্ছা মনের এই তিনটি মানসিক প্রক্রিয়ার দিক থেকেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন, হার্বার্ট স্পেন্সার (*Herbert Spencer*) ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—'ধর্ম হল একটা আনুমানিক ধারণা যা এ বিশ্বজগতকে বুদ্ধিগম্য করে তোলে।' এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ধর্মের ক্রিয়া হল বুদ্ধির ক্রিয়া যা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়। ম্যাকটাগার্ট (*McTaggart*) অনুভূতির দিক থেকে ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—'ধর্ম হল আমাদের ও বহির্বিশ্বের মধ্যে এক সামঞ্জস্য আছে এই বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল একটি আবেগ।"[1] এই সংজ্ঞা ধর্মের মধ্যে অনুভূতি বা আবেগের দিকটিকে প্রকাশ করে কিন্তু ধর্মের মধ্যে যে ক্রিয়ামূলক দিকটি আছে তাকে প্রকাশ করে না। সেহেতু সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক নয়। ফ্রেজার (*Sir James Frazer*) ধর্মের মধ্যে যে ক্রিয়ামূলক দিকটি বর্তমান তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তাঁর মতে "ধর্ম হল মানুষের থেকে উচ্চতর যে সকল শক্তি, প্রকৃতি এবং মানবজীবনের গতিপথ পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত করে তাদের তুষ্টতা বা প্রসন্নসাধন।"[2] যদিও এই সংজ্ঞার মধ্যে ধর্মের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় দিকই বর্তমান তবু এমন কথা বলা চলে না যে, কোন শক্তিকে তুষ্ট বা প্রসন্ন করাই ধর্মের প্রকৃত দিক।

আসলে যে ঈশ্বরের উপর মানুষের নির্ভরতাবোধ জাগে সেই ঈশ্বরের প্রতি সক্রিয় বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণই ধর্ম। ধর্মের দুটি দিক আছে। একটি তার অন্তরঙ্গ দিক, অপরটি তার বহিরঙ্গ দিক। ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক হল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনে যে ভাব-ধারণা, চিন্তা এবং অনুভূতির আবির্ভাব ঘটে সেগুলি এবং এর বহিরঙ্গ দিক হল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব যার মাধ্যমে ঐ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এই সব আচার-অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ক্রলে (*Crawley*)-এর মতে পবিত্র অনুষ্ঠানই

1. "An emotion resting on a conviction of a harmony between ourselves and the universe at large." —*McTaggart.*

2. "Propitiation or conciliation of powers superior to man which are believed to direct and control the course of nature and of human life."

—*Sir James Fraser.*

হল ধর্মের আসল বৈশিষ্ট্য। এ সংজ্ঞা ধর্ম থেকে ঈশ্বরকে নির্বাসিত করেছে এবং ধর্মের বহিরঙ্গ দিকের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণা এমনভাবে যুক্ত যে ঈশ্বরের কল্পনা ছাড়া ধর্মের কোন ধারণা করা যায় না। অবশ্য ঈশ্বর ছাড়াও ধর্মের কথা বলা চলে কিনা, এমন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। যেমন, বলা হয় বৌদ্ধধর্মে কোন ঈশ্বরের কথা নেই এবং কোঁতে (*Comte*) মানবত্বকে ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন। তবু এ কথা বলা যায়, যে-ধর্মে ঈশ্বরের বা পরমাত্মার কোন স্থান নেই, সে-ধর্ম হয় ঈশ্বরোপম কাউকে বিশ্বাস করে, না হয় তা কতকগুলি মূল্যহীন আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। সুতরাং যে সংজ্ঞাতে ঈশ্বরের কথা থাকবে না তাকে ধর্মের সন্তোষজনক সংজ্ঞা বলা চলে না।

ধর্মের পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলি ধর্মের সমস্ত দিকগুলিকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে নি। ধর্ম জটিল বিষয়, কাজেই যে-কোন একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে এর সকল দিকগুলিকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ধর্মের সংজ্ঞা দিতে আমাদের মনে রাখতে হবে ধর্ম হল মানুষের চিন্তা এবং আচরণের একটা স্বাভাবিক. বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং সর্বব্যাপক রূপ। ধর্মের মধ্যে বিশ্বাস এবং ক্রিয়া উভয় উপাদানই বর্তমান। তাছাড়া ধর্মের মধ্যে পরম কল্যাণ বা পরমার্থের (Values) দিকটিও উল্লেখযোগ্য, যা মানুষ কামনা করে কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তা লাভ করা সম্ভব নয় জেনে কোন উচ্চতর শক্তির সহায়তায় তা লাভ করতে চায়। ধর্ম কেবল পূজা বা আচার-অনুষ্ঠান নয়।

পূর্বোক্ত বিভিন্ন সংজ্ঞা ধর্মের যে অর্থই সূচনা করুক না কেন সমাজ-দার্শনিকের কাছে ধর্মের যে দিকটি মূল্যবান তা হল ম্যাকেঞ্জির (*Mackenzie*) ভাষায়—"এক সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক মূল্যবান সত্তার প্রতি অব্যাহত ভক্তিময় অনুরাগ।" (A certain absolute devotion to what is recognised as bighest and most valuable.)। প্রকৃত ধর্ম হল গঠনমূলক এবং সৃষ্টিমূলক। খ্রীষ্টধর্মও সামাজিক ঐক্যের আদর্শের প্রতি অনুরাগ এবং এই আদর্শকে রক্ষা করার ও উন্নত করার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ধর্মের মধ্যে যে মানবতার দিকটি বর্তমান, যে দিকটি

বৌদ্ধধর্ম, কোঁতের (*Comte*) মানবতাবাদ বা খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে বর্তমান, সেটি ধর্মের এই সামাজিক দিকটিকেই বড় করে দেখেছে। এই ধর্মকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হলে এর সঙ্গে আর যা কিছুই যুক্ত করা হোক না কেন, সমাজদার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা ধর্মের মানবতার দিকটিকেই বড় করে দেখব, যেহেতু এটি সামাজিক ঐক্যেরই যোগসূত্র। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "ধর্মকে মানুষের জীবনকে পূর্ণ করে তোলার জন্য উৎসর্গমূলক মনোভাব বলে গণ্য করলেই যথেষ্ট হবে।"[1] তাছাড়া ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলে বোঝা যাবে যে, ধর্ম বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, উপদেশ বা আদেশবাণী নয়, অলৌকিকতাও নয়। ধর্ম হল মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যগুলির (Values) স্বীকৃতি—অর্থাৎ সত্য, শিব ও সুন্দরের উপলব্ধি। সে কারণেই রাধাকৃষ্ণন (*S. Radhakrısnan*) বলেছেন, "সুন্দর, শিব ও সত্যের জন্য মনের যে অন্বেষণ তাই হল ঈশ্বরান্বেষণ।"[2] মায়েল এডওয়ার্ডস্ (*Mıall Edwards*)-ও ধর্মকে এই দৃষ্টিতেই দেখেছেন। তিনি বলেন, "ধর্ম সম্পর্কীয় জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সত্যতার প্রশ্ন প্রধানতঃ আমাদের পরমমূল্যের বাস্তবতার প্রশ্ন।"[3] সমাজদর্শনে আমরা ধর্মকে এই দৃষ্টিতেই দেখব—তাহল ধর্মের মূল্যবোধের দিকটি, মানবতার দিকটি এবং তার সামাজিক সংহতির দিকটি।

২। ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য (Chief Aspect of Religion):

আমরা ইতিপূর্বে মানুষের তিনটি দিকের কথা আলোচনা করেছি। যথা—(ক) বর্ধনশীল দিক, (খ) জৈবিক দিক এবং (গ) মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দিক।

1. "It may be enough to regard religion as meaning the spirit of devotion to the perfection on human life."

—*Mackensie*: Outlines of Social Philosophy, Page 210.

2. "The search of the mind for beauty, goodness and truth is the search for God."

—*S. Radhakrisnan*: Religion and Society, Page 47.

3. "......the question of the truth of the religious world view is largely the question of the objectivity of our highest values."

—*Miall Edwards*: The Philosophy of Religion; Page 9 55.

মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটে ওঠে তার বিচারবুদ্ধির মধ্যে যার দ্বারা সে তার আবেগ-অনুভূতিকে বা নিম্নস্তরের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষ হিসেবে মানুষের যে বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ মানুষের যে বিচারবুদ্ধির দিক, সেই দিকটিই জীবনের মূল্যবোধের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দিক। বিচারবুদ্ধির অধিকারী বলেই মানুষ কামনা করে সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শকে। ধর্মের আসল কাজ হল এই সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রকাশকে নিয়ে। সমাজ-জীবনে সামাজিক কাজের মধ্যে এ সকল মূল্যের অনুসন্ধান আমরা করি, যদিও অপর মূল্যগুলিও উপেক্ষণীয় নয়।

সামাজিক কাজের ক্ষেত্রে এসে আমরা দেখি নীতি এবং ধর্মের সমন্বয়। ধর্মের কাজ সত্য ও সুন্দরকে নিয়ে। নৈতিকতাকে একটু উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে বলা যায় তার কাজও সত্য ও সুন্দরকে নিয়ে। সামাজিক কাজের মধ্যে আমরা এই একই সত্য ও সুন্দরকে পেতে চাই। কাজেই সত্য ও সুন্দরের অনুসরণ কেবল নৈতিকতা নয়, মানুষের ধর্মবোধেরও পরিচয়। আমরা ধর্মকে অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখি বলেই ধর্মের এই অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করতে পারি না। এই সংকীর্ণ দৃষ্টির জন্য আমরা ধর্মকে আচার-অনুষ্ঠান, নীতি, বিচারহীন মতবাদ এবং অলৌকিকতার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করি। ধর্ম কেবলমাত্র কোন পরম সত্তার বিশ্বাস নয়; এ হল সেই পরম সত্তায় বিশ্বাস, যিনি সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতীক।

নীতি ও ধর্মের সমন্বয় সমাজ-জীবনের আদর্শ

ধর্মবোধ মানুষের নীতিবোধকে উন্নত করে, আবার উন্নত নীতিবোধ ধর্মবোধের অগ্রগতিকে সহায়তা করে। সত্য ও সুন্দরের সাধনা শুধু নীতিবোধেরও পরিচয় নয়, ধর্মবোধেরও পরিচয়। কলা, বিজ্ঞান এবং নীতির ক্ষেত্রে যেমন আমরা সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শের সমন্বয় দেখতে পাই, ধর্মের ক্ষেত্রেও এ তিনটি বিষয়ের সমন্বয় দেখি। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*)-র মতে উচ্চতর দার্শনিক চিন্তা, কাব্য সৃষ্টি এবং নৈতিক প্রচেষ্টা সবই ধর্ম সম্পর্কীয় বিষয়।[1]

1. *Mackenzie* : Outlines of Social Philosophy ; Page 212.

১৩। ধর্মের সামাজিক ভূমিকা (The Social Role of Religion):

ধর্ম যদিও এক হিসেবে ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের ব্যাপার, তবু সমাজ-জীবনে ধর্মের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সমাজবিজ্ঞানী ব্লেকমার এবং গিলিন (*Blackmar and Gillin*)-এর মতানুসারে ধর্ম যতখানি না ব্যক্তিগত ব্যাপার তার তুলনায় অনেক বেশী সামাজিক। তাঁদের মতানুযায়ী সামাজিক উপাসনা ছাড়া, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উপাসনার মধ্য দিয়ে ধর্ম বেঁচে থাকতে পারে না। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, যখন কোন গোষ্ঠী সমবেতভাবে উপাসনা করা থেকে বিরত হয়, তখন তাঁদের ধর্মেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

সমাজ-জীবনে ধর্ম নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। বিভিন্ন পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উপর ধর্ম তার প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিক মেলামেশার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিরা পূজা, উপাসনা প্রভৃতির জন্য এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে সমবেত হয়। এই সামাজিক মেলামেশার ফলে সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও প্রীতির সঞ্চার হয়। কাজেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ধর্মীয় মনোভাব অনেক সময় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে ও জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পাদন করার জন্য প্রণোদিত করে। বস্তুতঃ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মবোধ জাগ্রত করা ছাড়াও নানা ধরনের কার্য সম্পাদন করে। অনেক ধর্ম-প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়, হাসপাতাল, অনাথ আশ্রম প্রভৃতির পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

ধর্ম ও সমাজ জীবন

সমাজ-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ধর্মের কার্যকারিতা যে এখনও অক্ষুণ্ণ আছে তা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান মানুষের কর্মপদ্ধতিকে এখনও প্রভাবিত করে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সাধারণতঃ ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। আদিম ধর্মীয় অনুষ্ঠান যদিও তার প্রকৃতির বিচারে ছিল কিছুটা স্থূল, তবু আদিম সমাজে ব্যক্তি-জীবনের প্রায় সর্ব

সমাজ-নিয়ন্ত্রণে ধর্মের কার্যকারিতা

ক্ষেত্রেই তার প্রকাশ ঘটেছিল। আদিম সমাজে সমাজ-জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই যেমন জন্ম, দীক্ষা, বিবাহ, রোগ, মৃত্যু, কৃষিকার্য প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে নানারকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রকাশ ঘটত। বর্তমান যুগেও জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতি নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের বিবিধ অনুষ্ঠান যেমন—শস্য বপন, শস্য কর্তন, শিকার, মাছ ধরা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখা যায়। এ ছাড়াও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন গৃহপ্রবেশ, নতুন কর্মভার গ্রহণ, কোন শুভ কার্য শুরু করার সময় প্রায় সব সমাজেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রচলিত। নতুন কর্মভার গ্রহণের সময় শপথ গ্রহণের রীতি বর্তমান সমাজে দেখা যায়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন থেকে নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে, যার ফলে সমাজ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সহজতর হয়। আদিম যুগে সামাজিক ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে ধর্মের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিস্টোফার ডসন (*Christopher Dawson*), টয়েনবি (*Arnold J. Toynbee*) এবং ডেমেণ্ট (*V.A. Dement*) প্রভৃতি লেখকবৃন্দ তাঁদের রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যে, ধর্মই হল সভ্যতার কেন্দ্রস্থিত উপাদান এবং ধর্মের বিপর্যয় ঘটলে সভ্যতারও বিপর্যয় ঘটবে।[1]

ধর্ম মানুষের চরিত্রকে প্রভাবিত করে সামাজিক জীবনকে গঠিত করে। ধর্ম ব্যক্তির মনে সামাজিক মূল্যের বোধ সঞ্চারিত করে, ধর্ম ব্যক্তিকে সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে, অপরের চিন্তা ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে এবং চিন্তায় ও কার্যে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হতে শিক্ষা দেয়।

1. রাধাকৃষ্ণন (*S. Radhakrishnan*) বলেন, "আধ্যাত্মিক মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সত্য ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ, সততা, ন্যায়পরতা ও অনুকম্পা, অত্যাচারিতদের প্রতি সহানুভূতি এবং মানুষের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস হল সেই সকল গুণ যেগুলি বর্তমান সভ্যতাকে রক্ষা করবে।" ("Regard for spiritual values, love of truth and beauty, righteousness, justice and mercy, sympathy with the oppressed and belief in the brotherhood of man, are qualities which will save modern civilisation.")

—*Radhakrishnan*: Religion and Society; Page 18.

ধর্ম কেবলমাত্র এক ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির প্রতি নয়, সমস্ত বিশ্বের মানুষের প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছার ভাব জাগরিত করে।

মার্কস (*Marx*) এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, ধর্ম হল জনগণের আফিং এবং তাঁদের মতে ধর্মকে হাতিয়ার করে সমাজের এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর উপর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যে ধর্মকে হাতিয়ার করে জনসাধারণের উপর অত্যাচার এবং দমননীতি চালান হয়েছে একথা অস্বীকার করা চলে না। তবে তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ধর্মের সাহায্যে সমাজ-জীবনে কোন উন্নতি সম্ভব হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নতি, সংস্কার, বিপ্লব ইত্যাদি মানুষের ধর্মবোধের জন্যই সম্ভব হয়েছে। অনেক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের মূলে ধর্ম বর্তমান। অনেক সময় অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিরোধ জানিয়েছে। তাছাড়া, ধর্মই বহু মঙ্গলজনক সামাজিক ক্রিয়াকর্মের উদ্দীপক।

যথার্থ ধর্মভাব যদি প্রচার করা যায় তাহলে ধর্মের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজ সহজতর হতে পারে। অনেক মনীষী বিশ্বঐক্য ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যথার্থ ধর্মভাব প্রচারের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। অনেক সময় আমরা ধারণা করি, ধর্ম মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে ভেদাভেদ আনয়ন করে, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত করে জনকল্যাণের আদর্শ লাভের পথে বাধার সঞ্চার করে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, যে-ধর্ম সমাজ-জীবনে এই ভূমিকা গ্রহণ করে তা যথার্থ ধর্ম নয়, তা ধর্মের বিকৃত রূপ। ধর্মান্ধতাই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, সামাজিক ঐক্যের বন্ধনকে শিথিল করে, যথার্থ ধর্মভাব তা করে না। যথার্থ ধর্মভাব মানুষকে সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগের জন্য প্রেরণা দেয়। স্বামী বিবেকানন্দের মতে জীব সেবাই ঈশ্বর সেবা। যথার্থ ধর্মভাব মানুষকে সংযত করে, সহনশীল করে, মানুষকে নৈতিক শক্তি যোগায় এবং অপরের সঙ্গে সম্প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সামাজিক ঐক্যের আদর্শ রক্ষায় প্রণোদিত করে।

বস্তুতঃ, যা কিছু শুভ, শ্রেয় ও সুন্দর তার প্রতি অনুরাগ আসলে ধর্ম-সম্পর্কীয় অনুরাগ। বর্তমানে যেসব সমাজ-কল্যাণমূলক ও জনকল্যাণমূলক কাজ আমরা দেখি, তার মূলেও ধর্মের মনোভাব অনেক সময় বর্তমান থাকে। অনেক সময় শিক্ষা এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা যাদের লক্ষ্য হল ধর্মমূলক। অনেক সময় কোন প্রতিষ্ঠান হয়ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, কিন্তু ধর্মীয় মনোভাব এ সব প্রতিষ্ঠানের মূলে কার্যকরী আছে।

৪। সংহতি শক্তিরূপে ধর্মের স্বরূপ (Religion as a cohesive Force):

ধর্ম কি সংহতি শক্তি, না বিচ্ছেদ সৃষ্টি করার শক্তি? ধর্ম কি সামাজিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করে, না সামাজিক ঐক্যের বিনাশ সাধন করে?

ধর্মের দুটি প্রধান ভূমিকা আছে—একটি হল ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের উন্মেষ যার জন্য ব্যক্তি সসীম হলেও এক অসীম সত্তার মাঝে নিজের পূর্ণতা ও অমরতাকে খুঁজে পেতে চায় এবং তার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। কিন্তু এ ছাড়াও আছে ধর্মের একটা সামাজিক দিক। এই দিকটিই মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে। যে বন্ধন মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে, সেই বন্ধনই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে, মানুষের ঐক্যকে শক্তিশালী করে তোলে। গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "ঈশ্বরের পিতৃত্বের অধীনে মানুষের ভ্রাতৃত্বের এই হল ভিত্তি।"[1]

ট্রটার (*W. Trotter*)-এর মতে[2] যূথ-মনোভাবের উপরই ধর্মের ভিত্তি। ধর্ম সমষ্টিগত অনুভূতির প্রকাশ। তাঁর মতে ব্যক্তি যদি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করে তাহলে তাদের মধ্যে এক অসম্পূর্ণতাবোধ জাগে। সে কারণেই তারা ধর্মীয় গোষ্ঠী গঠন করে।

এমিলি দুরখীম (*Emile Durkheim*)-এর মতেও[3] সমষ্টিগত চেতনা বা গোষ্ঠী চেতনার প্রকাশই হল ধর্ম। ধর্মের প্রধান কাজ সামাজিক ঐক্য বা

1. "This is the basis of the brotherhood of man under the fatherhood of God." —*Gisbert* : Fundamentals of Sociology ; Page 215.
2. *W. Trotter* : Instinct of War and Peace ; Page 113.
3. *Emile Durkheim* : The Elementary Forms of Religious Life : Page 167

সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় করে তোলা। তাছাড়াও ধর্ম বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের সংযোগসাধন করে তাদের পরস্পরের বন্ধু করে তোলে গীর্জা বা অন্যান্য উপাসনালয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি উপাসনা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত হয়। অনেক সময় এ সকল প্রতিষ্ঠান গরীব-দুঃখীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে বা অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কার্য করে থাকে বা শিক্ষা ও আমোদ-প্রমোদের জন্য নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সকল সময়ই এ সব কাজ যে পুরোপুরি ধর্মসম্পর্কীয় তা নয়। তবে ধর্মের আদর্শই প্রত্যক্ষভাবে সকল কাজের প্রেরণা দান করে।

ধর্ম বন্ধনই সামাজিক ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তি

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও উৎসব সামাজিক জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এসব উৎসব ও অনুষ্ঠান যে সব সময় প্রত্যক্ষভাবে ধর্মমূলক তা নয়, তবে এসব অনুষ্ঠান ও উৎসবের অনেকগুলিরই মূলে ধর্মসম্পর্কীয় মনোভাব বিদ্যমান। ব্যক্তির জীবনে এসব ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে। অনেক ক্ষেত্রে বহু সামাজিক অনুষ্ঠান, যেমন—বীজবপন, শস্য সংগ্রহ, গৃহপ্রবেশ, শপথ গ্রহণ প্রভৃতি ধর্মাচরণরূপে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং সমাজ-জীবনে সংহতি শক্তিরূপে ধর্ম এখনও পর্যন্ত খুব প্রবল ও সজীব ধর্মই সমাজের স্থায়িত্বের অন্যতম কারণ। ধর্মীয় গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে গোষ্ঠী-চেতনা খুব প্রবলভাবেই আত্মপ্রকাশ করে যার জন্য এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে ভালবাসে না, এমন কি, মৃতের সঙ্গেও সম্পর্ক ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত নয়।

ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে একই অবস্থায় একই ধরনের অনুভূতি দেখা যায় এবং গোষ্ঠীর নেতাদের নির্দেশ বিনা বিচারে গ্রহণ করার প্রবণতা দৃষ্ট হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের মূলে যূথ-মনোবৃত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে ক্রিয়া করে। ম্যাক্‌ডুগ্যালের (*McDougall*) মতে ধর্মসম্পর্কীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বেশ উল্লেখযোগ্যভাবেই পরিলক্ষিত হয়।[1]

1. *McDougall : An Introduction to Social Philosophy* , *Page* 267.

অনেকের ধারণা ধর্ম ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সমাজ-জীবনকে উপেক্ষা করে ব্যক্তি জীবনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে। ব্যক্তিগত উন্নতির উপর অত্যধিক মনঃসযোগ করার ফলে সামাজিক চেতনা এবং কল্যাণের দিকটিকে অবহেলা করা হয়। তাছাড়া, ব্যক্তির আচার-অনুষ্ঠান পালনের উপর ধর্ম এতখানি গুরুত্ব আরোপ করে যে, ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের দিক হয়ে পড়ে গৌণ। ধর্মের মধ্যে সর্বব্যাপক আদর্শের কথা যাই থাক না কেন প্রতিটি ধর্মেরই একটি স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ রূপ আছে যার জন্য বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগসাধনের পথে অনেক সময় অন্তরায় সৃষ্টি করে। প্রোটেসটেন্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে যে বিরোধের কথা ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তা বিশেষতঃ ধর্মমূলক। ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মীয় যুদ্ধের ভিত্তি হল ধর্ম সম্পর্কীয় বিরোধ। প্রতিটি ধর্মই নিজ নিজ আচার-অনুষ্ঠানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ

কিন্তু, বিভিন্ন ধর্মের বাহ্যিক প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যত পার্থক্যই থাক না কেন, ধর্মের মূল তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করলেই বোঝা যাবে যে, সংযোগকারী বা সংহতি শক্তি হিসেবে ধর্ম মোটেই অনুপযোগী নয়। প্রতিটি ধর্মেরই মূল লক্ষ্য এক পরম সত্তার (Supreme Reality) উপলব্ধি, ধর্ম হল সসীম মনের অসীমকে জানার প্রচেষ্টা ও আগ্রহ।

মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে, এই পরম সত্তা সত্য, শিব ও সুন্দরের মূর্ত প্রতীক এবং সব মানুষই এক পরম সত্তার প্রকাশ তখনই মানুষের মধ্যে যথার্থ ধর্মবোধ জাগরিত হয়। প্রকৃত ধর্মবোধ জাগরিত হলে মানুষের সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি তিরোহিত হয়, মানুষ অপরকে ভালবাসতে শেখে; প্রেম, মৈত্রী ও ভালবাসার নিগূঢ় বন্ধনে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হয়। প্রকৃত ধর্ম মানুষকে মানুষের কাছে টেনে নিয়ে আসে, ধর্মান্ধতা বা বিকৃত ধর্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য সৃষ্টি করে। যথার্থ ধর্মবোধ মানুষকে অপরের ভাব, বিশ্বাস ও ধারণাকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়, মানুষকে ত্যাগী, ক্ষমাশীল, উদারমনা ও সংযমী করে তোলে।

ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষ যে সকল মনগড়া ধারণার সৃষ্টি করেছে, সেগুলিকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়ার কোন সংগত কারণ নেই। রাধাকৃষ্ণন (*Radhakrishnan*) বলেন ; "যখন আমরা সংস্কার বা সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করি তখন আমরা পৃথক হয়ে পড়ি। কিন্তু যখন আমরা ধর্ম-জীবনের প্রার্থনা এবং ধ্যানকে আশ্রয় করি তখনই আমরা একত্র হই।"[1] অর্থাৎ ধর্মের আচারগত দিকটির উপর গুরুত্ব না দিয়ে ধর্মের মূল ভাবকে উপলব্ধি করতে পারলেই মানুষ বুঝতে পারে যে, সব ধর্মই এক ; সব মানুষ এক পরম সত্তার প্রকাশ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হল আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। সব মানুষই এক বিশ্ব-সত্তার অংশ। একই ঐক্যের সূত্রে সমস্ত মানুষের মধ্যে এর নিগূঢ় বন্ধন বর্তমান। রাধাকৃষ্ণনের মতে এই মূলীভূত ঐক্যের স্বীকৃতিই মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের ভিত্তিতে কিছু পরিমাণ সহযোগিতাকে সম্ভব করে তুলবে।[2] বস্তুতঃ ধর্মই বিশ্বঐক্য ও বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে তুলতে পারে। সুতরাং সংহতি শক্তিরূপে ধর্মের উপযোগিতা কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়।

যথার্থ ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান পৃথক

৫। ধর্মের মার্কসীয় ব্যাখ্যা (The Marxist Interpretation of Religion) :

ধর্মের প্রতি মার্কসবাদীরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। তাঁরা ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দৈহিক, মানসিক, সামাজিক সব ঘটনাই জড়াত্মক উপাদান অর্থাৎ কিনা অর্থনৈতিক উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাঁদের মতে জড়েরই একমাত্র সত্তা আছে। কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব নেই।

1. "When we dispute over dogmas and definitions we are divided. But when we take to the religious life of prayer and contemplation, we are brought together."

—S. *Radhakrishnan* : Religion and Society ; Page 53.

2. "The recognition of this fundamental unity should make possible a certain measure of co-operation on a common basis for the good of mankind as a whole."

—S. *Radhakrishnan* : Religion and Society ; Page 54

স্বাভাবিক ভাবে মার্কসীয় দর্শন ধর্মীয় চেতনার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে পারে না। ধর্মীয় চেতনা, অলিক বা মিথ্যা, এর আসল কোন অস্তিত্ব নেই। ধর্মীয় চেতনা জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন সূচনা করে। কিন্তু মার্কসবাদীদের মতে জীবাত্মা বা পরমাত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আচারাদির মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ ঘটে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার হাস্যকর প্রচেষ্টা। মানুষ যতই প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করে ততই সে এই জাতীয় আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবহারিক উপযোগিতায় অবিশ্বাস করে।

মার্কসীয় মতবাদ অনুযায়ী মানুষই ধর্মকে সৃষ্টি করেছে, ধর্ম মানুষকে সৃষ্টি করেনি। ধর্মকে রাষ্ট্র বা সমাজই সৃষ্টি করেছে। ধর্ম হল এক বিপরীত জগৎ-চেতনা (a reversed world consciousness)। ধর্ম সঠিক জগতের ছবি মানুষের সামনে তুলে না ধরে জগতের একটা উলটো ছবি মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। ধর্মের যুক্তি, ধর্মের নৈতিক শাসন, এর সার্থকতা সবই এই বিপরীত জগৎ-চেতনা থেকে উদ্ভূত।

কার্ল মার্কস (*Karl Marx*) ধর্মের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে ধর্মীয় অনুভূতির কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই। ধর্ম মানুষের মনের অলীক কল্পনা মাত্র। ধর্ম মানুষের দাসত্ব-মনোভাবের পরিচায়ক এবং সমাজের অত্যাচারিত ও নিপীড়িত ব্যক্তির করুণ বিলাপই ধর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়।

কার্ল মার্কস (*Karl Marx*)-এর মতে ঈশ্বরের সম্বন্ধে ধারণা হল বিকৃত সভ্যতার মূল-নির্ভর (The idea of God is the key-stone of a perverted civilisation)। অ্যাঙ্গেলস্ (*Engels*) বলেন, 'ধর্মের প্রথম কথাই হল মিথ্যা' (The first word of religion is a lie)। লেনিন (*Lenin*)-এর মতে ধর্ম হল আধ্যাত্মিক নিপীড়নের একটা দিক (Religion is one of the aspects of spiritual oppression) এবং আধ্যাত্মিক নিপীড়ন বস্তুতঃ অর্থনৈতিক নিপীড়ন।

Marx-এর মতে ধর্ম জনগণের আফিং

ধর্মের প্রতি মার্কসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী একটিমাত্র বচনের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মার্কস (*Marx*) বলেন, 'ধর্ম হল জনগণের আফিং'

(Religion is the opium of the people)। মার্কস (*Marx*) এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দের মতে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির দ্বারা অগণিত শ্রমজীবীদের শোষণের উপরই আধুনিক সমাজের অস্তিত্ব। এই শোষণ নীতিকে অব্যাহত রেখে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পুঁজিপতিরা বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। ধর্ম হল একপ্রকার আধ্যাত্মিক মাদক যা অগণিত শ্রমজীবীকে সম্মোহিত করে রাখে। ধর্মের প্রভাবে তারা মানবতা বিসর্জন দিয়ে নিজেদের পঙ্গু ও নির্জীব করে তুলেছে; সুস্থ, সুন্দর জীবন-যাপনের ইচ্ছাও যেন তাদের বিনষ্ট হয়ে গেছে। ধর্মের নামেই পুঁজিপতিরা শোষণ ব্যবস্থাকে ন্যায়সংগত বলে প্রতিপাদন করে। অগণিত শ্রমজীবী অবিরাম পরিশ্রম করে, নিজেদের দারিদ্র্যের কবলে নিষ্পেষিত করে পুঁজিপতিদের স্বার্থপূরণ করে। তাদের বোঝান হয় যে, তারা পরিশ্রমের পুরস্কার লাভ করবে এ জগতে নয়, মৃত্যুর পরপারে যে স্বর্গরাজ্য বর্তমান সেখানে। ধর্ম এসব নিঃস্ব শ্রমজীবীদের ধৈর্য অবলম্বন করতে শিক্ষা দেয়, ভবিষ্যতে পুরস্কার প্রাপ্তির সান্ত্বনা শোনায়।

ঈশ্বরে বিশ্বাস শ্রমজীবীদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে জীবনের দুঃখ-কষ্ট তাদের প্রাপ্য। এর ফলে তাদের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তার ভাব জাগে এবং ঈশ্বরের কাছে তারা নিজেদের সমর্পণ করে দেয়। এই সমর্পণের ভাবের জন্য তারা তাদের দুর্ভাগ্যের প্রকৃত কারণ অবহিত হয়ে তাদের প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে না এবং জীবনের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য সচেষ্ট হয় না। ধর্ম মার্কসবাদীদের মতে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিনষ্ট করে। ধর্মীয় চেতনা বৈজ্ঞানিক চেতনার বিরুদ্ধ চেতনা।

মার্কসবাদীরা ধর্ম ও একেশ্বরবাদের উদ্ভব নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

মার্কস ও অ্যাঙ্গেলস (*Marx and Engels*) এর মতে ধর্মবিশ্বাস মানুষের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা আনে যে, প্রকৃতির অন্তরালে বা ঊর্ধ্বে এমন কেউ কেউ আছে যাদের প্রার্থনার দ্বারা সন্তুষ্ট করা চলে। ধর্মবিশ্বাস প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং বহু দেবদেবীর অস্তিত্ব কল্পনা করে। মানুষ যদিও সকল সময় পার্থিব শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তবু ধর্মের শিক্ষানুসারে এই সমস্ত পার্থিব শক্তিকে সে আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে কল্পনা করে।

এই লেখকদ্বয়ের মতে সমাজ-জীবনের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক শক্তি ছাড়াও কতকগুলি সামাজিক শক্তিও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রাকৃতিক শক্তির মতই মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে। ফলে প্রাকৃতিক শক্তির অন্তরালে মানুষ যেসব অলৌকিক শক্তি বা দেবতার কল্পনা করেছিল সেগুলি সামাজিক গুণ অর্জন করল এবং ধর্মের বিবর্তনের পরবর্তী স্তরে এ সব বিভিন্ন দেবতার প্রাকৃতিক এবং সামাজিক গুণগুলি একটি সর্বশক্তিমান দেবতায় আরোপিত হল। তাঁদের মতে এভাবে একেশ্বরবাদের উদ্ভব। মানুষ যেহেতু প্রাকৃতিক শক্তির হাতে ক্রীড়নক ছিল, সেহেতু নিজেদের অত্যন্ত অসহায় মনে করত। সেই কারণে প্রার্থনা, উপাসনা, পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে দেবতাকে তুষ্ট করতে চাইত। শীঘ্রই মানুষ উপলব্ধি করল যে তারা কেবল প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারাই নিপীড়িত নয়, যে ধনতান্ত্রিক শ্রেণী বস্তুতঃ সমাজের শাসনকর্তা তাদের দ্বারাও নিপীড়িত। তখন অত্যাচারের হাত থেকে নিজেদের পরিত্রাণের জন্য সাধারণ মানুষ ধর্মের মধ্যেই তাদের সান্ত্বনা খুঁজতে লাগল। অর্থনৈতিক অত্যাচার ও নিপীড়নে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কাছে ধর্মই সান্ত্বনা বহন করে নিয়ে এল। নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করলেই তারা স্বর্গের সুখ ও শান্তি ভোগ করবে এই বিশ্বাস তাদের জন্মাল। এই কারণেই মার্কস (*Marx*) বলেছেন যে, ধর্মই হল জনগণের আফিং।

মার্কস (*Marx*)-এর মতে ধর্ম সত্যকে বিকৃত করে। ধর্মপ্রচারকগণ দারিদ্র্যকে মহানরূপে অঙ্কিত করে মানুষের বিবেক, দয়া, ধৈর্য, ক্ষমা প্রভৃতি দুর্বল গুণগুলিকে বড় করে দেখায়। ধর্ম মানুষের মূল্যবোধ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে।

মার্কস্ (*Marx*) ও তাঁর সমর্থকদের মতে বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের যে অর্থনৈতিক ও উৎপাদনের ব্যবস্থার দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলি মানুষ নিজেই সৃষ্টি করেছে। শ্রেণীবিরোধ হল এই উৎপাদন ব্যবস্থার অবদান। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বর্তমান থাকবে ততদিন শ্রেণীবিরোধ বর্তমান থাকবে। যতদিন মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণী উৎপাদনের উপকরণগুলিকে করায়ত্ত করে, তার উপর মালিকানাকে প্রতিষ্ঠিত করে সর্বহারা শ্রমিকদের উপর শোষণ চালিয়ে যাবে ততদিন পর্যন্ত ধর্মের বিলোপসাধন সম্ভব নয়। কিন্তু যখন এই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটবে এবং উৎপাদন যন্ত্রের উপর সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ সমস্ত মানুষকে অত্যাচার ও শোষণ থেকে মুক্ত করে তুলবে—অ্যাঙ্গলস্ (*Engles*)-এর ভাষায় "কেবলমাত্র তখনই সর্বশেষ বহিরাগত শক্তি যা ধর্মের মধ্যে এখনও প্রতিফলিত হচ্ছে তা অদৃশ্য

ধর্ম হল শোষণের হাতিয়ার

হবে এবং তার সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাবে ধর্ম-সম্পর্কীয় চিন্তাধারা ; তার সোজা কারণ হল, তখন চিন্তা করার জন্য কিছুই বাকি থাকবে না।"[1] তখনই সমাজতন্ত্রবাদ শ্রমজীবীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের সন্ধান দিয়ে তাদের ধর্মের মোহ থেকে মুক্ত করবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের কোন স্থান নেই।

মার্কস (*Marx*) বলেন, "ধর্ম হল অত্যাচারিত জীবনের নিদর্শন, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়স্থল—এ যেন প্রাণহীন পরিবেশের প্রাণকেন্দ্র"।[2] মানুষের প্রকৃত সুখের জন্য তাদের অলীক সুখ অর্থাৎ ধর্মকে বিলুপ্ত করতে হবে। ধর্মের সমালোচনা আসলে মানুষের দুঃখের বিরুদ্ধে সমালোচনা। ধর্মের সমালোচনার এই প্রয়োজন যে, এতে মানুষের মোহমুক্তি ঘটে। মানুষকে চিন্তা করে, বিচার করে নিজের ভাগ্য নিজেকেই গঠন করতে হবে। কার্ল মার্কস (*Karl Marx*) এর কথায় "ধর্ম হল অলীক সূর্য যা মানুষের চারপাশে আবর্তিত হয়, যতদিন পর্যন্ত না মানুষ তার নিজের চারপাশে আবর্তিত হয়। মানুষ যদি নিজের চারপাশে আবর্তিত হয় তাহলে মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকে, কোন অলীক শক্তির কাছে মাথা নত করার প্রশ্ন ওঠে না।"[3] ইতিহাসের কাজ হল এ জগতের সত্যকে প্রকাশ করা। কার্ল মার্কস (*Karl Marx*) বলেন, "স্বর্গের সমালোচনা হয়ে পড়ে পৃথিবীর সমালোচনা, ধর্মের সমালোচনা হয়ে পড়ে অধিকারের সমালোচনা এবং ধর্মবিজ্ঞানের সমালোচনা হয়ে পড়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমালোচনা।"[4]

1. "Only then will the last alien force which is still reflected in religion vanish; and with it also will vanish the reflection itself, for the simple reason that there will be nothing left to reflect."
—*Engles* : Anti-Duhring (On Religion)

2. "Religion is the sign of the oppressed creature, the heart of a heartless world just as it is spirit of spiritless situation."
—*Karl Marx* : On Religion.

3. "Religion is only the illusory sun which revolves round man as long as he does not revolve round himself."—*Karl Marx*.

4. "Thus the criticism of heaven turns into the criticism of the earth, the criticism of religion into the criticism of right and the criticism of theology into the criticism of politics."
Contribution to the *Critique of Hegel's Philosophy of Right*.
—*Karl Marx and Engles* : On Religion ; Page 4.

৬। ধর্মের মার্কসীয় ব্যাখ্যার সমালোচনা (Criticism of the Marxian Interpretation of religion) :

(১) ধর্ম সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যা জড়বাদী দর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠিত। জড়বাদ জড়েরই একমাত্র সত্তা আছে মনে করে এবং সব কিছুকেই জড়ের প্রকাশ রূপে গণ্য করে। কিন্তু জড়বাদ প্রাণ ও মনের উৎপত্তির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। যেহেতু জড়বাদ ভ্রান্ত মতবাদ, সেহেতু জড়বাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের মার্কসীয় ব্যাখ্যাও ভ্রান্ত হতে বাধ্য।

(২) মার্কস এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দ ধর্মকে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও বিকৃত অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং সেজন্য ধর্ম তাঁদের কাছে অলৌকিকতা, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, অনুশাসনবাক্য এবং উপদেশবাণী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করলে ধর্মবিশ্বাসকে অলৌকিকতা, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি বা অনুশাসন বাক্যের সঙ্গে এক করা যায় না। ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মচেতনার মাধ্যমে মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা রূপ লাভ করে তাহল জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যগুলিকে (Highest Values) উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা; এই অর্থে ধর্ম সকলেরই কাম্য। রাধাকৃষ্ণন (*Radhakrishnan*) বলেন, "প্রতিটি সভ্যতা হল একটি ধর্মের প্রকাশ। কারণ ধর্ম হল পূর্ণ পরমার্থে বিশ্বাস এবং তাদের উপলব্ধি করার জন্য জীবনের একটি বিশেষ পন্থা।"[1]

মার্কস ধর্মকে এক বিশেষ বিকৃত অর্থে নিয়েছেন

(৩) মার্কস (*Marx*)-এর মতে ধর্ম জনগণের আফিং, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। প্রকৃত ধর্ম চেতনা মানুষের মধ্যে আত্মপ্রসাদের ভাব সৃষ্টি করে না বা তাকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে না। প্রকৃত ধর্ম-চেতনা মানুষের মধ্যে সাহস ও আশা সঞ্চারিত করে এবং জীবনের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য তাকে প্রণোদিত করে। নিষ্ক্রিয়তা সৃষ্টি করার বদলে তার মধ্যে সক্রিয়তা সৃষ্টি করে। প্রকৃত ধর্ম চেতনা যাদের মধ্যে প্রবল, তেমন ব্যক্তিরাই

1. "Every civilisation is the expression of a religion, for religion signifies faith in absolute values and a way of life to realise them."

—*S. Radhakrishnan* : Religion and Society. Page 21.

জনকল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করে। ধর্মবোধই মানুষকে অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রেরণা দেয়। মানুষকে লোভ এবং লালসা থেকে রক্ষা করে, নৈতিক শক্তির অধিকারী করে।*

(৪) মার্কস (*Marx*)-এর মতে ধর্মবোধের চেতনা হল বিপরীত জগৎ চেতনা (**reversed world consciousness**), অলীক জগতের চেতনা।

মানুষের আধ্যাত্মিক প্রেরণা অনস্বীকার্য

কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। ধর্মবোধ কোন অলীক চেতনাজাত বিষয় নয়, মানুষের গূঢ় প্রয়োজনবোধ থেকে ধর্ম উদ্ভূত। রাধাকৃষ্ণন (*S. Radhakrishnan*)-এর ভাষায় "আধ্যাত্মিকতার জগৎ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে, সকল সময় রয়েছে এবং সকল সময় থাকবে।"[1] মানুষের ধর্মবোধ মানুষের অন্তরের মধ্যেই নিহিত, কোন বাইরের কর্তৃপক্ষ মানুষের মনে এ চেতনার সৃষ্টি করে নি।

মার্কস (*Marx*)-এর মতে সমাজে শ্রেণীবিরোধ রয়েছে এবং ধনিক শ্রেণী শ্রমজীবী শ্রেণীকে শোষণের জন্যই ধর্মকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করে। মার্কসের মতে শোষিত শ্রেণী, যারা জাগতিক সুখ থেকে বঞ্চিত তারাই কেবলমাত্র জীবনের দুঃখ-কষ্টে সান্ত্বনা লাভ করার জন্য ধর্মের প্রতি ধাবিত হয়। তাঁদের মতে মানুষের অসন্তোষের মূলে রয়েছে দারিদ্র্য। কিন্তু মার্কস্‌বাদীদের এই অভিমত যথার্থ নয়। মানুষের সব কামনা-বাসনার মূলে, অপরিতৃপ্তির মূলে কেবলমাত্র জাগতিক অভাবই বর্তমান নেই। দৈনন্দিন

---

* রাধাকৃষ্ণন (*S. Radhakrishnan*) বলেন, "দুঃখ এবং অসন্তোষ একমাত্র দারিদ্র্য থেকেই উদ্ভূত হয় না। মানুষ হল অদ্ভুত জীব এবং অন্যান্য প্রাণীর থেকে সে মূলতঃ পৃথক। তার আছে দূর দিগবলয়, অজেয় আশা, সৃষ্টিমূলক শক্তি, আধ্যাত্মিক ক্ষমতা। তাঁর মতে, এগুলি যদি অ-বিকশিত এবং অ-পরিতৃপ্ত থাকে, তাহলে মানুষ জীবনে পার্থিব সুখ এবং ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও মনে করতে পারে যে তার জীবন অর্থহীন। (**"Unhappiness and discontent spring not only from poverty. Man is a strange creature fundamentally different from the other animals. He has far horizons invincible hopes, creative energies, spiritual powers."**)

—*S. Radhakrishnan* : **Religion and Society**; **Page 13.**

1. **"The kingdom of spirit is, always has been and always will be, within each of us"**

—*S. Radhakrishnan* : **Religion and Society**; **Page 40.**

জীবনের প্রয়োজন মিটলেই মানুষ সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হয় না। তাছাড়া, কেবলমাত্র শোষিত শ্রেণীর মধ্যেই যে ধর্মীয় চেতনা বর্তমান, তা নয়। ধর্ম হল মানুষের চিন্তা ও আচরণের এক সর্বব্যাপক রূপ। ধর্ম কোন পার্থিব তত্ত্ব নয়, এ হল অনুশীলন, নিয়মনিষ্ঠা যা কিছু সুন্দর এবং সত্য তার প্রতি অনুরাগ। ধর্ম হল এমন এক পরমসত্তার জন্য আকাঙ্ক্ষা, যে পরমসত্তা কেবল মাত্র অসীম ও অনন্ত নয়; এ হল সত্য, শিব ও সুন্দরের মূর্তরূপ। ধর্মবোধ হল মানুষের বৃহত্তর বা পরমসত্তার উপলব্ধি, জীবনের মূল্যবোধের উন্মেষ। ধর্মের মধ্যেই ব্যক্তি তার প্রকৃত মূল্য এবং মর্যাদাকে আবিষ্কার করে এবং এক বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন হয়। এই বোধের জন্য মানুষ কেবলমাত্র জাগতিক সুখে তৃপ্ত হতে পারে না। বস্তুতঃ, ইতিহাসে এরূপ যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে যেখানে বহু পার্থিব সুখের অধিকারী হয়েও মানুষ পরমার্থ লাভের জন্য সে সকল ত্যাগ করেছে।

(৫) মার্কসবাদীরা ধর্মের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যথার্থ নয়, আদিম ধর্মীয় ধারণা ও অনুষ্ঠান ছাড়াও মানুষের প্রকৃতির অন্যান্য উপাদান—যেমন, বিস্ময়, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়, রহস্যের অনুভূতি, অসীমের অনুভূতি, যা বহু ধর্মীয় ধারণা ও বিশ্বাসের মূলে বর্তমান, যেগুলিকে মার্কসবাদীরা উপেক্ষা করেছেন।

(৬) মার্কসবাদীদের বিশ্বাস যে সমভোগবাদী সমাজে (Communistic Society) ধর্মের কোন স্থান থাকবে না। কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়। ধর্মীয় চেতনা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত, প্রকৃত ধর্মের বিলোপ সাধিত হতে পারে না। সমভোগবাদী সমাজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উপাসনা পদ্ধতির বিলোপসাধন করতে পারে, কিন্তু যে ধর্মীয় চেতনার স্থান মানুষের মনে তার বিলোপসাধন করতে পারে না।

(৭) মার্কস (*Marx*) মনে করেন, সমাজের পরিবর্তনেই মানুষের পরিবর্তন, কিন্তু এর বিপরীত ধারণাই সত্য। মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন না হলে মানুষের জীবন ও সমাজ-জীবনের পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। কিন্তু এ

পরিবর্তন নিজ নিজেই আসে না। রাধাকৃষ্ণন (*Radhakrishnan*)-এর কথায়, "এ হল পরমসত্তার আত্মসমর্পণ। এ হল ধর্মাচারণ।"[1]

৭। ধর্ম ও শিক্ষা (Religion and Education) :

ধর্মশিক্ষাকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করা হবে কিনা, এ সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। কারও কারও অভিমত অনুসারে জনকল্যাণের আদর্শের সঙ্গে ধর্মের মূলতত্ত্বের নিবিড় সম্পর্ক আছে, সে কারণে ধর্মশিক্ষাকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করা প্রয়োজন। আবার কারও কারও অভিমতানুযায়ী যেহেতু বিভিন্ন ধর্মমতের অস্তিত্ব রয়েছে এবং এদের মধ্যে সময়ে সময়ে পারস্পরিক বিরোধ লক্ষ্য করা যায়, সেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। যদি কোন অপরিণতবয়স্ক শিক্ষার্থীর মনে কোন বিশেষ ধর্মভাব জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অন্য ধর্মের প্রতি বিরূপ ভাব তার মনে জাগতে পারে। ফলে মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা যে ধর্মের লক্ষ্য, ধর্মের সেই লক্ষ্যই ব্যাহত হতে পারে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার যে লক্ষ্য তাও কার্যকরী না হতে পারে। প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সুপ্ত গুণ ও শক্তিকে বিকশিত করে, তার ব্যক্তিত্বের সুষম সংগঠন, বাইরে থেকে কোন বিশেষ ভাব, ধারণা তার মনের মধ্যে জোর করে অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়া নয়। তার ফলে শিক্ষার্থীর মৌলিক চিন্তাশক্তি ও সৃজনীশক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, স্বাধীনভাবে কোন কিছু বিচার বিশ্লেষণ করে তার তাৎপর্য অনুধাবন করার শক্তি সে হারিয়ে ফেলে। তবে একথা ঠিক যে, শিক্ষার্থী যে পরিবেশে বেড়ে উঠতে থাকে, সেই পরিবেশের ধর্মভাব তার উপর কিছু পরিমাণে এসে পড়ে, যার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা তার পক্ষে খুবই কঠিন হয়। মাতাপিতা ও অভিভাবকের ধর্মভাব বা ব্যক্তি যদি কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তার প্রভাব তার মনের উপর স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল (*Bertrand Russell*)-এর মতে ধর্মশিক্ষা

ধর্মশিক্ষায় অসুবিধা

1. "It is a submission of the self to reality. It is the practice of religion."
—*S. Radhakrishnan*: Religion and Society : Page 99.

যুবকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারে না এবং তাকে আত্মনির্ভর হতে শিক্ষা দেয় না। প্রশ্ন হল, এই সব অনিবার্য প্রভাব ছাড়াও শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষভাবে কোন ধর্মশিক্ষা দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত ?

ধর্মের মূলতত্ত্ব শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে হবে

ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কিছু শিক্ষা দেওয়া যে প্রয়োজন তা অনস্বীকার্য। ইতিহাসের অনেক ঘটনার তাৎপর্যই শিক্ষার্থীদের কাছে দুর্বোধ্য থেকে যাবে, যদি বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কীয় ধারণার মধ্যে বিরোধ কোথায় শিক্ষার্থীর তা জানা না থাকে। যে ধর্মভাব বহু সাহিত্যিককে সাহিত্য রচনায় প্রেরণা দান করেছে সে সম্পর্কে কিছু জ্ঞান না থাকলে বহু সাহিত্যিকের খ্যাতনামা রচনাগুলির অর্থ অস্পষ্ট থেকে যাবে। তবে শিক্ষার্থীর উচিত হবে বিভিন্ন ধর্মমতগুলিকে অনুধাবন করা, কোন বিশেষ ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়া নয়। উদার মনোভাব নিয়ে বিভিন্ন ধর্মমতগুলিকে জানার চেষ্টা করলে শিক্ষার্থীর কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই, বরং শিক্ষার্থী লাভবান হয়। বিভিন্ন ধর্মমতগুলির প্রতি তার শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার ভাব জাগে, তার মন সংস্কার ও বিদ্বেষমুক্ত হয়। এরূপ মনোভাব সৃষ্টি হলে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের পথ সুগম হয়, মানুষে মানুষে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এর থেকেও বেশী প্রয়োজন ধর্মের মূলতত্ত্ব বা ধর্মীয় মনোভাবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া। শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে হবে যে, যথার্থ ধর্ম হল সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ধর্মের মুখ্য বিষয় নয়, গৌণ বিষয়।

শিক্ষার্থীর মনে অনুরাগ সৃষ্টির বিভিন্ন উপায়

শিক্ষার্থীর মনে এই অনুরাগ বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে। ম্যাকেঞ্জির (*Mackenzie*) মতানুসারে, বিজ্ঞানের চর্চা মানুষের মনে সত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে, শিল্পচর্চার মাধ্যমে সুন্দরের প্রতি অনুরাগ জন্মায় এবং ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে কল্যাণের প্রতি অনুরাগ এবং অকল্যাণের প্রতি বীতরাগ জন্মায়। অবশ্য ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে কল্যাণের স্থান এত বেশী যে, এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কিছু শিক্ষা দিতে পারলেই ভাল। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন বিশেষ ধর্মমতের উপর ভিত্তি করে এই শিক্ষা

যেন দেওয়া না হয় বা শিক্ষার্থীর মনে এ ধারণা যেন না জন্মায় যে, কোন বিশেষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই মানুষের কল্যাণ লাভ হয়। এমন ভাবে তাকে শিক্ষা দিতে হবে যাতে জীবনের যে-কোন অবস্থায় সে মিথ্যা অপেক্ষা সত্যকে, কুৎসিতের তুলনায় সৌন্দর্যকে এবং অকল্যাণের তুলনায় কল্যাণকে শ্রেয় মনে করে। পরবর্তী জীবনে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে যে ধর্মমতই গ্রহণ করুক না কেন, বস্তুতঃ ধর্মের এই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বা মূলতত্ত্বের সঙ্গেই শিক্ষার্থীর পরিচয় করিয়ে দেওয়াই প্রকৃত ধর্মশিক্ষার লক্ষ্য।

৮। ধর্মের ক্ষেত্রে সহনশীলতা (Religious Toleration):

ধর্মের প্রকৃত অর্থ বা তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি—ইতিপূর্বে আমরা ব্যাখ্যা করেছি; তবু আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য। শুধু সংগঠনে নয়, বিভিন্ন ধর্মের আচার অনুষ্ঠান বা প্রক্রিয়ার মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। অর্থাৎ এ পার্থক্য শুধু মতের পার্থক্য নয়, অনুশীলনের পার্থক্যও বটে। বিভিন্ন ধর্মের এই অনৈক্য অনেক সময় সংঘর্ষ ঘটিয়ে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যদিও কোন বাস্তব সংঘর্ষ না ঘটে, তবু পারস্পরিক তিক্ততা ও শত্রুতার মনোভাব সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ, ধর্মকে কেন্দ্র করে বহু গৃহযুদ্ধ বা অন্তর্বিপ্লব ঘটেছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কোন কোন সময় এই তিক্ততা প্রসারিত হয়েছে। সুতরাং যে সমাজ জনকল্যাণকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে তার পক্ষে এই ধর্মসম্পর্কীয় অনৈক্য বা পার্থক্যের প্রতি উদাসীন হওয়া সম্ভব নয়। বস্তুতঃ, যেসব ধর্মসম্পর্কীয় আচার-অনুষ্ঠান অপরের অধিকারের পথে কোন বাধার সৃষ্টি করে না, সেগুলির প্রতি উদাসীন হওয়া সম্ভব। তাছাড়া, বিভিন্ন ধর্মের নীতির মধ্যে যে তত্ত্বগত পার্থক্য আছে তাও রাষ্ট্রের দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিছু নয়। প্রকৃত অসুবিধা দেখা দেয় তখন যখন কোন কোন ধর্মের অধিকার ও কর্তব্যের সঙ্গে অপরের কর্তব্য ও অধিকার এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রতিটি ধর্মেরই লক্ষ্য হওয়া

ধর্মের পার্থক্য অনেক সময় সংঘর্ষ সৃষ্টি করে

উচিত অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল হওয়া। অসহনশীলতা (intolerance) এবং অবাধ্যতা (insubordination) যদি ধর্মের ক্ষেত্রে দেখা দেয় তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষে হস্তক্ষেপ না করে কোন উপায় থাকে না।

প্রথমত: কোন ধর্ম যদি বলপূর্বক নিজের বিশ্বাস অপরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করতে চায়, তাহলে বুঝতে হবে সেই ধর্মের মধ্যে সহনশীলতার অভাব আছে এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একান্তভাবে প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত: অবাধ্যতাকে স্বীকার করে নেওয়া কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। বস্তুতঃ, রাষ্ট্রের লক্ষ্য জনকল্যাণের আদর্শকে কার্যকরী করে তোলা। ধর্মের ক্ষেত্রে অসহনশীলতা এবং অবাধ্যতা যদি এই জনকল্যাণের আদর্শকে ব্যাহত করে তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষে জনকল্যাণের স্বার্থে তাকে কঠোরভাবে দমন করাই শ্রেয়।

ধর্মের বিষয়ে কখন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্‌ভাব বজায় রাখার জন্য ধর্মের ক্ষেত্রে সহনশীলতা একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ, ধর্মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই সহনশীলতার ইঙ্গিত দেয়। যে-কোন প্রকৃত ধর্ম অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল হতে শিক্ষা দেয়। বলপূর্বক ধর্মান্তর প্রকৃত ধর্মের আদর্শ বিরোধী কাজ। যে-কোন প্রকৃত ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের মূল উপাদান নয় এবং কোন এক ধর্মকে অন্যধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা মূর্খতার পরিচায়ক। প্রকৃত ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তি সকল সময় উপলব্ধি করেন যে, সব ধর্মের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল জীবনের পরম মূল্যগুলিকে উপলব্ধি করা। এই বোধই বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির মনে ধর্মের প্রতি সহনশীলতার ভাব জাগিয়ে তুলতে পারে যার ফলে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের পথ সুগম হয়ে উঠতে পারে।

৯। আন্তর্জাতিক ধর্ম (International Religion):

এ জগতের সব প্রধান প্রধান ধর্মই মানুষের ধর্মবোধকে ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে তাকে উদার ও জনকল্যাণমূলক করে তোলার জন্য সচেষ্ট। বস্তুতঃ, ধর্মকে যদি নিছক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে অভিন্ন করে

না দেখা হয় এবং সত্যকে জানা, সুন্দরকে ভালবাসা এবং ন্যায়পরতা ও জনকল্যাণের আদর্শে কাজ করাকেই যদি যথার্থ ধর্মের লক্ষণ বলে মনে করা হয়, তাহলে কোন ধর্মই নিজেকে আচার-অনুষ্ঠান ও স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারে না।

বস্তুতঃ, মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্ব, ভালবাসাকে সুদৃঢ় ও পারস্পরিক সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করে তোলার জন্য বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে যে বৃহৎ মানবতার আদর্শ আছে তাকে সকলের সামনে তুলে ধরে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় করে তোলার জন্য এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সচেষ্ট হচ্ছে। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংঘ যদি জাতিধর্মনির্বিশেষে জনকল্যাণের আদর্শকেই সক্রিয়ভাবে প্রচার করতে চায় তাহলে এই সংঘের দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ ধর্মমূলক দৃষ্টিভঙ্গী বলেই বিবেচিত হবে। ধর্মকে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে ধর্ম হল সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ। প্রত্যেক ধর্মের যেমন একটা আচার-অনুষ্ঠানের দিক আছে, তেমনি একটি নৈতিক দিকও আছে। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে যদি এক আন্তর্জাতিক ধর্ম (international religion) বা বিশ্বধর্মের (word religion) উদ্ভব না হয়, তাহলে বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্যহেতু যে তিক্ততা, বিবাদ ও শত্রুতা মাঝে মাঝে দেখা যায় তার পরিসমাপ্তি কখনই ঘটবে না। প্রতিটি ধর্মই যদি তার নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যা গতানুগতিক তাকে বড় করে না দেখে যা সত্য, সুন্দর ও কল্যাণজনক তাকেই বড় করে দেখে এবং সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আদর্শের প্রতি মানুষের অনুরাগকে সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হয় তাহলেই মানুষ ধর্ম-সম্পর্কীয় ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে সর্ব মানবের ঐক্যের আদর্শকে উপলব্ধি করতে পারবে। এই আন্তর্জাতিক ধর্ম বা বিশ্বধর্মই মানবতার বৃহত্তর আদর্শকে কার্যকরী করে তুলে আন্তর্জাতিক কলহ ও শত্রুতার পরিসমাপ্তি ঘটাতে এবং বিশ্বের মানুষকে এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সংযুক্ত করে বিশ্বের শান্তি ও ঐক্যের নীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

বিশ্বধর্মের প্রয়োজনীয়তা

১১। প্রকৃতিবাদ বলতে কি বুঝি (What is Naturalism) :

ইংরেজি *Naturalism* শব্দটিকে নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান যুগে *Naturalism* বা প্রকৃতিবাদ অর্থে আমরা বুঝি সেই মতবাদ যে মতবাদ অতি-প্রাকৃতিকবাদের (Super-naturalism) বিরোধী। যা কিছু অলৌকিক (Supernatural) বা অতি-প্রাকৃতিক, যা কিছু আধ্যাত্মিক (Spiritual) বা অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব (Transcendent of experience) তার বিরোধিতা করে যেসব মতবাদ গড়ে উঠেছে সেগুলি সবই প্রকৃতিবাদের অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের মধ্যে যখনই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত হয়েছে তখনই এই প্রকৃতিবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে বিষয়বস্তু'ক ব্যাখ্যা করার আগ্রহ থেকেই এ মতবাদের উদ্ভব। প্রাচীন গ্রীসে বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে অলৌকিকভাবে বা আধ্যাত্মিকভাবে ব্যাখ্যা করা হত। কিন্তু সোফিস্ট (*Sophist*) দর্শন সম্প্রদায়, দার্শনিক লিউকিপাস (*Leucippus*), ডেমোক্রিটাস (*Democritus*), এপিকিউরাস (*Epicurus*), আধ্যাত্মিকতা বা অলৌকিকতাকে বর্জন করে প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন এবং চিন্তাজগতে প্রকৃতিবাদের সূচনা করেন। এঁরা ছিলেন জড়বাদী বা বস্তুবাদী (Materialists); ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং সকল রকম অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবিশ্বাসী। এঁদের মতে কেবলমাত্র গতি (Motion) ও পরমাণুর (Atoms) সাহায্যে এই জগতের সকল কিছুকেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মধ্যযুগে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের চাপে পড়ে এবং প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুতে মানুষের আগ্রহের অভাবের জন্য এই প্রকৃতিবাদ তেমন বিকাশলাভ করতে পারেনি।

প্রাচীনযুগের প্রকৃতিবাদ

আধুনিক যুগে প্রকৃতির প্রতি মানুষের নূতন করে আগ্রহ দেখা দিয়েছে। মানুষের মন বিচারহীন মানসিক প্রবণতা ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিবাদের নূতন করে আবির্ভাব ঘটেছে। ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকৃতিবাদ ছিল জড়বাদ এবং নাস্তিকতাবাদ। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতির

প্রতি তীব্র অনুরাগের জন্য সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) উদ্ভব হয়েছে, সর্বেশ্বরবাদের মূল বক্তব্য হল সবই ঈশ্বর, 'প্রকৃতি ও ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন।' ডারউইন (*Darwin*)-এর বিবর্তনবাদ প্রকৃতিবাদকে নূতন শক্তি ও প্রেরণা দেয়। মানুষ জগৎ এবং সব কিছুকেই প্রাকৃতিক নিয়মের সহায়তায় ব্যাখ্যা করার জন্য আগ্রহী হয়। অবশ্য প্রাচীন প্রকৃতিবাদ যেভাবে অতি-প্রাকৃতিক বাদের (Super-naturalism) বিরোধিতা করেছে, আধুনিক প্রকৃতিবাদ তা করে নি। প্রাচীন প্রকৃতিবাদ কোন রকম বিচারের আশ্রয় গ্রহণ না করেই অলৌকিকতা বা অতি-প্রাকৃতিকতাকে বাতিল করতে চেয়েছে এবং 'জড়'কেই একমাত্র সত্তা হিসেবে স্বীকার করেছে। আধুনিক প্রকৃতিবাদ 'অজ্ঞেয়তাবাদ' (Agnosticism)-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে অলৌকিকতাকে স্বীকারও করল না, অস্বীকারও করল না। আধুনিক প্রকৃতিবাদ যেন এ কথাই বলতে চায়, "অলৌকিক কিছু যদি থাকে, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গী সংগত বা বুদ্ধিগ্রাহ্য কিনা তা বিতর্কের বিষয়।

আধুনিক প্রকৃতিবাদের বৈশিষ্ট্য

প্রকৃতিবাদের লক্ষ্য হল, কোন রকম অলৌকিকতার বা অতি-প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর সাহায্য না নিয়ে সব কিছুকে সরল ও সহজভাবে অপরের বুদ্ধিগ্রাহ্য করে, জটিলকে সরল করে, কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে যে-কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করা। জড়বাদ এবং প্রকৃতিবাদ এক ও অভিন্ন নয়। জড়-বাদীদের মতে সব কিছুই জড়ের প্রকাশ, কিন্তু প্রকৃতিবাদীরা প্রাকৃতিক নিয়ম ও কার্যকারণসম্বন্ধ, শক্তি ও গতির সাহায্যে সকল কিছুকে ব্যাখ্যা করতে চান।

বিবর্তনবাদের নিয়মানুসারে সরল থেকেই জটিলের উদ্ভব। জগতের ক্রমবিকাশের ধারণাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এর প্রতিটি স্তর পূর্ববর্তী স্তর থেকেই উদ্ভূত। পূর্ববর্তী কারণের সাহায্যে পরবর্তী ঘটনার ব্যাখ্যাই বুদ্ধিসংগত ব্যাখ্যা। প্রকৃতিবাদ বৈজ্ঞানিক কারণকেই (Scientific Cause) মানে, অন্য কোন রকম অপ্রাকৃতিক কারণ সে স্বীকার করতে চায় না; অন্ত-কারণ (Final Cause) বলে কোন কিছু নেই। প্রকৃতিবাদের লক্ষ্য ঘটনার কারণকে জান-

প্রকৃতিবাদ জড়বস্তু ও কার্যকারণের সাহায্যে সব কিছু ব্যাখ্যা করে

স্তার উদ্দেশ্যকে নয়। সুতরাং প্রকৃতিবাদ জগৎকে একটি যান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেখে থাকে। প্রকৃতিবাদীর দৃষ্টিতে মন হল একটি উপবস্তু (Epiphenomenon) এবং ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নেই; ইচ্ছা পূর্ব থেকে নির্ধারিত। প্রকৃতিবাদীরা বাস্তববাদীদের (Positivist) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে বলতে চায় বাহ্যিক ঘটনাকেই আমরা জানি ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাহায্যেই তাদের জানা যায় এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বাইরে আমাদের জ্ঞান যেতে পারে না। প্রকৃতিবাদীরা পরিণামবাদ বা উদ্দেশ্যবাদকে (Teleology) স্বীকৃতি দেয় না, অর্থাৎ এ জগতের বিবর্তন যান্ত্রিক নিয়ম অনুসারেই সাধিত হচ্ছে, এর মূলে উদ্দেশ্য বা পরিণামের অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতিবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মার অমরত্ব এবং অলৌকিক বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

প্রকৃতিবাদ বাস্তববাদী

১১। প্রকৃতিবাদের বিভিন্ন রূপ (Naturalistic Theories):

আমরা ইতিপূর্বে প্রকৃতিবাদের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। প্রকৃতিবাদ সকল রকম অপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, মূল্য বা মানকে পরিহার করে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যেই জাগতিক ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করে। প্রকৃতিবাদের নানারকম রূপ আছে। আমরা মোটামুটি তাকে দুভাগে ভাগ করতে পারি; যথা—(ক) বিচারহীন প্রকৃতিবাদ বা জড়বাদ (Dogmatic Naturalism or Materialism) এবং (খ) অজ্ঞেয়তাবাদ (Agnostic Naturalism)। এছাড়াও সাম্প্রতিক কালে (গ) মনস্তত্ত্বমূলক প্রকৃতিবাদ (Psychological Naturalism) নামে আর এক নূতন মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে।

(ক) **বিচারহীন প্রকৃতিবাদ বা জড়বাদ (Dogmatic Naturalism or Materialism):** এ মতবাদ অনুসারে জড়বস্তুই এ বিশ্বের একমাত্র আদিম সত্তা (Ultimate Reality) যার থেকে সকল কিছুই উদ্ভূত হয়েছে। প্রাণ, মন সব কিছুই জড় থেকে উদ্ভূত। জড়বস্তু ও

গতি (Matter and motion) উভয়ে একত্র হয়ে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু উৎপন্ন করেছে। সৃষ্টির কাজ যান্ত্রিকভাবেই সাধিত হচ্ছে। সৃষ্টির মূলে কোন উদ্দেশ্য বা পরিণাম নেই। কোন আদর্শ এই সৃষ্টিকে পরিচালিত করছে না। যন্ত্রের যেমন কোন স্বাধীনতা নেই, তেমনি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাও অলীক বস্তু। ধরা-বাঁধা নির্দিষ্ট নিয়মে জগতের সব কিছু ঘটে চলেছে। জড়বাদীদের মতে প্রত্যক্ষণই একমাত্র প্রমাণ এবং যেহেতু প্রত্যক্ষণের (Perception) সাহায্যে একমাত্র জড়বস্তুকেই জানা যায় সেজন্য তারা কেবলমাত্র জড়বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করে। জড়েরই অস্তিত্ব আছে, সত্যতা আছে—আর সব কিছু অলীক।

এই মতবাদকে বিচারহীন প্রকৃতিবাদ নামে অভিহিত করার কারণ, এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ বিনা বিচারে জড়কেই পরম সত্তা রূপে গ্রহণ করেন এবং বিনা বিচারে আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করেন।

জড়বাদ সবরকম অলৌকিকতাকে অস্বীকার করে। জড়বাদীরা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎসরূপে গণ্য করে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তার কোন সত্তা নেই। জড়বাদীরা অতীন্দ্রিয় আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। ঈশ্বরের ধারণা কাল্পনিক ধারণা। ধর্মীয় চেতনা অলীক বা মিথ্যা। ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুরূপ কোন প্রকৃত বস্তুর অস্তিত্ব নেই। সত্য, শিব ও সুন্দর—এই মূল্যগুলির যথার্থ সত্তা নেই।

কোঁৎ (*Auguste Comte*)-এর মতে মানবতার ধর্মই হল একমাত্র ধর্ম। এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানবতাই একমাত্র উপাসনার বস্তু। সুতরাং মানবতাকে দেবতার মতো জ্ঞান করে পূজা করা উচিত।

সমালোচনা (Criticism) :

(১) জড়বাদীরা ঈশ্বর বা অন্যান্য অতি-প্রাকৃতিক বা অলৌকিক বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন, যেহেতু সেগুলি প্রত্যক্ষগোচর নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষই যে একমাত্র প্রমাণ, তারই বা প্রমাণ কোথায়? জড়বাদীরা নানাভাবে পরোক্ষকেও প্রমাণ বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

(২) জড়বাদীরা জড়কেই পরম সত্তা মনে করে এবং জড়ের সাহায্যেই প্রাণ ও মনের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করে। কিন্তু জড়ের সাহায্যে প্রাণ ও মনের উৎপত্তি সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, প্রাণ ও মনের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা জড়ের নেই। মন যদি জড়বাদীদের অভিমতানুসারে দেহের উপবস্তু হয় তাহলে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করতে হয়। ইচ্ছার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করলে মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে হয় যা মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বিষয়।

(৩) জড়ের সাহায্যে বিশ্বের ঐক্য ও সামঞ্জস্য সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করা চলে না।

(৪) বিচারহীন প্রকৃতিবাদ বা জড়বাদের বিরুদ্ধে নানারকম যুক্তি আনা হয়েছে। আধুনিক মনের ধর্মবিশ্বাসের পথে জড়বাদ কোন সত্যিকারের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদী বাক্‌নার (*Buchner*), কার্ল ভগ (*Karl Vogt*), হেকেল (*Heckel*) এবং লিওব (*Leob*)-এর মতবাদও আজ আর মনকে আকর্ষণ করে না। জড়বাদীরা বিশ্বের গুণগত বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাকে জড় ও গতির প্রকাশেতেই রূপান্তরিত করেছে। জড়বাদীদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, বিশ্বের এই জটিলতা, তার এই বৈচিত্র্য, তার অফুরন্ত সম্পদ সব কিছুকে কেবলমাত্র জড়ে রূপান্তরিত করে, তারা জটিল বিষয়বস্তুকে অতি সরল করে তুলেছেন বটে, কিন্তু তাতে বিশ্বের যে রূপ আমরা পাই তাহল খণ্ড ও বিকৃত। জড়বাদীরা মূল্য বা আদর্শকে কোন স্বীকৃতি দেয় না। কিন্তু সত্য, শিব ও সুন্দর—এই মূল্যগুলিকে যদি জীবন থেকে নির্বাসিত করা যায় তাহলে জীবনের কোন অর্থই থাকে না।

(খ) অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদ (Agnostic Naturalism) অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদীরা বিচারহীন প্রকৃতিবাদীদের মতন মতামত দেবার ব্যাপারে এতখানি অসংযত নয়। অজ্ঞেয়তাবাদীরা বলতে চান যে, পরমসত্তা অজ্ঞেয়, তাকে কিছুতেই জানা যায় না। জাগতিক বস্তু ও ঘটনাগুলিকে

যেভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় সেইটাই তাদের আসল স্বরূপ। এর অন্তরালে যদি কোন পরমসত্তা থাকে তাহলে তা মানুষের অজ্ঞেয়।

এ মতবাদ অনুযায়ী 'জড়' এবং 'আত্মা' এর কাউকে প্রত্যক্ষভাবে জানা সম্ভব নয়। উভয়ই আনুমানিক ধারণা মাত্র। পরমসত্তা যেহেতু অজ্ঞেয় এবং এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ প্রত্যক্ষগোচর, সেহেতু জাগতিক ঘটনার সাহায্যেই এ বিশ্বকে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত। অলৌকিক বা অতি-প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম এবং এর জ্ঞানও অর্থহীন। এ মতবাদের একজন সমর্থক হলেন হাক্সলে (*Huxley*)। তিনি চিন্তার রাজ্য থেকে সকল রকম অলৌকিকতাকে নির্বাসিত করার কথা বলেছেন। তাঁর মতে অলৌকিকতা হল একান্তই অর্থহীন এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ধারণা কেবলমাত্র দুর্বোধ্যতা ও হতবুদ্ধিতা সৃষ্টি করে।

সমালোচনা (Criticism):

(১) অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে জেম্‌স ওয়ার্ড (*James Ward*) বলেছেন, "এ মতবাদ হল জড়কে বাদ দিয়ে জড়বাদ; এ মতবাদে জড়বাদের অধিকাংশ সিদ্ধান্তই বর্তমান, কেবলমাত্র তত্ত্বমূলক দিকটি ছাড়া।"[1] কাজেই জড়বাদীদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলি অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য।

(২) এ মতানুসারে চিন্তার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ধারণার কোন মূল্য নেই। প্রকৃতিবাদ মনে করে এ বিশ্বজগতে শুধু জড়, গতি এবং যান্ত্রিক শক্তিই রয়েছে। যদি একথা বলা হয় যে, মানুষের চেতনার জগতে আধ্যাত্মিক ধারণাগুলি ক্রিয়াশীল, তাহলে তার উত্তরে এ মতবাদ বলবে যে মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের কোন পার্থক্য নেই। মানুষ হল চেতনাযুক্ত স্বয়ংক্রিয়যন্ত্র (conscious automation)। ধাবমান গাড়ীর সঙ্গে তার ছায়ার যে সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে চেতনার সম্বন্ধও

1. "Materialism without matter, materialism with most of its consequences but divested of its metaphysics."

—*J. Ward* : Naturalism and Agnosticism. 3rd Ed. (1906), Vol. II, Page 206.

সেরূপ। চেতনা হল একটা উপবস্তু (Epiphenomenon)। সে কারণে সার্বিক চেতনাযুক্ত যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করা হয় সে-ঈশ্বরও হচ্ছে একটা ছায়া মাত্র, যা এ বিশ্বজগতের গতিকে অনুগমন করছে।

(৩) অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদের যে কোন মূল্য নেই তা নয়। এ মতবাদ যান্ত্রিকতাবাদকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বিবর্তনবাদের প্রাকৃতিক নির্বাচনকে এর সংগঠনমূলক নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় এর যথেষ্ট মূল্য আছে। মায়েল এডওয়ার্ড[1] (*Miall Edwards*)-এর মতে প্রকৃতিবাদ নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে মূল্যবান। কিন্তু মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দর্শন হিসেবে একে গ্রহণ করা যেতে পারে না; যেহেতু জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে তাৎপর্য, মূল্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ—এগুলিকে বর্জন করা চলে না। মায়েল এডওয়ার্ড (*Miall Edwards*)-এর কথায়, "বর্ণনার ক্ষেত্রেই এর সফলতা, মূল্যাবধারণের ক্ষেত্রে এ একেবারেই ব্যর্থ।"[2]

দার্শনিক মত হিসেবে অজ্ঞেয়তাবাদ অচল

(৪) প্রকৃতিবাদ নিম্নস্তরের সহায়তায় উচ্চতরকে ব্যাখ্যা করে। যেমন, এতে সামাজিক এবং মনস্তত্ত্বমূলক বিষয়কে জীববিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়, আবার জীববিদ্যাকে ব্যাখ্যা করা হয় পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার সহায়তায় এবং এগুলিকে শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত করা হয় কতকগুলি সংখ্যামূলক সম্পর্কতে কিন্তু এতে আদর্শমূলক বিজ্ঞান, সৌন্দর্যবিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের কোন মূল্য স্বীকৃতিলাভ করে না এবং শেষ পর্যন্ত এতে 'জগতের মর্মার্থের বিপুল ঐশ্বর্য পরমাণুর নৃত্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়' ('The world's wealth of meaning is lost in the dance of atoms.')।

(৫) এ মতবাদ অনুযায়ী মন উপবস্তু (epiphenomenon) ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু মন যদি উপবস্তুই হয় তাহলে মনের প্রয়োজনীয়তা কি? তাছাড়া, প্রাকৃতিক নির্বাচন অনুযায়ী যা অপ্রয়োজনীয়, বিবর্তনের নিয়মানুসারে তা

1. *Miall Edwards*: The Philosophy of Religion; Page 224.

2. "Its success lies in the sphere of description, it fails absolutely in the realm of valuation." —*Ibid*: Page 225.

ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। দেহই যদি সব কাজ করতে সক্ষম তবে চেতনাযুক্ত মনের প্রয়োজন কি? বস্তুতঃ, দৈনন্দিন ঘটনাই এ মতবাদের অসারতা প্রমাণ করে। তাছাড়া, মানুষের আধ্যাত্মিক স্বভাবের যা বৈশিষ্ট্য—মানুষের স্বাধীনতা, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, কামনা, ইচ্ছা, আদর্শ—এ সকলই এই মতানুসারে হয়ে পড়ে অবাস্তব ও অপ্রাসঙ্গিক।

(৬) অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদ ধর্মচেতনাকে অলীক মনে করে। মানুষের ধর্মচেতনা পরমকল্যাণ বা পরমার্থের বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। আমরা আগেই দেখেছি ধর্মকে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে এ হল সত্য, শিব ও সুন্দরের আরাধনা। কিন্তু প্রকৃতিবাদ এই সত্য, শিব ও সুন্দরকে কোন স্বীকৃতিই দেয় না। এর যান্ত্রিক জগৎ, তার নৈর্ব্যক্তিকতা এবং নিয়ন্ত্রিতবাদ মানুষের এ সকল পরম মূল্যকে একান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করে। কিন্তু সত্য, শিব ও সুন্দর আকস্মিক উপবস্তু নয়, অণু-পরমাণুর যান্ত্রিক সংঘর্ষণের ফলে তাদের সৃষ্টি নয়। সত্য, শিব ও সুন্দর হল পরম সত্তার প্রকাশ। রাধাকৃষ্ণান (*Radhakrisnan*)-এর মতে লৌকিক জগৎ এবং অলৌকিক জগতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি বলেন, 'অলৌকিক হল লৌকিকই—তবে তার পার্থক্য গভীরতায় এবং অসীমতায়। প্রকৃতি থেকে এ আলাদা কিছু নয়।"[1]

প্রকৃতিবাদ ধর্ম চেতনাকে স্বীকৃতি দেয় না

(গ) মনস্তত্ত্বমূলক প্রকৃতিবাদ (Psychological Naturalism):

মনস্তত্ত্বমূলক প্রকৃতিবাদের সমর্থকবৃন্দ ও নব্য মনোবিজ্ঞানীর দল ধর্মবিশ্বাসের প্রকৃতি এবং উৎপত্তির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সাহায্যে ধর্ম-চেতনার অবাস্তবতা প্রমাণ করতে চান। তাঁদের মতে ধর্মবিশ্বাস নির্জ্ঞান (Unconscious) মনের সৃষ্টি—এসব ধর্মবিশ্বাসের উৎস হিসেবে কোন বস্তুগত সত্তা নেই। ধর্মেতে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, এ বিশ্বাস ভ্রান্ত, কেননা ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। মনঃসমীক্ষণবিদ্‌দের মতে মানুষের জীবনে তার জন্মগত প্রবৃত্তি ও কামনাই আসল গুরুত্ব এবং

1. *S. Radhakrisnan*: An Idealistic View of Life; Page 58.

বিচারবুদ্ধির কাজ এই প্রবৃত্তির ও কামনার কাজগুলিকে পরিপূর্ণ করা। কতকগুলি কাল্পনিক জীবকে কেন্দ্র করে যে ধর্মসম্পর্কীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি, সেগুলি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিশূন্য প্রকৃতির মনস্তত্ত্বমূলক ক্রিয়া। "ধর্ম হল কেবলমাত্র যৌন উল্লাসের অপপ্রকাশ" (A mere misrepresentation of sex ecstacy)। "ধর্মসম্পর্কীয় রহস্যময় অনুভূতি বিকৃত মনের অসুস্থ কামনার প্রক্ষেপণ" (The mystic experiences are the projections of the morbid cravings of the psychologically perverted)। এ মতবাদের সমর্থক হলেন—ভুণ্ডট্ (*Wundt*), উইলিয়ম জেম্‌স -*William James*), স্টেনলে (*Stanley*), হল্ (*Hall*), স্টারবাক্ (*Starbuck*), লিউবা (*Leuba*), কাইস্ প্রেট্ (*Cyes Pratt*), ফ্রয়েড, (*Freud*), ইয়ুঙ (*Jung*, ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানীগণ।

জেম্‌স (*William James*) বলতে চান যে, আমাদের ধর্মসম্পর্কীয় চেতনা আসলে অচেতন বা নির্জ্ঞান মনেরই ব্যাপার। ডুরখীম্ (*Emile Durkheim*)-এর মতে সমাজই ঈশ্বরের ধারণা মানুষের মনের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। লিউবা (*Leuba*) তাঁর, '*Psychological study of Religion*' নামক গ্রন্থে বলেন যে, ধর্মসম্পর্কীয় ব্যাপার হল নেহাত সামান্য ব্যাপার এবং অলীক বস্তু ছাড়া কিছুই নয়; মানুষের কথাই স্বর্গের আদেশবাণী বলে ভ্রম হয়।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড এবং ইয়ুঙ (*Freud and Jung*) এই মতকে আরও অনেক দূর টেনে নিয়ে গেছেন। ফ্রয়েড (*Freud*)-এর মতে মানুষের অচেতন মনের অনেক অভিজ্ঞতাই অবদমিত হয়ে থাকে এবং পরোক্ষ-ভাবে ছদ্মবেশে সেসব অভিজ্ঞতা চেতনার স্তরে প্রবেশ করে। অবচেতন মনের এসব অভিজ্ঞতা স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। স্বপ্ন হল আমাদের অপরিপূর্ণ ইচ্ছা যেগুলি আমরা চেতন মন থেকে বিতাড়িত করি, কিন্তু যেগুলি মানুষের মনের অবচেতনা স্তরে বিরাজ করে। এ সকল ইচ্ছার উৎস মানুষের যৌনাকাঙ্ক্ষা। সমস্ত ধর্মবিশ্বাসের উৎপত্তি হল যৌন ইচ্ছা। এ ইচ্ছাগুলি দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। শিশু

Freud-এর মতে ধর্মের স্বরূপ

হল জাতির যৌন-জীবনের প্রতিমূর্তি। এই শিশু শৈশবে মাতা ও পিতার উপর একান্তভাবেই নির্ভর। মাতাপিতার স্মৃতি, শৈশবের কোমল অনুভূতি, অস্তিত্বশীল বিশ্বপিতার ধারণা এনে দেয়। ঈশ্বরের কল্পনা হল জাতির অবদমিত ইচ্ছার ফলস্বরূপ। ঈশ্বর অবচেতন মনের সৃষ্টি, যা নিছক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।

সমালোচনা (Criticism):

(১) ধর্মসম্পর্কীয় ধারণাকে অবচেতন মনের কামনায় রূপান্তরিত করার অর্থ ধর্মসম্পর্কীয় ধারণাকে অলীক প্রমাণ করা নয়। অর্থাৎ বিশ্বাসের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তার সত্যতা বা মিথ্যাত্বকে প্রমাণ করে না, কারণ কোন বিষয়ের উৎপত্তি এবং সত্যতা—এ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(২) নব্য মনোবিজ্ঞানীদের ধর্মসম্পর্কীয় অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা ধর্মসম্পর্কীয় অভিজ্ঞতাকে অলীক প্রমাণিত না করে, তার ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্যতাকেই প্রমাণ করে। তাঁদের মতে আমাদের কামনাই ধর্মসম্পর্কীয় ধারণাগুলি সৃষ্টি করে। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের ও বহির্জগতের মধ্যে যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া চলেছে তার ফলেই কামনা বাসনার সৃষ্টি হয় এবং একথাও অস্বীকার করা চলে না যে, জগতের যতটুকু আমাদের কাছে এই পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সেটুকু অলীক নয়, সত্যের যথার্থ প্রকাশ। জগতের সঙ্গে আমাদের কামনা-বাসনার যে পারস্পরিক ক্রিয়া তা জগতের অস্তিত্বই প্রমাণ করে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, মানুষের যে কোন ইচ্ছারই সত্যতা আছে। বোসাঙ্কয়েট (*Bosanquet*)-এর মতে আমাদের ক্ষিধে যেমন প্রমাণ করে দেয় যে খাদ্যের অস্তিত্ব আছে, ঈশ্বরের জন্য আমাদের সহজাত আকাঙ্ক্ষা তেমনি প্রমাণ করে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে।

১২। বর্তমান কালে ধর্মের ভূমিকা (The Role of Religion Today):

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, সেহেতু বিজ্ঞানের প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের জীবনে এসে পড়েছে। এই বৈজ্ঞানিক প্রভাব মানুষকে অনেকখানি

সংস্কারমুক্ত করে তুলেছে, বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। সে কারণে অলৌকিক ঘটনামাত্রই মানুষের মনে তেমনভাবে আর বিস্ময় বা ভীতির ভাব জাগিয়ে তোলে না। কিন্তু তা বলে এমন ধারণা করা ভুল হবে যে এই বৈজ্ঞানিক প্রভাব মানুষের ধর্মভাবের বিলুপ্তি ঘটাতে পেরেছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন কারও কারও মনে জেগেছে। বিশেষ করে ধর্মে বিশ্বাস নেই এমন লোকেরও যেমন অভাব সমাজে দেখা যায় না, তেমনি সমাজের এক বৃহত্তর অংশের মধ্যে ধর্মচেতনা এখনও খুবই প্রবল।

সমাজের বৃহত্তর অংশের মধ্যে ধর্মচেতনা এখনও প্রবল

পূর্বের মতো বর্তমান যুগে ধর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, কেউ কেউ এমন প্রশ্ন করেন। 'সত্য, শিব ও সুন্দরের' আরাধনাই যদি যথার্থ ধর্মভাবের পরিচায়ক হয় তাহলে এই বৈজ্ঞানিকযুগেও ধর্মের প্রয়োজনীয়তা আছে তা সহজেই বলা যেতে পারে। বরং এমন কথাও বলা যেতে পারে যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সবরকম ভেদাভেদ দূর করে দিয়ে, বিশ্ব ঐক্যের পথ সুগম করে তুলতে পারে একমাত্র ধর্মই।

ধর্মই বিশ্ব ঐক্যের পথ সুগম করে তুলতে পারে

বর্তমান যুগে ধর্মের প্রধান ভূমিকা হবে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ় করে তোলা। ধর্মের বহিরঙ্গ অর্থাৎ বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, নিষ্ঠাভরে পালন করাই যে যথার্থ ধর্মবোধের পরিচায়ক নয়, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে সেই শিক্ষাই দিতে হবে। প্রতিটি ধর্ম যেন মানুষকে এই শিক্ষাই দেয় যে যথার্থ ধর্মবোধ এমন এক পরমসত্তায় বিশ্বাস সূচিত করে যিনি সত্য, শিব ও সুন্দরের মূর্তরূপ। অপরের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসার মনোভাব বহন করা যথার্থ ধর্মবোধের পরিচায়ক নয়। ধর্ম প্রতিটি মানুষকে নীতিপরায়ণ, সদাচারী, কর্তব্যপরায়ণ, উদার ও সংযমী হতে শিক্ষা দেবে—ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় প্রকার কর্তব্য সম্পাদনে মানুষকে সমানভাবে সচেতন করে তুলবে এবং জীবনের পরম মূল্যগুলিকে লাভ করে নিজের চারিত্রিক পূর্ণতা লাভে তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। ধর্মের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করলে মানুষ বুঝতে

বর্তমান যুগে ধর্মের কর্তব্য

পারবে যে ধর্মান্ধতাই মানুষকে সংকীর্ণমনা, ক্ষুদ্রচেতা, স্বার্থপর ও নির্বিচারী করে তোলে, যথার্থ ধর্মভাব নয়। প্রতিটি ধর্মকেই নিজ নিজ ধর্মের দোষত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে সেগুলিকে সংশোধন করতে হবে এবং বিশ্বশান্তি ও ঐক্যের পথে ধর্ম যেন কোন বাধা সৃষ্টি করতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বস্তুতঃ, যখন প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করবে যে আমরা সবাই একই ঈশ্বরের সন্তান, একই পরমসত্তার প্রকাশ তখনই সব রকম ভেদাভেদ দূরীভূত হবে, মানুষ যথার্থ মনুষ্যত্ববোধে উদ্বোধিত হয়ে পারস্পরিক মিলনের যোগসূত্রটি দৃঢ় করে তুলতে পারবে। এ কঠিন কর্তব্য একমাত্র ধর্মের দ্বারাই সম্ভব। সেকারণে অতীতের তুলনায় বর্তমান যুগে ধর্মের ভূমিকা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

সংক্ষিপ্তসার

১। ধর্ম ব্যক্তি ও জাতির জীবনে সংহতি আনে। ধর্মের যথার্থ স্থান মানুষের অন্তরে, যদিও নানারকম আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আবেগ-অনুভূতি ধর্মের নামে চলেছে। ধর্মের বহুবিধ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন সংজ্ঞাই সর্বদোষমুক্ত নয়। সমাজদর্শনে সামাজিক ঐক্যের আদর্শেই ধর্মকে দেখা হয়। ধর্মই সমাজবন্ধনকে দৃঢ় করেছে।

২। মানুষের বিচারবুদ্ধি তাকে সত্য, শিব ও সুন্দরের সন্ধান দিয়েছে এবং এসব মূল্য তার ধর্মবোধের সঙ্গে যুক্ত। নীতি ও ধর্মের সমন্বয়ই সমাজ-জীবনের লক্ষ্য।

৩। মানুষের সমাজ-জীবনের সঙ্গে ধর্ম ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত। জন্ম-মৃত্যু, শিক্ষা সংস্কার, বিবাহ, ব্যবসা, কৃষিকার্য প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে নানাবিধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সমাজে প্রচলিত আছে। এ ছাড়া সমাজের সকল রকম মহৎ ও মঙ্গলময় কাজের পশ্চাতে আছে ধর্মবোধ।

৪। ধর্ম হচ্ছে সমাজের সংহতিশক্তির উৎস ও আধার। ধর্ম হল—"ঈশ্বরের পিতৃত্বের অধীনে মানুষের ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি।" ধর্মের বিরুদ্ধে অনেক বিষয়ে অভিযোগ আছে, কিন্তু সে সকল বিষয় মানুষের গড়া। একমাত্র ধর্মবোধের দ্বারাই ধর্মের বিকৃতরূপকে শোধন করা যায়।

৫। মার্কসীয় মতবাদ অনুযায়ী 'ধর্ম হল জনগণের আফিং'। এ হল মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির দ্বারা অগণিত শ্রমজীবীদের শোষণের হাতিয়ার। ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হবার পর সমাজে ধর্ম বলে আর কিছু থাকবে না।

৬। মার্কসীয় মতবাদ ধর্মকে এক বিশেষ বিকৃত অর্থে ব্যাখ্যা করেছে। মানুষের ধর্মবোধ তার অন্তর থেকে উদ্ভূত, কোন বাইরের কর্তৃপক্ষ একে মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। মানুষ সব সময় জাগতিক সুখ নিয়ে তৃপ্তি পায় না। মানুষ এক বৃহত্তর পরমসত্তার সন্ধানী, যে

তার আধ্যাত্মিক অভাবকে দূর করতে পারবে। এজন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও নেতারাই জনসাধারণের কাছে পরমসত্তার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম-শিক্ষা দেওয়ায় অসুবিধা থাকলেও ধর্ম-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। যথার্থ ধর্ম-শিক্ষা হল মানুষের মনে সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা।

৮। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্যের জন্য অনেক সময় বিরোধ দেখা দেয় এবং ধর্মকে কেন্দ্র করে অনেক গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লব দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া ধর্মের অসহনশীলতা ও অবাধ্যতা রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা এবং জনকল্যাণের বিরুদ্ধে যেতে পারে ; সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য।

৯। ধর্ম হল সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ এবং জনকল্যাণই এর উদ্দেশ্য। আচার-অনুষ্ঠানের পার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্ম যদি নৈতিকতার উপর জোর দেয় এবং সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রতি মানুষের অনুরাগ সৃষ্টি করতে পারে তবে তাই হবে আন্তর্জাতিক বা বিশ্ব-ধর্ম এবং তার দ্বারাই বিশ্বে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

১০। প্রকৃতিবাদ সকল প্রকার অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে অবিশ্বাসী। প্রকৃতিবাদ জাগতিক সকল কিছুই জড়বস্তু ও গতি বা কার্যকারণ সম্বন্ধের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চায়। এজন্য প্রকৃতিবাদ জগতের কোন অন্তিম উদ্দেশ্য বা পরিণামকে স্বীকার করে না।

১১। প্রকৃতিবাদের বিভিন্ন রূপ আছে। (ক) বিচারবিহীন প্রকৃতিবাদ বা জড়বাদ অনুযায়ী জড়বস্তুই জগতের একমাত্র আদিম সত্তা, যার থেকে পার্থিব বস্তু, প্রাণ, মন সবই উদ্ভূত হয়েছে। যেহেতু ঈশ্বর প্রত্যক্ষগোচর নয়, সেজন্য তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু একমাত্র জড়বস্তু ও গতির দ্বারা এই বৈচিত্র্যময় জগতের সব কিছুকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এছাড়া প্রত্যক্ষই যে একমাত্র প্রমাণ, তারই বা প্রমাণ কোথায়? (খ) অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদ বলতে চায় 'অলৌকিক কিছু যদি থাকে, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই'। অতএব প্রত্যক্ষগোচর বস্তু ও ঘটনা দিয়ে বিশ্বকে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত। অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদের বৈজ্ঞানিক মূল্য থাকলেও দার্শনিক মত হিসাবে এ অচল, কারণ মনুষ্য জীবনকে ব্যাখ্যা করতে গেলে মূল্য, আদর্শ, উদ্দেশ্য প্রভৃতিকে বাদ দেওয়া চলে না। এ মতবাদ মানুষের ধর্মচেতনাকে স্বীকার করে না। (গ) মনস্তত্ত্বমূলক প্রকৃতিবাদ অনুসারে ধর্মবিশ্বাস নির্জ্ঞান মনের সৃষ্টি এবং এ বিশ্বাসের মূলে কোন বস্তুগত সত্তা নেই। ধর্ম হল যৌনাকাঙ্ক্ষার অপপ্রকাশ এবং সেজন্য এ হচ্ছে অলীক কল্পনা। কিন্তু কোন বিষয়ের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং তার সত্যতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এছাড়া, যাকে প্রত্যক্ষগোচর বলি সে বস্তুও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুসারে নিছক মানসিক প্রক্রিয়া ছাড়া কিছু নয় এবং সে হিসেবে ব্যক্তিসাপেক্ষ, অর্থাৎ বাস্তব নয়। বস্তুতঃ, এক হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ধর্মের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সত্যতাকে প্রমাণ করে। ক্ষুধাবোধ খাদ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

১২। বর্তমান কালে ধর্মের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব ঐক্যের পথ সুগম করে তোলাই ধর্মের কর্তব্য। প্রতিটি ধর্মকে ধর্মের মূলতত্ত্ব অর্থাৎ ধর্ম যে সত্য, শিব ও সুন্দরের আরাধনা তা প্রচার করতে হবে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

সামাজিক ব্যাধি বিজ্ঞান

(Social Pathology)

১। সামাজিক ব্যাধি বিজ্ঞানের অর্থ (The meaning of social Pathology) :

যে বিজ্ঞান সমাজের অস্বাভাবিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে তাকেই সামাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞান বলা হয়। এই বিজ্ঞান সমাজের ব্যাধির স্বরূপ ও তার প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক ব্যাধি বলতে বোঝায় সামাজিক অকল্যাণ (social evils) যা সমাজের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থাকে ব্যাহত করে। যখন আমরা সমাজের ব্যাধির উল্লেখ করি তখন স্পষ্টতঃই আমরা সমাজের স্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে ব্যাধিকবলিত জীবদেহের তুলনা করি। ব্যক্তির মধ্যে যেমন আমরা সুস্থ ও অসুস্থ, এই দুই শ্রেণীবিভাগ করে থাকি সমাজের মধ্যেও সুস্থ ও অসুস্থ, এই দুই শ্রেণীবিভাগ করে থাকি।

অপরাধ সামাজিক ব্যাধির বহিঃপ্রকাশ

জীবদেহের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা যদি ব্যাহত হয়, তবে তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা থাকে না এবং দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে ও দেহের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যাধির আবির্ভাব ঘটে। জীবদেহের মতো সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যদি কোন সংগতি বা সামঞ্জস্য না থাকে বা তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সমাজদেহও অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সমাজদেহে নানারকম ব্যাধির আবির্ভাব ঘটে।

বর্তমান যুগে আধুনিক সমাজের দিকে তাকালে এই ব্যাধির স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে। বর্তমান যুগে প্রায় সব সমাজেই মানুষের মধ্যে দেখা যায় উদ্বেগ ও অসুস্থ উত্তেজনা যা সংক্রামক ব্যাধির মতন একজন থেকে আর একজনে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং হীনমন্যতার অনুভূতি, মানুষের আচরণের মধ্যে অস্বাভাবিকতা এবং সংগতিহীনতা বর্তমান সামাজিক

সমস্যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও যুদ্ধের ভীতি, বিপ্লব, বেকার সমস্যা, অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা, দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন, কর্মজীবনে অতৃপ্তি, পারিবারিক জীবনে অশান্তি, জীবনে ব্যর্থতা ও হতাশার ভাব, আর্থিক সমস্যা প্রভৃতি সমাজের সুস্থ জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে সমাজকে নানা ব্যাধিতে পূর্ণ করে তুলেছে। এছাড়াও প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশে মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে অসুস্থ প্রবণতা দেখা যায়, যার ফলে অনাচার, বিশৃঙ্খলা, আত্মকেন্দ্রিকতা, যৌন-বিকৃতি, উন্মত্ততা, বিলসন কাম (exhibitionism) প্রভৃতি দেখা দেয়। এই ব্যাধির ফলে সমাজে নানারকম অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ সমাজস্থ ব্যক্তির একাংশের নৈতিক অবনতি ঘটে। যে সামাজিক আদর্শ সমাজকে অগ্রগতির পথে চালিত করে সে সামাজিক আদর্শের কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়, সমাজের ক্রমোন্নতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়; সমাজের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা লুপ্ত হয়ে অরাজকতা দেখা দেয়।

উপরিউক্ত ঘটনাগুলি সমাজের সুস্থ অবস্থাকে ব্যাহত করে এবং তার স্বাভাবিক কার্যধারার পথে বাধার সৃষ্টি করে। কাজেই সামাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞান হল "সমাজের অসংহতি বা অসামঞ্জস্যের আলোচনা, যে আলোচনার ক্ষেত্রে সমাজের সংযোজনের অর্থ, বিস্তৃতি, কারণ, ফলাফল এবং সমাজের সংযোজনের পথে বাধা সৃষ্টি করে এমন উপাদানের প্রতিকারের বিষয়ও আলোচিত হয়, যেমন দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, বার্ধক্য, রোগগ্রস্থতা, স্বাস্থ্য, উন্মত্ততা, অপরাধ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পতিতাবৃত্তি, পারিবারিক কলহ ইত্যাদি।"

সমাজের ক্ষেত্রে 'ব্যাধি' শব্দটি প্রয়োগ করার সময় আমাদের তিনটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে, প্রথমতঃ আমরা একটা স্বাভাবিক সমাজের কথা চিন্তা করি, যার থেকে বিচ্যুতি ঘটলে সমাজ অসুস্থ হয়ে পড়েছে মনে করি। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক ব্যাধি মানুষের ব্যাধির মতো সংখ্যায় অনেক, তৃতীয়তঃ, সামাজিক ব্যাধি বলতে নৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতিও বোঝায়।

সামাজিক ব্যাধির কথা বলা হলে একটি স্বাভাবিক সমাজকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা হয় এবং কোন বিশেষ সমাজ এই আদর্শ অবস্থা থেকে কতখানি বিচ্যুত সেটা নির্ধারণ করা হয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে

সমাজের নিজস্ব কোন দেহ নেই, তবু সামাজিক ব্যাধির কথা বলা হলে সমাজের দেহের কল্পনা করা হয়।

প্লেটো (*Plato*)-র মতে সুস্থ মানবদেহের উপাদান তিনটি: যথা— (১) কামনা (Desire) (২) শৈর্য (Temper) এবং (৩) বুদ্ধি (Reason)। যদি এ তিনটি উপাদান পরস্পরের সঙ্গে বিরোধিতা করে বা সহযোগিতা না করে কাজ করে, তাহলেই মানবদেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর যদি এ তিনটির উপাদানের মধ্যে সংগতি বা সামঞ্জস্য বর্তমান থাকে তাহলেই দেহ থাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন অংশ যদি সমষ্টিগতভাবে জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করে তাহলেই সমাজের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা ব্যাহত হয় না ; নতুবা সমাজে ব্যাধি দেখা দেয়। সকল ব্যক্তি যখন সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে কাজ করে তখনই সমাজের উন্নতি অব্যাহত থাকে।

২। সামাজিক ব্যাধির স্বরূপ ও প্রকারভেদ (Nature and forms of social diseases):

সামাজিক ব্যাধি শুধুমাত্র যে সংখ্যায় অনেক তা নয়, তার প্রকৃতিও বিচিত্র। সামাজিক ব্যাধির পূর্ণাঙ্গ তালিকা গঠন করা সহজ নয়, সে কারণে আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে প্রধান প্রধান সামাজিক ব্যাধির উল্লেখ করব মাত্র।

দারিদ্র্য সামাজিক ব্যাধিগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। দারিদ্র্যের জন্যই ব্যক্তি আত্মনির্ভর হতে সক্ষম হয় না এবং পরগাছায় পরিণত হয়। দারিদ্র্য নানা প্রকার অপরাধের জনক, অপরাধ আবার সামাজের নৈতিক পরিবেশকে দূষিত করে। ভিক্ষাবৃত্তি আর একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক ব্যাধি। ভিক্ষুক সমাজ থেকেই তার জীবিকা সংগ্রহ করে, কিন্তু প্রতিদানে সমাজ তার কাছ থেকে কিছুই পায় না। তৃতীয়তঃ, অপরাধ। অপরাধ সবচেয়ে ঘৃণ্য সামাজিক ব্যাধি ; অপরাধীরা সামাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে। পরিবার সমাজের প্রাথমিক গোষ্ঠী। পারিবারিক শান্তির উপর সমাজের সংহতি নির্ভর করে। পারিবারিক কলহ, স্বামী-স্ত্রীর বা মাতাপিতার ও সন্তানদের মধ্যে অপ্রীতিকর

সম্পর্ক সামাজিক ব্যাধির উদ্ভবের কারণ হতে পারে। সামাজিক অধঃপতন সামাজিক ব্যাধির চরম পর্যায় সূচনা করে। যখন ব্যক্তি নিজ নিজ সামাজিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয় এবং তার ফলে সমাজের কর্মধারা ব্যাহত হয় তখনই সামাজিক অধঃপতন সূচিত হয়। কাজেই সামাজিক অধঃপতন ব্যক্তিরই চারিত্রিক অধঃপতন। অসংযত অভ্যাস, যেমন মদ্যপানে আসক্তি, যৌন ব্যভিচার বা বংশগত দৈহিক ত্রুটি ব্যক্তির চারিত্রিক অধঃপতন ঘটায়, যার ফলে সমাজের অধঃপতন সূচিত হয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে অস্বভাবী অবস্থার উদ্ভব, যেমন—ধর্ষকাম, মর্ষকাম প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি উৎপন্ন করে। এ ছাড়াও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্ম সম্পর্কীয় গোঁড়ামি, দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শ্রেণীবিরোধ, সামাজিক অত্যাচার, পেশাগত অসামঞ্জস্য, ক্ষমতার লালসা, জাতিবিভেদ প্রসূত নানা বিদ্বেষ প্রভৃতি সামাজিক দুর্নীতির উদাহরণ। এই সব কিছুই সমাজের স্বাভাবিক অবস্থাকে ব্যাহত করে সমাজ দেহকে অসুস্থ করে তুলতে পারে।

৩। সামাজিক ব্যাধির কারণ (Causes of Social Diseases):

একাধিক কারণে সমাজদেহ ব্যাধি কবলিত হয়। দূষিত সামাজিক পরিবেশ সামাজিক দুর্নীতি সৃষ্টি করে। অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের পদ্ধতি, বেকারাবস্থা, নারী ও শিশুকে মজুর নিয়োগের ব্যবস্থা, পারিবারিক অশান্তি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অপ্রীতিকর সম্পর্ক, দুর্ঘটনার আধিক্য, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, অস্বাস্থ্যকর গৃহ, মন্দ অভ্যাস, সমাজবিরোধী দলের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ, ত্রুটিযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থা, সস্তা ও যৌন-উদ্দীপনামূলক সাহিত্য, অশ্লীল পত্রিকা, ছায়া ছবি প্রভৃতি সমাজে দুর্নীতি সৃষ্টি করে। কিন্তু সমাজে দুর্নীতির কারণ শুধুমাত্র বাহ্য পরিবেশের মধ্যেই নিহিত নয়, সমাজস্থ ব্যক্তির মনেও এই দুর্নীতির কারণ নিহিত। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নিবিড়। সমাজ ও ব্যক্তি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি ও পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের মাধ্যমেই

অপরাধের উৎস
ব্যক্তির স্বার্থবোধ

সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়। আবার সামাজিক উন্নতি তখনই সম্ভব হয় যখন সমাজ ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি না করে উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে তার মনকে বিকশিত করে এবং বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার সুপ্ত ক্ষমতাকে বিকশিত করে তোলে। সুতরাং ব্যক্তি যদি সমাজের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে না দেয় এবং অপর পক্ষে সমাজও যদি ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক চেতনা পরিস্ফুট করার জন্য সচেষ্ট না হয়, বা সামাজিক কল্যাণের আদর্শটি তার সামনে তুলে ধরতে না পারে, তাহলেই সমাজের ঐক্য বিনষ্ট হয় ও সমাজ-জীবন নানারকম ব্যাধিতে ভরে যায় এবং সমাজে নানারকম দুর্নীতি দেখা দেয়।

আমরা জানি মূল্য দুপ্রকার—স্বতঃমূল্য (Intrinsic Value) এবং পরতঃ মূল্য (Extrinsic Value)। কতকগুলি মূল্য আছে যার মূল্য নিজস্ব নয়, যেমন টাকা, এ হল পরতঃ মূল্য। স্বতঃমূল্যের নিজস্ব মূল্য আছে। সত্য, শিব ও সুন্দর—এই তিনটি হল মানব-জীবনের স্বতঃমূল্য। এই তিনটি মানব-জীবনের তিনটি মহৎ আদর্শ। মানুষ যখন পরতঃমূল্যকে স্বতঃমূল্য বলে মনে করে তখনই সামাজিক দুর্নীতি দেখা দেয়। অনেক ব্যক্তিই অর্থ, ক্ষমতা, মর্যাদা, খ্যাতি প্রভৃতিকে স্বতঃমূল্য বলে মনে করে, আসলে এগুলি পরতঃমূল্য। অত্যধিক অর্থ, ক্ষমতা ও খ্যাতির লালসা নানা প্রকার সামাজিক দুর্নীতি সৃষ্টি করে।

সমাজস্থ ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক চেতনার অভাব সামাজিক দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ। নৈতিক দুর্নীতি সমাজের প্রাণশক্তি বিনষ্ট করে, সমাজের সংহতি ব্যাহত করে। সামাজিক এবং নৈতিক চেতনা ও সহনশীলতার অভাব, সমাজের পুরাতন গতানুগতিক আদর্শকে অন্ধের মতো অনুসরণ করার প্রবণতা এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের আদর্শের চেতনাহীনতাই এই সব সামাজিক দুর্নীতির কারণ।

হবহাউস (*Hobhouse*) বলেন, "সামাজিক ক্রমোন্নতি ও নৈতিক ক্রমোন্নতি শেষ পর্যন্ত এক, উভয়ের একই লক্ষ্য।"[1] সুতরাং যদি সমাজস্থ ব্যক্তির

---

1. "The social development and ethical development are at the end the same. They have a common goal."
—*L. T. Hobhouse* : Social Development

সামাজিক চেতনা এবং নীতিবোধ উন্নত না হয় তাহলে সামাজিক ক্রমোন্নতি সম্ভব হয় না। অপরদিকে যদি এ নীতিবোধ সামাজিক ও চেতনা বিনষ্ট হয় তাহলেই সমাজের মধ্যে অকল্যাণ দেখা দেয়, সমাজ ব্যাধিতে ভরে যায়।

৪। সামাজিক দুর্নীতি বা অকল্যাণ দমন করার উপায়। (Methods of Checking Social Evils) :

দেহ অসুস্থ হয়ে পড়লে যেমন উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করে তাকে নীরোগ, সবল ও সুস্থ করে তোলা হয়, অনুরূপভাবে সমাজদেহও যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তাকেও ব্যাধিমুক্ত করা যেতে পারে।

সামাজিক দুর্নীতি বা অকল্যাণ দমন করার একটি উপায় হল, অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা। প্রত্যেক সমাজই উপযুক্ত আইনের সাহায্যে, পুলিসী ব্যবস্থা এবং সামরিক ব্যবস্থার দ্বারা অসামাজিক কার্যকলাপ নিবারণ করার চেষ্টা করে। যদি কোন নাগরিক স্বেচ্ছায় সমাজের তথা রাষ্ট্রের নিয়মগুলি অনুসরণ না করে, তাহলে একমাত্র উপায় আইনের সহায়তায় তাদের নিয়মনিষ্ঠ করে তোলা। সুতরাং অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তিবিধানের মধ্য দিয়েই সমাজ-জীবনের সমতা রক্ষিত হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল, শাস্তিবিধানই কি সামাজিক অকল্যাণকে দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়? সামাজিক অকল্যাণের প্রকৃত স্বরূপকে যদি বিশ্লেষণের সাহায্যে জানা যায় তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, নিছক শাস্তি বা বলপ্রয়োগের দ্বারা অসামাজিক ক্রিয়াকলাপকে দমন করে সামাজিক অকল্যাণকে চিরতরে দূরীভূত করা সম্ভব নয়, অর্থাৎ বলপ্রয়োগর দ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ করা যায় না; এর কারণ হল সামাজিক অকল্যাণের মূল উৎস হল সমাজস্থ ব্যক্তিদের মন। অপরাধ করার প্রবণতা মানুষের মনেই নিহিত থাকে। যখন ব্যক্তি নিজেকে সামাজিক সমগ্রতা (Social Whole) থেকে বিচ্ছিন্ন করে, সমাজের কল্যাণকে উপেক্ষা করে নিজের ব্যক্তিগত এবং আংশিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যগ্র হয়, তখন এই মানসিক প্রবণতাই সামাজিক অকল্যাণ সৃষ্টি করে। সুতরাং

শাস্তিবিধান অপরাধ দমন করে, কিন্তু দূর করে না

ব্যক্তির এই অসামাজিক মানসিক প্রবণতাকে যদি দমন ও দূর করা না যায় তাহলে কেবলমাত্র বাহ্যিক শাস্তি বিধানের মাধ্যমে সামাজিক অকল্যাণকে দূরীভূত করা কোন মতেই সম্ভব নয়। বলপ্রয়োগ মনের আবেগকে দমন করতে পারে, তার উপযুক্ত সংস্কারসাধন করতে পারে না। জনকল্যাণ সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা যদি ব্যক্তির মধ্যে প্রবিষ্ট করান যায়, তবেই এই অসামাজিক মানসিক প্রবণতা নিবারিত হওয়া সম্ভব। অবশ্য এর জন্যে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা, সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক অবস্থার সংস্কারসাধন। অসুস্থ পরিবেশ ব্যক্তির সুস্থ স্বাভাবিক আচরণকে ব্যাহত করে। যে-কোন অগ্রসর সমাজই সামাজিক দুর্নীতি দূর করার জন্য একটা সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়। পরিবেশ যদি দূষিত হয়ে পড়ে তাহলে সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি কখনও সুস্থ থাকতে পারে না। সুস্থ, সুন্দর পরিবেশই সভ্যদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যের সঞ্চার করে তাদের সজীব করে তোলে। এছাড়াও সামাজিক আদর্শটি ব্যক্তির সামনে তুলে ধরা, ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথে সকল রকম প্রতিবন্ধক অপসারিত করা, সুস্থ ও সুন্দর-ভাবে বেঁচে থাকার সকল সুযোগ তাকে দান করা দরকার। ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তাবোধ (civic security) সৃষ্টি করতে হবে, সকল রকম শোষণের হাত থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করতে হবে এবং সমাজের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে ব্যক্তিকে সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপনের সুযোগ দিতে হবে।

নৈতিক চেতনার বিকাশই সামাজিক অকল্যাণের প্রতিকার

উচ্চ নৈতিক আদর্শই সমাজকে সকল রকম অকল্যাণের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে ও সমাজের অগ্রগতিতে সহায়তা করতে পারে। সমাজসংস্কারক ও রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার তাঁদের উচিত ব্যক্তির সামনে নৈতিক আদর্শের বর্তিকাটি সকল সময় প্রজ্বলিত করে রাখা যাতে ব্যক্তির মধ্যে এই উপলব্ধি আসে যে, ব্যক্তিগত কল্যাণ ও সামাজিক কল্যাণ এক ও অভিন্ন। ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা ও তার সামাজিক সত্তা বস্তুতঃ এক, উভয়ের মধ্যে কোন যথার্থ পার্থক্য নেই।

ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক চেতনা যত অধিক মাত্রায় দেখা দেবে, ততই ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারবে যে, যেগুলিকে অনেক সময় উদ্দেশ্য বলে ধারণা করা হয় সেগুলি আসলে উপায় ছাড়া কিছুই নয়। পরতঃমূল্য ও স্বতঃমূল্যের মধ্যে এক সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। সত্য, শিব ও সুন্দরেরই স্বতঃমূল্য আছে। ব্যক্তি এগুলিকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে ধারণা করলে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন হবে। সমাজস্থ প্রতিটি ব্যক্তি যদি সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করার জন্য সচেষ্ট হয় এবং ব্যক্তিগত কল্যাণকে জনকল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে না দেখে, তাহলেই সমাজ থেকে দুর্নীতি ক্রমশঃ হ্রাস পাবে এবং আদর্শ সমাজ গঠিত হবে।

৫। অপরাধ (Crime):

অপরাধ হল সামাজিক দুর্নীতি। অপরাধ সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে। অপরাধের নানারকম সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। যেমন, অপরাধ হল—'সমাজবিরোধী কাজ (anti-social act) বা অপরাধ হল—সমাজের অপর লোকেরা যে আচরণকে অবশ্য পালনীয় বলে ধার্য করেছে, সেই আচরণ অনুযায়ী চলার অক্ষমতা বা অস্বীকৃতি' (a failure or refusal to live up to the standard of conduct deemed binding by the rest of the community); আবার অপরাধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয় অপরাধ হল—'কোন আচরণ বা ত্রুটি যা আইনানুমোদিত শাস্তির দ্বারা নিষিদ্ধ' (act or omission forbidden by law under pain of punishment)। এ সমস্ত সংজ্ঞা সমাজের মনোভাবের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে। বস্তুতঃ, অপরাধ হল আইনের ব্যাপার, অপরাধ পুরাপুরি নৈতিক ব্যাপার নয়। অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় সমাজের বিরুদ্ধে এবং সেজন্য অপরাধীকে সমাজ বা রাষ্ট্র দণ্ড দান করে।

অপরাধের সংজ্ঞা

অপরাধ ও পাপের মধ্যে পার্থক্য আছে। পাপ হল নৈতিক স্খলন। সব পাপই অপরাধ নয়। যেসব পাপের জন্য রাষ্ট্র শাস্তি দিতে পারে সেগুলিই অপরাধ। যেমন—অপরকে প্রতারিত করা, অপরের সম্পত্তি হরণ করা

হল অপরাধ। রাষ্ট্র এ জাতীয় অপরাধের জন্য অপরাধীকে শাস্তি দেয়। কিন্তু অকৃতজ্ঞতা হল পাপ ও তার জন্য রাষ্ট্র শাস্তি দিতে পারে না এই পাপের কথা জানতে পারলে সমাজ ব্যক্তিকে ধিক্কার দেয়। কোন্ ধরনের কাজ অপরাধজনক তা অংশতঃ সমাজের দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

অপরাধ ও পাপ

আদিম সমাজে সমাজ-বিরোধী অপরাধ (Public Crime) এবং ব্যক্তি-বিরোধী অপরাধ (Private Crime)—এই উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। কয়েক ধরনের অপরাধ ছিল সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ, অর্থাৎ সমাজবিরোধী অপরাধ। যেমন—আদিম সমাজ নানা দেব-দেবীতে, নানা রকম অতি প্রাকৃতিক বস্তুতে বিশ্বাস করত; কাজেই এসব দেব-দেবী বা অতি প্রাকৃতিক শক্তিকে রুষ্ট করতে পারে এমন কোন আচরণ সমাজবিরোধী অপরাধ বলে গণ্য করা হত। যেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে আক্রোশবশতঃ কারও বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ করত সেগুলিই ব্যক্তিবিরোধী অপরাধ বলে গণ্য হত।

সমাজ-বিরোধী ও ব্যক্তিবিরোধী অপরাধ

অপরাধ এবং অপরাধীকে নানাভাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। ব্লেকমার এবং গিলিন্ (*Blakmar and Gillin*) অপরাধকে চারভাগে শ্রেণীভুক্ত করেছেন। রাজনৈতিক অপরাধ, যেমন—রাজদ্রোহিতা, সাধারণ অপরাধ যা রাজনৈতিক নয়, যেমন—গৃহদাহ; ব্যক্তিকেন্দ্রিক অপরাধ, যেমন—নরহত্যা, দাঙ্গা, বলাৎকার; ব্যক্তির সম্পত্তি সম্পর্কীয় অপরাধ, যেমন—চৌর্য, ডাকাতি, তহবিল তছরূপ ইত্যাদি।

অপরাধের শ্রেণীবিভাগ

অপরাধীকেও চারভাগে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। রাজনৈতিক, সাময়িক, প্রকৃতিগত কারণে অপরাধী (natural criminals) এবং স্বভাব-অপরাধী। রাজনৈতিক অপরাধী, যেমন—রাজদ্রোহী; সাময়িক অপরাধী, অর্থাৎ যারা সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ অপরাধে লিপ্ত হয়; প্রকৃতিগত কারণে অপরাধী—জন্মগত ত্রুটিবশতঃ যারা অপরাধে লিপ্ত হয়; স্বভাব-অপরাধী অর্থাৎ এই জাতীয় অপরাধী অপরাধ করার মানসিক

অপরাধীর শ্রেণীবিভাগ

অভ্যাস গঠন করে এবং অনুকূল পরিবেশ সত্ত্বেও তাদের কার্যধারার পরিবর্তন সাধন করে না।

৬। অপরাধের সামাজিক দিক (The Sociological Aspect of Crmie):

সমাজে আমরা নানা ধরনের অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেখতে পাই। সমাজের আইন অমান্য করা, সমাজের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা, অপরের সম্পত্তি ও অধিকারে অযথা হস্তক্ষেপ করা, সমাজস্থ ব্যক্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কার্য সম্পাদন করা—সবই অপরাধ বলে গণ্য হয়। যে কোন সুশৃঙ্খল সমাজে নরহত্যা, চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা, অন্যায়ভাবে অপরের ধন আত্মসাৎ করা—সবই অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন হল, অপরাধের সামাজিক কারণ কি? কি কারণে সমাজে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়? সাধারণভাবে বলা যায় যে, ব্যক্তির মধ্যে যখন নীতিবোধ সম্যকভাবে পরিস্ফুট না হয় বা কোন কারণে তার সামাজিক চেতনা নিষ্ক্রিয় হয় তখন ব্যক্তির স্বার্থচেতনা প্রবল হয়ে দেখা দেয় ও সমাজে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়। জাগ্রত সামাজিক চেতনাই মানুষকে সাধারণের মঙ্গল (Common Good) রক্ষা ও অর্জন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

কোন্ বিশেষ কারণে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। অপরাধ বিজ্ঞান মনে করে যে প্রতিটি অপরাধই হল এক ধরণের ব্যাধি, এক ধরনের উন্মাদনা বা জন্মগত কিংবা অর্জিত শারীরিক ত্রুটি এবং সেজন্য অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে তাকে চিকিৎসালয়ে বা সংশোধনাগারে পাঠান প্রয়োজন। উপযুক্ত চিকিৎসার গুণে যেমন শারীরিক ব্যাধি দূরীভূত হয়ে রোগী নিরোগ হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনিভাবে অপরাধীর উপযুক্ত চিকিৎসা তার অপরাধ করার প্রবণতাকে বিনষ্ট করে তাকে সমাজের সুস্থ, স্বাভাবিক নাগরিকে পরিণত করে।

অপরাধ-বিজ্ঞানের অভিমত

এ মতবাদের সমর্থনে উপযুক্ত যুক্তি থাকলেও এর বিরুদ্ধে একথা বলা যায় যে, সকল রকম অপরাধই শারীরিক ব্যাধিজাত নয় বা কোন শারীরিক

কিংবা মানসিক ত্রুটির জন্যই সকল অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় না, বরং অধিকাংশ অপরাধী ব্যক্তিই সাধারণ লোক থেকে অনেক বেশি চতুর ও নিজেদের কাজ হাসিল করতে ওস্তাদ।

অপরাধ সম্পর্কীয় সমাজবিজ্ঞানীরা (Criminal Sociologists) মনে করেন যে, সামাজিক অব্যবস্থার জন্যই অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়। সমাজের মধ্যে যে অসাম্য, অসংগতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং কলুষতা (corruptions) বর্তমান তার জন্যই অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়। তাঁদের মতে প্রধানতঃ দারিদ্র্যের জন্যই চৌর্যবৃত্তির উদ্ভব। সুতরাং যদি সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়পরতার ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠিত হয় তবে সামাজিক অপরাধ রোধ করা সম্ভব।

অপরাধ-সম্পর্কীয় সমাজবিজ্ঞানীর অভিমত

বর্তমান যুগে এ মতবাদ মার্কসবাদীদের মতবাদের দ্বারাও সমর্থিত। মার্কসবাদীদের মতানুসারে সকল রকম সামাজিক অকল্যাণের মূল হল অর্থনৈতিক অব্যবস্থা। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির দ্বারা অগণিত শ্রমজীবীদের শোষণের ভিত্তির উপরই আধুনিক সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। অগণিত শ্রমজীবী অত্যাচারে, শোষণে ও নিপীড়নে জর্জরিত। এই অর্থনৈতিক নিগ্রহই সামাজিক অকল্যাণের মূল। তারই জন্য সমাজে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়। যে সমাজ শ্রেণীবিরোধ থেকে মুক্ত, সেখানে প্রতিটি ব্যক্তি বেঁচে থাকার এবং নিজেকে বিকশিত করার পূর্ণ সুযোগ লাভ করে। যে সমাজে ব্যক্তি নিজের স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত না হয়ে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করে সে সমাজে অপরাধীর সংখ্যা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। সে কারণে মার্কসবাদীরা মনে করেন, পুজিপতিদের বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের সংগ্রামের দ্বারা যখন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে তখন সকল প্রকার সামাজিক অকল্যাণ বহুল পরিমাণে দূরীভূত হবে।

মার্কসবাদীদের মতবাদ

পূর্বোক্ত মতবাদের মধ্যে যে কিছুটা সত্য আছে তা অস্বীকার করা চলে না। অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক অসাম্য যে বহু অপরাধের মূলে বর্তমান তা মিথ্যা নয়। দারিদ্র্য, অভাব, অনটন প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সুস্থ

মানুষকেও অপরাধী করে তোলে। কিন্তু সকল অপরাধের মূলেই যে সামাজিক বৈষম্য বর্তমান এমন কথা বলা চলে না। অভাবে পড়ে অনেকে যেমন অপরাধ করে স্বভাবের জন্যও অনেকে অপরাধ করে। ধনী ব্যবসায়ী অর্থের লোলুপতায় উন্মত্ত হয়ে খাদ্যে ভেজাল মেশায় বা প্রয়োজনীয় বস্তু চোরাবাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় করে প্রচুর অর্থ লাভ করে। অভাবের বশবর্তী হয়ে তারা এ কাজ করে না। সামাজিক চেতনার অভাব আছে বলেই তারা এ জাতীয় কার্য করে। সুতরাং কোন কোন অপরাধের মূলে সামাজিক বৈষম্য বর্তমান থাকলেও সব অপরাধের মূলে সামাজিক অসাম্য বা বৈষম্য বর্তমান এমন কথা বলা চলে না।

সামাজিক চেতনার অভাবই অপরাধের মূল প্রেরণা

কোন কোন অপরাধসম্পর্কীয় সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, কোন স্থানের জলবায়ুর সঙ্গে সেই স্থানে অনুষ্ঠিত অপরাধের মধ্যে বিশেষ সংযোগ আছে। এ সম্পর্কে গবেষণা করে কেউ কেউ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ঋতুগত পরিবর্তনের সঙ্গে আত্মহত্যার সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। কিন্তু আবার কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে এ সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ।

ফ্রয়েড (*Freud*) এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে অপরাধের আসল কারণ হল মানুষের অবদমিত যৌন ইচ্ছা। মানুষের যৌন কামনা যখন স্বাভাবিক পথে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, তখন নানারকম অসামাজিক আচরণ ও অপরাধের মাধ্যমে তা আত্মপ্রকাশ করে।

ফ্রয়েডের অভিমত

এ মতবাদ আংশিক সত্য, কারণ সকল অপরাধের মূলেই অবদমিত যৌন ইচ্ছা বর্তমান এমন কথা বলা চলে না।

শারীরিক ত্রুটি-বিচ্যুতি, মানসিক বিকৃতি, সামাজিক বৈষম্য এবং অবদমিত যৌন ইচ্ছা এ সকলই অপরাধের মূলে বর্তমান থাকতে পারে। কিন্তু অপরাধের প্রধান কারণ হল সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে চেতনার অভাব। ব্যক্তি যদি উপলব্ধি করতে পারে, কিসে তার যথার্থ কল্যাণ ও মঙ্গল সাধিত হয় এবং যদি সে বিশ্বাস করে যে তার নিজের কল্যাণ জনকল্যাণের সঙ্গে

বিশেষভাবে যুক্ত তাহলে অপরাধ অনুষ্ঠানের প্রবণতা তার মধ্যে দেখা দেবে না। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গলের সঙ্গে সমাজের মঙ্গলকে অভিন্ন করে দেখতে শেখেনি সেই মানুষের কাছে সামাজিক কর্তব্য একটা অবিরত ভীতির সঞ্চার করে এবং সমাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার জন্য সে প্রলুব্ধ হয়।"[1] মানুষের প্রকৃত কল্যাণ কিসে লাভ করা যায় তার জন্য নৈতিক আদর্শের জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। নীতিবিজ্ঞানই বলে দেয় মানুষের পরমার্থ বা পরমকল্যাণ কি, তার প্রকৃত স্বরূপ কি। মানুষের আত্মোপলব্ধি বা আত্মবিকাশই তার পরমকল্যাণ। মানুষ যদি তার বিচার বুদ্ধির দ্বারা 'ইন্দ্রিয়প্রধান আমি'কে (Sensuous self) 'বুদ্ধিপ্রধান আমি'র (Rational self) বশীভূত করতে পারে তবেই নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে। এই 'বুদ্ধিপ্রধান আমি' তার 'সামাজিক আমি'র (Social self) সঙ্গে অভিন্ন। অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধিগত যে সত্তা সে সত্তা তার সামাজিক সত্তার সঙ্গে মিশে আছে। নিজের কল্যাণ বা মঙ্গলের প্রকৃত স্বরূপ যখনই মানুষ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারবে তখনই তার মধ্যে জনকল্যাণের পরিপূর্ণ চেতনা জাগ্রত হবে। সে বুঝবে যে অপরের কল্যাণ বা মঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিজের কল্যাণকে লাভ করা যাবে। ব্যক্তি ও সমাজের যে নিবিড় সম্পর্ক সে সম্পর্কের চেতনা ও সামাজিক ঐক্যবোধ তার অপরাধ-প্রবণতাকে নিবারিত করবে।

সমাজকল্যাণই ব্যক্তির কল্যাণ—এই বিশ্বাস অপরাধ-প্রবণতা নষ্ট করে

৭। অপরাধ কিভাবে নিবারণ করা যায় (How to Prevent Crimes)?:

নানাভাবে অপরাধ নিবারিত হতে পারে। যে-কোন সভ্য রাষ্ট্রে অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তিবিধান অপরাধ নিবারণের প্রধান উপায়। শাস্তির প্রতিরোধক

1. 'Social duty presents itself as a continual menace to a man who has not learned to identify the good of society with his own, and he is thus tempted to take up arms against it."

—*Mackenzie*: Manual of Ethics; Page 367

দিক বর্তমান যার জন্য সভ্য সমাজে অপরাধ আংশিকভাবে নিবারিত হয়। কিন্তু শুধুমাত্র শাস্তির দ্বারা অপরাধ সম্পূর্ণভাবে নিবারিত হতে পারে না। সুস্থ সামাজিক পরিবেশ অপরাধ নিবারণে বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে।

সুস্থ সামাজিক পরিবেশ অপরাধ নিবারণে সহায়ক

সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার ও জীবনধারণের মানের উন্নতি সাধনে অপরাধ নিবারিত হয়। মানুষের চরিত্রের উপর দারিদ্র্যের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। দারিদ্র্য অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি করে। যদি সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায় এবং বেকারাবস্থা, দারিদ্র্য, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতির বিলোপ সাধন করা হয়, অপরাধ অনেকাংশে নিবারিত হয়। সাধারণ লেখাপড়া ছাড়াও প্রতিটি ব্যক্তিকে বৃত্তিগত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন যাতে সে অর্থনৈতিক দিক থেকে আত্মনির্ভর হতে পারে। এ ছাড়াও উপযুক্ত বাসগৃহের ব্যবস্থা, সুন্দর জীবন-যাপনের উপযোগী অবস্থা, খেলাধূলার ও শরীর চর্চার ব্যবস্থা, সুস্থ আমোদ-প্রমোদ, নগরীর বিকেন্দ্রীকরণ, পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা, শক্তিশালী সরকার, নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলী প্রভৃতি সুস্থ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে অপরাধের সংখ্যা হ্রাসে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

অপরাধ নিবারণে যা সবচেয়ে প্রয়োজন তাহল সমাজের সভ্যদের মনে সামাজিক ও নৈতিক চেতনা ও মূল্যবোধের সঞ্চার করা, সামাজিক আদর্শের

ব্যক্তির নৈতিক ও সামাজিক চেতনা অপরাধ নিবারণ করে

সঙ্গে তাদের পরিচিত করা, উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে জনকল্যাণের চেতনা মনে জাগ্রত করা। যে সমাজে ব্যক্তির নৈতিক চেতনা তীব্র এবং যে সমাজে জনগণ সমবেতভাবে জনকল্যাণ সাধনে প্রণোদিত হয়, সেই সমাজে স্বাভাবিক ভাবেই অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পায়।

৮। অপরিণত বয়স্কদের দুষ্ক্রিয়তা (Juvenile Delinquency):

অপরিণত বয়স্কদের দুষ্ক্রিয়তা সমাজদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আজকের যে শিশু, ভাবীকালে সেই শিশুই রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নাগরিক, কাজেই

শিশু অপরাধ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যার প্রতি সমাজ-দার্শনিক উদাসীন থাকতে পারে না।

পরিণতবয়স্ক নরনারীর দ্বারা অনুষ্ঠিত অপরাধ থেকে পৃথক করার জন্য অপরিণতবয়স্কদের অনুষ্ঠিত অপরাধকে দুষ্ক্রিয়তা নামে অভিহিত করা হয়। আইনগত এবং সামাজিক, উভয় দিক থেকেই পরিণতবয়স্ক নরনারী এবং অপরিণতবয়স্ক শিশু ও কিশোরদের অনুষ্ঠিত অপরাধের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। অপরিণতবয়স্কদের দুষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে সর্বাগ্রে আমাদের দুটি প্রশ্নের আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। দুষ্ক্রিয়তা বলতে কি বোঝায়, কাকে অপরিণত বলা চলে?

দুষ্ক্রিয়তার পরিচয়

দুষ্ক্রিয়তার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে সিরিল বার্ট (*Cyril Burt*) বলেন, সেই সব আইনভঙ্গের ব্যাপারই দুষ্ক্রিয়তার অন্তর্ভুক্ত যার জন্য পরিণতবয়স্ক নরনারীকে দণ্ডভোগ বা কারাবাস করতে হয়। যেমন—চৌর্য, ডাকাতি, ক্ষতিপূরণ, অভদ্রোচিত মারপিঠ—এ ছাড়াও আছে এমন অপরাধ যা একমাত্র শিশুরাই করতে পারে। যেমন, বখাটেগিরি যা বাপ-মায়ের শাসনের বাইরে, এ ছাড়াও রয়েছে অতিরিক্ত মিথ্যে কথা বলা এবং যৌন অশোভনতা। তবে তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, দুষ্ক্রিয় অদুষ্ক্রিয়ের মধ্যে প্রভেদ করার ব্যাপারে কোন ধরাবাঁধা সীমারেখা নেই, উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান তা মাত্রাগত।

অপরিণত বয়স্ক কাদের বলে

অপরিণতবয়স্কের বয়স নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে আইনের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য আছে। আইনের চোখে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা অপরিণত, কিন্তু মনোবিজ্ঞানীর কাছে প্রকৃত বয়স অপেক্ষা মানসিক বয়সের গুরুত্ব বেশী। কাজেই সাত বছর থেকে একুশ বছরের মধ্যে বয়স এমন শিশু ও যুবক-যুবতীদের অপরিণতবয়স্ক বলা চলে।

দুষ্ক্রিয়তার কারণগুলিকে সিরিল বার্ট (*Cyril Burt*) চারভাগে শ্রেণীভুক্ত করেছেন। পরিবেশগত (environmental), প্রাকৃতিক (physical), বুদ্ধিগত (intellectual) এবং ভাবগত (temperamental)।

পরিবেশগত কারণ

দুষ্ক্রিয়তা সৃষ্টিকারী উপাদানগুলির মধ্যে পরিবেশ খুবই উল্লেখযোগ্য। পরিবেশ বলতে গৃহ বা পরিবার এবং গৃহের বাইরের অবস্থা, উভয়কেই বোঝাতে পারে। গৃহের আভ্যন্তরীণ অবস্থার মধ্যে, দারিদ্র্য, ভদ্রভাবে বসবাসের জন্য গৃহে স্থানাভাব, গৃহের মধ্যে নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের অব্যবস্থা, মাতা ও পিতা এবং মাতাপিতা ও সন্তানদের মধ্যে অপ্রীতিকর সম্পর্ক, শাসন ও নিয়মনিষ্ঠার অভাব, আর্থিক অনটনের জন্য নিরাপত্তার অভাব, কৃষ্টির অসমতা প্রভৃতি কিশোর-কিশোরীর মনে প্রভাব বিস্তার করে তাদের মনে অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টি করতে পারে। গৃহের বাইরের প্রভাবের মধ্যে অসৎ সংসর্গের প্রভাবই দুষ্ক্রিয়তার বিশেষ কারণ। এ ছাড়াও অত্যধিক আমোদ-প্রমোদের প্রতি আসক্তি, দুর্নীতিমূলক চলচ্চিত্র, গৃহের চারিপার্শ্বস্থ কুরুচিকর পরিবেশ, যেমন—গৃহ সন্নিকটস্থ পানশালা, বেকারাবস্থা, মন্দ সাহিত্য, অমনোরম কর্মজীবন, নোংরা পরিবেশপূর্ণ বস্তি, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের স্বল্প ব্যবস্থা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রাকৃতিক কারণ

প্রাকৃতিক কারণগুলির মধ্যে, শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির অভাব, শিশুর অতিরিক্ত দৈহিক বৃদ্ধি, বয়ঃসন্ধি, অঙ্গবৈকল্য যার জন্য শিশুর মনে হীনমন্যতাবোধের সঞ্চার হয়, অতিরিক্ত যৌন চেতনা ইত্যাদি দুষ্ক্রিয়তা সৃষ্টি করতে পারে। এ ছাড়াও নানা প্রকার রোগ, শারীরিক দুর্বলতা, কোন ইন্দ্রিয়ের বিশেষ ত্রুটি, ক্ষীণ স্বাস্থ্য, পুরাতন রোগ প্রভৃতি অপরিণত বয়স্কদের দুষ্ক্রিতার কারণ হতে পারে।

বুদ্ধিগত ও স্বভাবগত কারণ

বুদ্ধিগতকারণের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, অজ্ঞতা, মানসিক অসামর্থ্য, নির্বুদ্ধিতা, অস্বাভাবিক কুশলতা, বিশেষ ধরনের কুশলতা ইত্যাদি দুষ্ক্রিয়তা উৎপন্ন করতে পারে। ভাবগত কারণের মধ্যে, পেটুকতা, অতিরিক্ত যৌন উত্তেজনা, বিবাদ প্রবণতা, ক্রোধ, সঞ্চয়ী মনোবৃত্তি, পলায়নবৃত্তি, অতিরিক্ত কৌতূহল, যূথ প্রবৃত্তি, অপরের মনে ভয়, বেদনা উৎপন্ন করার ইচ্ছা প্রভৃতি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে।

দুষ্ক্রিয়তার প্রতিবিধেকরূপে কোন একটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করলে ফললাভ ঘটবে না। বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন আছে।

দুষ্ক্রিয়তার প্রতিবিধেক

শুধুমাত্র শাস্তির মাধ্যমে অপরিণতবয়স্ক কিশোর-কিশোরীদের অপরাধ প্রবণতা নিবারিত হতে পারে না। দুষ্ক্রিয় কিশোর কিশোরীকে সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা প্রয়োজন, যাতে সে স্বাভাবিক ব্যক্তি হিসাবে সমাজে বসবাস করতে পারে।

গৃহের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ যে ক্ষেত্রে দুষ্ক্রিয়তার কারণ, সেক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে শিশুকে গৃহ থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা, শিল্প-বিদ্যালয় ও সংশোধনাগারে ও নিরীক্ষা ভবনে প্রেরণ করা তার দুষ্ক্রিয়তা নিবারণে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। প্রয়োজনবোধে দুষ্ক্রিয়তাকারীকে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রাখা যেতে পারে। তবে গৃহ থেকে স্থানান্তরিত করা অপেক্ষা গৃহের আভ্যন্তরীণ পরিবেশের উন্নতিসাধনই দুষ্ক্রিয়তা নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায়। পরিবারের অর্থনৈতিক স্থিতি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এবং মাতাপিতা ও সন্তানদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক; ভদ্রভাবে বসবাসের জন্য উপযুক্ত স্থান সঙ্কুলান, শিশুর খেলাধূলার ব্যবস্থা, মাতাপিতা কর্তৃক নৈতিক আদর্শ অনুসরণ প্রভৃতি গৃহের আভ্যন্তরীণ পরিবেশকে উন্নত করে এবং শিশুর অপরাধ প্রবণতা নিবারণ করে। গৃহের বাইরের পরিবেশ যদি শিশুর দুষ্ক্রিয়তার কারণ হয় তাহলে অসৎ সংসর্গ থেকে শিশুকে কিভাবে মুক্ত করা যায় তার দিকে সর্বপ্রথম নজর দিতে হবে মন্দ প্রভাবযুক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ, বেকার দুষ্ক্রিয়তাকারী কিশোর-কিশোরীদের জন্য বৃত্তিগত শিক্ষা ও উপদেশ, ঘরের বাইরে খেলাধূলার ও নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, কুরুচির পরিচায়ক এমন আমোদ-প্রমোদ থেকে শিশুকে দূরে রাখা প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়তা দমনের পক্ষে সহায়ক কারণ।

যেসব প্রাকৃতিক কারণ শিশু-দুষ্ক্রিয়তার কারণ সেগুলি নিবারণের জন্য কতকগুলি বিশেষ দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা, রোগের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা, মানসিক বৈকল্য দূর করার জন্য মনোবিজ্ঞানীর সহায়তা গ্রহণ করা, অঙ্গবৈকল্য দূর করার জন্য আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা, ইন্দ্রিয়গত ত্রুটি দূরীকরণের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসার ব্যবস্থা,

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর কিশোরীদের উপযুক্ত তত্ত্বাবধান, শারীরিক ব্যায়াম, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ, প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়তা দূরীকরণে সহায়ক।

যেসব বুদ্ধিগত কারণে কিশোর-কিশোরীরা দুষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে সেগুলি নিবারণ করতে হলে শিশুর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। স্বভাবগত কারণে যেসব কিশোর-কিশোরী দুষ্ক্রিয়, তাদের অপরাধ প্রবণতা নিবারণ করতে হলে তাদের অনুভূতি ও আবেগ যাতে সুস্থ পথে পরিচালিত হয় তার দিকে নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীর মনে যৌন বিষয়ে কৌতূহল জাগ্রত হয়। উপযুক্ত যৌন শিক্ষার মাধ্যমে তাদের এই কৌতূহল পরিতৃপ্ত করার প্রয়োজন, যাতে কিশোর-কিশোরীর মনে কোন অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়।

কিশোর-কিশোরীর দুষ্ক্রিয়তা দূর করার জন্য তার দৈহিক ও মানসিক গঠনের দিকে উপযুক্ত লক্ষ্য রাখতে হবে, অস্বাভাবিক আর্থিক অনটন থেকে তাকে মুক্ত রাখতে হবে, উপযুক্ত শিক্ষালাভের ও মনোমত বৃত্তি সংগ্রহের সুযোগ করে দিতে হবে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে এবং যাতে সে সভ্য সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে জীবন ধারণের সুযোগলাভ করে সেদিকে নজর দিতে হবে।

৯। শাস্তি (Punishment):

সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করার ফলেই অপরাধ দেখা দেয়। সুতরাং সমাজের কর্তব্য অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে তার অপরাধের প্রকৃত স্বরূপটি তার কাছে এবং সমাজস্থ অপর ব্যক্তির কাছে তুলে ধরা। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে অন্যায় হল মানবতার বিরুদ্ধে অন্যায় এবং এই নিয়মের অবমানিত মহিমা যতক্ষণ পর্যন্ত না তৃপ্ত হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না কাজের অন্যায় ও নিষ্ফলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যায়কে ক্ষমা করা যায় না। এখানেই শাস্তি দেবার যথার্থ কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।"[1]

1. "A wrong against social law is a wrong against humanity and cannot be forgiven until the offended majesty of the law has been appeased, i e, until the wrongness and essential nullity of the act has been made apparent. It is here that the justification of punishment is to be found."
—*Mackenzie*: Manual of Ethics, Page 374

সমাজ বা রাষ্ট্র অপরাধীকে শাস্তি দান করে, কারণ অপরাধী সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করে সামাজিক নিয়মের যে মহিমা তাকে অবমাননা করে। অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি দান করে যদি নিয়মের মহিমা-রক্ষা করা না যায়, তাহলে সামাজিক ঐক্য, শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হবে যার ফলে সমাজের নৈতিক আদর্শের মহিমা ক্ষুণ্ণ হবে। প্রতিটি ব্যক্তি যদি নিজের খেয়াল-খুশীমত আচরণ করে, অপরাধী অপরাধ করেও যদি শাস্তি না পায় তাহলে রাষ্ট্র-প্রবর্তিত আইন-কানুনের কোন মহিমা বা মর্যাদা থাকে না। আইনের মহিমা যদি নষ্ট হয় তাহলে সমাজের ঐক্যও বিনষ্ট হবে। সামঞ্জস্য বা সংহতি যা সমাজ-জীবনের প্রাণ, যা সমাজকে গতিশীল করে রাখে, তার গতিপথও রুদ্ধ হবে এবং মানবতার আদর্শ ও জনকল্যাণের আদর্শকে কার্যকরী করা যাবে না। সুতরাং অপরাধীর শাস্তি হওয়ার প্রয়োজন আছে।

আইনের মহিমা রক্ষা করাই শাস্তির প্রধান উদ্দেশ্য

তাছাড়া, যে অপরাধী সে তার অপরাধের মধ্য দিয়ে যেমন সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে তেমনি নিজের অধঃপতন সূচনা করে। সমাজের উচিত অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে অপরাধের এই উভয় দিক তার সামনে তুলে ধরা। অপরাধী জানুক তার অপরাধের স্বরূপ কি—অপরাধীকে শাস্তি দেবার এ হল নৈতিক ভিত্তি।

শাস্তির নৈতিক ভিত্তি

সমাজ মানুষকে তার কার্যানুযায়ী পুরস্কার দান করে। সদ্‌ব্যক্তি সদ্‌ আচরণের জন্য যেমন অনেক ক্ষেত্রে পুরস্কৃত হন, তেমনি অপরাধীও তার অপরাধের জন্য ফল লাভ করে বা পুরস্কৃত হয়, তবে এ পুরস্কার সদর্থক (Positive) নয়, নঞর্থক (negative)। অ্যারিস্টটল (*Aristotle*)-ও মনে করেন যে, শাস্তি হল নঞর্থক পুরস্কার। কাণ্ট, হেগেল, ব্রাডলে (*Kant, Hegel, Bradley*) প্রভৃতি দার্শনিকবৃন্দও অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া সমর্থন করেন। কাণ্ট (*Kant*) বলেন, অপরাধী না নিজের মঙ্গলের জন্য, না অপরের মঙ্গলের জন্য অপরাধ করেছে, সুতরাং তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত। হেগেল (*Hegel*) মনে করেন, অপরাধী নিজেই শাস্তি চেয়েছে, এ হল তার পুরস্কার, তবে নঞর্থক পুরস্কার।

শাস্তি হল নঞর্থক পুরস্কার

ব্রাডলে (*Bradley*)-এর মতে অপরাধের সঙ্গে শাস্তির এক অনিবার্য সম্পর্ক আছে। শাস্তির মাধ্যমেই অপরাধীকে তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয় এই কারণে যে, সে অপরাধজনক কর্ম সম্পাদন করে শাস্তি অর্জন করেছে। অপরাধীকে তার অর্জিত শাস্তির জন্যই শাস্তি দেওয়া হয়, অন্য কোন কারণে নয়।

ন্যায়পরতার ভিত্তিতেই সমাজের অস্তিত্ব। যেহেতু অপরাধ এই ন্যায়পরতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে, সে কারণে তার শাস্তি হওয়া একান্তই প্রয়োজন। শাস্তির একটা সামাজিক দিক আছে এবং সেটি হল সামাজিক সংহতি রক্ষা করা।

রস্ (*W. D. Ross*)-এর মতে[1] শাস্তির মাধ্যমেই রাষ্ট্র ব্যক্তির মৌলিক অধিকারকে রক্ষা করে। তাঁর মতে আইন এমনভাবে গঠিত হওয়া দরকার যাতে ব্যক্তি তার অপরাধের মাত্রানুযায়ী শাস্তি পায়। অবশ্য কতটুকু অপরাধের জন্য কতটুকু শাস্তি পাবে তার মাত্রা নির্ধারণ করার জন্য কোন সঠিক মান নির্ণয় করা কঠিন। তবু আদর্শের দিক থেকে বিচার করলে অপরাধীর শাস্তি যেন তার অপরাধের তুলনায় অধিক না হয়। কারও কারও মতে শাস্তির প্রধান লক্ষ্য হল অপরাধীর মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত করা যে সমাজের শৃঙ্খলার মৌলিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করার এক বিশেষ মূল্য আছে।

কোহেন (*F. S Cohen*)-এর মতে[2] মানুষের কল্যাণের জন্যই শাস্তি দেওয়া হয়। শাস্তির মাধ্যমেই আইনের অন্তর্নিহিত মূল্যের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়। শাস্তির একটা মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে। শাস্তি অপরাধীর ব্যক্তিত্বকে অপরের চোখে ছোট করে দেয়। অপরাধী অনুভব করে যে শাস্তির মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্ব অপরের কাছে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাছাড়া, নানাভাবে শাস্তি মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে।

1. *W. D. Rose* : **The Right and the Good ; Page 62**
2. *F. S. Cohen* : **Ethical Systems and Legal Ideas ; Page 98**

১০। শাস্তি সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories of Punishment):

অপরাধীকে শাস্তিদান করার মূল নীতি কি হবে তাই নিয়ে প্রধানত তিনটি মতবাদ উপস্থাপিত করা হয়েছে। যথা—(ক) প্রতিরোধাত্মক মতবাদ (Deterrent or Preventive Theory of Punishment, (খ) সংশোধনাত্মক মতবাদ (Reformative Theory of Punishment) এবং (গ) প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (Retributive Theory of Punishment)।

(ক) প্রতিরোধাত্মক মতবাদ: (The Preventive, Deterrent or Exemplary Theory): এ মতবাদ অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্য হল, অন্যান্য ব্যক্তিদের অনুরূপ অপরাধজনক কাজ করা থেকে প্রতিরোধ করা। মানুষ দৃষ্টান্ত দেখেই শিখে, সুতরাং অপরাধীকে অন্যায় কাজ করে শাস্তি পেতে দেখলে অন্য ব্যক্তি সেরূপ অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে। সুতরাং শাস্তি দেবার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অপরাধ নিবারণ করা

প্রতিরোধাত্মক মতবাদ অনুসারে শাস্তিদানের উদ্দেশ্য অপরকে অনুরূপ কাজ করা থেকে বিরত করা

উপযোগিতার নীতির উপরেই এ মতবাদের ভিত্তি। বিচারকের সুপরিচিত এক অনুশাসন বাক্যে এ মতবাদকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে—"ভেড়া চুরি করার জন্য নয়, যাতে ভেড়া আর চুরি না হয় তার জন্য তোমায় শাস্তি দেওয়া হচ্ছে," (You are not punished for stealing sheep, but in order that sheep may not be stolen)। এ মতবাদ অনুযায়ী যখন কোন অপরাধীকে মৃত্যু বা চরম দণ্ড দান করা হয় তখনও তার উদ্দেশ্য অনুরূপ ভয়ংকর অপরাধজনক কাজ করা থেকে অপরকে বিরত করা। সুতরাং এ মতবাদের সরল অর্থ হল এই যে, অপরাধীকে এমন শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন যাতে অন্য কোন ব্যক্তি আর সেরূপ আচরণ না করে। অপরাধীর শাস্তি মানুষের মনে ভীতি উৎপাদন করবে যার ফলে তারা অন্যায় কার্য করা থেকে বিরত থাকবে।

এ মতবাদ অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডও সমর্থনযোগ্য

সমালোচনা (Criticism) :

(i) এ মতবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রধান অভিযোগ হল এই যে, এ মতবাদ অপরাধীকে উদ্দেশ্য (End) হিসেবে গণ্য না করে তাকে একটি উপায় (Means) বা যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। অপরাধীও মানুষ, তার ব্যক্তিত্ব আছে, আত্মনির্ধারণের ক্ষমতা আছে, সে জড় বস্তু নয়।

এ মতবাদ অপরাধীকে যন্ত্ররূপে গণ্য করে

কোন মানুষকে কেবলমাত্র অপরের মঙ্গলের বা কল্যাণের জন্য উপায়রূপে গণ্য করা উচিত নয়। অপরকে অপরাধ থেকে বিরত করার জন্য যদি কোন মানুষকে যন্ত্র বা উপায়রূপে গণ্য করা হয়, তাহলে তাকে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হল না। নিজের কল্যাণের জন্য নয়, কেবলমাত্র অপরকে অপরাধ থেকে বিরত করার জন্য একজন লোক দুঃখ বা কষ্ট অনুভব করতে বাধ্য হবে, নৈতিক বিচারে এ কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন—"এ হল মানুষকে বস্তুরূপে, কেবলমাত্র উপায়রূপে গণ্য করা, উদ্দেশ্যরূপে গণ্য করা নয়।"[1]

কিন্তু লিলি (*Lillie*) এ অভিযোগের উত্তরে বলেছেন যে, এ অভিযোগ যথার্থ নয়, কারণ একমাত্র মৃত্যুদণ্ড ছাড়া শাস্তির প্রতিরোধাত্মক ভাবটি অপরাধীর উপরই বিশেষ করে কার্যকরী হয়, সুতরাং তাকে নিছক অপরের কল্যাণের জন্য উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয় না।

(ii) লিলি (*Lillie*) বলেন—"এ মতবাদের প্রধান ত্রুটি হল এই যে, শাস্তির একমাত্র উদ্দেশ্য যদি হয় অপরকে অন্যায় কার্য থেকে বিরত করা, তাহলে যাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে সে নিজে নির্দোষ কি দোষী তাতে কিছু যায় আসে না।"[2]

(iii) তাছাড়া, অনেক সময় দোষীকে কেবলমাত্র অপরকে শিক্ষা দেবার জন্যই শাস্তি দিলে সে শাস্তি অপরাধের তুলনায় খুব বেশি হতে পারে। কিন্তু

1. "It would involve treating a man as a thing as a mere means and an end in himself." —*Mackenzie* : A Manual of Ethics. Page 375

2. "The real weakness of the deterrent theory is that, if the only purpose of punishment is to deter people from wrong-doing, it does not really matter whether the person punished is himself innocent or guilty."

—*Lillie* : An Introduction to Ethics, Page 251.

এ মতবাদে অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে কোন পরিমাণগত সামঞ্জস্যের প্রয়োজনকে স্বীকার করা হয় নি।

(খ) **সংশোধনাত্মক মতবাদ (Reformative or Educative Theory of Punishment):** এ মতবাদ অনুযায়ী শাস্তির উদ্দেশ্য হল অপরাধীকে সংশোধন করা, তাকে শিক্ষা দেওয়া। অপরাধী অন্যায় কাজ করে, তাকে শাস্তি দেওয়া হয় যাতে সে তার আচরণকে সংশোধিত করে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত হয়। এ মতবাদ প্রতিরোধাত্মক মতবাদের মতো মানুষকে উপায় হিসেবে গণ্য করে না। অপরাধীকে এ মতবাদে উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তার নিজের কল্যাণের জন্যই তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "বর্তমান যুগে এ মতবাদই বিশেষ করে গ্রহণ করা হয়। কারণ এ যুগের মানবোচিত মনোভাবের সঙ্গে এ মতবাদই সর্বাপেক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ।"[1]

এ মতবাদ অনুযায়ী শাস্তির উদ্দেশ্য অপরাধীকে সংশোধন করা

বর্তমান সময়ে সংশোধনাত্মক মতবাদ খুবই জনপ্রিয়। অপরাধসম্পর্কীয় সমাজবিজ্ঞান (Criminal Sociology) এবং অপরাধসম্পর্কীয় নৃতত্ত্বের (Criminal Anthropology) অনেক লেখক এ মতবাদকে সমর্থন করেন। অপরাধসম্পর্কীয় সমাজবিজ্ঞান এ কথাই বলে যে, অপরাধীর অপরাধ করার জন্য প্রধানতঃ দায়ী প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ। সামাজিক দুর্নীতি, অসাম্য ও অসংগতিই অপরাধ সৃষ্টি করে। সাম্য ন্যায় ও মৈত্রীর ভিত্তিতে যদি সমাজ গঠিত হয় তাহলে অপরাধ নিবারিত হতে পারে। সমাজের অর্থনৈতিক অসাম্য ও দুরবস্থা দূরীভূত হলেই অপরাধও অনেকাংশে নিবারিত হবে। অপরাধবিজ্ঞান মনে করে, অপরাধ মানসিক ব্যাধিজাত, উন্মাদনা বা কোন

অপরাধ সম্পর্কীয় সমাজ-বিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্বের অনেক লেখক এ মতবাদ সমর্থন করেছেন

---

1. **"This appears to be the view that is most commonly taken at the present time; because it is the one which seems to fit in best with the humanitarian sentiments of the age."**

—*Mackenzie*: A Manual of Ethics; Page 375

শারীরিক ত্রুটির ফল। শারীরিক কারণেই অপরাধের উদ্ভব, অপরাধ স্বেচ্ছাকৃত নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করা নয়। সুতরাং চিকিৎসার জন্য অপরাধীকে চিকিৎসালয়ে বা সংশোধনাগারে প্রেরণ করা প্রয়োজন। ফ্রয়েড (*Freud*) এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, অবদমিত যৌন ইচ্ছাই অপরাধের মূল কারণ। সুতরাং অপরাধীর এই অবদমিত ইচ্ছার স্বরূপটি আবিষ্কার করে তার ইচ্ছাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক পথে পরিচালনা করাই যুক্তিযুক্ত।

ফ্রয়েড-এর মতে অবদমিত যৌন ইচ্ছাই অপরাধের মূলে বর্তমান

সমালোচনা (Criticism):

(i) এ মতবাদ অনুযায়ী চরম দণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করা চলে না কারণ অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিলে তার সংশোধনের কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সবক্ষেত্রে কি তা ন্যায়সংগত হবে? এমন অপরাধীও আছে যাকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ ভবিষ্যতে তার হাতে অন্য লোকের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা।

মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করা চলে না

(ii) এ মতবাদ অনুযায়ী সংশোধনের জন্যই অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক সময় শাস্তি অপেক্ষা সদয় ব্যবহার, সহানুভূতি ও সমবেদনাই অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের পক্ষে বিশেষভাবে কার্যকরী হতে পারে। ক্ষমাও অনেক সময় অপরাধীর মনে মনস্তাপ ও অনুশোচনার সৃষ্টি করে এবং নিজের দুষ্কর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ফলে তার চরিত্র সংশোধিত হয়। আবার শাস্তি সকল সময় অপরাধীর উপর কার্যকরী হয় না এবং অনেক সময় অপরাধীকে আরও কঠোর অপরাধী করে তোলে। এক কথায় অপরাধীর সংশোধনই যদি শাস্তিদানের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে সকল ক্ষেত্রে শাস্তির প্রয়োজন নাও হতে পারে। অথচ, সংশোধনাত্মক মতবাদ অনুযায়ী সংশোধনের জন্য অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে। লিলি (*Lillie*) বলেন যে, অনেকে সংশোধনের জন্য অপরাধীকে শিক্ষা দেবার কথা বলেন। কিন্তু শিক্ষা আর শাস্তি এক কথা নয়: অবশ্য এ কথা ঠিক যে, অপরাধীকে দুঃখ দেওয়াই তার

অনেক সময় শাস্তি না দিয়ে সদয় ব্যবহার করাই অপরাধীকে সংশোধিত করার উপায়

সংশোধনের একমাত্র উপায় নয়। কিন্তু দুঃখ দিলে বা ক্ষমা করলে কিসে অপরাধী লাভবান হবে এ নির্ণয় করা কঠিন। তবে লিলি (*Lillie*) বলেন, "এটা বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয় যে, দুঃখভোগ অপরাধীকে অনেক সময় ভাল ফল দান করে।"[1]

(iii) অপরাধসম্পর্কীয় সমাজবিজ্ঞানের মতামত সকল সময় গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক অপরাধের মূলে সামাজিক অসাম্য, অসংগতি, দারিদ্র্য বর্তমান তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অভাবে নয়, অনেকে স্বভাবের জন্য অপরাধী। ধনী ব্যবসায়ী যখন জাল জিনিস বাজারে বিক্রয় করে তখন তার সামাজিক কারণ যাই থাক না কেন, ব্যবসায়ীর অত্যধিক লাভের কামনাই যে দুষ্কর্মের মূলে বর্তমান তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অপরাধ বিজ্ঞানের মতামতও সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। শারীরিক ত্রুটি, মানসিক ব্যাধি বা উন্মাদনাই সকল প্রকার অপরাধের মূলে বিদ্যমান নয়। সকল অপরাধই যদি মানসিক ব্যাধিজাত হয় তবে নৈতিক বিচারের প্রশ্ন হয়ে ওঠে অবান্তর, সমাজে ঐক্য বা সাম্যও বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ফ্রয়েড (*Freud*)-এর মতও সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ সকল অপরাধই অবদমিত যৌন-ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত—এ ধারণা সত্য নয় এবং সকল মনোবিজ্ঞানী এই অভিমত সমর্থন করেন না।

সব রকম অপরাধের কারণ সামাজিক অব্যবস্থা নয়

(গ) **প্রতিশোধাত্মক মতবাদ** (Retributive Theory of Punishment) : ন্যায়বোধের উপর এ মতবাদের ভিত্তি। এ মতবাদ অনুযায়ী অপরাধীকে তার কাজের পরিণাম ভোগ করতেই হবে। অর্থাৎ তাকে বুঝতে হবে তার কাজের মন্দ ফলাফল বা পরিণাম কেবল অপরের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, তার নিজের পক্ষেও ক্ষতিকর। লিলি (*Lillie*)-র মতে এই শাস্তি সম্পর্কীয় মতবাদ অনুযায়ী শাস্তির উদ্দেশ্য হল, যার উপর অপরাধ করা হয়েছে তার যে দুর্ভোগ,

ন্যায়বোধের উপরই প্রতিশোধাত্মক মতবাদের ভিত্তি

1. "It is reasonable to believe however that the suffering of pain may often have a good effect on the offender."

—*Lillie* : An Introduction to Ethics, Page 282

অপরাধীকেও সেই দুর্ভোগ ভুগতে হবে এবং সেহেতু এ মতবাদ 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত'—এই নিয়মকে সমর্থন করে।

অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার অর্থ তার দুষ্কর্মের জন্য তাকে দুঃখ দিয়ে নৈতিক নিয়মের সার্বভৌম মহিমাকে রক্ষা করা। অপরাধী নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছে, মানুষের ন্যায়বোধ দাবী করে অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি হোক এবং ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষিত হোক। অপরাধীর যদি শাস্তি না হয় তাহলে নৈতিক নিয়মের কোন মর্যাদা, কর্তৃত্ব এবং মহিমা বজায় থাকে না। নৈতিক নিয়ম হয়ে উঠবে খেয়ালখুশির ব্যাপার। অবশ্য লিলি (*Lillie*)-র মতে নৈতিক নিয়মের মহিমার কথা বড় কথা নয়। সমাজে যদি নিয়ম থাকে তবে সে নিয়মলঙ্ঘন করার শাস্তি অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। তিনি বলেন, "নিয়মকে সমর্থন করতেই হবে, তার কারণ এই নয় যে, কেউ প্রতিশোধ দা'ব করছে, এর কারণ হল, শাসন ছাড়া নিয়ম বলে কিছু থাকবে না।"[1]

এ মতবাদ অনুসারে শাস্তির উদ্দেশ্য নৈতিক নিয়মের সার্বভৌম মহিমাকে রক্ষা করা

এ মতবাদ অনুযায়ী শাস্তির উদ্দেশ্য হল অন্যায়ের প্রতিশোধ দেওয়া (Retribution)। আদিম যুগে যে ব্যক্তির উপর অন্যায় করা হত সে বা তার আত্মীয় ও বন্ধুরা প্রতিশোধ গ্রহণ করত। এখন প্রতিশোধ গ্রহণ করার বা অপরাধীকে দুষ্কর্মের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

এ মতানুসারে মৃত্যুদণ্ডও সমর্থনযোগ্য। অবস্থা বিশেষে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে এবং সেই দণ্ড এ কারণে সমর্থনযোগ্য যে, সেহেতু অপরাধী অপর ব্যক্তিকে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে যেহেতু তাকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হবে। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয় কেবলমাত্র তার নিজের কল্যাণ বা সমাজের কল্যাণের জন্য নয়—নৈতিক নিয়মের মর্যাদা ও মহিমা বজায় রাখার জন্য। "যেমন কর্ম, তেমন ফল"—অপরাধীকে তার কর্ম অনুযায়ী ফল পেতে হবে।

এ মতানুসারে মৃত্যুদণ্ডও সমর্থনযোগ্য

1. "The law must be vindicated, not because any one demands vengeance, but because without sanctions it would cease to be a law."
Lillie: An Introduction to Ethics, Page 284

অ্যারিস্টটল (*Aristotle*) মনে করেন শাস্তি হল নেতিবাচক পুরস্কার। অপরাধী যেরূপ কাজ করেছে, কর্মানুযায়ী সে সেইরূপ ফললাভ করবে। হেগেলও অ্যারিস্টটলকে সমর্থন করে বলেন যে, শাস্তি হল নেতিবাচক পুরস্কার। ব্রাডলে (*Bradley*) মনে করেন, অপরাধী শাস্তি পায়, কারণ সেই শাস্তি সে নিজেই চেয়েছে। শাস্তির জন্যই অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া দরকার। কাণ্ট (*Kant*) বলেন, অপরাধীর শাস্তি পাওয়া উচিত; যেহেতু সে, না নিজের মঙ্গলের জন্য, না সমাজের মঙ্গলের জন্য অপরাধ করেছে।

Aristotle, Hegel, Bradley, ও Kant-এর মতবাদ

অনেকে মনে করেন এই মতবাদ খ্রীষ্টধর্মের বিরোধী, কারণ খ্রীষ্টধর্ম প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইচ্ছাকে সমর্থন করে না এবং প্রতিশোধের মধ্যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ভাব আছে। কিন্তু আদিম যুগে মানুষ যখন ব্যক্তিগত বিদ্বেষে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করত তার সঙ্গে বর্তমান যুগে রাষ্ট্র প্রবর্তিত শাস্তি ব্যবস্থাকে তুলনা করা সংগত নয়। বিচারক ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ভাব মনে পোষণ না করে নিরপেক্ষভাবে অপরাধীর অপরাধ বিবেচনা করে তাকে শাস্তি দান করেন।

অনেকের মতে এ মতবাদ খ্রীষ্টধর্মের বিরোধী

এ মতবাদের দুটি রূপ আছে। যথা—(i) কঠোর (Rigoristic) ও (ii) লঘু (Mollified)।

(i) **কঠোর প্রতিশোধাত্মক মতবাদ** (Rigoristic form of the Retributive Theory): এ মতবাদ অনুসারে অপরাধের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তিবিধান করা প্রয়োজন। এতে অপরাধ যদি কঠোর হয় তাহলে কঠোর শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন এবং অপরাধ যদি লঘু হয়, তাহলে লঘু শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। এতে দোষ-নিরাসক কারণগুলি (extenuating circumstances) বিবেচনায় কোন স্থান নেই; অর্থাৎ অপরাধী কিরূপ মানসিক অবস্থাতে অপরাধ করেছে, কি পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অপরাধ করেছে, কারও দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিল কি না—এগুলির বিচার এ মতবাদ করে না। ব্যক্তি এবং ঘটনা নিরপেক্ষভাবে শুধু অপরাধের কথা চিন্তা করেই

কঠোর প্রতিশোধাত্মক মতানুসারে অপরাধের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তিবিধান করা উচিত

শাস্তিবিধান করতে হবে। কোন ব্যক্তি অপরকে হত্যা করেছে, অতএব তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। আদিম যুগে মানুষের এই ছিল মনোভাব।

(ii) **লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদ** (Mollified form of the Retributive Theory): এ মতানুসারে ব্যক্তি এবং পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত যেসব দোষ নিরাসক কারণ বা অবস্থাগুলি বর্তমান সেগুলিও বিচার করে দেখতে হবে। অর্থাৎ শুধু অপরাধ নয়, অপরাধ ও অপরাধীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থা অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তিবিধান করতে হবে। কি অবস্থায় অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, অপরাধের পেছনে কোন প্ররোচনা ছিল কিনা, অপরাধীর অভিপ্রায়, তার মানসিক প্রবণতা, তার বয়স ইত্যাদি সব বিচার করে অপরাধীর যথার্থ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী শাস্তিবিধান করতে হবে।

লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদ অনুযায়ী দোষ নিরাসক কারণগুলি বিচার করতে হবে

(ঘ) কোন্ মতটি গ্রহণযোগ্য ?

প্রতিশোধাত্মক মতবাদের লঘু রূপটিই যে গ্রহণযোগ্য মতবাদ এ বলা বাহুল্য। কারণ, এ মতবাদের ভিত্তি হল মানুষের ন্যায়বোধ। শাস্তি বিধানের পেছনে যদি কোন নৈতিক সমর্থন না থাকে তাহলে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারটিকে সমর্থন করা মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে অপর দুটি মতকেও সমর্থন করা চলে। শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য যে অংশতঃ প্রতিরোধাত্মক এবং অংশতঃ সংশোধনাত্মক তা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার সমর্থনে প্রধান যুক্তি হল—অপরাধী অপরাধ করেছে, নৈতিক নিয়মের মহিমায় আঘাত করেছে; অতএব অপরাধীর কৃতকর্মের ফল তার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তার কাছেই ফিরে আসুক—নৈতিক নিয়মের মহিমা বজায় থাকুক।

প্রতিশোধাত্মক মতবাদের লঘু রূপটিই গ্রহণযোগ্য মতবাদ

এ মতবাদের নৈতিক সমর্থন বর্তমান

এ মতবাদের মধ্যে সংশোধক ও প্রতিশোধক ভাবও বর্তমান। এতে সংশোধক ভাব বর্তমান, যেহেতু প্রফেসার সেথ্ (*Prof. Seth*)-এর ভাষায়

"প্রকৃত সংশোধন তখনই হয় যখন কাজের অবশ্যম্ভাবী ফল মনে করে শাস্তিকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা যায়।" অপরাধী যখন উপলব্ধি করে যে, সে নৈতিক নিয়মের মহিমাকে নষ্ট করেছে এবং সেহেতু এর উপযুক্ত ফল তার পাওয়া কর্তব্য, তখনই অপরাধীর মনে অনুশোচনা জাগে এবং তার চরিত্র সংশোধিত হয়। এই মতে প্রতিরোধক ভাবও বর্তমান, কারণ, শাস্তি যে নিজের কাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, এই স্বীকৃতিই অপরাধীর মনে অপরাধের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়ে দেয় এবং অপরাধকে পরোক্ষভাবে নিবারণ করে। এ মতবাদের মধ্যে উপযোগিতা, করুণা এবং ন্যায়বোধ তিনটিরই সংযোগ ঘটেছে। সুতরাং প্রতিশোধাত্মক মতবাদের লঘু রূপটিই সন্তোষজনক মতবাদ এবং গ্রহণযোগ্য।

সংক্ষিপ্তসার

১। জীবদেহের সঙ্গে সমাজের তুলনা করা চলে। দেহের উপাদানের মধ্যে সংগতি বা সামঞ্জস্যের অভাব হলে দেহে ব্যাধি দেখা দেয়। অনুরূপভাবে সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির ও বিভিন্ন অংশের মধ্যে-সামঞ্জস্যের অভাব হলে সামাজিক ব্যাধির উদ্ভব হয়। জনকল্যাণের আদর্শ ভুলে ব্যক্তি যখন নিজের স্বার্থের সন্ধান করে তখন তার নৈতিক অবনতি হয় ও সমাজেরও ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়; ফলে সমাজে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়।

২। অপরাধ ও পাপ এক বস্তু নয়। পাপ হল নৈতিক স্খলন। সব পাপই অপরাধ নয়। যে পাপের জন্য রাষ্ট্র বা সমাজ শাস্তি দিতে পারে তাই অপরাধ। অপরাধই সমাজ ব্যাধির বহিঃপ্রকাশ।

৩। সমাজে অপরাধের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে অপরাধ-বিজ্ঞানের অভিমত হল মানসিক ও শারীরিক ব্যাধি বা ত্রুটির জন্য মানুষ অপরাধ করে এবং এজন্য অপরাধীর চিকিৎসা দরকার। অপরাধ সম্পর্কীয় সমাজ-বিজ্ঞানের মতে সমাজের অসাম্য, অসংগতি ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থার জন্যই অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন হলে সমাজ থেকে অপরাধ দূরীভূত হবে। মার্কসবাদীদের মতে বর্তমানে পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক শোষণই হচ্ছে সকল সামাজিক ব্যাধির মূল কারণ এবং ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ঐ সকল সামাজিক ব্যাধি থাকবে না। ফ্রয়েডপন্থীরা মনে করেন যে, মানুষের অবদমিত যৌন কামনাই নানাপ্রকার অসামাজিক আচরণ ও অপরাধের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুতঃ, এ সকল মতবাদ আংশিক দৃষ্টিভঙ্গীজাত। অপরাধ প্রবণতার মূল কারণ মানুষের সামাজিক চেতনার অভাব ও স্বার্থপরতার প্রাবল্য।

৪। অপরাধের সামাজিক প্রতিবিধান হল শাস্তি। শাস্তির উদ্দেশ্য হল সামাজিক আইনের মহিমা রক্ষা করা এবং শাস্তি এক হিসেবে হচ্ছে নেতিবাচক বা নঞর্থক পুরস্কার।

৫। অপরাধ নিবারণের জন্য প্রয়োজন সমাজের সভ্যদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক চেতনা সঞ্চারিত করার; এ ছাড়াও সমাজের পরিবেশ উন্নত করার জন্য যা প্রয়োজন, তা করা দরকার।

৬। অপরিণতবয়স্কদের দুষ্ক্রিয়তা—অপরিণতবয়স্কদের অপরাধই দুষ্ক্রিয়তা নামে পরিচিত। সাত থেকে একুশ বছরের মধ্যে বয়স এমন ব্যক্তি অপরিণতবয়স্ক গণ্য হতে পারে। দুষ্ক্রিয়তার চারটি কারণ—পরিবেশগত, প্রাকৃতিক, ও স্বভাবগত। উপরিউক্ত কারণগুলি দূর করার মধ্যেই প্রতিষেধক নিহিত।

৭। শাস্তি সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদ আছে। (ক) প্রতিরোধাত্মক মতবাদ অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সমাজের অপর ব্যক্তিরা যেন-অনুরূপ অপরাধ না করে। কিন্তু এ মতবাদে অপরাধীও যে একজন নৈতিক-জীব বা ব্যক্তি তা অস্বীকার করা হয়েছে এবং অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে যে পরিমাণগত সামঞ্জস্য রাখা প্রয়োজন তাও বলা হয় নি। (খ) সংশোধনাত্মক মতবাদ অনুসারে অপরাধীকে চরিত্র সংশোধনের সুযোগ দেওয়াই শাস্তির উদ্দেশ্য। অপরাধ-সম্পর্কীয় সমাজ-বিজ্ঞান, অপরাধ-সম্পর্কীয় নৃতত্ত্ব ও ফ্রয়েডপন্থীরা এ মত সমর্থন করেন। এ মতবাদের অসুবিধা হল এই যে, অপরাধীকে কোন অবস্থাতেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে না এবং অপরাধীর চরিত্র সংশোধনই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তবে অনেক ক্ষেত্রে শাস্তির আদৌ প্রয়োজন নাও হতে পারে। এছাড়া, সকল ক্ষেত্রেই যে লোকে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি বা সামাজিক অব্যবস্থার জন্য অপরাধ করে, একথা বলা যায় না। (গ) প্রতিশোধাত্মক মতবাদ অনুযায়ী অপরাধীকে তার অন্যায় কাজের উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়াই শাস্তির প্রধান উদ্দেশ্য। ভিন্ন ভাষায়, সামাজিক ও নৈতিক নিয়মের সার্বভৌম মহিমা রক্ষা করাই শাস্তির উদ্দেশ্য। এ মতবাদের দুটি রূপ, কঠোর ও লঘু। আদিম যুগে মানুষ এর কঠোর রূপ অনুসারে প্রতিহিংসা গ্রহণ করাই শাস্তির একমাত্র কাজ মনে করত এবং অপরাধীর প্রকৃতি কি ও কোন্ পরিবেশে সে অপরাধ করছে তা বিবেচনা করত না। এ মতবাদের লঘু রূপ অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি দেবার সময় তার মানসিক, শারীরিক অবস্থা, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অপরাধের পশ্চাতে কোন প্ররোচনা ছিল কিনা ইত্যাদি দোষ নিরাসক অবস্থা বিবেচনা করে তবেই তার শাস্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ণয় করতে হয়। এই সঙ্গে শাস্তি ব্যবস্থা যাতে সংশোধনাত্মক এবং প্রতিরোধাত্মক হয় তার উপরও এ মতবাদ জোর দেয়। কাজেই লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদটি গ্রহণযোগ্য।

৮। শাস্তি সামাজিক দুর্নীতি ও অকল্যাণ দমন করার একটি উপায়, কিন্তু শাস্তি অকল্যাণ বা অপরাধকে সমাজ থেকে দূর করতে পারে না। কারণ শাস্তি হল একটি নেতিবাচক প্রথা। জনকল্যাণই হল সামাজিক জীবনের আদর্শ এবং উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ ও অর্থ নৈতিক নিরাপত্তাই সমাজ থেকে অপরাধ দূর করার প্রকৃষ্ট পন্থা।

সপ্তদশ অধ্যায়

সামাজিক ক্রমোন্নতি, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি (Social Development, Social Evolution and Social Progress)

১। সামাজিক পরিবর্তন বলতে কি বুঝ? (What is Social Change)? :

ব্যক্তির জীবনে যেমন আমরা অসংখ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করি, সমাজ-জীবনেও সেরূপ অসংখ্য পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই। সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। বর্তমানে আমরা সমাজের যে রূপ প্রত্যক্ষ করছি একশ বা হাজার বছর আগে সমাজের এ রূপ ছিল না। সমাজের বাইরের আঙ্গিক ও ভেতরের স্বরূপ উভয়কে কেন্দ্র করে অসংখ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সমাজের গঠন ছাড়াও তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন সাধিত হয়। সমাজের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, অর্থাৎ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বহু পরিবর্তন দেখা দেয়। সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উৎস নির্দেশ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক পরিবেশ সামাজিক পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। ধীর এবং আকস্মিক ভৌগোলিক পরিবর্তন, জলবায়ু সংক্রান্ত পরিবর্তন, তাপের পরিবর্তন প্রভৃতি বিশেষ ভাবে সামাজিক গঠনকে প্রভাবিত করে, সমাজের মধ্যে পরিবর্তন সংঘটিত করে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভয়ংকর ভূমিকম্প বা ভয়ংকর বন্যা কোন সমাজের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এমন পরিবর্তন আনতে পারে যে পরিবর্তিত প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য নতুন পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে থাকে।

সমাজস্থ ব্যক্তিদের নতুন জৈবিক অবস্থার (Biological Conditions) পরিবর্তন, যেমন—জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস, বংশগত পরিবর্তন প্রভৃতি সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে,

যে অনেক দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে সমাজ-জীবনের অবস্থার মধ্যে নতুন নতুন পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তাছাড়া, মানুষ নিজে জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধির সাহায্যে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে, সৃষ্টি করে। তার ফলে সমাজের মধ্যে নানারকম পরিবর্তন সাধিত হয়। যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতি সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য উৎস। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার মানুষের সামাজিক সম্পর্কে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে বেতার, টেলিফোন, বাষ্পীয় ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কেবলমাত্র যে আমাদের পারিবারিক জীবনের এবং সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে তা নয়, আমাদের আচার, অনুষ্ঠান, বিশ্বাস এবং ধারণার মধ্যেও প্রকৃত পরিবর্তন সংঘটন করেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য মানুষ নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যার ফলে মিল ও কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হস্তচালিত যন্ত্র শিল্পের ক্রমশঃ বিলোপ সাধিত হচ্ছে। মিল এবং কারখানা সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে প্রভূত পরিবর্তন সংঘটিত করেছে। কাজেই বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার নতুন নতুন সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। মানুষের জনহিতকর কাজও সামাজিক পরিবর্তনের মূলে বর্তমান। তাছাড়া আছে সমাজের ব্যক্তিদের সংস্কৃতির পরিবর্তন, যার ফলে সামাজিক পরিবর্তন দেখা দেয়। যে কোন সমাজের দিকে তাকালেই দেখা যাবে সংস্কৃতির বৈচিত্র্য, মানুষের মূল্যবোধের, উদ্দেশ্যর ও আদর্শের বিভিন্ন ধারণা। তারই ফলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি এবং সংস্কৃতিতে কেন্দ্র করে সমাজের মধ্যে নানারকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে কোন এক যুগের সাহিত্য ও কলা অপর যুগের ব্যক্তির কাছে সমান আদরণীয় নাও হতে পারে। তাছাড়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলার প্রকাশের ভঙ্গীও নানাভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। সংস্কৃতি সমাজকে প্রভাবিত করে এবং সমাজও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। সংস্কৃতি সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করে এবং সামাজিক পরিবর্তন নতুন ধরনের সংস্কৃতি সৃষ্টি করে।

বহুবিধ প্রভাবের ফলে সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল

২। সামাজিক পরিবর্তনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য (A Few Prominent Characteristics of Social Change):

ইতিপূর্বে আমরা সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন আমরা সামাজিক পরিবর্তনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করব।

দ্রুতগতি সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভৌগোলিক পরিবর্তনের তুলনায় সামাজিক পরিবর্তন দ্রুতগতিতে সাধিত হয় সময় সময় এই পরিবর্তন এত দ্রুত সাধিত হয় যে তা অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হয়। যুদ্ধোত্তর কালে, সামাজিক বিপ্লবের পরে, কোন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার পরে এই জাতীয় দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সমাজের মধ্যে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে। রাশিয়ার বিপ্লবের পর রাশিয়ার সমাজ অল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নতুনভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে। প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতির এমন পরিবর্তন সাধিত হয়, যা কল্পনার অতীত। অবশ্য সময় সময় এই পরিবর্তন খুবই ধীর গতিতে ঘটে থাকে।

সামাজিক পরিবর্তনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন সত্ত্বেও সমাজের একটা মোটামুটি স্থায়িত্ব আছে, যার জন্য কোন একটি সমাজকে অপর একটি সমাজ থেকে পৃথক করা যেতে পারে।

সামাজিক পরিবর্তনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সামাজিক পরিবর্তন কম বেশী অনিশ্চিত, সে কারণে এই পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। যেসব কারণে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে থাকে সেগুলি সংখ্যায় অনেক এবং বিচিত্র ধরনের এবং এই কারণগুলি এতই অস্থায়ী এবং জটিল ধরনের যে এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন হয়ে পড়ে। সমাজ জীবনের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র সম্পর্কে যেমন কোন বিশেষ সময়ে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি, কোন বিশেষ মাসে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে কিন্তু পরবর্তী কুড়ি বছরের মধ্যে কোন বিশেষ সমাজে কি পরিবর্তন ঘটতে চলেছে তা সুনির্দিষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ নয়।

বৈচিত্র্য সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সামাজিক পরিবর্তন কখনও সামাজিক উন্নতির কখনও বা সামাজিক অবনতির পরিপোষক, কখনও স্থায়ী, কখনও অস্থায়ী। কোন কোন সামাজিক পরিবর্তন জনকল্যাণের পরিপন্থী কখনও বা বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর।

সময় সময় সামাজিক পরিবর্তন পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে ঘটতে পারে, কখনও বা সমাজস্থ ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে সংঘটিত হতে পারে। যে সাধারণ ধারা বা পদ্ধতি (General Scheme) অনুসারে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে সামাজিক পরিবর্তনের সেই ধারা বা পদ্ধতিকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি ধারা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। এ তিনটি ধারা হল—একাভিমুখী (Unilinary), পুনরাবির্ভাবশীল (Pendular) এবং বিবর্তনসম্মত (Evolutionary)।

একাভিমুখী সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ হল যে, সমাজ স্থিরভাবে একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে, একটি লক্ষ্য অনুযায়ী সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ মতানুসারে প্রকৃতির অন্ধশক্তি, অদৃষ্ট বা ঐশ্বরিক শক্তি এই অগ্রগতির ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে এবং সমাজকে কেন্দ্র করে যেসব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সেগুলি নেহাত আকস্মিক ঘটনা।

দ্বিতীয় মতানুযায়ী সামাজিক পরিবর্তন ঘড়ির দোলকের গতির সঙ্গে তুল্য। সামাজিক পরিবর্তন অবিরত কোন নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী হয় নি, এ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে থেকে থেকে এবং সব সময়ে তা একাভিমুখে হয় নি, মাঝে মাঝে এ পরিবর্তনের গতি রুদ্ধ হয়েছে।

তৃতীয় ধরনের পরিবর্তন হল বিবর্তনসম্মত পরিবর্তন, যে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক বিবর্তন বলতে আমরা এই পরিবর্তনকেই বুঝি।

৩। সমাজের স্থিতিশীল রূপ (Society as an enduring entity) :

সমাজের মধ্যে অসংখ্য রকমের পরিবর্তন সংঘটিত হলেও সমাজের একটা স্থায়ী সত্তা আছে, একটা স্থিতিশীল রূপ আছে। তবে কি অর্থে সমাজ

স্থিতিশীল সেটা আমাদের বুঝে নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়ার (Process) মাধ্যমে কোন বস্তু উৎপন্ন হয়েছে, সেই প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন বস্তুকে পৃথক করা চলে। অর্থাৎ কিনা প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও পরিণাম (Product) বা ফল তার নিজস্ব সত্তা বা অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে তা নয়। সমাজ হল এমন একটা সৃষ্ট বস্তু যা, যে প্রক্রিয়াগুলির দ্বারা সৃষ্ট, তার মধ্যেই নিজের স্থিতি বজায় রাখে, যখন প্রক্রিয়াগুলি আর ক্রিয়া করে না তখন সমাজেরও বিলোপ সাধিত হয়। মানুষের জাগতিক এবং সাংস্কৃতিক কীর্তি যে প্রক্রিয়াগুলির দ্বারা সৃষ্ট তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বহুকাল যাবৎ টিকে থাকতে পারে। মানুষের জাগতিক বা পার্থিব কীর্তি বহু যুগ ধরে বেঁচে থাকে। মানুষের সাংস্কৃতিক কীর্তির আয়ু আরও বেশী হতে পারে। যে প্রক্রিয়াগুলির দ্বারা এই সাংস্কৃতিক কীর্তির সৃষ্টি, সেগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাবার বহুকাল পরেও তারা বেঁচে থাকে। শেক্সপীয়ারের নাটক, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, মাইকেল এঞ্জেলো বা রেলেফের আঁকা চিত্র, এগুলি বহু যুগ ধরে জগতের বুকে বেঁচে থাকবে। কিন্তু কোন সামাজিক অনুষ্ঠান তার প্রক্রিয়ার মধ্যেই টিকে থাকে। ধরা যাক, জাতিভেদ প্রথা; যাদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত তারা বর্জন করলে এই প্রথার কোন স্থায়িত্ব থাকে না। অনেক সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানই এভাবে বর্জিত হওয়াতে, আর সমাজে দেখা যায় না।

সমাজ এবং সামাজিক ঘটনার বৈশিষ্ট্য হল যে, এরাও কোন প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ, কিন্তু যেহেতু তারা বস্তুগত মানসিক ফল (objective mental product), জাগতিক ফল বা পরিণাম থেকে পৃথক। সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজ বেঁচে থাকতে পারে না। সামাজিক সম্পর্ক বিলুপ্ত হল, অথচ সামাজিক ঘটনা টিকে থাকল, এ সম্ভব নয়। যাদুঘরে প্রাচীনযুগের সভ্যতার বহু নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে, কিন্তু যাদুঘরে গেলে প্রাচীন যুগের আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দেখা আমরা পাব না, কারণ যাদুঘরে এগুলিকে সংরক্ষিত করা চলে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্কের প্রকাশ, তাকে বাদ দিয়ে সামাজিক

সম্পর্ক টিকে থাকতে পারে না। সমাজের এই বৈশিষ্ট্য হেতু সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে জাগতিক বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পার্থক্য।

৪। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক ক্রমোন্নতি, সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতির সম্বন্ধ (Relation of Social change to Social Development, Social Evolution and Social Progress) :

সামাজিক পরিবর্তন বলতে, কোন বিশেষ সময়ে সামাজিক গোষ্ঠী এবং অনুষ্ঠানের প্রকৃতিগত, বিষয়গত এবং গঠনগত পরিবর্তন এবং ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও অনুষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন বোঝায়। সামাজিক ক্রমোন্নতি, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি, এদের প্রত্যেকটিই কোন না-কোন এক ধরনের সামাজিক পরিবর্তন। কিন্তু প্রতিটি পদের দ্বারা যে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয় তার মধ্যে প্রকারগত প্রভেদ বর্তমান।

'ক্রমোন্নতি' (Social Development) পদটি সাধারণতঃ জীবদেহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। জীবদেহের ক্রমোন্নতি সাধিত হলে জীবের আকারগত ও গঠনগত পরিবর্তন সংঘটিত হয়। 'ক্রমোন্নতি' শব্দটি সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। সমাজ জীবদেহে নয়, কিন্তু জীবদেহের সঙ্গে তুলনীয়। জীবদেহের মতো সমাজেরও পরিবর্তন ঘটে, সমাজ সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় উন্নীত হয়। শক্তি (energy), সংগঠন (organisation) এবং সামঞ্জস্যই (harmony) ক্রমোন্নতির লক্ষণ। জীবেদেহের ক্রমেন্নেতি সাধিত হয় তখনই, যখন জীবদেহে শক্তি সঞ্চারিত হয়, যখন অধিকতর সংগঠনের জন্য সেই শক্তি কোন নির্দিষ্ট পথে চালিত হয়, এবং যখন জীবদেহের প্রতিটি অংশের ক্রিয়ার মধ্যে এমন সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে সমগ্রের বৃদ্ধি ঘটে, এবং সেই সঙ্গে অংশেরও বৃদ্ধি ঘটে। ক্রমোন্নতির সাধারণ লক্ষণগুলি সামাজিক ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান। সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক ক্রমোন্নতি সংঘটিত করে এবং সামাজিক ক্রমোন্নতির ফলে নানা ধরনের সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

সামাজিক বিবর্তন (Social Evolution) এক ধরনের সামাজিক পরিবর্তন। কিন্তু যে কোন সামাজিক পরিবর্তনই সামাজিক বিবর্তন সূচনা করে না। সামাজিক বিবর্তন হল সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির ধীর ক্রমবিকাশের ধারায় উত্তরোত্তর জটিল অবস্থায় উপনীত হওয়া। কানিংহাম (*Cunnigham*)[1] সামাজিক বিবর্তনের দুটি দিকের কথা বলেছেন। সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন এবং সামাজিক বিশ্বাস ও ধারণার বিবর্তন যা শিল্পগত, ধর্মগত, বিজ্ঞানসম্পর্কীয় ও দার্শনিক ধারণার বিবর্তনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

সামাজিক অগ্রগতিও এক ধরনের সামাজিক পরিবর্তন, যখন সমাজ কোন অভিলষিত লক্ষ্য বা আদর্শের দিকে অগ্রসর হয়, তখনই সামাজিক অগ্রগতির কথা বলা চলে। 'অগ্রগতি' শব্দটির নৈতিক তাৎপর্য আছে। সামাজিক অগ্রগতি সমাজস্থ ব্যক্তির নৈতিক অগ্রগতি সূচনা করে।

৫। *সামাজিক ক্রমোন্নতি বলতে কি বুঝ? (What is Social Development)?:

ক্রমোন্নতি কথাটির অর্থ কি? কেবলমাত্র আকারগত এবং পরিমাণগত বৃদ্ধিই ক্রমোন্নতির মাপকাঠি নয়। কোন একটি সংগঠনের যদি আয়তনে বাড়তে থাকে তবে তার ক্রমোন্নতির কথা আমরা বলি না। আকারগত বৃদ্ধির সঙ্গে যদি সংগঠনটির কার্যদক্ষতা (efficiency of organisation) যুক্ত হয়, তবেই আকারগত বৃদ্ধির সার্থকতা আছে।

সামাজিক ক্রমোন্নতির স্বরূপ

সামাজিক উন্নতি সম্পর্কে অনেকে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। কেউ কেউ মনে করেন, সমাজের অন্তর্ভুক্ত কিছু কিছু ব্যক্তির সদ্গুণগুলিকে যদি বিকশিত করা যায়, তাহলেই সামাজিক ক্রমোন্নতি দেখা দেয়। কিন্তু এ ধারণা

1. Problems of Philosophy; Page 217-218

* সামাজিক ক্রমোন্নতির আলোচনায় আমরা 'সমাজ' কথাটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ না করে তাকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করব।

ভ্রান্ত, যেহেতু কয়েকজন মাত্র সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি নিয়ে সমাজে বেঁচে থাকতে পারে না। অবশ্য যদি এসব সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করে সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সমাজের সমষ্টিগত জীবনকে পরিচালিত করেন, তা হলেই সামাজিক উন্নতি সম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা দেখা যায় না। অনেকে আবার সমাজস্থ ব্যক্তিদের দিকে লক্ষ্য না রেখে শুধুমাত্র সমাজের ক্রমোন্নতির কথা বলে থাকেন। কিন্তু ব্যক্তিকে ছাড়া সমাজের ক্রমোন্নতির বা অস্তিত্বের কোন প্রশ্ন ওঠে না। ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver and Page*) বলেন, "জীবদেহের উন্নতি হল তার জীবনের উন্নতি এবং সমাজের উন্নতি হল তার সভ্যদের মধ্যে যে জীবন আছে তার উন্নতি।[1] ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজের ক্রমোন্নতি কিভাবে সম্ভব? সুতরাং সমাজ থেকে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়।

হবহাউস (*Hobhouse*) বলেন, "সামাজিকতা হল মানুষে মানুষে সম্পর্ক; সেটা সম্পর্ককে বাদ দিয়ে কেবল মানুষ নয় বা মানুষকে বাদ দিয়ে কেবল সম্পর্ক নয় এবং সামাজিক ক্রমোন্নতি হল পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত মানুষের ক্রমোন্নতি।"[2] তাঁর মতে একটি জনসমাজের ক্রমোন্নতি তখনই হয় যখন তার (১) **মাত্রা** (Scale), (২) **দক্ষতা** (Efficiency), (৩) **স্বাধীনতা** (Freedom) এবং (৪) **পারস্পরিকতা** (Mutuality)—এ চার বিষয়ে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। মাত্রার অর্থ জনসংখ্যা; দক্ষতার অর্থ একই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন; স্বাধীনতার অর্থ স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও কাজ করার সুযোগ এবং পারস্পরিকতার অর্থ, যে লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করা হয় সে লক্ষ্য সাধনের জন্য সকলের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা।

Hobhouse-এর মতে সামাজিক ক্রমোন্নতির বিভিন্ন উপাদান

---

1. "The development of the organism is the development of its life and the development of community is the development of the life which exists in its members." —*MacIver and Page*: Society; Page 178

2. "The social relation is a relation of man to man, not man apart from the relation, nor the relation apart from the man and social development is the development of men in their mutual relations." —*Hobhouse*: Social Development; Page 76

পূর্বোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন একটিকেই সামাজিক ক্রমোন্নতির একমাত্র মাপকাঠি বা মানদণ্ড বলে ধরা যেতে পারে না।[1] হবহাউসের মতে যদিও মাত্রা, দক্ষতা, স্বাধীনতা এবং পারস্পরিকতা সামাজিক ক্রমোন্নতির মাপকাঠি, তবু শক্তি, সংগঠন এবং সামঞ্জস্যই ক্রমোন্নতির সাধারণ লক্ষণ। অর্থাৎ কিনা ক্রমোন্নতির দৃশ্যমান দিকটুকু বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ক্রমোন্নতির স্বরূপ বা প্রকৃতিকে যদি বুঝতে চাই তাহলে দেখতে পাব যে শক্তি, সংগঠন এবং সামঞ্জস্যই ক্রমোন্নতির লক্ষণ। কোন সংহতির (system) ক্রমোন্নতি ঘটে যদি তার সত্তার মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হয়, সেই সংহতির সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যদি সেই শক্তিকে চালিত করা হয় এবং যখন সংহতির প্রতিটি অংশের ক্রিয়ার মধ্যে এমন সামঞ্জস্য সাধিত হয় যার দ্বারা সমগ্র সংহতির কল্যাণ সাধিত হয়। ক্রমোন্নতির সাধারণ লক্ষণগুলি সামাজিক ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রেও প্রতীয়মান। কোন সমাজের ক্রমোন্নতি ঘটে

1. সমাজের লোকসংখ্যা বাড়তে পারে, কিন্তু সংগঠন হয়ত তখনও প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে। হয়তো বা কয়েকজন মুষ্টিমেয় শক্তিশালী ব্যক্তি তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য সমাজকে দক্ষতার সঙ্গে সংগঠিত করতে পারে। কিংবা কোন সমাজ তার দুর্বল সংগঠনের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে পারে এবং তার বিনিময়ে সমষ্টিগত কল্যাণমূলক কাজ আশা করতে পারে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সমাজের ক্রমোন্নতি যথেষ্ট এবং যথার্থভাবে ঘটেছে, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ যদি একসঙ্গে হতে থাকে, তাহলেই সমাজের সত্য সত্যই ক্রমোন্নতি ঘটেছে এমন কথা বলা যেতে পারে।

বস্তুতঃ, বাস্তবে দেখা যায়, কোন একটি সমাজের উন্নতি কেবলমাত্র একটি বা একাধিক বিষয়ে হয় অর্থাৎ আংশিকভাবেই সাধিত হয়। অনেক সমাজে হয়ত চিন্তা করার, কাজ করার, উদ্যোগী হবার যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু সংগঠন বলতে বিশেষ কিছু নেই। আবার কোন ক্ষেত্রে সমাজের সংগঠন খুবই দৃঢ়, কিন্তু সকল ব্যক্তির শুভেচ্ছা সেই সংগঠনের মূলে নেই, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ইচ্ছাই সমাজের সকলের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এসব বৈশিষ্ট্য যে পরস্পরের বিরোধী তা নয়, এগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। ধরা যাক, স্বাধীনতা এবং সহযোগিতা। সহযোগিতার প্রশ্ন তখনই আসে যখন সকলকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। আসল কথা পূর্বোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনই সমাজের ক্রমোন্নতির প্রকৃষ্ট ভিত্তি।

যদি তার সভ্যরা (মাত্রা) নিজেদের সত্তার মধ্যে যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহ করে। সমাজের সংরক্ষণ ও অধিকতর বৃদ্ধির জন্য এই শক্তিকে চালিত করে (দক্ষতা), এবং যখন প্রতিটি সভ্য স্বাধীনভাবে পারস্পরিক ও সামগ্রিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য ক্রিয়া করে (স্বাধীনতা ও পারস্পরিকতা)।

হবহাউস (*Hobhouse*) বলেন, "সামাজিক জীবনের বাধ্যবাধকতা সামাজিক ক্রমোন্নতির ভিত্তি নয়। পরস্পরের অভাব মেটাবার জন্য যে সহযোগিতা তাই হল সামাজিক উন্নতির ভিত্তি।"[1] ক্রমোন্নতি হল অগ্রসরমান পরিপূর্ণতা' (Development is advancing fulfilment)। পরিপূর্ণতা অর্থে কি বুঝব ? পরিপূর্ণতা হল ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা। অসংগত ও বিরোধপূর্ণ উদ্দেশ্যের মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা কখনই সম্ভব নয়।

সামাজিক ক্রমোন্নতির লক্ষণ

কেবলমাত্র সংগতিপূর্ণ উদ্দেশ্যের মাধ্যমেই এই পরিপূর্ণতা লাভ করা সম্ভব। আবার এমন হতে পারে যে, আমার পরিপূর্ণতা লাভ অপরের পরিপূর্ণতা লাভের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে ; কাজেই প্রয়োজন সামঞ্জস্যের। এ সামঞ্জস্য হল আঙ্গিক সামঞ্জস্য (organic harmony)। সমাজের ক্রমোন্নতির ভিত্তি হল এই আঙ্গিক সামঞ্জস্য বা সংগতি।

বস্তুতঃ, সামাজিক ক্রমোন্নতির আলোচনায় আমরা এসে পৌঁছলাম নৈতিকতার ক্ষেত্রে। কারণ যে সামঞ্জস্যপূর্ণ পূর্ণতা লাভের দ্বারা সামাজিক ক্রমোন্নতি সম্ভব তা নীতিবিজ্ঞানের পরমকল্যাণ বা পরমার্থ ছাড়া আব কিছুই নয়। নীতিবিজ্ঞানই বলে দেয় মঙ্গল বা কল্যাণের স্বরূপ কি ? জীবনের মূল উপাদানগুলিকে, তা বাইরের হোক বা ভেতরের হোক, শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক যাই হোক না কেন, নিয়ন্ত্রিত না করলে উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব নয়। নীতিবিজ্ঞান নির্ণয় করে দেয় কোন্ উদ্দেশ্য ভাল, কোন্ উদ্দেশ্য মন্দ—যাতে ব্যক্তি সেই ধারণা অনুযায়ী তার উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে। অপরের মঙ্গল

1. Social development, then rests not on the element of ocnstraint in social life, but on the element of co-operation resting on mutual need."
—*Hobhouse* : Social Development, Page 489

বা কল্যাণের মাধ্যমেই ব্যক্তিকে নিজের কল্যাণ লাভ করতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সামঞ্জস্য আসবে। প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারাই পরিচালিত হতে হবে। কোন আবেগ বা বহিরাগত উদ্দেশ্যের দ্বারা নয় বা কারও চাপে পড়ে নয়, অর্থাৎ নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে, জনকল্যাণ লাভের জন্য জীবনের বিভিন্ন দিককে নিয়ন্ত্রিত করে, অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করেই ব্যক্তিকে নিজের উদ্দেশ্যসাধন করতে হবে। হবহাউস (*Hobhouse*)-এর কথায়, "সামাজিক ক্রমোন্নতি এবং নৈতিক ক্রমোন্নতি শেষ পর্যন্ত একই। উভয়ের একই লক্ষ্য।"[1]

সামাজিক ক্রমোন্নতি ও নৈতিক ক্রমোন্নতি এক ও অভিন্ন

৬। সামাজিক ক্রমোন্নতির শর্তাবলী (The Conditions of Social Development):

হবহাউস (*Hobhouse*) তাঁর *Social Development* গ্রন্থে* সামাজিক ক্রমোন্নতির চারটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা—(ক) পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কীয় (Environmental), (খ) জৈবিক (Biological),

1. "Thus social development and ethical development are at the end the same, they have a common goal."
—*Hobhouse*: Social Development, Page 89

* কেউ কেউ বলেন যে, সমাজবিজ্ঞানে নৈতিক আদর্শের কোন স্থান নেই। উদ্দেশ্যের সার্থকতা ও মূল্যের আলোচনা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং সমাজ-বিজ্ঞানে সে আলোচনা না টেনে আনাই উচিত। আমাদের বক্তব্য হল, সামাজিক ক্রমোন্নতিকে "আমরা সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখছি না, দেখছি সমাজ-দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। সমাজ-দার্শনিকের কাজই হল আদর্শ নিয়ে, মূল্যাবধারণ নিয়ে। হবহাউস (*Hobhouse*) এ সম্পর্কে খুব সুন্দর কথা বলেছেন। তাঁর মতে, আমরা জোর করে সমাজবিজ্ঞানে নীতিবিজ্ঞানকে বা আদর্শ ও মূল্যাবধারণকে টেনে আনছি না। সামাজিক উন্নতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে করতেই আমরা নীতিবিজ্ঞানে এসে পৌঁচেছি। তিনি বলেন, আমরা সমাজ এবং তার ক্রমোন্নতি নিয়ে শুরু করেছিলাম। আলোচনা করে দেখলাম যে পরিপূর্ণভাবে উন্নত সামাজিক জীবন হল মানুষের ক্ষমতার সামঞ্জস্যপূর্ণ উপলব্ধি (A fully developed social life is a harmonious relation of human capacity)। এ সিদ্ধান্তে এসেছি দুটি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। "সমাজকে একটি স্থিত বিষয়

(গ) মনস্তত্ত্বমূলক (Psychological) এবং (ঘ) সমাজবিদ্যা সম্পর্কীয় (Sociological)। আমরা পর পর এই শর্তগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করছি :

সামাজিক ক্রমোন্নতির শর্তগুলি আলোচনা করার পূর্বে আমাদের বিশেষ করে একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। যে-কোন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সমগ্র সমাজ-জীবনের উপর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন, শিল্প-সংক্রান্ত কোন পরিবর্তনের ফল যে কেবল শিল্পের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে এমন কোন কথা নেই, তার গণ্ডীর বাইরেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে। হয়ত এ পরিবর্তনের ফলে নতুন সংগঠনের সৃষ্টি হতে পারে, শ্রেণী সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটতে পারে; রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটাও অসম্ভব নয়। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোন শর্তই একাকী কার্যকরী হয় না। আলোচনার জন্যই শর্তগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করতে হয়। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে তাদের পৃথক করা হয় বলে বাস্তবেও যে তারা পৃথকভাবে কার্যকরী হয় তা নয়।

সামাজিক ক্রমোন্নতির শর্তগুলি পৃথক নয়— একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল

হিসেবে বিশ্লেষণ করে আমরা পাই একটা সহযোগিতার বিধি। 'কল্যাণ'কে কতকগুলি সুসংগঠিত মূল্য হিসেবে বিশ্লেষণ করে আবার পাই একটা সহযোগিতার বিধি। উভয়ের মধ্যে যে পরিমাণে মিল আছে তাই সমাজ-জীবনে মূল্যের স্থান সূচনা করে। সামাজিক বিধি হচ্ছে নৈতিক বিধিরই একটি বিশেষ দিক" ("Analysing a society as an existent fact, we find in it a co-operative principle. Analysing the good as a system of values we again find the co-operative principle. So far as there is coincidence, there is an element of value in social life. The social principle is an aspect of the ethical.")। সোজা কথা হল, আত্মিক সামঞ্জস্যের ভিত্তিই হল 'মঙ্গল' বা 'কল্যাণ' এবং জীবনে বা সমাজে সে সামঞ্জস্য লাভ করতে গেলে মঙ্গল বা কল্যাণকে উপলব্ধি না করে উপায় নেই। কল্যাণ হচ্ছে নীতিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু; ফলে সামাজিক ক্রমোন্নতির সঙ্গে নৈতিক ক্রমোন্নতি এক হয়ে যাচ্ছে।

Hobhouse এ সম্বন্ধে বলেন, 'In sum, as a whole and in its completeness social development coincides with ethical development.' (Ibid: Page 93-94.)

(ক) পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কীয় শর্ত (Environmental Conditions) :

এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলতে কাকে বুঝব? প্রথমতঃ, আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলতে বুঝতে পারি সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ যার কোলে মানুষের প্রথম জীবন শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, বুঝতে পারি সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ বা প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক—সব মিলিয়ে একটা বৃহত্তর পরিবেশ যাকে মানুষ নিজের প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত করে নেয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষভাবে মানুষের সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে। অত্যধিক তাপ বা শৈত্য কোনটিই মানুষের পরিশ্রম করার পক্ষে অনুকূল অবস্থা নয়, যেখানে মাটি অনুর্বর সেখানে সমাজ গড়ে ওঠে না। আবার সেসব জায়গায় শিল্পের উন্নতি লক্ষ্য করা যায় যেখানে খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। অনুকূল পরিবেশ সামাজিক উন্নতি ত্বরান্বিত করে, প্রতিকূল পরিবেশ সামাজিক উন্নতিতে বাধা সঞ্চার করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ সমাজ-জীবনের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোকদের মধ্যে শ্রমশীলতার যে পার্থক্য আমরা দেখি, প্রাকৃতিক আবহাওয়া তার অন্যতম কারণ। অবশ্য একথা মনে করলে ভুল হবে যে, প্রাকৃতিক পরিবেশই (Physical environment) প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক ব্যবস্থাকে সংগঠিত করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের সামনে নিয়ে আসে নতুন সমস্যা। মানুষ তার বুদ্ধি, জ্ঞান, সংগঠন শক্তি ও পরিশ্রমের সহায়তায় সেই সব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে এবং তারই ফলে সমাজের বিকাশ সাধিত হয়। বস্তুতঃ, মানুষের চিন্তা এবং ইচ্ছাই হল তার শক্তির উৎস। পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্ধারণ করে দেয়, কোন্ পথে সেই শক্তিকে পরিচালিত করতে হবে।

সমাজ-জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

অবশ্য সামাজিক ক্রমোন্নতির ব্যাপারে পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের প্রচেষ্টার পক্ষে সহায়কও হতে পারে আবার বাধাও সৃষ্টি করতে পারে।

পরিবেশ দুভাবে কাজ করে—প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক ক্রমোন্নতিকে সহায়তা করে এবং পরোক্ষভাবে বাধা সৃষ্টির দ্বারা মানুষের কর্মশক্তিকে উদ্দীপিত করে তার কাজে সহায়তা করতে পারে। পরিবেশ শিল্পোন্নতি, মানুষের স্বাস্থ্য, মানুষের নিরাপত্তা ও মেলামেশার পক্ষে অনুকূল ও প্রতিকূল হতে পারে।

(খ) জৈবিক শর্ত (Biological Conditions):

কারও কারও মতে বংশগত উন্নতি সামাজিক ক্রমোন্নতির শর্ত। অনেকের মতে সামাজিক ক্রমোন্নতির জৈবিক শর্ত হচ্ছে জীবন সংগ্রামে 'যোগ্যতমের বাঁচা'র (survival of the fittest) অধিকার। যেহেতু 'যোগ্যতমই বেঁচে থাকবে' ও দুর্বল ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে যাবে, সেহেতু বংশপরম্পরায় সমাজ ক্রমোন্নতির পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হবে। কিন্তু মানুষের সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতাবোধ (Sense of Justice)-এর সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে সমাজে দুর্বলের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বস্তুতঃ, যোগ্যতমেরই বাঁচার অধিকার আছে—এ ধারণা মানুষের ক্রমোন্নতিকে ব্যাখ্যা করার পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়; বরং সকল সামাজিক সংগঠনই 'জীবন-সংগ্রাম'-এর বিরোধী। প্রত্যেক সামাজিক সংগঠনই তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে যাতে তার সভ্যদের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হয় এবং তার ফলে যারা দুর্বল, কর্মশক্তিহীন তারাও টিকে থাকে। মানুষের যতই অগ্রগতি হতে থাকে, বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম ততই কমতে থাকে।

'জীবন-সংগ্রাম' বা 'যোগ্যতমেরই বাঁচার অধিকার' যুক্তিযুক্ত ধারণা নয়

কারও কারও মতে যোগ্যতম ব্যক্তি নয়, যোগ্যতম গোষ্ঠীর বেঁচে থাকার মধ্যেই সামাজিক ক্রমোন্নতি নিহিত।

কিন্তু এ মতবাদ যুক্তিগ্রাহ্য নয় এবং ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিতও নয়। মানুষের নীতিবোধ এবং ধর্মবিশ্বাস এ কথাই বলে যে শুধু নিজের গোষ্ঠীর নয়, অপর গোষ্ঠীর সভ্যদের প্রতিও মানুষের কর্তব্যবোধ আছে। ইতিহাসে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধের কথা থাকলেও বহু গোষ্ঠীর একত্রিকরণের মাধ্যমে সমাজ-জীবনের বিস্তৃতির দ্বারাই সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব।

জৈবিক মতবাদের দিক দিয়ে কারও কারও মতে সামাজিক উন্নতির জন্য উপযুক্ত মাতাপিতা নির্বাচন করে নিতে হবে। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের অনেকখানি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া; সেহেতু যদি উপযুক্ত মাতাপিতা সন্তান উৎপাদন করে তাহলেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উৎকর্ষ দেখা দেয়। সমাজের কাজ হল উপযুক্ত নরনারীকেই পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সুযোগ দেওয়া এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। কিন্তু এ মতবাদ ব্যক্তির অর্জিত গুণগুলিকে কি ভাবে পাওয়া যাবে তার কোন ব্যাখ্যা দেয় না। বংশগতি ছাড়াও মানুষের অর্জিত গুণের সামাজিক ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান আছে। বংশগত উন্নতি সামাজিক ক্রমোন্নতির পক্ষে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু উভয়কে অভিন্ন গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়।

(গ) **মনস্তত্ত্বমূলক শর্ত** (Psychological Conditions): সমাজ হল মনস্তত্ত্বমূলক সংগঠন। মানুষের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ও সম্পর্ক থেকেই সমাজের উদ্ভব। মানুষের মনই এই পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। মনের সঙ্গে যা কিছুর সম্পর্ক, সমাজ-জীবনের উপরে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান।

হবহাউসের মতে মনের উন্নতিই সামাজিক ক্রমোন্নতির মনস্তত্ত্বমূলক শর্ত। উন্নত, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সমগ্রের দিকে লক্ষ্য রেখে কার্য করে এমন মনই সামাজিক ক্রমোন্নতির তৃতীয় শর্ত। মনের উন্নতি বলতে হবহাউস বোঝেন, মানুষের স্বাভাবিক আচরণ ও বাসনাকে বিচারবুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার (rational will) অধীনস্থ করা বা সমগ্রের দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করতে পারে। বিচার-বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার কাজ হল মূল-স্বার্থগুলির (Root-interests) মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা, যার ফলে কোনরকম বিরোধের সৃষ্টি না করে মানুষের অসংখ্য আবেগ ও বাসনা পরিপূর্ণভাবে ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। হবহাউস (*Hobhouse*)-এর মতে মানুষের সরলতম ক্রিয়ার মধ্যেও আবেগ ও অনুভূতির উপস্থিতি প্রতীয়মান হয়। অনুভূতি ও আবেগের সাধারণ উপাদান (Common element) হল স্বার্থ (interest) যা উভয়কে নিয়ন্ত্রিত করে। বিভিন্ন স্বার্থের ভিত্তি রূপে রয়েছে কতকগুলি মূল-স্বার্থ (root-

interests)। এই মূল-স্বার্থ বা প্রয়োজনগুলিই জীবনের ভিত্তি স্বরূপ। সময় সময় মনে হতে পারে যে আমরা চিন্তার (thought) দ্বারা চালিত হচ্ছি। আসলে এই মূল-স্বার্থগুলিই আমাদের চালিত করে। চিন্তা, আবেগ ও অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। যদি মূল স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয় তাহলে বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা তাদের নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

মানুষের মূল-স্বার্থ (Root-interest) আত্মকেন্দ্রিক (egoistic) হতে পারে, সামাজিক (social) হতে পারে, জ্ঞানমূলক (cognitive) হতে পারে, গঠনমূলক (constructive) হতে পারে। আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থ হল আত্মস্বার্থ। আত্মস্বার্থের ক্ষেত্রে আছে বিরোধ ও অসংগতি। সামাজিক স্বার্থ বলতে অপরের স্বার্থ সম্পর্কে চেতনা বোঝায়। সামাজিক স্বার্থের ক্ষেত্রেই ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির সহানুভূতি এবং সামাজিক জীবনের প্রতি ও সংগঠনের প্রতি অনুরাগ দেখা দেয়। জ্ঞানমূলক স্বার্থ বলতে বোঝায় কোন বস্তুর সংগঠন এবং পদ্ধতি বুঝে নেবার আগ্রহ। সংগঠনমূলক স্বার্থ কোন বিষয়ের গঠন ও পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। মানুষের আবেগ ও অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করলে এই সব স্বার্থের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ও সংযোগ লক্ষ্য করা যাবে। অন্যান্য স্বার্থের সঙ্গে সামাজিক স্বার্থ যখন মিশ্রিত হয়—অর্থাৎ আত্মস্বার্থ, সামাজিক স্বার্থ, জ্ঞানমূলক স্বার্থ এবং গঠনমূলক স্বার্থ—এই চারটি স্বার্থের যখন মিশ্রণ ঘটে, তখনই পারস্পরিক সহানুভূতির (corporate feeling) ভিত্তি সৃষ্টি হয় যা মানুষকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে। মনের উন্নতি তখনই হয় যখন আমাদের এসব মূল স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়।

(ঘ) **সমাজবিদ্যা সম্পর্কীয় শর্ত** (Sociological Conditions): সামাজিক মানসতা (Social mentality), সাধারণ ইচ্ছা (common will) উৎপন্ন করার ব্যাপারে সহায়ক। কোন সমাজই উন্নত হতে পারে না যদি সমাজের ব্যক্তিরা সমাজের ঐক্য ও সাধারণ কল্যাণের জন্য কাজ না করে। সমাজ সাধারণ আবেগের বশবর্তী হয়ে কাজ করতে পারে, বা লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন না হয়েও কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ করতে পারে বা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করতে পারে।

কিন্তু যখন সমগ্র সমাজ সমাজের সাধারণ কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে তাকে লাভ করার জন্য সচেষ্ট হয় তখনই সমাজের সাধারণ ইচ্ছার (Common will) কথা বলা যেতে পারে।

সাধারণ ইচ্ছা হল বিভিন্ন ব্যক্তির সমষ্টিগত বাস্তব ইচ্ছা। ব্যক্তির ইচ্ছার ঊর্ধ্বে কোন সাধারণ ইচ্ছা নেই। এই সাধারণ ইচ্ছার অন্তরালে এক ঐক্য বর্তমান। তা হল সামাজিক চেতনা। এই চেতনা হল মানুষে মানুষে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তারই ফলে গড়ে ওঠে এমন একটা নিয়ম-পদ্ধতি যা যে-কোন ব্যক্তি যতটুকু জানে তার থেকে অনেক ব্যাপক (interaction which builds up an order much greater than anything which the individual knows)। এ হল সামাজিক মানসতা (social mentality), যা বহু মানুষের মনে পরস্পরের প্রতিক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত হয়। হবহাউস (*Hobhouse*-এর মতে এ সামাজিক মানসতা সামাজিক ক্রমোন্নতির অনিবার্য শর্ত।[1]

সামাজিক মানসতা সামাজিক ক্রমোন্নতির অনিবার্য শর্ত

প্রত্যেক সমাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত এই সাধারণ ইচ্ছার সৃষ্টি করা যাতে সমাজের সভ্যবৃন্দ সামাজিক ঐক্য ও জনকল্যাণের জন্য কাজ করে। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক মানসতা বা সামাজিক চেতনাকে বিকশিত করা। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যে আঙ্গিক সম্পর্ক সে সম্পর্কে প্রতিটি ব্যক্তি যদি সচেতন হয় তাহলেই সমাজের ক্রমোন্নতি সহজে সম্ভব। সামাজিক চেতনার লক্ষ্য হল এই আঙ্গিক সম্পর্ক। এই সামাজিক চেতনাকে বিকশিত করে তোলা প্রয়োজন। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হলেও সকল সময় বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয় না। সে কারণে বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় তার আবেগ ও প্রবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনের একান্ত প্রয়োজন। তাহলেই সামাজিক চেতনার উদ্ভব হবে, ফলে মানুষ সমাজের সঙ্গে তার যে আঙ্গিক সম্পর্ক তা উপলব্ধি করবে এবং

1. "Social mentality is the governing factor in social life and its development therefore is the governing factor in social development."
—*L. T. Hobhouse*: Social Development; Page 185

জনকল্যাণের আদর্শকে কাজ করার জন্য ব্রতী হবে। সামাজিক চেতনার উদ্দেশ্য হল এই আদর্শকে উপলব্ধি করা, এর ফলেই ব্যক্তি নিজেকে বিকশিত করবে।

কিন্তু সামাজিক চেতনাকে বিকশিত করা সম্ভব নয়, যদি না মানুষের সামনে কোন ধর্মনিষ্ঠ নৈতিক (ethico-religious) আদর্শ তুলে ধরা হয়। জনকল্যাণের আদর্শ হল নৈতিক আদর্শ এবং ধর্মবোধ মানুষকে সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শের সন্ধান দেয়। এই ধর্ম এবং নৈতিক আদর্শ যদি ব্যক্তির সামনে তুলে ধরা যায় তাহলেই তার সামাজিক চেতনার বিকাশ সম্ভব।

সুতরাং সিদ্ধান্তে আমরা একথা বলতে পারি যে সামাজিক ক্রমোন্নতি নির্ভর করে পরিবেশের উপর, কতকগুলি জৈবিক শর্তের উপর এবং এ ছাড়া কয়েকটি মনস্তত্ত্বমূলক শর্তের উপর। কিন্তু এ সবচেয়ে বেশী নির্ভর করে মানুষের সামাজিক চেতনার উপর। এই সামাজিক চেতনার বিকাশ পরোক্ষভাবে নির্ভর করছে ধর্ম ও নৈতিক আদর্শের উপরে। সুতরাং নৈতিক উন্নতির সঙ্গে সামাজিক ক্রমোন্নতি বিশেষভাবে যুক্ত।

৭। বিবর্তন কাকে বলে? (What is Evolution ?):

ইংরেজি *Evolution* কথাটি এসেছে Latin শব্দ *evolve* থেকে, যার অর্থ হল বিকশিত হওয়া বা প্রকাশিত হওয়া (To develop or to unfold)। বিবর্তন হল যা অপ্রকাশিত এবং অব্যক্ত ছিল, ধীরে ধীরে তা প্রকাশিত এবং অভিব্যক্ত হওয়া। ধীরে ধীরে একটা ক্রমবিকাশের ধারায় এই অব্যক্ত ও অপ্রকাশিত নিজেকে ব্যক্ত করে। বিবর্তন (Evolution) এবং অগ্রগতি (Progress) এক কথা নয়। অগ্রগতি বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট উচ্চ বা শ্রেয় লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু বিবর্তনসম্মত পরিবর্তন হল গিসবার্ট (*Gisbert*)-এর কথায়, "একটি ধারার বিভিন্ন শাখায় বিস্তারিত হওয়া, যে শাখাগুলি আবার অনির্দিষ্টভাবে প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।"[1]

বিবর্তন ও অগ্রগতি এক বা অভিন্ন নয়

1. "If we revert to the question of evolutionary change, we may describe it as the branching off, of a line in various direction, which again ramify indefinitely."

— *Gisbert* : Fundamentals of Sociology; Page 374

বিবর্তনবাদ অনুযায়ী জগৎ ও জগতের প্রতিটি বস্তুই সরল অবস্থা থেকে ক্রমবিকাশের ফলে জটিল অবস্থায় এবং সমসাত্ত্বিক অবস্থা থেকে বিষমসাত্ত্বিক অবস্থায় (from homogeneous to heterogeneous stage) উপনীত হয়েছে। বিবর্তন বলতে কেবলমাত্র ক্রমবৃদ্ধি বোঝায় না। বিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন কেবলমাত্র আকারে নয়, গঠনেও। যদি কোন বস্তু বা কোন কিছু সম্পূর্ণভাবে বাইরের শক্তির দ্বারা পরিবর্তিত হয় তাহলে তাকে আমরা বিবর্তন বলি না। বস্তুটির গঠনের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি তার দ্বারা পরিবর্তিত হলেই তবে তাকে বিবর্তন বলি। এই মতবাদ অনুযায়ী আজ এই পৃথিবীতে যে বিভিন্ন শ্রেণীর জীব (species) আমরা লক্ষ্য করি, অতীতের কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর জীব থেকে উদ্ভূত হয়ে ক্রমবিকাশের পথে সেগুলি বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে।

কোন বস্তু যখন তার অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা পরিবর্তিত হয় তখনই বিবর্তন সূচিত হয়

সামাজিক বিবর্তন বলতে বোঝায় মানুষের আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস সামাজিক এবং রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সরল অবস্থা থেকে ধীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জটিল অবস্থায় উপনীত হওয়া।

৮। সামাজিক বিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories on the Nature of Social Evolution) :

প্রশ্ন হল, সমাজের এ ধরনের কোন বিবর্তনের কথা বলা যেতে পারে কিনা ?

অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, 'বিবর্তন' সমাজের বা সামাজিক বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না। তাঁদের মতে সামাজিক বিবর্তন বলে কিছু নেই, আছে সামাজিক পরিবর্তন। কিন্তু কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক বিবর্তনের সত্যতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে তাঁদের মধ্যে সামাজিক বিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়।

অনেকের মতে সমাজের বিবর্তন হয় না

হারবার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) এর মতে সমাজের বিবর্তন বিশ্বের সাধারণ বিবর্তন প্রক্রিয়ারই একটি অংশ বা অঙ্গ। সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ক্রমবিকাশের ফলে সামাজিক ব্যবস্থা সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায়, সমসাত্ত্বিক অবস্থা থেকে বিষম সাত্ত্বিক অবস্থায় উপনীত হয়েছে। সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে ঐক্যবিধান এবং পৃথকীকরণ পাশাপাশিই চলতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার (social systems) আবির্ভাব ঘটে। ফলে স্পেনসার (*Spencer*)-এর মতে বিবর্তন প্রক্রিয়ার তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। যথা—(১) ঐক্যবিধান (Integration), (২) পৃথকীকরণ (Differentiation) এবং (৩) নিয়মানুগত্য (Determination)। প্রথমতঃ, ঐক্যবিধান প্রক্রিয়া অনুযায়ী বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সংহতির (system) সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, পৃথকীকরণের ফলে ঐক্যের বা সংহতির মধ্যে আবার বিভেদ দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ, এই ঐক্যবিধান ও পৃথকীকরণ একটি নিয়ম মেনে চলে। হারবার্ট স্পেনসার (*Herbert Spencer*)-এর মতে সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রেও এই তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

Spencer এর মতে সামাজিক বিবর্তনের স্বরূপ

পরিবার হল সমাজের কেন্দ্রীয় সংগঠন। সমাজের বিবর্তনের প্রথম অবস্থায় বিভিন্ন পরিবার বিভিন্ন সংগঠন হিসেবে বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরস্পরের থেকে বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ঐক্যবিধান প্রক্রিয়ার ফলে এই সব বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত পরিবার সুসংবদ্ধ হয়ে সমাজ গড়ে তুলল। দ্বিতীয়তঃ, পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া অনুসারে শ্রমবিভাগহেতু এই সমাজের মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির আবির্ভাব ঘটল। কিন্তু ঐক্যবিধান প্রক্রিয়া অনুসারে এগুলি আবার সুসংবদ্ধ হয়ে নতুন সামাজিক সংগঠনের সৃষ্টি করল। এই ঐক্যবিধান ও পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করে, কাজেই বিবর্তন প্রক্রিয়ার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়মানুগত্যও কার্যকরী হয়। হারবার্ট স্পেনসার (*Herbert Spencer*)-এর মতে সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতির এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

ম্যাকাইভার ও পেইজ (*MacIver and Page*)-এর মতে সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে নৈতিক অগ্রগতির কোন সম্পর্ক নেই এবং বিবর্তনের মূল প্রথা হল পৃথকীকরণ (differentiation)। তাঁদের মতে সামাজিক বিবর্তন হল একটা সংহতির (system) মধ্যে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ফলে একটি সংহতি বা সমগ্রতার মধ্যেই আকারগত ও ক্রিয়াগত বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক বিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে MacIver ও Page-এর অভিমত

ই. সি. হেজ (*E. C. Hayes*)-এর মতে[1] সামাজিক বিবর্তন মানুষকে এক নিম্নতর অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত করে। সামাজিক বিবর্তনই মানুষকে মর্যাদা দান করে এবং তার মধ্যে নৈতিক চেতনা এনে দেয়। তাঁর মতে সামাজিক বিবর্তনের পথে নতুন ধরনের কলার (Art), সাধারণ ধারণার (Concepts) এবং নৈতিক আদর্শের ও সামাজিক আদর্শের আবির্ভাব ঘটে।

E. C. Hayes-এর অভিমত

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে[2] সামাজিক বিবর্তনের একটা নির্দিষ্ট গতিপথ আছে। সামাজিক বিবর্তন হল ধীর ক্রমবিকাশের ধারায় উত্তরোত্তর অবস্থায় উপনীত হওয়া।

সমালোচনা (Criticism):

সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজ-দার্শনিকদের অভিমতগুলি এবার বিচার করে দেখা যাক:

বিবর্তনের ধারায় সমাজ সমসাত্ত্বিক থেকে বিষমসাত্ত্বিক অবস্থায় উপনীত হয়েছে—হারবার্ট স্পেনসার (*Herbert Spencer*)-এর এ ধারণাও ভ্রান্ত। তাছাড়া, হারবার্ট স্পেনসার (*Herbert Spencer*) সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতিকেও অনেকটা অভিন্ন বলে ধারণা করেছেন, তাও যথার্থ নয়। কোন এক সময় একটি নতুন সামাজিক ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে বলেই যে সেটি ভাল তা বলা চলে না।

Herbert Spencer-এর অভিমতের সমালোচনা

1. *E. C. Hayes*: Introduction to the Study of Sociology. Page 283
2. *Bogerdus*: Sociology, Page 389

অনেকে মনে করেন যে, সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি এক ও অভিন্ন, কিন্তু সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি অভিন্ন নয়,

সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি এক ও অভিন্ন নয়

সামাজিক বিবর্তন হল সমাজের ক্রমবিকাশ। সামাজিক অগ্রগতি হল একটি লক্ষ্যের বা আদর্শের অভিমুখে সমাজের অগ্রগমন ও ক্রমোন্নতি। সামাজিক বিবর্তনের গতি যে সকল সময়ই নৈতিক, সৌন্দর্যগত ও বুদ্ধিগত আদর্শের দিকে এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। সমাজের বিবর্তন অনেক সময় কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কোন লক্ষ্যের অভিমুখে নাও চলতে পারে।

ম্যাকাইভার ও পেজ (*MacIver and Page*)-এর অভিমতও সর্বাংশে সত্য নয়। সমাজের বিবর্তনের মূলে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া বর্তমান থাকলেও কেবলমাত্র ঐক্যবিধান এবং পৃথকীকরণ—এই দুই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সামাজিক বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ প্রক্রিয়া ভাষা এবং ধর্মের

MacIver ও Page-এর অভিমতের সমালোচনা

বিকাশের ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। বাংলা, গুজরাটি, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃত থেকে আগত হলেও সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য এ ভাষাগুলিতে নেই। কেবলমাত্র পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলেই ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবার বা রাষ্ট্র থেকে উৎপন্ন হয়নি। এখানে অন্য শক্তিও কাজ করছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পৃথকীকরণ প্রক্রিয়াকে প্রয়োগ করা যায় না। একথাও বলা হয় যে, যেহেতু সমাজ মানসিক ব্যাপার, সেহেতু সমাজের বিবর্তন হল মনের বিবর্তন। কিন্তু মন তা কেবলমাত্র পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা চালিত হয় না, সরলতা এবং সমন্বয় (simplification and synthesis) প্রক্রিয়ার দ্বারাও সমাজের বিবর্তন ঘটে থাকে।

এসব কারণে অনেকে মনে করেন যে, সমাজের পরিবর্তনকে 'সামাজিক বিবর্তন' না বলাই যুক্তিযুক্ত।

সিদ্ধান্ত :

আবার কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সামাজিক বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। গিন্‌সবার্গ (*Ginsberg*) তাঁর '*The*

Concept of Evolution' প্রবন্ধে সামাজিক বিবর্তনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন—"এ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা শেষ পর্যন্ত নতুন কিছু উৎপাদন করে কিন্তু যার পরিবর্তনের মধ্যে একটা সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা আছে।[1] বিবর্তন মানেই যে সরলতা থেকে জটিলতায় যাওয়া, গিন্‌সবার্গ (*Ginsberg*) তা স্বীকার করেননি। তাঁর মতে এ বিশ্বজগৎ যে-কোন পূর্ববর্তী সরল অবস্থা থেকে উদ্ভূত, তা বিশ্বাস করার কোন সংগত কারণ নেই। আদিম যুগের ভাষা যে বর্তমান যুগের ভাষার তুলনায় অনেক সরল ছিল, তা ঠিক নয়।

গিন্‌সবার্গ (*Ginsberg*) বিবর্তনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দুটি: (১) পরিবর্তনের মধ্যে একটা কিছু যা স্থায়ী, (২) নতুনত্ব। সমাজের বিবর্তন তার আভ্যন্তরীণ শক্তির দ্বারাই প্রধানতঃ সাধিত হয়, যদিও বাইরের পরিবেশকে উপেক্ষা করা চলে না। এ দিক থেকে দেখতে গেলে সমাজ-বিবর্তন হচ্ছে সমাজস্থ ব্যক্তিদের বিবর্তন। গিন্‌সবার্গ (*Ginsberg*) বলেন, "যে যথার্থ বিকশিত হচ্ছে সে হল সমাজস্থ মানুষ, যারা কথা বলে, চিন্তা করে এবং ধর্মানুরাগী।[2] কিন্তু এ মানুষের বিবর্তন হলেও সমাজের সমগ্রতা এবং ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতেই এ বিবর্তনকে বুঝে নিতে হবে। অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তনের যে উপাদান সেগুলি সমাজের অভ্যন্তরে নিহিত থাকে। একথা ঠিক যে, সামাজিক পরিবর্তনের মূলে আছে সমাজস্থ ব্যক্তির মন, বিভিন্ন মনের পারস্পরিক ক্রিয়া এবং তার পরিণতি। কিন্তু যদিও সামাজিক ঘটনা মানুষের সঙ্গে মানুষের জটিল ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার পরিণাম এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই তাদের জানা যায়, তবুও মানুষ যদি একটা সমগ্রতার অঙ্গস্বরূপ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা না করে, তবে কোন সামাজিক ঘটনা কখনই সম্ভব হতে পারে না। গিন্‌সবার্গ (*Ginsberg*,

সামাজিক বিবর্তন আসলে সমাজস্থ ব্যক্তির বিবর্তন

1. "It is a process of change culminating in the production of something new but exhibiting an orderly continuity in transition."
—*M. Ginsberg*: Studies in Sociology, Page 7[illegible]

2. "The real subjects undergoing development are men on societies who speak and think and are religious."
—*M. Ginsberg*: Studies in Sociology, Page 8.

বলেন, "কিন্তু যদি ব্যক্তিই সমাজ তৈরী করে থাকে, তাহলে, এও সমান সত্য যে, সমাজ ব্যক্তিকে তৈরী করে।"[1] সুতরাং সমাজের বিবর্তন যেমন এক হিসেবে ব্যক্তির বিবর্তন, তেমনি সমাজেরও বিবর্তন।

সমাজ দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে সামাজিক বিবর্তনের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য।

৯। সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি (Social Evolution and Social Progress) :

সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি এক ও অভিন্ন নয়। বিবর্তনের (evolution) মধ্যে রয়েছে ঐক্যবিধান এবং পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া, অগ্রগতি (progress) "হল এমন এক দিকে ক্রমোন্নতি বা বিবর্তন যা কোন আদর্শ বা মূল্যের বিচারসিদ্ধ মানকে পূরণ করে।" (a development or evolution in a direction which satisfies rational criteria of value.)

ইংরেজী Progress কথাটি ল্যাটিন শব্দ *Progradi* (*Pro*=সামনে এবং *gradi*=যাওয়া) থেকে উদ্ভূত যার অর্থ হল সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া বা অগ্রগতি। অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটা লক্ষ্য থাকে। যখন কোন পরিবর্তন লক্ষ্যের অভিমুখে বস্তুকে চালিত করে তখন লক্ষ্য থেকে বস্তুটি কতদূরে আছে তার সাহায্যে বস্তুর কতটুকু অগ্রগতি হল তা বোঝা যায়।

সমাজের বিবর্তন হল সমাজের বিকাশ বা ক্রমবৃদ্ধি। সামাজিক অগ্রগতি হল মানুষ যে সামাজিক ও নৈতিক গুণগুলিকে মূল্য দেয়, সমাজস্থ মানুষের জীবনে সেই গুণগুলির অধিকতর প্রকাশ, বিকাশ ও স্থায়িভাবে রূপায়িত হওয়া।

সামাজিক বিবর্তনের ফলে সমাজের বাইরের এবং ভিতরের নানারকম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির বিষয়টি অন্য মানদণ্ডের সহায়তায় বিচার্য। অগ্রগতি নির্ধারণ করার জন্য নৈতিক আদর্শের প্রয়োজন। সমাজের অগ্রগতি হল সমাজস্থ ব্যক্তির অগ্রগতি এবং ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি তার অগ্রগতির অন্যতম অনিবার্য শর্ত। কিন্তু অনেকে মনে করেন, সামাজিক

বিবর্তন বৈজ্ঞানিক ধারণা ও অগ্রগতি নৈতিক ধারণা

1. "But if individuals make society, it is equally true that society make individuals." —M. Ginsberg : Studies in Sociology. Page 87

বিবর্তনের সঙ্গে নৈতিকতার বা নৈতিক মূল্যের কোন সংযোগ নেই। অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্ক আদর্শের, বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্ক বাস্তব ঘটনার। ম্যাকাইভার (*MacIver*) বলেন, 'সংক্ষেপে বিবর্তন হল বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং অগ্রগতি হল নৈতিক ধারণা'।[1]

সামাজিক বিবর্তনের ফলে সমাজের বাহ্যিক রূপ ও আভ্যন্তরীণ স্বরূপের কতকগুলি পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু তা বলে এমন কথা বলা যেতে পারে না যে, তাতে সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। হবহাউস (*Hobhouse*) বলেন, "কোন একটি বস্তু বিবর্তিত হয়, এতে প্রমাণ হয় না যে সে-বস্তুটি ভাল ; সমাজ বিবর্তিত হয়েছে, এতে প্রমাণ হয় না যে সমাজের অগ্রগতি হয়েছে।[2]

কিন্তু অনেক লেখক উভয়কে অভিন্ন গণ্য করেছেন। কোঁৎ (*Comte*), হারবার্ট স্পেন্সার (*Herbert Spencer*), লেস্টার ওয়ার্ড (*Lester Ward*) প্রভৃতি মনে করেন যে, সমাজের বিবর্তন সমাজের অগ্রগতি সূচনা করে উদাহরণ স্বরূপ হারবার্ট স্পেন্সার মনে করেন যে, সমাজ যখন বিবর্তিত হতে থাকে, তখন সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়। তাঁর মতে সামাজিক বিবর্তন মূলতঃ সামাজিক অগ্রগতি। কিন্তু এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজের বিবর্তন সাধিত হলেই সমাজের অগ্রগতি ঘটে না। সমাজের বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে অনেক সময় দেখা গেছে যে, সমাজের অগ্রগতি সাধিত না হয়ে সমাজ পশ্চাদগামী হয়েছে। হবহাউস (*Hobhouse*) হারবার্ট স্পেন্সারের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি যে, সামাজিক বিবর্তন সামাজিক অগ্রগতির সূচক। তাঁর মতে সামাজিক অগ্রগতি সমাজের ব্যক্তিদের নৈতিক উন্নতির উপর নির্ভর এবং সে কারণে উভয়ের মধ্যে কোন সংযোগ নেই। হবহাউসের মতে সামাজিক অগ্রগতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে না, সমাজের ব্যক্তিদের সচেতন প্রচেষ্টায় একে লাভ করা যায়। সমাজস্থ ব্যক্তিরা যখন নৈতিক মূল্য লাভে যত্নবান হয় তখনই সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়।

হবহাউসের অভিমত

1. "......in short......evolution is a scientific concept and progress an ethical concept." —*MacIver* : Society : Page 5..

2. "The fact that a thing is evolving is no proof that it is good, the fact that society has evolved is no proof that it has progressed." —*Hobhouse* : Social Evolution and Political Theory

কিন্তু হবহাউসের অভিমত সন্তোষজনক নয়। তিনি সামাজিক অগ্রগতিকে নৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করেছেন। সামাজিক অগ্রগতির মধ্যে সমাজের নৈতিক, জাগতিক, বুদ্ধিগত এবং সৌন্দর্য্য সম্পর্কীয়, সব রকম অগ্রগতিই নিহিত। যখনই আমরা অগ্রগতির কথা চিন্তা করি তখনই আমরা কোন আদর্শের কথা চিন্তা করি এবং সমাজের অগ্রগতির কথা চিন্তা করার সময় আমাদের দেখতে হবে সমাজ সেই আদর্শের দিকে কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে আদর্শের কোন সম্পর্ক নেই।

সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতির সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্তু সামাজিক বিবর্তনের আলোচনায় সামাজিক মূল্যের প্রশ্নটিকে অযথা টেনে না নিয়ে আসাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য সমাজে বসবাস করতে হলে সামাজিক মূল্যের (Social Values) দিকটিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে তার মধ্যে নৈতিক মূল্যকে টেনে নিয়ে আসা বাঞ্ছনীয় নয়। যখন শান্ত এবং ধীরভাবে কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে কোন বৈজ্ঞানিক ঘটনা অনুসন্ধান করা অপ্রয়োজন, তখন প্রয়োজনে নৈতিক আদর্শকে টেনে আনা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী।[1]

সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতির কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা বিচার করে দেখা যেতে পারে, কিন্তু তা তখনই সম্ভব হবে যখন সামাজিক বিবর্তনকে নৈতিক বিষয় বহির্ভূত ঘটনারূপে প্রথমেই পর্যবেক্ষণ করা হবে।

১০। সামাজিক আদর্শ এবং সামাজিক অগ্রগতি (The Social Ideal and Social Progress):

ইতিপূর্বে আমরা সামাজিক আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সামাজিক আদর্শের আলোচনা স্বভাবতই সামাজিক অগ্রগতির ধারণা এনে দেয়।

1. অবশ্য নৈতিক মূল্যাবধানের ব্যাপারটিকে এড়িয়ে কাজ করা সকল সময় সম্ভব নয়। তাছাড়া, প্রতিটি সামাজিক ঘটনার দুটি দিক আছে—একটি বাস্তবতার দিক এবং অপরটি মূল্যের দিক। ম্যাকাইভার ও পেইজ (*MacIver and Page*)-এর কথায় "এসব তথ্য, কিন্তু সামাজিক মূল্যাবধারণের থেকে উদ্ভূত বলে সেগুলি মূল্যগত তথ্য। (They are facts but they are also value-facts arising out of social valuations.)। সকল সামাজিক পরিবর্তনের এ দুটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান। সে কারণেই একটি থেকে আর একটিকে আলাদা করে দেখা উচিত।

বস্তুতঃ যে আদর্শকে উপলব্ধি করার জন্য কোন প্রচেষ্টা করা না হয় সে আদর্শ আদর্শই নয়। আদর্শ মানেই পূর্ব থেকে অনুমান করে নিয়ে তাকে অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়া। অবশ্য একথা ঠিক যে, কোন সমাজের পক্ষে তার আদর্শকে পূর্ণভাবে লাভ করা অর্থাৎ আদর্শ অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য যে সমাজ তার আদর্শকে লাভ করার জন্য সচেষ্ট হবে না, তা নয়। বস্তুতঃ সামাজিক আদর্শের স্বরূপ সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকলে আমরা বলতেই পারি না, সমাজের কোন অগ্রগতি হচ্ছে কি না। কিন্তু কোন অবস্থাতেই সমাজ তার আদর্শ অবস্থায় উপনীত হয়েছে, এমন কথা বলা যেতে পারে না।

সমাজের আদর্শ এবং আদর্শলাভের প্রচেষ্টা এই উভয়ের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে একটা অসুবিধা দেখা দেয়। প্রত্যেকটি সামাজিক কাজের মূল্য বিচার করতে গেলে একটা সামাজিক আদর্শের প্রয়োজন। আবার সামাজিক আদর্শটিকে বুঝতে গেলে সামাজিক কাজের মাধ্যমেই তাকে বুঝতে হবে। সুতরাং কোন্‌টি আগে বা কোন্‌টি পরে এ বিচার করতে গেলে অসুবিধা দেখা দেয়। কিন্তু বিষয়টিকে এভাবে বুঝে নেওয়া যেতে পারে—কোন একটি কাজ করতে গেলে তার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে। এই নির্দিষ্ট লক্ষ্যই সমস্ত কাজটিকে নিয়ন্ত্রিত করে কাজের গতিপথ নির্ধারণ করে। এই লক্ষ্যই সাময়িক ভাবে আদর্শের স্থান গ্রহণ করে ব্যক্তির কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু ঐ লক্ষ্যেও পৌছালে, সে আর লক্ষ্য থাকে না, অন্য কোন লক্ষ্য এর স্থান গ্রহণ করে। এভাবে ব্যক্তি লক্ষ্য থেকে নতুন লক্ষ্যে, আদর্শ থেকে নতুন আদর্শে গমন করে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ব্যক্তি তার পরম আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করতে পারে না।

সামাজিক আদর্শ ও অগ্রগতি পরস্পর নির্ভরশীল

সামাজিক আদর্শ এবং সামাজিক অগ্রগতি যতই হতে থাকে সামাজিক আদর্শের স্বরূপ ততই বেশী উন্নত হয়। যে সামাজিক আদর্শ যত উন্নত, সে সমাজের অগ্রগতিও তত বেশী।

১১। সামাজিক অগ্রগতির স্বরূপ (The Nature of Social Progress) :

সামাজিক অগ্রগতি এবং সামাজিক বিবর্তন এক বিষয় নয়, যদিও উভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। গিন্সবার্গ (*Ginsberg*) অগ্রগতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "এ হল এমন এক দিকে ক্রমোন্নতি বা বিবর্তন যা কোন আদর্শ বা মূল্যের বিচারসিদ্ধ মানকে পূরণ করে"।[1] অগ্রগতি হল কোন একটি অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া। সুতরাং অগ্রগতির ব্যাপারে দুটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যথা—লক্ষ্যের স্বরূপ কি এবং সেই লক্ষ্য থেকে বস্তুটি কতদূরে। আমরা সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ঠিক এই জিনিসকেই বুঝে থাকি। যখন আমরা সামাজিক অগ্রগতির কথা বলি তখন আমরা সর্বপ্রথম একটা আদর্শ সমাজের কথা কল্পনা করি, এই আদর্শ সমাজই হল লক্ষ্য যার অভিমুখে সমাজ অগ্রসর হয়। এই আদর্শ সমাজ হল এমন একটা সমাজ যার ভিত্তি হবে সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর উৎস। যে সমাজে প্রতিটি মানুষ নিজেকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারবে, যে সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করবে, সে সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য হবে সমষ্টিগত কল্যাণ লাভ করা, সেই সমাজে মানুষ কি পার্থিব, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল দিক দিয়েই তার পূর্ণতা লাভ করবে। সমষ্টিগত পার্থিব সুখ ও শান্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উপাদান, যা ছাড়া কোন সুখই স্থায়ী হয় না।

সাধারণতঃ, যদি আমরা দেখি কোন সমাজে মানুষ নিজেকে বিকশিত করার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেছে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের, কলা ও শিল্পের উন্নতি সাধিত হচ্ছে। সেখানে নিরাপত্তা, বন্ধুত্ব, সাধুতা, শ্রমশীলতা, আন্তরিকতা, ভালবাসা, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা এসব বর্তমান আছে এবং সে সমাজে মানুষ নীতিনিষ্ঠ, সামাজিক চেতনাসম্পন্ন, পরার্থপর ও জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ, তখন সে সমাজ যে অন্য সমাজের তুলনায় অধিকতর বাসের যোগ্য তাতে

1. "A development or evolution in a direction which satisfies rational criteria of value.' *M. Ginsberg* : The Idea of Progress ; Page 42

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে কোন একটি সমাজের তুলনায় অন্য সমাজের অগ্রগতি অধিক সাধিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা খুব সহজ নয়, যেহেতু সেক্ষেত্রে ইতিহাস, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের মনস্তত্ত্বমূলক দিকগুলির সুস্পষ্ট জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মনস্তত্ত্বমূলক দিকটি বিশেষ করে অসুবিধাজনক, কারণ, যাঁরা পুরাতনপন্থী তাঁরা মনে করেন অতীত সব সময়ই বর্তমানের তুলনায় ভাল এবং যাঁরা আধুনিক তাঁরা সকল সময় বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রশংসাতেই মত্ত।

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় নৈতিক মূল্যের কোন স্থান নেই এবং যেহেতু সামাজিক অগ্রগতির ভিত্তি নৈতিক মূল্যের উপর, সেহেতু সে অগ্রগতির কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। সামাজিক সম্পর্ক (Social Relation) এবং সামাজিকতা (Sociability)—এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে যখন নৈতিক অনুভূতি অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখনই সামাজিকতার সৃষ্টি। সামাজিক মূল্যের সঙ্গে নৈতিক মূল্য যুক্ত হলে তবে সমাজ গতিশীল হয় উন্নত হয়। বস্তুতঃ, নৈতিক মূল্যকে বাদ দিলে যেমন ব্যক্তিগত জীবনের কোন অর্থ থাকে না অর্থাৎ ব্যক্তির উন্নতি বা অগ্রগতির প্রশ্ন আসে না, অনুরূপভাবে নৈতিক মূল্যকে দূরে সরিয়ে দিলে সামাজিক অগ্রগতির প্রশ্ন অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

সামাজিক অগ্রগতি নৈতিক আদর্শের দ্বারা নির্ণীত

নৈতিক উন্নতির কথা বাদ দিলে সমাজের অগ্রগতির প্রশ্ন অবাস্তব এবং অর্থহীন। হারবার্ট স্পেন্সার (*Herbert Spencer*)-এর অভিমত যে, সমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলে। সমাজ-দার্শনিক হবহাউস (*Hobhouse*) তা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে মানুষের ইচ্ছার দ্বারাই সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব এবং সামাজিক অগ্রগতি সমাজের মানুষের নৈতিক অগ্রগতি। জন্ ডিউই (*John Dewey*)-ও স্বীকার করেন যে, সামাজিক অগ্রগতি মানুষের ইচ্ছার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষ যখন সামাজিক পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে তখনই সামাজিক অগ্রগতি দেখা দেয়।

১২। সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ড (The Criteria of Social Progress):

সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজ-দার্শনিক বিভিন্ন অভিমত পোষণ করেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিমত নীচে আলোচনা করা হচ্ছে:

ব্ল্যাকমার (*Blackmar*) এবং গিলিন (*Gillin*) সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ডের বিস্তারিত তালিকা সন্নিবিষ্ট করেছেন। সেগুলি হল:

সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ড

(১) সমাজের নিবিড় সমগ্রতা (Closer integration of society), (২) সামাজিক গঠন এবং কার্যের মধ্যে পৃথকীকরণ (Differentiation of social structure and function), (৩) অংশগুলির মধ্যে নিবিড় গ্রন্থন (Closer articulation of parts), (৪) প্রতিটি পুরুষ-পরম্পরা বংশধরদের জন্য জীবনের অপেক্ষাকৃত ভাল পরিবেশ (Better conditions of life for each succeeding generation), (৫) জাতি ও গোত্রের উন্নতি (Improvement of race and stock), (৬) সুযোগের সমতা-বিধান (Equalisation of opportunity), (৭) সকলের স্বার্থে অধিকতর সম্পদনিয়োগ (Increased service of wealth in the interest of all), (৮) ব্যক্তির স্বার্থে সমাজের সামাজিক নির্দেশ (Social direction of society in the interest of the individual) এবং (৯) প্রকৃতির শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ (Control over the forces of nature)।

পূর্বোক্ত তালিকাটি খুব সুস্পষ্ট নয়। প্রথম এবং তৃতীয়, চতুর্থ এবং সপ্তম শর্তগুলি প্রায় অভিন্ন। পঞ্চম শর্তটি অন্য শর্তগুলির ফলস্বরূপ। নবম শর্তটি অস্পষ্ট, যেহেতু কোন একটি সমাজ যদি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাহলে সে সমাজের অগ্রগতি সূচিত হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। দ্বিতীয়, ষষ্ঠ এবং অষ্টম শর্ত দুর্বোধ্য।

গিডিংস (*Giddings*)-এর মতে[1] সামাজিক অগ্রগতির বিষয়টিকে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (objective) এবং ব্যক্তি-সাপেক্ষ (subjective)—এই দুই দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ দিক থেকে বিচার করলে সামাজিক অগ্রগতির কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—অধিকসংখ্যক সামাজিক চুক্তি, পার্থিব কল্যাণের বৃদ্ধি, জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং বুদ্ধিসম্মত আচরণের ক্রমোন্নতি। ব্যক্তি-সাপেক্ষ দিক থেকে বিচার করলে জাতীয় চেতনার (Consciousness of the kind) ক্রমোন্নতির মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি প্রকাশিত হয়। সহানুভূতি ও বিচারবুদ্ধিই জাতীয় চেতনার ফলস্বরূপ। সামাজিক সম্পর্কের বৃদ্ধি এবং সহানুভূতির প্রসারের মাধ্যমেই সামাজিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।

Giddings-এর মতে সামাজিক অগ্রগতির লক্ষণ

সামাজিক অগ্রগতি সম্পর্কে গিডিংস (*Giddings*)-এর পূর্বোক্ত অভিমত অনেকটা প্রাচীন। জনসাধ্যার বৃদ্ধি বর্তমান সমাজে সামাজিক অগ্রগতির লক্ষণ নয় এবং বর্তমানে প্রতিটি সভ্য সমাজেই পরিবার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাছাড়া, অনেক সমাজদার্শনিক, জাতীয় চেতনাকে (Consciousness of the kind) বর্তমান যুগে সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে বাধাস্বরূপ মনে করেন। উগ্র জাতীয় চেতনা থেকেই অনেক সময় সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি এবং এই সাম্প্রদায়িকতা সামাজিক অগ্রগতির পথে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে।

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ড হল সমাজস্থ ব্যক্তিদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি। এঁদের মতে সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে পার্থিব কল্যাণ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজের নৈতিক ভিত্তি যদি দুর্বল হয় তাহলে সেই সমাজে অগ্রগতি কখনও সম্ভব নয়। হবহাউস (*Hobhouse*)-ও মনে করেন যে, সামাজিক অগ্রগতি বস্তুতঃ ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি ছাড়া কিছুই নয়। সামাজিক অগ্রগতি হারবার্ট স্পেন্সার (*Herbert*

কারও কারও মতে সামাজিক অগ্রগতি হল ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি

1. *F. H. Giddings*: Principles of Sociology; Page 958.

Spencer)-এর অভিমত অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে না। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সামঞ্জস্যের ক্রমবৃদ্ধিই সামাজিক অগ্রগতির সূচনা করে।

এই সকল সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজ-দার্শনিকদের অভিমত অংশতঃ সত্য। ব্যক্তির নৈতিক উন্নতির উপর সামাজিক অগ্রগতি নির্ভরশীল। কিন্তু সে কারণে সামাজিক অগ্রগতিকে নৈতিক উন্নতি বা আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা কোন মতেই যুক্তিসংগত নয়। তাছাড়া, সামাজিক অগ্রগতির যে-কোন স্তরে ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের পূর্ণ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না।

অনেকের মতে ঐক্য, শৃঙ্খলা এবং সমতাই সামাজিক অগ্রগতির লক্ষণ

অধিকাংশ সমাজ-দার্শনিক বিশ্বাস করেন যে—ঐক্য, শৃঙ্খলা এবং সমতাই সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্য। সি. এস. এলউড (*C. S. Ellwood*)-এর মতে সমাজের ব্যক্তিদের পারস্পরিক উপযোগিতার ফলে সমাজে যে ঐক্যের সৃষ্টি হয়, তাই সামাজিক অগ্রগতির লক্ষণ। গিন্‌সবার্গ (*M. Ginsberg*)-এর মতে সমাজের ব্যক্তিদের পারস্পরিক সহযোগিতা সামাজিক অগ্রগতি সূচনা করে। আবার অনেকের মতে বাইরে থেকে সময় সময় আমরা যে সামঞ্জস্য, ঐক্য বা শৃঙ্খলা দেখতে পাই, তা সামাজিক অগ্রগতির লক্ষণ নয়। কেননা, তার অন্তরালে এমন কোন অসামঞ্জস্য, বিশৃঙ্খলা ও মানসিক অশান্তি বিরাজ করতে পারে যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না।

কোন কোন সমাজ-দার্শনিক মনে করেন যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ক্রমোন্নতিই সামাজিক অগ্রগতির লক্ষণ। আবার অনেক দার্শনিক যাঁরা উপযোগবাদ (Utilitarianism) সমর্থন করেন, তারা মনে করেন যে সমাজের সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ বৃদ্ধি করাই সামাজিক অগ্রগতির লক্ষণ।

ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) মানুষের উন্নতির প্রধান ধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিন প্রকার নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। সেগুলি হল; (ক) মানুষের দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ (The control of natural forces by human agency); (খ) সামাজিক চেতনার দ্বারা ব্যক্তির

1. *Mackenzie* : Outlines of Social Philosophy ; Page 244

নিয়ন্ত্রণ (The control of individuals by the communal spirit) এবং (গ) আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-control)। এই তিন প্রকার নিয়ন্ত্রণের উপর সামাজিক অগ্রগতি নির্ভরশীল।

(ক) **প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব** (Conquest of Nature): মানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ধ্বংসমূলক উদ্দেশ্যে প্রকৃতিকে প্রযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। সমাজের অগ্রগতি মানুষের উচ্চতর শক্তির বিকাশের উপর নির্ভর। কিন্তু উচ্চতর শক্তিকে বিকশিত করতে হলে মানুষের জাগতিক প্রয়োজনের দিকটিকে উপেক্ষা করা যুক্তিসংগত নয়। অবশ্য জাগতিক প্রয়োজনগুলিকে সংগ্রহ করার সময় ব্যক্তিগত কল্যাণের দিকে লক্ষ্য না রেখে সমষ্টিগত কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(খ) **সামাজিক নিয়ন্ত্রণ** (Social Control): সমাজের মধ্যে একাধিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান বর্তমান। সমাজের অগ্রগতি সব সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য জনকল্যাণমূলক হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র সকলেই যদি জনকল্যাণের আদর্শকে গ্রহণ করে ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহলেই সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব।

(গ) **আত্মনিয়ন্ত্রণ** (Self-control): সমাজের অগ্রগতি এক হিসেবে সমাজস্থ ব্যক্তিরই অগ্রগতি। সুতরাং ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, নৈতিক অগ্রগতি ভিন্ন সমাজের অগ্রগতি কখনও সম্ভব নয়। ব্যক্তির পক্ষে সর্বপ্রথম প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার, যে শিক্ষার দ্বারা সে চরিত্র গঠন করবে, তার নিম্ন প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করবে এবং উচ্চতর কামনা-বাসনাগুলিকে উপযুক্ত পথে চালিত করবে। ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় তার কামনা-বাসনাগুলিকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেওয়া। মানুষকে বিচারবুদ্ধির সহায়তায় সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ব্যক্তির মনে সামাজিক চেতনা ও জনকল্যাণের ধারণাটি অনুপ্রবিষ্ট করাতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন ধর্মবোধের। আমরা দেখেছি, প্রকৃত ধর্মবোধ হল সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ। প্রকৃত ধর্মবোধ ও নীতিবোধের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

সিদ্ধান্ত :

(পূর্বোক্ত বিভিন্ন সমাজ-দার্শনিকদের অভিমতের উপর ভিত্তি করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সমাজের অগ্রগতির একটা জাগতিক (Material) দিক আছে এবং একটা মানসিক (Psychical) দিক আছে। সমাজের জাগতিক অগ্রগতি বা পার্থিব কল্যাণ বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের দ্বারা সমাজের ধনসম্পদের বৃদ্ধি, মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সাহায্যে মানুষের কল্যাণ সাধন, উন্নত জীবনযাত্রার মান, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে তুলে সামাজিক একতার বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার সাহায্যে সুস্থ, সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি যার ফলে ব্যক্তির সৃজনীপ্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ ঘটে থাকে।) কিন্তু এ ছাড়াও সামাজিক অগ্রগতির একটা মানসিক দিক আছে ।

(সমাজের অগ্রগতি বাইরের পরিবেশ অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করলেও আসলে এই অগ্রগতি সমাজস্থ ব্যক্তির নৈতিক অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল। ধর্মবোধ ও নৈতিক আদর্শ সামনে রেখে সমাজস্থ মানুষ যখন জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যগুলিকে মর্যাদা দিতে শিখবে, সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের কথা চিন্তা করে নিজের স্বার্থসিদ্ধিকে উপেক্ষা করবে, আত্মকেন্দ্রিকতাকে পরিহার করে অন্যান্য সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিত্রতার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে মানবতার আদর্শকে লাভ করার জন্য চেষ্টা করবে, তখনই হবে সমাজের অগ্রগতি।)

ধর্মবোধ ও নৈতিক উন্নতির দ্বারাই সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব

সুতরাং সমাজের অগ্রগতি কেবলমাত্র তার বাহ্যিক ধন-সম্পদের বৃদ্ধি বা সমাজের আয়তন বৃদ্ধি বা সমাজের বাহ্যিক বিস্তৃতি বোঝায় না; সামাজিক অগ্রগতি হল নৈতিক অগ্রগতি, নৈতিক মূল্যের সম্যক উপলব্ধি।

১৩। সামাজিক অগ্রগতির প্রসারণ এবং গভীরতা (Extensive and Intensive Aspects of Social Progress) :

সামাজিক অগ্রগতির দুটি দিক আছে, একটি তার প্রসারণের দিক এবং অপরটি তার গভীরতার দিক। সমাজের অগ্রগতির প্রসারণের দিক বলতে

আমরা বুঝি জনকল্যাণের বিস্তৃতি, অর্থাৎ সমাজস্থ কত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে জনকল্যাণের আদর্শটিকে প্রসারিত করা গেল। যখনই কোন সমাজ একটি স্তর থেকে আর একটি স্তরে উন্নীত হবে তখনই প্রয়োজন জনকল্যাণের ক্ষেত্রটিকে বিস্তৃত করা। সমাজের মধ্যে একাধিক সামাজিক গোষ্ঠী বর্তমান। যদি কোন সমাজ অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থকে উপেক্ষা করে কোন একটি বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর মঙ্গলসাধনে ব্রতী হয়, তাহলে তার দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে পড়ে একান্ত সংকীর্ণ। কিন্তু সমাজের যতই অগ্রগতি হয়, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর উপর সীমাবদ্ধ না থেকে ধীরে ধীরে প্রসারিত বা বিস্তৃত হয় এবং সমস্ত মানবতার মধ্যেই জনকল্যাণের আদর্শটিকে উপলব্ধি করার জন্য সচেষ্ট হয়।

এ ছাড়াও সামাজিক অগ্রগতির একটা গভীরতার দিক আছে। এ দিকটি পরিস্ফুট হয় যখন ব্যক্তি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের সঙ্গে নিজের কল্যাণকে অভিন্ন বলে মনে করে। প্রতিটি ব্যক্তিই যদি সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণকেই নিজের কল্যাণ বলে মনে করে এবং সমগ্র সমাজের কথা ভেবে কাজ করে তাহলে সে সমাজের অগ্রগতি খুব তাড়াতাড়ি সাধিত হয়। বস্তুতঃ, সামাজিক অগ্রগতির মূল উৎস ব্যক্তি-মন। সামাজিক অগ্রগতি নির্ধারণ করার জন্য ব্যক্তি-মনের এ প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। অবশ্য একথা সত্য যে, ব্যক্তির মানসিক প্রবণতা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। তবু ব্যক্তির প্রকাশ্য আচরণের মাধ্যমেই এই মানসিক প্রবণতার কথা অনেক পরিমাণে জানা যেতে পারে।

(ক) সামাজিক অগ্রগতির ব্যাপক দিক (The Extensive Aspect of Social Progress): ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, জনকল্যাণের আদর্শটি প্রথমে কয়েকটি সামাজিক গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করেই সীমাবদ্ধ ছিল। আদিম যুগে মানুষ উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল রক্তের সম্পর্ক এবং তারই ফলে তাদের মধ্যে সমজাতীয় স্বার্থের সৃষ্টি হয়েছিল। উপজাতিদের মধ্যে যেসব নিয়ম-কানুন প্রচলিত আছে সেগুলি থেকেই জানা যায়, কি ভাবে এই সব উপজাতির

অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের এসব নিয়মগুলিকে কঠোরভাবে পালন করে সাধারণের স্বার্থকে রক্ষা করতে হত। সে সময় এক একটি সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকত।

ক্রমশঃ এসব বিভিন্ন উপজাতি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে জাতি এবং বৃহত্তর জাতিতে পরিণত হল, এর ফলে সাধারণের স্বার্থের পরিধি অনেক বেশী বিস্তৃত হয়ে পড়ল। সাধারণ নিয়ম এবং প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল, মানুষের মধ্যে সামাজিক চেতনা আরও বেশী তীব্রভাবে দেখা দিল। কিন্তু জাতীয়তারও দৃষ্টিভঙ্গী সীমিত। ভৌগোলিক সান্নিধ্য এবং ভাষাগত স্বার্থ মানবতার স্বার্থকে খণ্ডিত করল। তাই মানুষ চাইল এই জাতীয়তার বাধাকে ভেঙে দিয়ে বিশ্বমানবতার আদর্শকে লাভ করতে; মানুষের মধ্যে এমন কতকগুলি আন্তর্জাতিক শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল যার ফলে মানুষ চাইল এই জাতীয়তার গণ্ডি ভেঙে দিয়ে এক আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে—এক মানুষ, এক জাতি—এই আদর্শ লাভ করতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) মানুষের মধ্যে এই সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল যাতে মানুষ নিজ নিজ জাতির সীমিত স্বার্থের গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে বৃহত্তর মানবজাতির স্বার্থের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে

অনেকে মনে করেন, সমাজের অগ্রগতির জন্য প্রতিটি স্তরকে পরবর্তী বৃহত্তর স্তরের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশে যেতে হবে। এ ধারণা একান্তই ভ্রান্ত। যে কোন উপজাতি নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে জাতির অংশ হিসেবে বর্তমান থাকতে পারে এবং সেই ভাবে বিভিন্ন জাতি নিজ বৈশিষ্ট্যের অনেকখানি বজায় রেখেও আন্তর্জাতিক আদর্শ লাভ করতে পারে।

(খ) সামাজিক অগ্রগতির গভীরতার দিক (The Intensive Aspect of Social Progress): বস্তুতঃ, সামাজিক অগ্রগতির গভীরতার দিকটি (Intensive aspects) তার প্রসারণের দিকটির (Extensive aspect) সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। সমাজ যখন অগ্রগতির পথে এক একটি স্তর অতিক্রম করে, তখন সমষ্টিগত স্বার্থের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের

সামাজিক চেতনারও তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সামাজিক চেতনার তীব্রতা প্রথমতঃ সমাজ-জীবনের প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে এবং সেগুলি রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ, এই সামাজিক চেতনা নাগরিকদের দায়িত্ববোধ এবং কর্তব্যবোধ সম্পর্কীয় সচেতনতাকে আরও তীব্র করে তোলে। তারই ফলে নতুন নতুন নিয়ম-কানুন প্রণীত হয়। কিন্তু এতে সমাজের সভ্যদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় না। মানুষ ক্রমশঃ উপলব্ধি করে যে, তার স্বার্থ সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত এবং জনকল্যাণের সঙ্গে নিজের কল্যাণকে সে অভিন্ন বলে মনে করে।

১৪। সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে যা সহায়ক ও প্রতিবন্ধক (Hindrances and Aids to Social Progress) :

সমাজ যখন তার লক্ষ্য বা আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে, তখন সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির পথে যে, কোন প্রতিবন্ধক দেখা দেয় না, তা নয়। সময় সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যা সমাজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দেয়।

যেহেতু সামাজিক অগ্রগতি জাগতিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর সেহেতু যে অবস্থাগুলি সমাজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করে সেগুলি জাগতিক ও মানসিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কুসংস্কার, প্রাচীন রীতি-নীতির প্রতি বিচারবিযুক্ত আনুগত্য, ধর্মান্ধতা, সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের ব্যর্থতা, সমাজস্থ ব্যক্তিদের মনে গঠনমূলক চিন্তার উন্মেষে বাধা সঞ্চার করে সামাজিক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রতি যে-সমাজ উদাসীন, যে-সমাজ সামাজিক জীবনের পরিবর্তিত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন সাধন করে না, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করে না, সে-সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। গোষ্ঠী-সংঘাত,

সামাজিক অবস্থার পক্ষে যেসব অবস্থা প্রতিবন্ধক

সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রীতির সম্পর্কের অভাব, সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক চেতনার অভাব, সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনে সমাজস্থ ব্যক্তিদের উদাসীনতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, গুলি সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত করে। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব, মন্দ শাসন বা, ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক আদর্শও সমাজের অগ্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধক।

বিজ্ঞানের উন্নতি [illegible] পক্ষে, সুতরাং সমাজের অগ্রগতির [illegible] সহায়ক হতে পারে। বিজ্ঞানের সাহায্যে কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করা চলে এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের জাগতিক [illegible] উন্নতি সাধন করা চলে। যদি সমাজস্থ ব্যক্তিদের জাগতিক প্রয়োজন মেটে তবে সংগঠনমূলক চিন্তার অবকাশ ঘটে এবং জীবনের উচ্চতর প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য ব্যক্তিরা সচেষ্ট হতে পারে। সামাজিক অগ্রগতি [illegible] উন্নতি ছাড়াও ব্যক্তির মানসিক উন্নতির উপর নির্ভর। কাজেই সমাজস্থ ব্যক্তির শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন।

সামাজিক অগ্রগতির [illegible] ব্যবস্থা [illegible]

সাধারণ লেখাপড়া ছাড়াও প্রতিটি ব্যক্তি যাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাহায্যে কোন বৃত্তির জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে তার দিকেও সমাজের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শিক্ষা কেবল ব্যক্তির বুদ্ধিগত উন্নতি সাধিত করে তা নয়, তাকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে সচেতন করে। যদি সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করে, তাহলে সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে না। কাজেই উপযুক্ত শিক্ষা সমাজের অগ্রগতির পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক। উপযুক্ত সামাজিক আদর্শও সমাজের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে। উপযুক্ত নেতৃত্ব, সুন্দর শাসন ব্যবস্থাও সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক চেতনার উন্মেষ। সমাজস্থ ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক চেতনা জাগ্রত হলে, তারা সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয় এবং তখনই সমাজের অগ্রগতির পথে যেসব প্রতিবন্ধক দেখা দেয় সেগুলি দূরীভূত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

১। মনুষ্য-সমাজ অহরহঃ পরিবর্তনশীল। পার্থিব, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সমাজের রূপ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ধারাকে তিনটি মতানুসারে তিনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম মতানুসারে সামাজিক পরিবর্তন একাভিমুখী, দ্বিতীয় মতানুসারে সামাজিক পরিবর্তন ঘড়ির দোলকের মতো পুনরাবির্ভাবশীল ও তৃতীয় মতানুসারে সামাজিক পরিবর্তন বিবর্তনমূলক।

সমাজের ক্রমোন্নতি চারিটি বিষয়ের অগ্রগতির দ্বারা সূচিত হয়, যথা—মাত্রা অর্থাৎ জনসংখ্যার বৃদ্ধি, দক্ষতা অর্থাৎ সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিভিন্ন কাজের সমন্বয়; স্বাধীনতা অর্থাৎ ব্যক্তিদের স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজের সুযোগ এবং পারস্পরিকতা অর্থাৎ সামাজিক লক্ষ্যসাধন বিষয়ে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ। অবশ্য এ চারিটি বিষয়ে সমান অগ্রগমন সাধারণত: সম্ভব নয়; তাই সামাজিক উন্নতি এক বা একাধিক বিষয়ে আংশিকভাবে সাধিত হয় অনেকের মতে সমাজের মধ্যে বিরোধী শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর সামাজিক ক্রমোন্নতি নির্ভর করে; তা ঠিক নয়। সামঞ্জস্যের মারফতেই সমাজের উন্নতি হয় এবং সমাজস্থ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা লাভ করে। বস্তুতঃ, সামাজিক উন্নতি ও নৈতিক উন্নতি শেষ পর্যন্ত এক ও অভিন্ন। কেউ কেউ বলেন, সমাজবিজ্ঞানে নৈতিক আদর্শের কোন স্থান নেই। কিন্তু সামাজিক উন্নতি বিচার করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানের স্তর অতিক্রম করে আমরা সমাজদর্শনের ক্ষেত্রে চলে যাই। সামাজিক বিধি হচ্ছে নৈতিক বিধিরই এক দিক, ফলে, সামাজিক ক্রমোন্নতি ও নৈতিক ক্রমোন্নতি এক হয়ে যাচ্ছে।

২। সামাজিক ক্রমোন্নতি কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভর করে এবং শর্তগুলি পৃথক নয়, অর্থাৎ এরা একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল। (ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কীয় শর্ত মানুষের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, আবার সহায়তাও করতে পারে; তার দেহের গঠন ও কর্মক্ষমতার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল হতে পারে এবং তাকে অপর সমাজে মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দিতে পারে বা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। (খ) অনেকের মতে সামাজিক ক্রমোন্নতির যৌক্তিক শর্তাবলী হচ্ছে 'জীবন-সংগ্রাম' ও 'যোগ্যতমের বাঁচার অধিকার'। কিন্তু 'ন্যায়পরতা' ও দুর্বলকে রক্ষা মনুষ্যসমাজের ক্রমোন্নতির পক্ষে অপরিহার্য। অনেকের মতে সামাজিক গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংগ্রাম সামাজিক ক্রমোন্নতির শর্ত। কিন্তু বহু গোষ্ঠীর একত্রীকরণের মাধ্যমে সমাজ-জীবনের বিবৃতির দ্বারাই সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব। কেউ কেউ সন্তানের উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া গুণের উপর জোর দেন এবং উপযুক্ত মাতাপিতার নির্বাচন সামাজিক ক্রমোন্নতির পক্ষে প্রয়োজন মনে করেন। কিন্তু ব্যক্তির অর্জিত বিচিত্র গুণ, এ সামাজিক চেতনা ছাড়া সামাজিক ক্রমোন্নতি সম্ভব নয়। (গ) সামাজিক ক্রমোন্নতির মনস্তত্ত্বমূলক শর্ত হচ্ছে কতকগুলি মূল স্বার্থকে অর্জন করার জন্য বিচার-বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা। আত্ম-স্বার্থ, সামাজিক স্বার্থ, জ্ঞানমূলক স্বার্থ, এবং গঠনমূলক স্বার্থের সংমিশ্রণে যে পারস্পরিক

সহানুভূতির সৃষ্টি হয় তাই মানুষের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত রাখে। (ঘ) সামাজিক ক্রমোন্নতির মনোবিদ্যা-সম্পর্কীয় শর্ত হচ্ছে সামাজিক চেতনা বা সাধারণ ইচ্ছা যা মানুষের ধর্মবোধ ও ন্যায়বোধের সঙ্গে যুক্ত। সামাজিক ক্রমোন্নতি ও নৈতিক ক্রমোন্নতি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।

৩। বিবর্তন বলতে বুঝায় যা অব্যক্ত ও অপরিস্ফুট তার ক্রমিক প্রকাশ। বিবর্তনবাদ অনুসারে জগতের যাবতীয় বস্তু বিবর্তন-জাত। বিবর্তন প্রণার বৈশিষ্ট্য তিনটি—ঐক্য-বিধান, পৃথকীকরণ ও নিয়মানুগত্য। সমাজ বিবর্তনে এ বৈশিষ্ট্যগুলি এভাবে প্রকাশিত হয়েছে,

(ক) অধিকতর শ্রমবিভাগ; (খ) সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের বৃদ্ধি, এবং (গ) সামাজিক যোগাযোগ প্রথার বৈচিত্র্য ও সৌকর্য। সমাজ-বিবর্তন আসলে সমাজস্থ ব্যক্তির বিবর্তন এবং এ বিবর্তনে মানুষের চিন্তা, সামাজিক চেতনা ও আদর্শবোধই অধিক ক্রিয়াশীল, যদিও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়।

৪। সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি অভিন্ন নয়। বিবর্তন হল ক্রমবিকাশ, অগ্রগতি হল কোন আদর্শাভিমুখে অগ্রগমন। বিবর্তন হল বৈজ্ঞানিক ধারণা আর অগ্রগতি নৈতিক ধারণা। অবশ্য সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি পৃথক হলেও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

৫। আদর্শ ছাড়া অগ্রগতি সম্ভব নয়। এজন্য সামাজিক আদর্শ ও সামাজিক অগ্রগতি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ও পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। সামাজিক মূল্যের অর্জনই সামাজিক অগ্রগতি নির্ণয় করে।

৬। আদর্শ সমাজকে লক্ষ্য করেই সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব। এ আদর্শ সমাজের ভিত্তি হল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা এবং সমষ্টিগত কল্যাণই ঐ সমাজের লক্ষ্য। ঐ সমাজে ব্যক্তির পার্থিব, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সবরকম পূর্তিলাভের পূর্ণ সুযোগ সম্ভব। নৈতিক মূল্যকে বাদ দিয়ে সামাজিক ক্রমোন্নতি সম্ভব নয়।

৭। সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ড বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে নির্ণয় করেছেন। ম্যাকেঞ্জি বলেন, তিন প্রকার নিয়ন্ত্রণের মারফত সামাজিক অগ্রগতি নির্ণীত হয়, যথা—(ক) প্রকৃতির শক্তির উপর মানুষের প্রভুত্ব, (খ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং (গ) সমাজস্থ ব্যক্তির আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত নৈতিক আদর্শই হল সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ড।

৮। সামাজিক অগ্রগতির দুটি দিক আছে, প্রসারণ ও গভীরতা। প্রসারণের দিক থেকে সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ গোষ্ঠী থেকে শুরু হয়ে সম্প্রদায়, জাতি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। গভীরতার দিক থেকে সামাজিক অগ্রগতি সামাজিক চেতনা বা জনকল্যাণ সাধনের ইচ্ছারূপে ব্যক্তি-মনে ক্রমশঃ স্বাভাবিক প্রবণতায় পরিণত হয়।

৯। সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক অবস্থা হল, বিজ্ঞানের উন্নতি, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, ব্যক্তির উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা, ব্যক্তির মনে নৈতিক ও সামাজিক চেতনার সঞ্চার, উপযুক্ত সামাজিক আদর্শ ইত্যাদি। সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধক হল কুসংস্কার, প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য, ব্যক্তির মনে সামাজিক ও নৈতিক চেতনার অভাব, বিজ্ঞানের প্রতি অভাব, প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়, মন্দ শাসনব্যবস্থা, ত্রুটিযুক্ত সামাজিক আদর্শ ইত্যাদি।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সামাজিক সত্তা ও লোকায়ত নীতিতত্ত্ব

(The Social Self and the Ethos of the People)

১। সামাজিক সত্তা (The Social Self):

যদিও মানুষের সত্তা এক ও অভিন্ন, তবু আমরা মানুষের দুটি স্বতন্ত্র সত্তার কথা বলে থাকি। একটি হল তার ব্যক্তিগত সত্তা (Private self) এবং অপরটি হল তার সামাজিক সত্তা (Social self)। ইচ্ছা, আবেগ, অনুভূতি ও বিচারবুদ্ধি নিয়ে মানুষের এক নিজস্ব সত্তা আছে যার জন্য সমাজের মধ্যে বাস করেও সে তার স্বাতন্ত্র্য হারায় না। তার একটা ব্যক্তিগত সত্তা আছে যার জন্য সমাজের অন্য দশজনের থেকে সে পৃথক। কিন্তু এ ছাড়াও তার একটা সামাজিক সত্তা আছে। সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তি-সত্তার উপর প্রভাব বিস্তার করে তার সামাজিক সত্তাকে গড়ে তোলে। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের স্বীকৃতির মাধ্যমেই তার এই সামাজিক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এর ফলে সমাজের অন্য সকলের মনোযোগ তার প্রতি আকর্ষিত হয় ও সমাজস্থ অন্যান্য ব্যক্তির সম্পর্ক তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। সে চায় সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সাধন করতে। সমাজের অন্যান্য সকলের সাহচর্যে সে নিজের সত্তাকে বিকশিত করতে চায়।

মানুষ তার সামাজিক সত্তার মাধ্যমেই সমাজের বিভিন্ন কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। অপরের চোখে মানুষ যা, তার মাধ্যমেই তার সামাজিক সত্তা সূচিত হয়। সে কারণে সামাজিক জনমত অগ্রাহ্য করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই সামাজিক সত্তার মাধ্যমেই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক।

মানুষের যে দুটি প্রধান ধর্ম, জীববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি তার দিকে তাকিয়ে আমরা মানুষের ইন্দ্রিয়ময় সত্তা (Sensuous Self) এবং বুদ্ধিময় সত্তার (Rational Self) কথা বলে থাকি। ইন্দ্রিয়ময় সত্তার দ্বারা মানুষের জীববৃত্তি, অর্থাৎ তার ইন্দ্রিয়, আবেগ, অনুভূতির দিকটিকে বুঝি এবং বুদ্ধিময় সত্তার দ্বারা মানুষের বিচারবুদ্ধির দিকটিকে বুঝি। মানুষ যখন নিজের আবেগ, অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়কে বড় করে দেখে তখন সে একক, সে নিছক আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করে এবং তখন তার সত্তা হল ইন্দ্রিয়ময় সত্তা। মানুষের বুদ্ধিময় সত্তাই হল তার সামাজিক সত্তা (Social Self), কারণ এই বুদ্ধিবৃত্তিই মানুষের সামাজিক চেতনার বিকাশ সাধন করে মানুষের সামাজিক সত্তাকে গড়ে তোলে।

ব্যক্তির বুদ্ধিময় সত্তাই সামাজিক সত্তা

প্রশ্ন হল, মানুষের পরমকল্যাণের স্বরূপ কি? নীতিবিজ্ঞান বলে মানুষের পরমকল্যাণ হল আত্মোপলব্ধি (Self-realisation)। এই আত্মোপলব্ধি মানুষের তখনই আসে যখন মানুষ তার নিম্নতম সত্তাকে (Lower Self) নিয়ন্ত্রিত করে তার উচ্চতর সত্তাকে (Higher Self) উপলব্ধি করতে চায়। নিম্নতর সত্তা হল তার ইন্দ্রিয়ময় সত্তা; উচ্চতর সত্তা হল তার বুদ্ধিময় সত্তা এবং এই বুদ্ধিময় সত্তাই হল তার সামাজিক সত্তা। সমাজের মধ্যে থেকেই এই বুদ্ধিময় সত্তা অর্থাৎ সামাজিক সত্তাকে উপলব্ধি করা সম্ভব। মানুষ নিজের স্বাতন্ত্র্যকে প্রাধান্য না দিয়ে যখন সমাজের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে বা জাতির সঙ্গে বা সমস্ত মানবতার সঙ্গে নিজের সত্তাকে মিশিয়ে দেয় তখনই সে তার সামাজিক সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে।

আমরা দেখেছি, মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ সামাজিক কল্যাণ বা জনকল্যাণের বিরোধী নয়। সমাজের মধ্যে থেকে ব্যক্তি যদি অন্যান্য ব্যক্তি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তার নিজের কল্যাণ লাভ করতে চায়, তবে সে কখনই নিজের কল্যাণ লাভ করতে পারে না। অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধিতা করে নয়, স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার মাধ্যমেই ব্যক্তি তার নিজের কল্যাণ লাভ করতে পারে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ব্যক্তি নিজেকে বিকশিত করে, তার পূর্ণতাকে লাভ করতে

পারে। নিজের প্রকৃত সত্তা বা বৃহত্তর সত্তার উপলব্ধি হল নিজের ব্যক্তিত্বেরই উপলব্ধি। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল মাধ্যম যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে সহায়তা করে। ব্যক্তির পরম কল্যাণ একাধারে ব্যক্তির নিজস্ব কল্যাণ এবং অপরদিকে সামাজিক কল্যাণ (Social Good)। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "কেবলমাত্র সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন করেই আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তা বা পরম কল্যাণকে উপলব্ধি করতে পারি।[1] সুতরাং মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে দিকটি সামাজিক তাকে উপেক্ষা করা যেতে পারে না। বস্তুতঃ, মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা এবং তার সামাজিক সত্তা মিলেই তার পূর্ণ সত্তা।"

সামাজিক কল্যাণের মাধ্যমেই ব্যক্তির প্রকৃত তথা সামাজিক সত্তার উপলব্ধি হয়

২। লোকায়ত নীতিতত্ত্ব (The Ethos of a People) :

Ethos শব্দটি আসলে একটি গ্রীক শব্দ। Ethos কথাটির অর্থ হল নৈতিক পরিবেশ (Moral Atmosphere), যে নৈতিক পরিবেশে সমাজের শ্রেষ্ঠ লোকেরা বাস করে। একটি জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অভ্যাস, আদর্শ, প্রচলিত নৈতিক মতামত, ভাব, আচরণ ও নির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারাই এই নৈতিক পরিবেশ গঠিত হয়। সাধারণতঃ যে ব্যক্তির আচরণ এই নৈতিক পরিবেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, তিনি সদ্‌ব্যক্তি। যে ব্যক্তি এই নৈতিক পরিবেশকে উপেক্ষা করেন তিনিই মন্দ ব্যক্তি। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "এই লোকায়ত নীতিতত্ত্ব নির্দিষ্ট নিয়ম ও বিধির দ্বারা অংশতঃ গঠিত হয়।"[2] বাইবেলোক্ত ঈশ্বরের দশটি আদেশবাণী ইহুদীদের লোকায়ত নীতিতত্ত্বের একটি প্রধান অংশরূপেই গণ্য হত এবং কিছুটা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে ইউরোপের লোকদেরও লোকায়ত নীতিতত্ত্বের অন্যতম প্রয়োজনীয় অংশরূপে গণ্য হত। কিন্তু এই লোকায়ত নীতিতত্ত্ব যেমন আদর্শ বাণী, নীতি বা বিধির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তেমনই সুনির্দিষ্টভাবে বিধিবদ্ধ নয় এমন কার্যধারা, অভ্যাস ও

সমাজের নীতিনিষ্ঠ বারদের আদর্শ ও আচরণের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশই লোকায়ত নীতিতত্ত্ব

1. "We can realise the true self or the complete good only by realising social ends." —*Mackenzie* : A Manual of Ethics ; Page 275.
2. "The Ethos of a people is partly constituted by definite rules or precepts." —*Ibid* : Page 330.

বিচারের মানদণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যা কোন নির্দিষ্ট সমাজে নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত। কোন ব্যক্তির সদ্‌গুণ একটি জাতির লোকায়ত নীতিতত্ত্ব বা নৈতিক অভ্যাসের দ্বারা অনেকখানি নির্দিষ্ট হয়। লোকায়ত নীতিতত্ত্ব হল লোক-সমাজের নৈতিক কার্যধারার জগৎ। সমাজের অধিকাংশ লোকই সমাজের দ্বারা সাধারণ ভাবে স্বীকৃত নৈতিক নিয়মের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করেই কার্য করে থাকে। ব্যক্তি তার সামাজিক গোষ্ঠীর নৈতিক অভিজ্ঞতার দ্বারা লাভবান হয়। সামাজিক আচার, রীতিনীতি তাদের কাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। গোষ্ঠীর দ্বারা স্বীকৃত নৈতিক নিয়মের প্রভাব চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও উপেক্ষা করতে পারে না।

হেগেল (*Hegel*) বলেন, "শিশু সার্বজনীন লোকায়ত নীতিতত্ত্বেরই স্তন্যপান করে। জ্ঞান এবং সততা জাতির এই লোকায়ত নীতিতত্ত্বের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ জীবন-যাপনের মধ্যেই নিহিত।"[1]

হেগেল (*Hegel*)-এর মতে বিশ্বের মধ্যে যে নৈতিক নিয়ম কাজ করছে লোকায়ত নীতিতত্ত্ব সে নিয়মের প্রকাশ। ব্রাডলে (*Bradley*) এই লোকায়ত নীতিতত্ত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, "নিজের জগতের নৈতিকতাকে ত্যাগ করে যে লোক কোন উচ্চতর নৈতিকতার অনুসন্ধান করে সে নীতিভ্রষ্টতার প্রবেশ-দ্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে" (**The man who seeks to have a higher morality than that of his world is on the thresh-hold of immorality**)। কিন্তু ব্রাডলে (*Bradley*)-র এরূপ উক্তি অত্যুক্তি ছাড়া কিছুই নয়। লোকায়ত নীতিতত্ত্ব গতিশীল অচল বস্তু নয়। সমাজ-জীবনের যেমন বিকাশ আছে লোকায়ত নীতিতত্ত্বের ঠিক তেমনি বিকাশ এবং ক্রমোন্নতি আছে। সমাজে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাঁরা তাদের চারপাশের পরিবেশ নিয়েই সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাঁরা পরিবেশকে উন্নত করতে চান, তাঁরা উচ্চতর আদর্শকে উপলব্ধি করতে চান এবং উচ্চতর জীবনযাত্রার জন্য অভিলাষী হয়ে ওঠেন। তাঁদের অবিরাম প্রচেষ্টার দ্বারাই লোকায়ত নীতিতত্ত্বের ক্রমোন্নতি সাধিত হয়;

1. "The child is suckled at the breast of the Universal Ethos, Wisdom and Virtue consist in living agreeably to the Ethos of one's people."—*Hegel.*

সুতরাং, যেহেতু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা কোন সমাজের নৈতিক পরিবেশের উন্নতি সাধন করা যায়, সেহেতু আমরা দেখি লোকায়ত নীতিতত্ত্ব অচল বা গতিহীন নয়, এর নিয়ত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। একথা সত্য যে, লোকায়ত নীতিতত্ত্ব ব্যক্তির নৈতিক স্বভাবকে উন্নত করে এবং নৈতিক অগ্রগতি সূচিত করে। কিন্তু যে সমাজে এই লোকায়ত নীতিতত্ত্বের মান খুবই নিম্নস্তরের হয়, সে সমাজের নৈতিক ধারণা এবং অভ্যাসও হয় নিম্নস্তরের। ম্যাকেঞ্জি বলেন, "লোকায়ত নীতিতত্ত্ব আমাদের নৈতিক আদর্শের সন্ধান দেয়, তবুও · আমাদের মূল্যবোধের ধারণাকে আরও উন্নত করে ঐ আদর্শকে আরও উচ্চ করা বাঞ্ছনীয়।"[1]

লোকায়ত নীতিতত্ত্ব নিশ্চল নয়—চলধর্মী

যেসব সদ্‌গুণ কোন একটি সমাজের লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে সেগুলি লোকায়ত নীতিতত্ত্বের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় এবং তার পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় যদি সেই লোকগুলির সামাজিক জীবন সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করা যায়।

সংক্ষিপ্তসার

১। ব্যক্তির সামাজিক সত্তা আসলে তার বুদ্ধিময় সত্তা এবং বুদ্ধিময় সত্তাই তার প্রকৃত উচ্চতর সত্তা। সামাজিক কল্যাণ লাভের প্রচেষ্টার দ্বারাই ব্যক্তি তার সামাজিক সত্তাকে উপলব্ধি করে। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সত্তা মিলেই তার পূর্ণ সত্তা।

২। লোকায়ত নীতিতত্ত্ব হল সেই নৈতিক পরিবেশ যেখানে সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা বাস করে। সমাজের নীতিনিষ্ঠ বীরদের আচরণ দ্বারা এই নীতিতত্ত্ব পুষ্টিলাভ করে। কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও কতকগুলি অভ্যাসসিদ্ধ আচার-আচরণের দ্বারা লোকায়ত নীতিতত্ত্ব গঠিত হয়। কিন্তু এর কোন স্থায়ী রূপ নেই। এ হল একটি চলমান আদর্শ যাকে সমাজস্থ ব্যক্তিরা নীতিনিষ্ঠ আচরণের দ্বারা উন্নত ও পুষ্ট করতে পারে।

1. "While, then, it is on the whole true that the Ethos of our people furnishes us with our moral standard, ...yet...it is often desirable to elevate the standard itself by the further development of our conception of Value." —*Mackenzie*: A Manual of Ethics, Page 332.

পরিশিষ্ট

বর্ণাশ্রমধর্ম

(Varnasrma-Dharma)

১। ভূমিকা (Introduction) :

মানুষের জীবনে আমরা এক অদ্ভুত বিরোধিতা লক্ষ্য করি। মানুষের সত্তার দুটি দিকের মধ্যেই এই বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। এই দুটি দিকের মধ্যে একটি হল দৈহিক দিক এবং অপরটি হল আত্মিক দিক। মানুষের দৈহিক দিক তাকে ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য লালায়িত করে, ঘৃণা, বিদ্বেষ, ঈর্ষায় পীড়িত করে এবং ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রণোদিত করে। কিন্তু মানুষের আত্মা স্বভাবতঃই অবিনাশী, অমর, নিত্য ও মুক্ত। মানুষের আত্মা কোন জাগতিক বন্ধন স্বীকার করতে চায় না, জাগতিক কামনা-বাসনার বহু উর্ধ্বে সে বিচরণ করে। বন্ধন দশা থেকে মুক্তিলাভ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। হিন্দুধর্ম মতে ভিন্ন ভিন্ন জীবন পরিগ্রহণ ও দেহধারণের মাধ্যমে এক ক্রমবিকাশের ধারায় এই মুক্তি বা মোক্ষলাভ করা সম্ভব হয়।

মানুষের সত্তার দুটি দিক—দৈহিক ও আত্মিক

এই মোক্ষ অবস্থার পথে দুটি স্তর বা পর্যায়ের উল্লেখ করা হয়। একটি প্রবৃত্তির, অপরটি নিবৃত্তির—একটি ভোগের, অপরটি ত্যাগের। প্রথম অবস্থায় আত্মার ভোগের প্রতি আকুতি জন্মায়, অপর অবস্থায় আত্মা ভোগ থেকে বিরত হয়। যতক্ষণ আত্মা দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে, আত্মা নিজেকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে। আসলে আত্মা দেহ নয় এবং দেহের সঙ্গে আত্মার এই অভিন্নতাবোধ ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু যতদিন আত্মা দেহকে আশ্রয় করে থাকে, দেহের সীমা তাকে মেনে চলতে হয়। এই কারণেই আত্মা দৈহিক সুখের জন্য লালায়িত হয়। দেহাশ্রয়ী আত্মা যদি মোক্ষলাভ করতে চায়, তাহলে তার শ্রেষ্ঠ উপায় হল স্বাভাবিক কামনা, বাসনা, প্রবৃত্তিকে দমন না করে, সংযত

মোক্ষ অবস্থার পথে দুটি স্তর—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

ভাবে, বিচার-বুদ্ধিসম্মত ভাবে জাগতিক বস্তুগুলিকে ভোগ করা। একেই বলা হয় প্রবৃত্তির জীবন এবং আত্মার মোক্ষলাভের ক্রমবিকাশের পথে এই স্তরকে বলা হয় প্রবৃত্তি-মার্গ।

হিন্দুশাস্ত্রে এই প্রবৃত্তি-মার্গের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই মার্গ অনুসরণ করে আত্মা তার সুপ্ত শক্তিকে জাগরিত করতে পারে এবং মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হতে পারে। এই প্রবৃত্তি-মার্গের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে রয়েছে নিবৃত্তি-মার্গ। এই ভোগের পথই ধীরে ধীরে মানুষকে ত্যাগের আধ্যাত্মিক পথের দিকে চালিত করে।

প্রবৃত্তি-মার্গই নিবৃত্তি-মার্গের দিকে চালিত করে

মানুষের জীবনের চারটি কাম্যবস্তু হল কাম বা ভোগ, অর্থ, ধর্ম এবং মোক্ষ। দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য এবং দেহের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা বোধের জন্য মানুষের আত্মা ভোগ বা কামের জন্য লালায়িত হয়। কিন্তু ভোগের জন্য প্রয়োজন ধন, সম্পত্তি, সামাজিক প্রতিপত্তি, অর্থাৎ ভোগের জন্য উপায় হিসেবে অর্থও মানুষের জীবনের অন্যতম কাম্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যে-কোন স্থিতিশীল সমাজে অর্থ সংগ্রহ করার ও তার অধিকারী হওয়ার জন্য সমাজের আচরণ সম্পর্কীয় রীতিনীতিগুলি অনুসরণ করা প্রয়োজন এবং ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে তাই হল ধর্ম বা সততা। সুতরাং ধর্ম বা সততা ব্যক্তির তৃতীয় কাম্যবস্তু। কিন্তু এসব লক্ষ্য বা কাম্যবস্তু ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র, এগুলি জীবনের পরম লক্ষ্য হতে পারে না। একমাত্র মোক্ষলাভের মাধ্যমেই সবরকম দুঃখকষ্টের নিবৃত্তি ঘটে এবং এই মোক্ষকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বা পুরুষার্থ বলে অভিহিত করা হয়।

মানুষের জীবনে কাম্যবস্তু কাম, অর্থ ধর্ম এবং মোক্ষ

বর্ণাশ্রমধর্ম :

চতুরাশ্রম (The Four Asramas or Stages of Life) : ব্যক্তি যাতে তার জীবনের পরম লক্ষ্যকে লাভ করতে পারে, সেকারণে হিন্দুধর্ম ব্যক্তির জীবনের প্রকৃত শিক্ষার এবং বিকাশের জন্য বর্ণাশ্রমধর্মের

প্রবর্তন করেছেন। বস্তুতঃ, এই বর্ণাশ্রমধর্মের মধ্যে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি মার্গের অর্থাৎ ভোগের এবং ত্যাগের এক অপরূপ সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবেই মানুষের জীবনকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে দিয়েছে, সেগুলির দিকে এবং মানুষের জন্মগত ও অর্জিত গুণের এবং মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রতিটি মানুষকে শৈশব বাদ দিয়ে জীবনের চারটি পর্যায় বা স্তর অতিক্রম করতে হয়—যৌবন, পূর্ণবয়স্কত্ব, মধ্যবয়স (পঞ্চাশ বৎসরের পর থেকে জীবনের এই পর্যায় শুরু) এবং বার্ধক্য। প্রতিটি মানুষ সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করে এবং তার মধ্যেই প্রতিপালিত হয়। সুতরাং সামাজিক অবস্থা অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তির নৈতিক জীবনে আমরা চারটি স্তর দেখতে পাই, যে স্তরগুলি ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন স্তরগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই চারটি স্তর হল ব্রহ্মচর্য বা ছাত্রজীবন, গার্হস্থ্য বা পারিবারিক জীবন, বাণপ্রস্থ বা কর্ম থেকে অবসরপ্রাপ্তি এবং সন্ন্যাস বা ভোগবিরতির জীবন। সমাজে অনুরূপভাবে আমরা চারটি শ্রেণী লক্ষ্য করি, কর্ম বা পেশার ভিত্তিতে যাদের প্রথম উদ্ভব ঘটেছিল। এখন এই চারটি শ্রেণী চারটি বর্ণ বা জাতিতে (Caste) রূপান্তরিত হয়েছে; যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই সব বিভিন্ন বর্ণ বা জাতির আচার-আচরণ ও কর্তব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক :

যৌবন, পূর্ণবয়স্কত্ব, মধ্যবয়স এবং বার্ধক্য

(ক) **ব্রহ্মচর্য :** চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রম হল ব্রহ্মচর্য। শিশুকে পাঁচ বা আট বৎসর বয়সে গুরুগৃহে গমন করে গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং মাতাপিতার সাহচার্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অধ্যয়নকাল সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত গুরুগৃহে গুরুর তত্ত্বাবধানে অধ্যয়নে রত থাকতে হয়। গুরুগৃহে বাসকালীন ছাত্র বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করে। ছাত্রকে আত্মসংযমী, মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী ও কঠোর জীবন যাপন করতে হয়। শাস্ত্র অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাকে ব্যায়াম অভ্যাসের দ্বারা শরীরকে মজবুত করে তুলতে হয় এবং কিছু সময় প্রার্থনা ও উপাসনা করতে হয়, নিজের ও গুরুর জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ করতে

ব্রহ্মচর্য

হয়। বস্তুতঃ সংগীত, নৃত্য, অলস গল্পগুজব ও সর্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জন করে সৎ ও সংযত জীবন যাপন করতে হয়। এর ফলে ছাত্রের দেহ ও মন উভয়ই সুগঠিত হয় এবং গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করার জন্য সে উপযুক্ত হয়।

(খ) **গার্হস্থ্য বা পারিবারিক জীবন:** গুরুগৃহে থেকে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে ব্যক্তি নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং বিবাহ করে পারিবারিক জীবনের কর্তব্য ও দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বস্তুতঃ, স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে বিবাহিত জীবন যাপন করা এক পরম কর্তব্য। হিন্দুধর্মের বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র দৈহিক কামনার পরিতৃপ্তি নয়—বিবাহিত জীবন হল আধ্যাত্মিক জীবন। স্বামী ও স্ত্রী পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের আত্মোপলব্ধির ও চারিত্রিক পূর্ণতা লাভ করে এবং তারই মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়। হিন্দুধর্মে বিবাহ একটি ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠান। প্রতিটি গৃহস্থকেই প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হয়। যথা—দেবযজ্ঞ: দেবতার উপাসনা ও ভজনা, পিতৃযজ্ঞ: পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা, ঋষিযজ্ঞ: বেদ, উপনিষদ, ভাগবৎ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র পাঠ করা, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ: অন্যান্য মানুষের ও মনুষ্যেতর জীবের সেবা করা, দানধর্ম করা, হাসপাতাল, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করা। বস্তুতঃ, অতিথিসেবা, দানধর্ম, সাধুতা, মিতব্যয়িতা; জিতেন্দ্রিয়তা, ধর্ম আচরণ ও সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে অনুরাগ প্রভৃতি গুণগুলি প্রতিটি গৃহস্থের অবশ্যই অর্জন করা কর্তব্য।

গার্হস্থ্য

(গ) **বাণপ্রস্থ:** প্রবৃত্তি-মার্গ প্রথম ও দ্বিতীয় আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত। গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্য যথাবিহিত সম্পাদন করার ফলেই ব্যক্তির পরবর্তী দুটি আশ্রমে প্রবেশের অধিকার জন্মায়। পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত গার্হস্থ্য-জীবনের কর্তব্য সমাপন করার পর, ব্যক্তির কর্তব্য সক্রিয় কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে কোন নির্জন পরিবেশে অবসর জীবন যাপন করা। এই অবস্থায় ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য হবে দৈনিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা, নিয়মিত ভাবে ধর্মশাস্ত্র পাঠ করা, সকলের

বাণপ্রস্থ

প্রতি বন্ধুত্বভাবাপন্ন হওয়া, সর্বাবস্থায় ধীরভাবে থাকা, কারও কাছ থেকে কিছু যাচ্ঞা না করা এবং সর্বজীবে দয়া করা।

(ঘ) **সন্ন্যাস :** সন্ন্যাস হল চতুরাশ্রমের শেষ আশ্রম। এই অবস্থায় ব্যক্তি জাগতিক সকল প্রকার ভোগ এমনকি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান থেকেও বিরত হয়ে কেবলমাত্র ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থাকে। এই স্তরে চিত্ত সর্বকামনাশূন্য হয়ে আত্মাতেই অবস্থিতি করে। এই অবস্থায় আত্মা দেহকে আশ্রয় করে থাকলেও সকল প্রকার জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বিরাজ করে এবং ব্যক্তি লোকরক্ষার জন্য অনাসক্তভাবে কর্ম করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, কর্মফলের বাসনা না করে যিনি কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী ; যিনি অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত, কর্মত্যাগী তিনি নন।[1]

সন্ন্যাস

হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণ (The Four Varnas in Hindu Society) **:** কর্ম, গুণ, শ্রম ও বিত্ত অনুসারে সমাজে মানুষের বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বিত্ত অনুসারে মানুষকে নিম্নবিত্ত, উচ্চবিত্ত প্রভৃতি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্যক্তিগত গুণ বা বিদ্যা অনুসারে মানুষকে লেখক, চিকিৎসক, শিল্পী, সাহিত্যিক প্রভৃতি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতেও মানুষের শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। হিন্দু সমাজে আমরা এই সামাজিক শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করি। হিন্দু-সমাজে চারটি বর্ণ বা শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে ; যথা—(১) ব্রাহ্মণ, (২) ক্ষত্রিয়, (৩) বৈশ্য এবং (৪) শূদ্র। জন্ম বা বংশগতি অনুসারে এই শ্রেণী-বিভাগ করা হয়নি। জীবের স্বভাব বা প্রকৃতির গুণ-ভেদবশতঃই বর্ণভেদ ও কর্মভেদ শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। চতুর্বর্ণের উৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্পষ্টই বলা হয়েছে—'চতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'[2] অর্থাৎ গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে প্রাচীন হিন্দু সমাজে গুণ ও কর্ম অনুসারে কোন্ মানুষ কোন্ শ্রেণীর

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র

1. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১ম শ্লোক।
2. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, চতুর্থ অধ্যায়, ১৩ শ্লোক।

অন্তর্ভুক্ত তা নির্ধারণ করা সহজ হত এবং চরিত্রগত ও কর্মগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির বর্ণেরও পরিবর্তন ঘটত। কিন্তু বর্তমান হিন্দু সমাজ বর্ণাশ্রমের এই উৎপত্তির ভিত্তিটুকু সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছে, যার ফলে বর্তমান হিন্দু সমাজে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে চারটি বর্ণ না পেয়ে আমরা চারটি জাতি (caste) দেখতে পাই। বর্তমান জাতিপ্রথা সমাজের সংহতি, ঐক্য ও শক্তিকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে। হিন্দু সমাজের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে হলে এই জাতিপ্রথা দূরীকরণের একান্ত প্রয়োজন। ঋগ্বেদ সংহিতির বিখ্যাত পুরুষ-সূক্তের দ্বাদশ ঋক্-এ বলা হয়েছে, সৃষ্টিকালে পুরুষের (সৃষ্টি কর্তার) মুখ থেকে ব্রাহ্মণের বাহু থেকে ক্ষত্রিয়ের, উরু থেকে বৈশ্যের, পদ থেকে শূদ্রের জন্ম হয়েছিল। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে ব্রাহ্মণের স্থান সমাজে সকলের উঁচুতে। তারপরের স্থান হল ক্ষত্রিয়ের, তার নীচে বৈশ্যের এবং সকলের নীচে শূদ্রের। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে যে বর্ণের স্থান অন্য বর্ণের আগে, সেই বর্ণের মধ্যে অন্য বর্ণের তুলনায় উচ্চতর গুণের উপস্থিতি রয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের কর্মসমূহ স্বভাবজাত গুণের দ্বারা বিভক্ত এবং এদের এক এক জনের স্বভাবে এক একটি গুণের প্রাধান্য। ব্রাহ্মণেরা সত্ত্ব প্রধান, ক্ষত্রিয়গণ ও বৈশ্যগণ রজঃপ্রধান এবং শূদ্রগণ তমপ্রধান। শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, আত্মতত্ত্বানুভব এবং পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম; শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, কর্মকুশলতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দানে মুক্তহস্ততা ও ঈশ্বর ভাব ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম; কৃষি, গো-রক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম এবং উচ্চতর বর্ণের পরিচর্যা করা শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম। মানুষ নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে তার ব্যক্তিগত কল্যাণ এবং সামাজিক কল্যাণ লাভ করতে পারে। নিজের নির্দিষ্ট কর্তব্য পরিত্যাগ করে অপরের কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত নয়। পরধর্ম যতই ভালরূপে অনুষ্ঠিত হোক তার তুলনায় দোষযুক্ত স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম আচরণই শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ। সকলেরই স্বধর্ম পালন করা উচিত। মানুষ স্বধর্ম পালন করেই পরম সিদ্ধিলাভ করতে পারে। প্রতিটি মানুষের স্বধর্ম কোনটি তা নির্ধারণ করতে হলে তার গুণ ও

স্বধর্ম

কর্ম অনুসারেই তা নির্ধারণ করতে হবে এবং এই স্বধর্ম নির্ধারণ করতে পারলে ব্যক্তিকে আর তার স্বভাব বহির্ভূত কার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয় না।

বর্ণাশ্রমধর্ম ব্যবস্থিত বিভিন্ন স্তরগুলিকে একের পর এক অনুসরণ করতে হবে, নতুবা সমাজের শান্তি, ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হবে। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই সাধারণ নিয়মভঙ্গ করা চলে—কোন কোন ব্যক্তি পূর্ব জন্মের সুকৃতির ফলে প্রথম থেকেই সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করতে পারেন।

মন্তব্য :

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক জাতিভেদ এবং হিন্দুশাস্ত্রের প্রাচীন বর্ণভেদ—এ দুটি ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা। 'বর্ণভেদ মূলতঃ গুণানুগত—জাতিভেদ সম্পূর্ণ বংশানুগত'। বর্ণাশ্রমধর্মের যে অনেক গুণ আছে তা অস্বীকার করা চলে না, তবে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণাশ্রমটিকে টিঁকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। হিন্দু সমাজের প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, কাজেই প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্ম বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অচল। অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সামাজিক কারণে বর্তমানে কোন বিশেষ বয়সে ছাত্রকে গুরুগৃহে পাঠান সম্ভব হয় না। তাকে জীবিকার জন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। শিক্ষা সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করাও সব সময় অর্থনৈতিক কারণে সম্ভব হয় না। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাই যে বর্ণাশ্রমধর্মের তুলনায় ভাল, তা বলা চলে না।

জাতিভেদ প্রথা দূরিকরণ

তবে সমাজের পরিবর্তনকে অস্বীকার করা চলে না। বর্ণভেদের যে মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, জাতিভেদ প্রথার দ্বারা বর্তমানে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, পরন্তু পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা সঞ্চারিত হয়ে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক কলুষিত হয়। জাতিভেদ প্রথা সমাজের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করে: হিন্দু সমাজের সংহতি, ঐক্য ও মহান ঐতিহ্যকে যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে এই জাতিভেদ প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করা একান্ত কর্তব্য।
